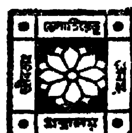
# পশ্চাৎপট



গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭৩

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ : ৭ই জুলাই, ১৯৫৮

প্রচ্ছদ রূপায়ণে :
রূপায়ণ
কলকাতা-৫

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

পশ্চাৎপট

## মণিহারী

যাহা নাই তাহার কথা লিখিতে বসিয়াছি।

অনেকে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি যেন এইবার আমার জীবন-চরিত লিখি। লিখিতে বসিয়া কিন্তু প্রথমেই একটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। আমার জীবন-চরিতে 'আমার' কতটুকু? আমি তো আমার পিতামাতার সৃষ্ট জীব। তাঁহারাই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, লালন-পালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, মেডিকেল কলেজে পড়াইয়া ডাক্তার করিয়া দিয়াছেন এবং বিবাহ দিয়া আমাকে আমার জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া সংসারে স্থাপন করিয়াছেন। এ-সবের মধ্যে 'আমার' কৃতিত্ব কতটুকু? আমার প্রতিভা? আমার প্রতিভা যদি কিছু থাকিয়াই থাকে (যদি বলিতেছি এই জন্য যে, অনেক সমালোচক আমার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পান না), তাহা হইলে সে-প্রতিভার জন্যও আমি এমন একটা অদৃশ্য শক্তির কাছে ঋণী যাহার দিব্য প্রভাবের বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত হইলেও তাহার অস্তিত্বের নিকট আমাকে ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং আমার জীবন-চরিত লিখিতে গিয়া দেখিতেছি আমার জীবন-চরিতে 'আমার' বলিয়া আস্ফালন করিবার মতো কিছুই নাই। আমি সংসারের [illegible] পড়িয়া 'আঁকুপাঁকু' করিয়াছি মাত্র। তাহার ইতিহাসই হয়তো আমার জীবন-চরিত। আমার এই আঁকুপাঁকু করার ইতিহাসও আমার অনেক গল্প-কাহিনীতে বিবৃত হইয়া আছে। তাহা ছাড়া সব কথা এখন মনেও নাই। আগামী ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৮৪ সালে আমি আটাত্তর বৎসরে পা দিব। এতদিনের সব স্মৃতি মনে থাকা সম্ভব নয়। যেটুকু মনে আছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। সন-তারিখও খুব সম্ভব নির্ভুল হইবে না। তাহা ছাড়া আমার জীবন সম্বন্ধে কেহ কেহ কিছু কিছু লিখিয়াছেন ইতিপূর্বে, সুতরাং সে-সবের পুনরুক্তি হওয়াও সম্ভব। পাঠক-পাঠিকাদের এই সব কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়া আমি এইবার শুরু হইতে আমার জীবন-কাহিনী আরম্ভ করি।

আমার পিতার নাম স্বর্গীয় ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, আমার মাতা স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবী। আমাদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জিলার শিয়াখালা

গ্রামে। সম্ভবত কোন সময় আমাদের বাস্তুভিটার কাছে কাঁটাবন ছিল। তাই বোধহয় আমাদের পরিবার 'কাঁটাবুনে' মুখুজ্যে নামে খ্যাত। আমার পিতামহ কেদারনাথ ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ তান্ত্রিক কালীসাধক। আমার প্রপিতামহ মহেশচন্দ্র ছিলেন সেকেলে পণ্ডিত। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী শুনিয়াছি। জানি না ইহা কতদূর সত্য। তিনি নাকি কাহাকেও গলায় মালা দিতে অনুমতি দিতেন না। বলিতেন, আমার গলায় একজনই মালা দিয়াছে, অন্য কাহারও মালা আমি লইব না। তাঁহার একটি পায়ে গোদ ছিল। পীড়াপীড় করিলে বলিতেন— নিতান্তই যদি দিতে চাও, এই গোদের উপরই পরাইয়া দাও।

আমার পিতা বাল্যকালেই মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তিনি মামার বাড়ীতে মানুষ হন। তাঁহার মামার কর্মস্থল ছিল সাহেবগঞ্জ। বাবা সেখানে পড়াশোনা করিয়া পরে ক্যামবেল মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারি পাশ করেন। তাহার পর সাহেবগঞ্জের ওপারে মণিহারী গ্রামে গিয়া প্রথমে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসাবে, পরে সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেডিক্যাল অফিসাররূপে ডাক্তারি জীবন আরম্ভ করেন। মণিহারী গ্রাম পূর্ণিয়া জেলায়। প্রথমে তাহা বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত ছিল, পরে বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই মণিহারী গ্রামে ১৩০৬ সালে ৪ঠা শ্রাবণ (ইংরাজি ১৮৯৯ খৃঃ অঃ ১৯শে জুলাই) সন্ধ্যাকালে আমি জন্মগ্রহণ করি।

আমার জন্ম-সময়ের দুই-তিনটি কাহিনী আমার মা-বাবার মুখে শুনিয়াছি। আমার জন্মের কয়েকদিন আগে হইতে এবং জন্মের কয়েকদিন পর পর্যন্ত এমন প্রবল বারিপাত হইয়াছিল যে, গঙ্গার জল, কোশীর জল এবং বৃষ্টির জল মিশিয়া আমাদের বাড়ীর চারিদিকে এত জল জমিয়াছিল যে, আমাদের বাড়ীটি দ্বীপের মতো হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণ নৌকাযোগে আসিয়া নবজাতকের মুখদর্শন করিয়াছিলেন। মণিহারী গ্রাম গঙ্গা নদী ও কোশী নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গঙ্গার জল গৈরিক, কোশীর জল কালো। কোশী নদের এই শাখাটি মণিহারী অঞ্চলে 'কারি' কোশী (কালো কোশী) নামে পরিচিত। বড় হইয়া কৃষ্ণ-গৈরিকের অপরূপ সমন্বয় বহুবার উপভোগ করিয়াছি।

আমার জন্ম-সময়ের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সেই সময় আমাদের বাড়িতে চা' প্রথম প্রবেশ করে। আমার জন্মের খবর পাইয়া আমার পিতৃবন্ধু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সাহেবগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি ধার্মিক ও স্ব-অভিমানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সে যুগের আধুনিক। তি

চা খাইতেন। তাঁহার জামার 'কাট', তাঁহার কার্পেটের 'পামশু' তাঁহার হাতের ছড়ি ও শৌখীন আংটি সকলের মনে ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিত। তিনি আসিয়া দেখিলেন মায়ের একটু জ্বর-ভাব হইয়াছে, শরীর ম্যাজম্যাজ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিধান দিলেন, এক কাপ চা খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ীতে চা ছিল না। মণিহারী ঘাটে লোক পাঠানো হইল। মণিহারী ঘাটের জাহাজে সেকালে 'কেলনার' কোম্পানীর রেষ্টুরেণ্ট থাকিত। সেখানে চা পাওয়া যাইত। তৈরী চা এবং চায়ের পাতাও। প্রমথনাথ সম্ভবত ঘটিতে চা ভিজাইয়া গ্লাসে করিয়া চা পরিবেশন করিয়াছিলেন। কারণ বাড়ীতে চায়ের বাসনপত্রও ছিল না।

আমার শৈশবকালের আর একটি ভয়াবহ ঘটনা মায়ের মুখে শুনিয়াছি। আমি যখন নিতান্ত শিশু তখন আমার বালিশের নীচে একটি সর্প শিশু আবিষ্কার করিয়া মা নাকি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। সাপটিকে কিন্তু মারা যায় নাই। বালিশ সরাইবামাত্র সে দ্রুতবেগে অন্তর্ধান করিয়াছিল।

আমাদের বাড়ীটা গ্রামের বাহিরে একটু 'বুনো' জায়গায় অবস্থিত ছিল। কাছে ছিল পীরবাবার পাহাড়। পীরবাবার পাহাড়ের চারিদিকে বেশ জঙ্গল ছিল। শুনিয়াছি, আমাদের বাড়ির উঠানের ভিতর দিয়া বন্য খরগোস, সাপ, এমন কি বন্য শূকর পর্যন্ত যাতায়াত করিত। একবার একটি নেকড়ে বাঘও নাকি বাহির হইয়াছিল।

খুব ছেলেবেলার কথা আমার মনে নাই। একটা ঘটনা কেবল আবছাভাবে স্মরণ হইতেছে। আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে খানিকটা জায়গা ছিল। সেখানে পরে কয়েকটা পেয়ারা গাছ লাগানো হইয়াছিল। আমাদের বাড়ীটা ছিল বেশ উঁচু জায়গার উপর। বেশ খানিকটা ঢালু দিয়া নামিয়া সেই সরু পায়ে চলা রাস্তাটির উপর নামিতে হইত যে রাস্তাটি বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া গিয়া অবশেষে পীরবাবার পাহাড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ির কেহ আমাকে সে রাস্তায় নামিতে দিত না। আমার মনে হইত সে রাস্তাটি বাঁকিয়া পীরপাহাড়ের ওধারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, না জানি সেখানে কি আছে। মনে পড়িতেছে একটা রহস্যময় স্বপ্ন ঘনাইয়া উঠিয়াছিল আমার কল্পনায়, রূপকথালোকের না জানি কি ঐশ্বর্য ওখানে মূর্ত হইয়া আছে। তখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বছর ছিল। একদিন লুকাইয়া সেই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। দুপুরবেলা। চাকরেরা কেহ কাছে পিঠে ছিল না, মা ঘুমাইতেছিলেন। বাবা 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। আমার ছোট ভাই ভোলাও তখন মায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল। আমি

চুপি চুপি সেই পথে নামিয়া গেলাম। পথের ওপারে চাষের জমি, তাহার ওপারে কোশী। আশেপাশের দৃশ্যের কথা তেমন মনে নাই। একটুকুই শুধু মনে আছে, রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া পীরপাহাড়ের নিকট গিয়াছে সেখানে গিয়া বড়ই হতাশ হইলাম। দেখিলাম ঘেঁটুবনের মাঝখানে একটা বাঁকা বাবলা গাছ দাঁড়াইয়া আছে। রূপকথালোকের কোনও আশ্চর্যজনক অলৌকিকত্ব কিছুই নাই। এরূপ স্বপ্নভঙ্গ আমার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু এই বোধহয় প্রথম।

আমার জীবনের আর একটি কথা এখানেই লিপিবদ্ধ করা উচিত। অতি শৈশবেই আমি খোলা মাঠে এবং খোলা আকাশের নীচে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার ভাই ভোলানাথ আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট। সে যখন মাতৃগর্ভে ছিল তখনই আমি মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে আমাকে মেলিন্স ফুড খাওয়ানো হইত। কিন্তু তাহা আমার পেটে সহ্য হইতেছিল না। এমন সময় এ সমস্যার একটি সমাধান মিলিল। আমাদের তখন অনেক চাষবাস ছিল, জমিতে প্রায় দশ বারোজন কৃষাণ খাটিত। তাহাদের মধ্যে একটি মুসলমান মজুর ছিল। তাহার নাম ছিল চামরু। তাহার তখন একটি মেয়ে হইয়াছিল। চামরুর বউ নাকি একদিন আসিয়া মাকে বলিয়াছিল—'আমার মেয়ে আমার একটা থন-এর (স্তনের) দুধই খেয়ে উঠতে পারে না। আর একটা থন থেকে দুধ এমনি পড়ে যায়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমি খোকাবাবুর জন্যে একটা থন আলাদা করে রেখে দিতে পারি।' বলিয়াছিল অবশ্য ছেকাছেনি ভাষায় হিন্দীতে। মা প্রথমটা নাকি রাজি হন নাই, কিন্তু শেষে আমার পেটে যখন 'মেলিন্স ফুড' কিছুতেই সহিল না তখন রাজি হইয়াছিলেন। চামরুর বউয়ের দুধ খাইয়া আমার শরীরের খুব উন্নতি হইয়াছিল নাকি। মা বলিতেন আমি নাকি এত মোটা হইয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে কোলে তুলিতে পারিতেন না। এসব কথা অবশ্য আমার কিছুই মনে নাই, সবই মায়ের মুখে শুনিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। পরবর্তী কলেজ জীবনে যখন আমি 'লিবারেল' হইয়াছিলাম, অর্থাৎ মুর্গি খাইতে শিখিয়াছিলাম তখন মা বলিতেন—ও ম্লেচ্ছ, হবেই তো! ছেলেবেলায় মুসলমানীর দুধ খেয়েছে যে! মা সেকেলে হিন্দু রমণী ছিলেন। নানারকম বাছ-বিচার ছিল তাঁহার। মুসলমান, খৃষ্টান এমনকি ব্রাহ্মদের স্পর্শ করিলেও তিনি মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ হইতেন। অবশ্য ইহা তাঁহাকে কর্তব্যবিমুখ করে নাই এ প্রমাণও আছে। আমি যখন মেডিকেল

কলেজের সিক্সথ ইয়ারে পড়ি তখন আমার ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছিল। ভালো হইয়া যাইবার পরও রোজ বিকালে একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। তখন আমার চিকিৎসক (ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায) আমাকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। বলিলেন—'তুমি তোমাদের মণিহারী গ্রামে ফিরে যাও। সকালে উঠে তোমাদের আমবাগানে চলে যেও। সেখানেই সমস্ত দিন থেকো। রোজ একটি করে মুর্গি খেও আর তিন চার চামচ কড লিভার অয়েল। আর কোন ওষুধ খাবার দরকার নেই।' আমাদের মৈথিল ঠাকুর ছিল, সে মুর্গি রাঁধিয়া দিতে সম্মত হইল না। মা নিজেই মুর্গি রাঁধিয়া দিতেন, তাহার পর স্নান করিতেন।

খুব ছেলেবেলায় আমাদের চাকরেরা আমাকে চন্দনবাবু বলিয়া ডাকিত। নামটি সম্ভবত চামরুর বউই আমাকে দিয়াছিল। চামরুর বউ প্রায় প্রতিদিনই আমাকে ভ্রমণে লইয়া যাইত। কখনও পাকুড়তলায়, কখনও কাচারিতে, কখনও ফসিয়া-তলায়, কখনও বা রঘুনাথ দয়ালের। খুব অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে, আমি একটি ছোট লাঠি হাতে লইয়া বনে জঙ্গলে শস্যক্ষেত্রে যদৃচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়াইতাম। কেহ আপত্তি করিলে আমি নাকি লাঠি উঁচাইয়া প্রতিবাদ জানাইতাম। মায়ের মুখে শুনিয়াছি আমাদের বৃদ্ধা দাসী ননি 'যামুন দাদির' পিঠে আমার লাঠির বাড়ি প্রায়ই নাকি পড়িত। মোটেই সুবোধ বালক ছিলাম না। বাবার নিকট অনেক রোগী দেশী টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া আসিত। আমাদের সহিস [illegible] আমাকে রোজ একটা না একটা ঘোড়ার উপর চড়াইয়া হাটের উপর টহল দিত। না দিলে আমি নাকি খুব কান্নাকাটি করিতাম। আমাদেরও দুইটা ঘোড়া ছিল, বাবা দূরে যাইতে হইলে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন। কিন্তু সে ঘোড়া দুইটি বেশ বড় জাতের ঘোড়া, পাহাড়ী ঘোড়া। পচনা তাহাদের পিঠে আমায় চড়াইতে সাহস করিত না। বাবা যখন কোথাও বাহিরে যাইতেন, তখন তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য আমি খুব বায়না করিতাম। বাবা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁহার কোলের কাছে সামনে বসাইয়া কিছুদূর লইয়া গিয়া আবার নামাইয়া দিতেন, ইহার একটা অস্পষ্ট ছবি মনে জাগিতেছে। তখন আমার বয়স কত ছিল মনে নাই, সম্ভবত ছয় সাত বৎসর। এই সময়কার আরও কয়েকটি আবছা ছবি মনে আছে। কয়েকটি কুকুরছানা, কয়েকটি খরগোস (দেশী এবং বিলাতী), একঝাঁক পায়রা, শালিক পাখী, টিয়া পাখী আর এক খাঁচা শাদা বিলাতী ইঁদুর। জীবজন্তু পোষার খুব ঝোঁক ছিল ছেলেবেলায়। ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই ছেলেবেলায় অনেক উৎসাহ

উদ্দীপনা অনেক হর্ষ বিষাদ আমার চিত্তকে আবর্তিত করিয়াছে। কুকুরগুলি অবশ্য সবই প্রায় দেশী কুকুর ছিল। গ্রামে কোথাও কুকুরের বাচ্চা হইয়াছে শুনিলেই সেখানে যাইতাম এবং একটি বাচ্চাকে মনোনীত করিয়া আসিতাম। তাহার পর প্রত্যহ গিয়া দেখিতাম বাচ্চাটিকে। প্রায় মাসখানেক পরে দুধ ছাড়িবার পর তাহাকে বগলদাবা করিয়া বাড়ি লইয়া আসিতাম একদিন। তাহার পর তাহাকে তেজী করিবার জন্য তাহার গলায় একটি দড়ি বাঁধিয়া উঠানের একধারে বাঁধিয়া রাখিয়া দিতাম। সে তারস্বরে নানা গ্রামে চিৎকার করিতে থাকিত। তাহাকে লইয়াই সারাদিন ব্যস্ত থাকিতাম। তাহার পর ক্রমশঃ তাহার সহিত ভাব হইয়া যাইত। মা সাধারণত কুকুরকে ঘরে বা বারান্দায় ঢুকিতে দিতেন না। রাত্রে অবশ্য বারান্দার একধারে একটা কেরোসিন কাঠের বাকসে তাহাকে শুইতে দিতাম, মা তাহাতে আপত্তি করিতেন না। ছেলেবেলার কয়েকটি কুকুরের নাম এখনও মনে আছে। বাঘা, কার্লো, টম। বাঘা ছিল হলদে রঙের কুকুর, গায়ে মাঝে মাঝে কালোর ছিটেফোঁটা ছিল। বাঘার কথা খুব স্পষ্ট মনে পড়িতেছে না। মা নাকি বাঘাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতেন। সে একাদশীর দিন উপবাস করিত। মায়ের ধারণা ছিল বাঘা কোন অভিশাপগ্রস্ত মহাপুরুষ। কার্লোর কথা খুব মনে আছে। কালো রঙের বেশ বলিষ্ঠ কুকুর ছিল সে। মুখটা খুব সূচালো, কান দুইটি খাড়া খাড়া। পচনা সহিস তাহাকে বুনো শুয়োরের চর্বি খাওয়াইয়াছিল। পচনার ধারণা ছিল কার্লোর বলিষ্ঠতা, সাহসিকতা ও তেজস্বিতা সবই নাকি ওই বুনো শুয়োরের চর্বি হইতে উদ্ভূত। কালো সত্যই খুব তেজী কুকুর ছিল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে পাড়ার সব কুকুরকে পরাজিত করিয়া 'চ্যাম্পিয়ন' হইয়াছিল। পাড়ার কোন কুকুর পারতপক্ষে তাহার সম্মুখীন হইত না। দৈবাৎ হইয়া পড়িলে মাথা নীচু করিয়া পিছনের পা দুটির ভিতর লেজ ঢুকাইয়া অত্যন্ত করুণভাবে বশ্যতা স্বীকার করিত। কার্লোর বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রধানত দেখা যাইত ছাগলদের বিরুদ্ধে। আমাদের বাড়ীর হাতায় সে কোন ছাগলকে ঢুকিতে দিত না। তাহাকে বড় বড় খাসীকে কাৎ করিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি। সে ছুটিয়া গিয়া একেবারে ঘাড় কামড়াইয়া ধরিত। একবার একটা ছোট পাঁঠাকে মারিয়াই ফেলিয়াছিল। আমের সময় কার্লো আমাদের বাগানের বিশ্বাসযোগ্য প্রহরীও ছিল। বাহিরের কোন লোককে সে বাগানে ঢুকিতে দিত না। আমাদের গর্বের বস্তু ছিল কার্লো। মা কিন্তু কার্লোর উপর তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। মাঝে মাঝে সে উবু হইয়া বসিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া একটানা হু-উ হু-উ শব্দ করিত। মা বলিতেন, ইহা বড় কুলক্ষণ। মামাবাবু

বলিতেন ও বোধহয় পূর্বজন্মে ওস্তাদ গায়ক ছিল। পূর্বজন্মের স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া যায়। তাই ওরকম করে।

টম দেশী কুকুর ছিল না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিল সে। বাবার বন্ধু প্রমথনাথ কুকুরটি সাহেবগঞ্জ হইতে আনিয়া আমাদের উপহার দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, টমের মা নাকি আসল ফক্স্ টেরিয়ার (Fox Terrier)। একটি নির্ভেজাল সাহেব গার্ডের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সাহেব বছরখানেক আগে বদলি হইয়া যাইবার সময় কুকুরীটিকে তাঁহার এক বাঙালী বন্ধুকে দান করিয়া যান। সেই বাঙালীর গৃহে টমের জন্ম। প্রমথনাথ শুধু টমকেই আনেন নাই, সঙ্গে একটি ছবিও আনিয়াছিলেন। ছবিটিতে একটি ল্যাজকাটা বিলাতী কুকুর সবিস্ময়ে এবং সকৌতুকে একটি মার্জার শিশুকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। প্রমথনাথ বলিলেন, 'টমের ল্যাজ কাটিতে হবে। সত্যচরণ তো বলে বেরিয়ে গেল, দুর্যোধন, তুমিই কাট।'

দুর্যোধন মণ্ডল—আমাদের দুর্যোধন কাকা—কম্পাউণ্ডার ছিলেন। তিনি সোৎসাহে রাজী হইয়া গেলেন। একটা ধারাল কাঁচি জলে ফুটাইয়া ফেলিলেন অবিলম্বে। ছবির মাপ অনুসারে প্রমথনাথ টমের ল্যাজের দুই স্থানে শক্ত সুতা বাঁধিয়া দিলেন। বলিলেন, এই দুটো বাঁধনের মাঝখানে কাটো। কচ করিয়া ল্যাজটা কাটিয়া ফেলিলেন দুর্যোধন কাকা, টম কেঁউ কেঁউ করিয়া উঠিল, কাটা ল্যাজটা মাটিতে পড়িয়া লাফাইতে লাগিল। আমরা তো বিস্ময়ে অবাক। টম বেশ ভালো কুকুর হইয়াছিল। যদিও আকারে ছোট ছিল, কিন্তু প্রতাপ ছিল খুব। বাবার কাছে যে সব রোগী আসিত তাহারা এই বিলাতি কুত্তাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। আমাদের এই ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল অনেকে, প্রলুব্ধও হইয়াছিল। ইহার প্রমাণও পাওয়া গেল। টম চুরি গেল একদিন। খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল চারিদিকে। কিন্তু টমকে আর পাওয়া গেল না। আমি আর একটা দেশী কুকুরের বাচ্চা পুষিয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, মা কিন্তু সে চেষ্টায় বাধা দিলেন। বলিলেন, আর কুকুর পুষব না। কয়েকদিন পরে দেখা গেল আমাদের উঠানে একটি তাগড়া কুকুর আসিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া আছে এবং আমাদের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু ল্যাজ নাড়িতেছে। আঃ আঃ বলিয়া আহ্বান করিতেই সে গট গট করিয়া আগাইয়া আসিল। শুধু তাহাই নয়, আমাদের নিকট হইতে একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া বসিয়াও পড়িল এবং সামনের থাবা দুটির উপর মুখ রাখিয়া সোৎসুকে চাহিয়া রহিল

আমাদের দিকে। ল্যাজ সমানে নাড়িতেছে। আমি তখন বিস্কুট খাইতেছিলাম। এক টুকরো বিস্কুট তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলাম। টুকরাটাকে মাটিতে পড়িতে দিল না সে, শূন্য হইতে লপ্‌ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তাহার এই সার্কাস-সুলভ দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মা-ও মুগ্ধ হইলেন এবং বলিলেন —এ মুখপোড়া নড়বে না দেখছি। মা-ই তাহার নামকরণ করিলেন 'টুটকো'। দুই তিন দিন পরে টুটকোর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। সে ঠিক খাইবার সময় আমাদের বাড়িতে আসে। আমাদের চাকর খাওয়া দাওয়ার পর আমাদের পাত হইতে উদ্বৃত্ত ভাত প্রভৃতি লইয়া যেখানে ফেলিত—টুটকো সেইখানে ঠিকসময়ে রোজ আসিয়া বসিয়া থাকিত। যাহা পাইত খাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইত। পরে জানা গেল, কয়েকটি বাড়িতেই সে এই ব্যবস্থা করিয়াছে। ঠিক খাওয়ার সময়ে যায়, যতটুকু পায় উদরস্থ করিয়া চলিয়া আসে। কাহারও বাড়িতে থাকে না। তাহার আস্তানা হাটতলায়। সেইখানে মাড়োয়ারিদের যে আটচালাটা ছিল সেইখানেই রাত্রে সে শয়ন করে। এরকম কুকুর আমি আর দেখি নাই। ছেলেবেলায় আরো কুকুর মাঝে মাঝে আনিয়াছি। বাড়িতে আসিয়াছে, থাকিয়াছে, মারা গিয়াছে। কিন্তু কেন জানি না আর কাহারও কথা আমার মনে নাই। হয়তো তাহাদের কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। মনে দাগ কাটে নাই। তবে একটা না একটা কুকুর আমার জীবনে বরাবর আছে। সেদিন রকেট, টিম ছিল। জুলু, ভুটান ছিল। ডামরু ছিল। এখন কলিকাতা শহরে একটা বাড়িতে আছি। এখানে কুকুর পোষা সম্ভব নয়।

ছোটবেলায় আমার আর এক সঙ্গী ছিল। শালিকের বাচ্চা। চাকরেরা আমাকে আনিয়া দিত। আমাদের বাড়ির আশেপাশেই তাহাদের পাওয়া যাইত। আমাদের বাড়ির দেয়ালের ফাঁকেই বাসা বাঁধিত শালিক পাখিরা। একবার টিয়া পাখির বাচ্চা এবং বুলবুলি পাখির বাচ্চাও তাহারা আমাকে আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু একটিও আমি বাঁচাইতে পারি নাই। তাহাদের ছাতুগোলা, ফলের টুকরা প্রভৃতি খাওয়াইতাম। আমাদের চাকর ভাগিয়া বলিয়াছিল, ফড়িং ধরিয়া উহাদের খাওয়াইলে উহারা বাঁচিবে। ফড়িং ধরিবার চেষ্টাও করিতাম। কিন্তু ফড়িং ধরা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া একদিন দুইটা মাত্র ফড়িং ধরিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পাখিদের খাওয়াইতে পারি নাই। মোটকথা ছেলেবেলায় আমি পাখি পুষিতে পারি নাই। একটু বড় হইলে মা আমার সে সাধ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন আমি স্কুলে পড়ি। মা কলিকাতা

হইতে মামাবাবুকে দিয়া একবার একটি বড় টিয়াপাখি কিনিয়া আনাইলেন। চমৎকার টিয়া। মা তাহার নাম রাখিলেন দুর্গাদাস। মা রোজ তাহাকে রাধাকৃষ্ণ নাম শিখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে নিজের হাতে ছোলা দিতাম। পাকা লঙ্কা দিতাম। তারপর ক্রমশ খুব ভাব হইয়া গেল। খাঁচার মধ্যে আঙুল পুরিলে প্রথম প্রথম সে কামড়াইয়া দিত। কিন্তু পরে আর কামড়াইত না। বরং গলাটা বাড়াইয়া দিত, আমি তাহার গলায় সুড়সুড়ি দিতাম। সে আরামে চোখ বুজিয়া থাকিত। এইভাবে বেশ চলিতেছিল। কিন্তু একদিন আমার দুর্বুদ্ধি হইল। আমার ইচ্ছা হইল খেলনার টেবিলটা রং করিবার জন্য স্টেশনমাস্টার সাহেব আমাকে কিছু লাল রং দিয়া গেলেন একদিন। আমার খেলনার টেবিলে লাগাইবার পরও কিছুটা রং বাঁচিয়া গেল। আমার মনে হইল পাখির খাঁচাটাতেও যদি রং লাগাইয়া দিই কেমন হয়? লাল খাঁচায় সবুজ পাখি বেশ চমৎকার দেখাইবে। আমি সমস্ত খাঁচাটায় রং মাখাইয়া দিলাম। তাহার পর স্কুলে চলিয়া গেলাম। স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখি পাখিটা খাঁচার মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে। মা বলিলেন—রং খাইয়া মরিয়াছে দেখ। খাঁচায় রং লাগাইতে কে বলিয়াছিল তোমায়? সমস্ত রংটা পাখিটা ঠুকরে চেটে খেয়েছে। কিন্তু দেখি মরে পড়ে আছে। নিশ্চয় রং খেয়েই মরেছে। ঐ খেলনা আর টেবিলও ফেলে দাও। নতুন খেলনা আর টেবিল কিনে দেব তোকে। আমার খেলনা আর টেবিলও মা পুড়াইয়া ফেলিলেন। ইহার পর আর কোনও পাখি আমি পুষি নাই। মা আর পুষিতে দেন নাই।

ছেলেবেলার আর একটি পোষা প্রাণীর কথা মনে পড়িতেছে। সেটি একটি কালো খরগোস। কুচকুচে কালো খরগোস প্রায় দেখা যায় না। সর্বাঙ্গ কুচকুচে কালো, চোখ দুটি টকটকে লাল। নীলকুঠির এক সাহেব তাঁহার জমিদারি বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। তিনি যাইবার সময় তাঁহার পোষা জন্তুগুলি বন্ধুবান্ধবদের দান করিয়া যান। তিনি বাবাকে একটি কাকাতুয়া এবং এই খরগোসটি দিয়া গিয়াছিলেন। মা কিছুতেই আর পাখি পুষিতে রাজি হইলেন না। মায়ের আরও আপত্তি হইল, কাকাতুয়াটি ইংরেজী ভাষায় 'ড্যাম' 'নিগার' প্রভৃতি কথা বারবার বলে। তিনি পাখিটিকে দান করিয়া দিলেন। বাবাই আর কাহাকে যেন দান করিলেন সেটি। সম্ভবত জোন্স সাহেব গার্ডকে। স্টেশনের একটা কুলি আসিয়া পাখিটিকে লইয়া গেল। খরগোসটি আমাদের বাড়িতে রহিল। আমি সেটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিলাম। নিজ হাতে তাহার জন্য দূর্বাঘাস সংগ্রহ

করিয়া তাহার খাঁচায় ঢুকাইয়া দিতাম। সাহেব যে খাঁচাটি দিয়াছিলেন সেটিও চমৎকার। দরজা না খুলিয়া উপর হইতে খাঁচায় খাবার দেওয়া যায়। আমি স্কুল হইতে আসিয়াই প্রথমে খরগোসটির তদারক করিতাম। মা আমাকে যে খাবার দিতেন—লুচি, রুটি বা পরোটা—তাহার অংশ তাহাকে দিতাম। কোনদিন খাইত, কোনদিন খাইত না। আমাদের বাড়ির মেথর প্রতিদিন আসিয়া তাহার খাঁচাটা পরিষ্কার করিয়া দিত। তখন সে খরগোসটাকে খাঁচা হইতে বাহির করিত এবং আমি তাহাকে ধরিয়া থাকিতাম। একবার সে আমার হাত ফসকাইয়া পলাইয়া গিয়া বাড়ির পিছনের জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হয়। ইহার পর হইতে খাঁচা পরিষ্কার করিবার সময় বেশ শক্ত করিয়া তাহাকে ধরিয়া থাকিতাম। প্রতিদিন রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বেও খাঁচার দরজাটা খুলিয়া দেখিতাম খরগোসটা ঠিক আছে কিনা। তাহার গায়ে মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া খাঁচার দরজাটি ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া তবে শুইতে যাইতাম। ইহা আমার দৈনন্দিন কর্ম ছিল। একদিন কিন্তু একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। আমাদের জমিতে নানারকম ফসল ফলিত। তখন পাটের সময়। পাট শুকাইয়া সেগুলি বড় বড় বাণ্ডিল করিয়া আমাদের পূর্বদিকের বারান্দায় চাল পর্যন্ত স্তূপীকৃত করা ছিল। প্রতি বছরই থাকিত। আমাদের বাড়ি পাকাবাড়ি ছিল না, মাটির চওড়া দেওয়ালের উপর প্রকাণ্ড খড়ের চাল। একদিন রাত্রে যেই খরগোসের খাঁচাটি খুলিয়াছি অমনি খরগোসটি বাহির হইয়া গেল এবং ছুটিয়া গিয়া সেই পাটের গাদার মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। মা তখন রান্নাঘরে। আমি ঘরের কোণে পিলসুজের উপর যে প্রদীপটি ছিল তাহা লইয়াই খরগোসটির অনুসরণ করিয়া সেই স্তূপীকৃত পাটের বস্তার পাশে যে সরু গলি মতো রাস্তা ছিল তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। বুঝিতে পারি নাই প্রদীপের শিখায় কখন পাটে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। একটু পরেই দেখিলাম আমার চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে। আমাদের চুলুহা নামক ষণ্ডা চাকরটা ছুটিয়া সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বাবা আমার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিলেন। চাকরের দল জ্বলন্ত পাটের বস্তাগুলোকে ছুঁড়িয়া উঠোনে ফেলিতে লাগিল। কারু নামক চাকরটি ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া জ্বলন্ত বাণ্ডিলগুলির উপর জল ঢালিতে লাগিল ক্রমাগত। একটা হৈ হৈ তুলকালাম কাণ্ড পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। সকলেই বলিতে লাগিল, ভাগ্যে ঘরের চালে আগুন ধরিয়া যায় নাই। আমি ভাবিলাম, খরগোসটা বোধহয়

পুড়িয়া মারিয়াছে। কিন্তু একটু পরে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম সে নিজের খাঁচার ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গোলমাল দেখিয়া নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। মা তাহার পরদিনই খরগোসটাকে বিদায় করিয়া দিতে চাহিলেন। বাবা কিন্তু বলিলেন, না থাক, একজন বন্ধু উপহার দিয়ে গেছে, যতদিন থাকে থাক। বেশীদিন কিন্তু তাহাকে রাখিতে পারি নাই। সুযোগ পাইলেই খরগোসটা খাঁচার বাহিরে চলিয়া যাইত। একদিন আবার সে পশ্চিমদিকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া গেল। কিছুতেই আর তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পরে পাওয়া গেল তাহার মৃতদেহটা। ভাগিয়া নামক চাকরটি বলিল, শৃগাল বা বিড়াল উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

ইহার পর আর কোন পশু বা পাখি পুষিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইহার পর আমি মাছ লইয়া মাতিয়াছিলাম। বড় বড় ফাঁক-মুখো শিশিতে মাছ পুষিয়াছি অনেক। পাড়াগাঁয়ে থাকিতাম—লাল নীল রঙীন মাছ পাওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু হাটে একপ্রকার খল্‌সে মাছের মতো জীবন্ত মাছ পাওয়া যাইত, তাহার গায়ে অস্পষ্ট লাল নীল রং। সেই মাছই পুষিতাম। ভোলা মাছ বলিয়া পরিচিত আর একরকম ছোট মাছ পুষিবারও সখ ছিল খুব। ভোলা মাছের পেটটা বেলুনের মতো ফুলিয়া উঠিত। পেটের উপরটা ছিল কালো। দেখিতে অদ্ভুত ধরনের। মাছেদের মুড়ি খাইতে দিতাম। শিশির ভিতর মুড়ি ফেলিয়া দিলে মাছেরা উপরে ভাসিয়া উঠিয়া টপটপ করিয়া মুড়িগুলি খাইয়া ফেলিত। অন্যান্য খাবারও তাহাদের দিতাম। সব খাবার তাহারা খাইত না। প্রতিদিন জল বদলাইয়া দিতাম। শিশির ভিতর কিছু মাটি ও শ্যাওলাও ঢুকাইয়া দিতাম। কিন্তু তবু তাহাদের বাঁচাইতে পারি নাই। কিছুদিন পরেই তাহারা মরিয়া ভাসিয়া উঠিত। যেদিন উঠিত সেদিন গভীর শোকের ছায়া নামিত মনে। মনে হইত কোন পরমাত্মীয় চিরদিনের মতো চলিয়া গেল। তাহাদের অকাল মৃত্যুর জন্য আমিই যে দায়ী একথা কিন্তু কখনও মনে হইত না।

আমরা স্কুলে গিয়াছিলাম একটু বড় বয়সে। আমাদের প্রথম পড়াশুনা আরম্ভ হয় বাড়িতে। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয় একবার সরস্বতী পূজার দিন আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছিলেন। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন সতীশবাবুর ভাই। সতীশবাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের জমিদারি কাছারির গোমস্তা ছিলেন। একটি চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্যই তিনি ভাইকে মণিহারিতে লইয়া আসিয়াছিলেন। জমিদারির কাছারিতে তাঁহার একটি কাজও নাকি জুটিয়াছিল। কিন্তু সে কাজ তাঁহার ভালো

লাগে নাই। আমাদের বাড়ি তখন অনেক লোকের আশ্রয়স্থল ছিল। বাবার অনেক রোগীদের আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসিয়া থাকিতেন। অনেক চাকুরীপ্রার্থী আসিয়া জুটিতেন। বাবাদের একটা থিয়েটার পার্টি ছিল। সে পার্টির অনেক লোকের আস্তানা ছিল আমাদের বাড়িতে। তাছাড়া আমাদের বাড়ির কাছে রেলওয়ে স্টেশন থাকাতে অনেক লোক আমাদের বাড়িতে আসিয়া একবেলা খাইয়া তাহার পর ট্রেন ধরিতেন। ও অঞ্চলের জমিদারদের আমলা গোমস্তারা প্রায়ই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে কাটিহার কিংবা পূর্ণিয়া যাইতেন। বাবা সকলেরই ডাক্তার ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অসঙ্কোচে আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম করিয়া যাইতেন এক আধবেলা। গঙ্গার ঘাটও ছিল আমাদের বাড়ির নিকটে। সুতরাং গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে বেশ জনসমাগম হইত। ও অঞ্চলে কোনও হোটেল ছিল না, ডাকবাংলো তখনও হয় নাই, সুতরাং অনেক গভর্ণমেণ্ট অফিসাররা আসিয়াও আমাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। শিকার করিবার জন্যও অনেক পক্ষীলোলুপ শিকারীও মাঝে মাঝে পদার্পণ করিতেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে প্রত্যহ দশ বারোজন বাহিরের লোক আহারাদি করিতেন তখন। বামুনদিদি ছিলেন রাঁধুনী। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয়ও এই ভীড়ে ভিড়িয়া গেলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন— যতদিন কোন ভালো চাকরি না পান, ততদিন আমার ছেলে দুটির দেখাশোনা করুন আপনি। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয়ই হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন আমাদের। তাঁহার বিদ্যা কতদূর ছিল তাহা আমার জানা নাই, কিন্তু তাঁহার স্নেহময় স্বভাব, তাঁহার সরলতা, আমাদের শিখাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ যে নিখাদ নির্মল ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। কখনও মিথ্যা ভাষণ করিতেন না, কখনও অধীর হইতেন না। আজও তাঁহাকে ভক্তি করি আমি। বাবার চেষ্টাতেই মণিহারি গ্রামে একটি লোয়ার প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হয়। গ্রামের দুর্গা মণ্ডপে—যেখানে প্রতি বছর দুর্গাপূজা হইত—সেইখানেই স্কুলটি প্রথমে বসিয়াছিল। গ্রামের কয়েকটি ছোট ছেলে লইয়া স্কুলটি আরম্ভ হয়। তারাপদ পণ্ডিত স্কুল শেষ হইলে প্রত্যেক ছেলেকে নিজে গিয়া তাহাদের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। তাহার পর আমাদের বাড়িতে একজন বাঙালী ডিভিশনাল ইনসপেক্টর আসেন, তিনি স্কুলটিতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া আমার পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি যখন আসিয়াছিলেন তখন বাবা বাড়িতে ছিলেন না। আমি বাহিরের ঘরে,

চেয়ারে বসিয়া একটি মোটা বই হইতে উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পাঠ করিতেছিলাম। এতটুকু ছেলে এত মোটা বই হইতে গড় গড় করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছে দেখিয়া তিনি বেশ বিস্মিত হইয়াছিলেন। কাছে আসিয়া দেখিলেন, বইটি আমি উল্টা করিয়া ধরিয়া আছি। আমাদের বাড়িতে একজন রামায়ণ পাঠ করিতেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ। শুনিয়া শুনিয়া আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তখনও আমি পড়িতে শিখি নাই। বাবার সহিত ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের যখন সাক্ষাৎ হইল তিনি বলিলেন—ইহাকে এখন স্কুলে ভর্তি করিবেন না। বেশী পড়ার চাপ দিলে পাগল হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং দুই বছর আমাকে স্কুলে যাইতে হয় নাই। তারাপদ পণ্ডিত মহাশয় বাড়িতে আমাকে যৎসামান্য পড়াইতেন। এই সময় আমাদের বাড়িতে আর একটি অদ্ভুত লোকও ছিলেন। তাঁহার নাম কেশ মশাই। তিনি গান করিতে পারিতেন, বেহালা চমৎকার বাজাইতেন, পায়ে ঘুঙুর পরিয়া নৃত্যও করিতেন মাঝে মাঝে। সাধারণ থেলো হুঁকায় লম্বা লাল রংয়ের একটি নল লাগাইয়া তিনি তামাক খাইতেন। হুঁকায় মুখ লাগাইয়া খাইতেন না। সেকালের এণ্ট্রান্স পাশ ছিলেন শুনিয়াছি। চাকরি করিবার ইচ্ছা থাকিলে ভালো চাকরি পাইতেন। কিন্তু তিনি ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন। এক জায়গায় বেশীদিন থাকিতে পারিতেন না। গুণী লোকের সন্ধান পাইলে আমার বাবা তাঁহাদের আপ্যায়িত করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। অনেকে আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকিয়াও যাইতেন। কেশ মশাই আমাদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। তিনিই আমাকে প্রথম ইংরেজী অক্ষর পরিচয় করাইয়া দেন। সকালের দিকে মেজাজ খুশি থাকিলে আমাকে লইয়া বসিতেন। আমি সুবোধ বালক ছিলাম না। নানারকম দুষ্টামি করিতাম। তখন তিনি তাঁহার হুঁকার নলটি লইয়া আস্ফালন করিতেন—'মারব কিন্তু'—কিন্তু মারিতেন না। হাসিতেন। সন্ধ্যার দিকে কেশ মশাই গুম হইয়া বসিয়া থাকিতেন। আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল। কোন-কোনদিন খেয়াল হইলে বেহালা বাজাইতেন। আমাদের বাড়িতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই গান-বাজনার একটা আসর বসিত। আমিও সে আসরে বসিতাম। মাঝে মাঝে দুই একটা গানও গাহিয়াছি মনে পড়িতেছে। কাটিহার হইতে এবং সাহেবগঞ্জ হইতে অনেকে আসিতেন। বাবার খুব বন্ধু ছিলেন তিনি। খুব ভালো গান গাহিতে পারিতেন। অনেক সময় থিয়েটারের রিহার্সালও হইত। আলিবাবা রিহার্সালের কথা আমার মনে আছে। তাহাতে মর্জিনা যিনি ছিলেন তিনি কাটিহার হইতে আসিতেন। রেলের কর্মচারী ছিলেন। খুব ভালো

নাচিতে পারিতেন। রোগা রোগা কালো রং, নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। বাবা বৈকালেই 'কলে' বাহির হইয়া যাইতেন। 'কল' হইতে ফিরিয়াই যোগ দিতেন সেই মজলিশে। সে মজলিশে স্টেশনের বাবুরা, থানার দারোগা সাহেব, জমিদার কুঠির আমলারা, পোস্টমাস্টার, মণিহারি ঘাটের বাঙালী কর্মচারীরা, সকলেই উপস্থিত থাকিতেন। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত গান বাজনা হইত। আমি যতক্ষণ পারিতাম ঐ আসরে বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু রাত্রি নয়টার সময় মা আমাকে চাকর পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন। আমার তো পড়াশোনার বালাই ছিল না, সুতরাং সন্ধ্যাবেলা পড়িবার জন্য কেহ ডাকাডাকি করিত না। যাহা খুশি করিয়া বেড়াইতাম। বেশীর ভাগ সময় কাটিত মাঠে মাঠে। চাষের চাকরদের নাম এখনও মনে আছে। চামরু ফরিদ পাচ্ছা চুলুহা বিজা ভাগিয়া জগন্নাথ মধুয়া। মধুয়া আমাদের বাড়ির চাকর ছিল। খুব হুড়ো গোছের ছিল সে। প্রায়ই তাহার সহিত উঠানে ছুটাছুটি করিতাম। ধরিয়া ফেলিলেই সে আমাকে কাতুকুতু দিত। মা খুব বকাবকি করিতেন। কিন্তু আমরা গ্রাহ্য করিতাম না।

যে লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের উল্লেখ করিয়াছি, সে স্কুলে আমি বেশী দিন যাই নাই। ওই লোয়ার প্রাইমারি স্কুল পরে প্রাইমারি হইল। সে স্কুলেও বাবা আমাকে পাঠান নাই। সেই স্কুল শেষে যখন মাইনর স্কুলে পরিণত হইল তখন সেই স্কুলে আমি ভর্তি হইলাম। তখন আমার বয়স প্রায় নয় বৎসর। যখন মাইনর স্কুল হইল তখন আমার কাকাবাবু স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্কুলের হেড-মাষ্টাররূপে নিযুক্ত হইলেন। বাহির হইতে একজন হেড-পণ্ডিত আসিলেন। যতদূর মনে পড়িতেছে তাহার নাম যতীন দত্ত। দুবরাজপুরে বাড়ি, নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকিতেন এবং আমাদের (আমাকে এবং আমার ভাই ভোলাকে) পড়াইতেন। ভোলা আমার অপেক্ষা মাত্র দেড় বছরের ছোট ছিল। আমরা দুইজনে একই ক্লাশে ভর্তি হইলাম। আমার সেই বাল্যকালে কাকাবাবুই কিন্তু আমাদের প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। যতীন পণ্ডিতের নিকট আমরা স্কুলের পড়া পড়িতাম, কিন্তু কাকাবাবু আমাদের অন্যরকম শিক্ষা দিতেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রত্যহ সকালে উঠিয়া বাড়ির গুরুজনদের প্রণাম করিতে হইত। তাহার পর হাতমুখ ধুইয়া বারান্দায় হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া ভগবদ বিষয়ক কবিতা পাঠ করিতে হইত। 'জয় ভগবান সর্ব শক্তিমান'—এই কবিতাটি আমাদের মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া একটি সংস্কৃত শ্লোকও মুখস্থ করিয়াছিলাম আমরা—'ত্বমেব মাতা,

ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা, দ্রবিণং ত্বমেব'—এইটি তাহার প্রথম লাইন। সকালে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল—আদা ছোলা, গুড় এবং দুধ। কাকাবাবুর সামনে বসিয়া সেগুলি খাইতে হইত। কি করিয়া কাপড় পরিতে হয়, কাছা ও কোঁচার সামঞ্জস্য কি করিয়া রক্ষা করিতে হয়, কি করিয়া দাঁত মাজিতে হয় তাহা তিনিই শিখাইয়াছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন এবং তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে আমরাও নিরামিষাশী হই। কিন্তু আমরা মাছ মাংসের লোভ ছাড়িতে পারি নাই। কাকাবাবু অবশ্য ইহা লইয়া জোর জবরদস্তি করেন নাই কখনও। তবে আমরা বুঝিতে পারিতাম মাছ মাংসের সম্বন্ধে জুগুপ্সা প্রকাশ করিলে তিনি খুশি হইবেন। কিন্তু আমরা তাহা কোনদিনই করি নাই। আমার বাবা এসব বিষয়ে খুব উদার মতাবলম্বী ছিলেন। খাদ্যবিলাসীও ছিলেন তিনি। খাইতেও পারিতেন খুব। মাছও প্রচুর পাওয়া যাইত। বড় পাকা রুই মাছের সের ছিল চার আনা। প্রকাণ্ড বড় চিতল মাছ বারো আনা বা এক টাকায় পাওয়া যাইত। ছোট মাছের দর ছিল দু আনা সের। আমাদের বাড়িতে তরিতরকারি প্রচুর হইত। প্রকাণ্ড একটা সবজির বাগানই ছিল আমাদের। কপি বেগুন আলু মূলা নানারকম শাক বিলাতী বেগুন এত ফলিত যে পাড়ার লোকেদের বিতরণ করা হইত। হাটেও বিক্রি হইত কিছু কিছু। আমাদের বাড়ির সামনেই হাট ছিল। তখন মাংস খাওয়া তেমন প্রচলিত হয় নাই। গোঁড়া হিন্দুরা বৃথা মাংস খাইতেন না। গ্রামে কসাই-এর দোকানও ছিল না। আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় এবং কালিপূজার সময় অনেক 'মুণ্ডহীন' পাঠার সমাগম হইত। বাবার রোগীরা সেগুলি ডাক্তারবাবুকে উপহার স্বরূপ পাঠাইত। দুধের অভাব ছিল না। আমাদের বাড়িতেই প্রচুর গাই এবং একটি মহিষী ছিল। ঘি দুধ ক্ষীর ছানা পায়সের অভাব কখনও অনুভব করি নাই। মা ঘরে সন্দেশও করিতেন। বাবা সকালে অশ্বারোহণে রোগী দেখিতে বাহির হইতেন কিছু লুচি ও তরকারি খাইয়া। তাঁহার ঔষধের বাক্স বহিয়া তাঁহার পিছু পিছু যাইত পচনা সহিস। সেই ঔষধের বাক্সে একটি কৌটায় মা কিছু খাবার দিয়া দিতেন। বাবা ফিরিতেন বৈকালে। তাঁহার বৈকালিক আহার ছিল দশ-বারোখানা মোটা আটার রুটি বা পরোটা। সঙ্গে একবাটি বুটের ডাল এবং প্রচুর আলুর দম। ইহার পর আবার তিনি কলে বাহির হইয়া যাইতেন। ফিরিতেন রাত্রি আটটা নটা নাগাদ। তখন আমাদের বাড়িতে গানের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। সেখানে তিনি যোগদান করিতেন। রাত্রি এগারোটা, সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত গানের

জলসা বা থিয়েটারের রিহার্সাল চলিত। তাহার পর রাত্রের খাওয়া দাওয়া। বাবার সহিত রাত্রে এক পঙক্তিতে বসিয়া তাঁহার অনেক বন্ধু আহার করিতেন। সে আহারও ভূরিভোজন।

আমার কাকাবাবু তাঁহার দাদার ম্লেচ্ছ আচরণ যদিও পছন্দ করিতেন না, কিন্তু কখনও তাহাকে প্রতিবাদ করিতে শুনি নাই। বাবাকে দেখিলে তিনি ভয়ে জড়সড় হইয়া যাইতেন। বাবা কোন কারণে রাগিয়া গেলে ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। দাদার মুখের উপর কখনও একটি কথাও তিনি বলেন নাই। যদিও দাদার বিজাতীয় আচরণ (যথা, পেঁয়াজ খাওয়া, যার তার হাতে খাওয়া, সন্ধ্যাহ্নিক না করা, ব্রাহ্মদের সহিত বন্ধুত্ব করা) তিনি অপছন্দ করিতেন, কিন্তু দাদাকে প্রকৃতই ভক্তি করিতেন তিনি। আমার জীবনে এরূপ ভ্রাতৃভক্ত লোক বড় একটা দেখি নাই। আমি যখন ডাক্তার হইয়াছি, বাবা এবং কাকাবাবু যখন বৃদ্ধ তখনও দেখিতাম কাকাবাবু বাবাকে ঠিক আগেকার মতই সমীহ করিয়া চলেন। বাবা রাগিয়া গেলে ভয়ে অস্থির হইয়া যান। সেই ছেলেবেলায় কাকাবাবুর নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিয়াছিলাম। ইংরেজী উচ্চারণ যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, সে বিষয়ে তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। ভালো ভালো ইংরেজী কবিতা তিনি আমাদের মুখস্থ করাইতেন। বাংলা কবিতাও। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত', নবীন সেনের 'কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ', হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে', তাঁহার 'জীবন সঙ্গীত', রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে',—এবং আরও অনেক কবিতা তিনি আমাদের মুখস্থ করাইয়াছিলেন। সেগুলি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবৃত্তির ভঙ্গিতে তাঁহাকে শুনাইতে হইত। আমরা যখন মাইনর স্কুলে পড়িতাম তখন আবৃত্তিও একটা পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। আবৃত্তিতে একশ' নম্বর থাকিত। আরও অনেক রকম বিষয় ছিল। ফ্রি হ্যাণ্ড ড্রইং, মডেল ড্রইং। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। আশপাশের গাছপালা, আকাশের নক্ষত্র, মেঘ প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানলাভ করিতে হইত। এই বিষয়টিতে কাকাবাবুর সাহায্য পাইতাম। তিনিই আমাদের প্রথম সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডলী চিনাইয়া দিয়াছিলেন। আর একটি জিনিসও তিনি প্রত্যহ আমাদের মুখস্থ করাইতেন। ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষের নাম—কেদারনাথ, মহেশচন্দ্র, রামকানাই, অনন্তরাম, নারায়ণ ওঝা, বিবর্তন, উদ্ধব প্রত্যহ তাঁহার নিকট বলিতে হইত। আমাদের যখন উপনয়ন হইল

অল্প বয়সেই হইয়াছিল ) তখন উপবীতে গ্রন্থি দিবার মন্ত্রটিও তিনি আমাদের, শিখাইয়াছিলেন—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বৃহস্পতি, প্রবরসা। বলিতেন আমাদের বংশে এই তিনজনই প্রবর—ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা এবং বৃহস্পতি। আমার কাকাবাবুর মতো শিক্ষক দুর্লভ। তাঁহার হাতের লেখাও ছিল চমৎকার। তিনি গোঁড়া ছিলেন। ব্রাহ্ম, ক্রিশ্চান এবং মুসলমানদের সহিত তিনি অভদ্র ব্যবহার করিতেন না বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত বিশেষ মাখামাখিটা তিনি পছন্দ করিতেন না। অন্তঃপুরিকাদের সম্বন্ধেও তিনি আধুনিকতার বিরোধী ছিলেন। মেয়েদের অনাবৃত-মুখে যেখানে-সেখানে যাওয়া, জুতা পরা, আধুনিকতার নামে বেহায়াপনা করা—এসব তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বাড়ি হইতে কোথাও যাইবার সময় পাঁজি খুলিয়া দিন-ক্ষণ বিচার করিতেন। একবার মনে আছে কাকীমাকে তিনি পুরুলিয়া হইতে আনিতে গিয়াছেন, আমরা যথাসময়ে তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য স্টেশনে গিয়াছি। ট্রেন আসিল, কিন্তু কাকীমা আসিলেন না! খানিকক্ষণ পরে কাকাবাবুর একটি টেলিগ্রাম আসিল—

**Could not start. Seven pundites object starting on an inauspicious day.**

কাকাবাবু গোঁড়া ছিলেন বলিয়া হিন্দু বিহারীরা তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। আমাদের সংসারের নানা জাতের লোকের মধ্যে বাস করিয়া এবং বাবার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে আঁকড়াইয়া ধরা মনোবৃত্তি সত্ত্বেও যে তিনি তাঁহার সনাতনী ছুঁৎমার্গে চলিতে পারিয়াছিলেন এজন্য বিহারীরা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। অনেক মিশিরজী পাঁড়েজী এবং ওঝাজী তাঁহার ভক্ত ছিল। মণিহারী গ্রামে দুর্গা ওঝা তখন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাকাবাবুকে খুব ভক্তি করিতেন। তাঁহার ছেলে বৈজনাথ আমাদের দুই ক্লাশ নীচে পড়িত। দুর্গা ওঝা কাকাবাবুকে বৈজনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কাকাবাবুকে দিয়া কিছু ইংরেজী চিঠিপত্রও তিনি লিখাইয়া লইতেন। এজন্য মাসে তাঁহাকে কুড়ি টাকা বেতন দিতেন। এ যুগে কুড়ি টাকা দুই শত টাকার সমান। কাকাবাবুকে ওঝাজি শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়াই তিনি আমাদের মাইনর স্কুলের জন্য একটি গৃহনির্মাণ করাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে বাবাও তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মাটির দেওয়াল এবং খড়ের চাল দিয়া বেশ বড় একটি স্কুল-গৃহ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্কুল স্থাপন ব্যাপারে বাবার খুব উৎসাহ ছিল। আমাদের বাড়িতে সে সময় বেশ বড় বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আমাদের মাইনর

স্কুলটি তাঁহাদের সুপারিশে কিছুদিনের মধ্যেই গভর্নমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের মধ্যে গণ্য হইল। কাকাবাবু বেশীদিন মণিহারী স্কুলে ছিলেন না। মনোমত চাকরী পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হেডমাষ্টার সংগৃহীত হইত। এক একজন হেডমাষ্টার কিছুদিন থাকিতেন আবার চলিয়া যাইতেন। যে সব হেডমাষ্টার এবং হেডপণ্ডিত বাহির হইতে আসিতেন তাঁহারা প্রায় আমাদের বাড়িরই পরিজন হইয়া যাইতেন সকলে। আমাদেরই বাড়িতে তাঁহার বাসস্থান হইত এবং আমাদের দুই ভাইকে তাঁহারা পড়াইতেন। সব মাষ্টার পণ্ডিতের কথা স্পষ্ট মনে নাই। হরেরামবাবুর চেহারাটা মনে পড়িতেছে। দীর্ঘকায় লোক ছিলেন তিনি। রাশভারিও ছিলেন। আমরা তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতাম। আর মনে আছে 'বুড়ো মাষ্টার' মহাশয়কে। তিনি বেশ প্রবীণ লোক ছিলেন। পাকা দাড়ি ছিল। মাথার সামনের দিকে বেশ বড় একটা গর্ত ছিল। বাল্যকালে আঘাত পাইয়া ওই স্থানটা বসিয়া গিয়াছিল। অস্ত্রোপচার করিয়া অনেক কষ্টে নাকি রক্ষা পান। কিন্তু তিনি ওই মাথার সামনের গর্তটাকে কৌশলে ঢাকিয়া রাখিতেন। তাঁহার পিছন দিকে চুল ছিল, সেই চুলগুলি লম্বা করিয়াছিলেন এবং সেগুলিকে বুনিয়া কুলার মতো ঢাকনা বানাইয়াছিলেন একটা। সেই ঢাকনা দিয়া তিনি মাথার সম্মুখভাগটা ঢাকিয়া রাখিতেন। মনে হইত একটা চুলের টুপি পরিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুইটি পুত্র (এবং যতদূর মনে পড়িতেছে একটি কন্যাও) আসিয়াছিলেন। বুড়ো মাষ্টার আমাদের বাড়ি আহার করিতেন না। নিজেরাই রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতেন। বাবা তাঁহাদের জন্য এ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 'বুড়ো মাষ্টার' অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিতেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। একটু তোতলাও ছিলেন। উত্তেজিত হইলে তাঁহার তোতলামি বাড়িয়া যাইত। যতদূর মনে পড়িতেছে আত্মপ্রশংসা করিবার একটু প্রবণতা ছিল তাঁহার। কোন কোন সাহেব কখন কি উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে কি প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি সুযোগ পাইলেই গড় গড় করিয়া বলিয়া যাইতেন। কথা বলিবার সময় ডান হাত দিয়া ডান হাঁটুটা চাপড়াইতেন। কিন্তু একটা গুণ ছিল। আমাদের খুব যত্ন করিয়া পড়াইতেন। আমরা যমের মতো ভয় করিতাম তাঁহাকে। তাঁহার পড়াইবার একটি কায়দাই ছিল। বোঝ আর না বোঝ, সব মুখস্থ কর। প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্টবুক গড় গড় করিয়া আবৃত্তি না করিতে পারিলে শাস্তি পাইতাম। ইহা ছাড়া ছিল

'লেনি'র কঠিন গ্রামার এবং একটা মোটা ওয়ার্ডবুক ( Word book )। সব মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। গদ্য পদ্য কমা ফুলষ্টপ সুদ্ধ মুখস্থ না করিলে আমাদের নিস্তার ছিল না। ঝাড়া মুখস্থ করার ফলে বুঝি আর নাই বুঝি-অনেকগুলি ইংরেজী শব্দ আমরা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু বুড়ো মাষ্টার বেশী দিন আমাদের নিকট রহিলেন না। আগেই বলিয়াছি, অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিতেন তিনি। বোধহয়, প্রাণায়াম কুম্ভক প্রভৃতি করিতেন। একদিন পূজার আসনেই তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। দেখা গেল পক্ষাঘাত হইয়াছে। শেষে তিনি মারাই গেলেন।

আমাদের স্কুলের কয়েকজন হেড-পণ্ডিতের কথা মনে আছে। যতীনবাবুর কথা আগেই বলিয়াছি। তিনি আমাদের বাড়িতে থাকিতেন। খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। আমরা যেন তার সমবয়সী সঙ্গী ছিলাম। একবার মনে আছে পূজার সময় তিনি বাড়ি যান নাই। বিজয়ার দিন একটু অধিক মাত্রায় সিদ্ধিপান করিয়া বাড়ির সামনের হাটের উপর হাসিতে হাসিতে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একজন প্রশ্ন করিয়াছিল, পণ্ডিতমশাই আপনি বারবার থুতু ফেলছেন কেন। এই শুনিয়া পণ্ডিত মশাই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন— বলছ কি, থুতু? আমার থুতু? হা হা করিয়া হাসিয়া হাটের উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে। ভূতনাথ পণ্ডিত। তিনি কালো বেঁটে ঈষৎ স্থূলকায় ব্যক্তি ছিলেন। মাথায় কদমছাঁট চুল। পণ্ডিত হিসাবে অতুলনীয় ছিলেন তিনি। সমস্ত বিষয় নিপুণতায় বুঝাইয়া দিতেন, সামনে বসিয়া পড়া অভ্যাস করাইতেন। আমাদের মুখ দিয়া সব বলাইয়া লইতেন। ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। সমস্তই তাঁহার সামনে বসিয়া করিতে হইত। আমি যে মাইনর পরীক্ষায় ভালো ফল করিয়াছিলাম তাহার কৃতিত্ব ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের। যেদিন মাইনর পরীক্ষার ফল বাহির হইল এবং জানা গেল যে আমি জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছি তখন ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয় আবেগভরে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

আর একজন পণ্ডিতের কথা মনে পড়িতেছে। তিনি সম্ভবত ভূতনাথ পণ্ডিতের আগে আসিয়াছিলেন। ঠিক মনে পড়িতেছে না। তাঁহার নাম ছিল হরসুন্দরবাবু। লোকে তাঁহাকে বাঙাল পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত। তিনি বরিশাল জেলার লোক ছিলেন। তাঁহার মুখে খাপছা খাপছা গোঁফ দাড়ি ছিল। লুঙ্গি

পরিতেন। যদিও হিন্দু ছিলেন কিন্তু চেহারা দেখিয়া অনেক সময় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত। প্রকৃতিটাও একটু উগ্ররকমের ছিল। তাঁহার ভাষা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। আমাদের তিনি 'চ্যামডা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রাগিয়া গেলে হঠাৎ চুলের মুঠি খামচাইয়া ধরিতেন। তাঁহার মুখের ভাবও তখন ভীষণ হইয়া উঠিত। তাঁহার এসব আচরণ মা পছন্দ করিতেন না। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমাদের যখনই কোন পণ্ডিত বা মাষ্টার পড়াইতেন, মা সেই বারান্দায় একটু দূরে মাথায় আধ ঘোমটা টানিয়া হয় কুটনা কুটিতেন বা সুপারি কুচাইতেন। তিনি নিজে লেখাপড়া তেমন কিছু জানিতেন না, পণ্ডিত মহাশয় বা মাষ্টার মহাশয় আমাদের কি পড়াইতেছেন তাহা তাঁহার বোধগম্য হইত না। তবু তিনি নীরব প্রহরীর মতো একটু দূরে বসিয়া থাকিতেন। বাবা রোগী দেখিতে বাহির হইয়া যাইতেন। তিনি আমাদের দেখাশোনা করিবার অবসর পাইতেন না। মা কিন্তু আমাদের লেখাপড়ার সময় রোজ আসিয়া বসিতেন। তাঁহার এই বসাটাই আমাদের মনে এবং সম্ভবত আমাদের শিক্ষকদের মনেও লাগামের মতো কাজ করিত। মা হরসুন্দর পণ্ডিত মহাশয়ের উগ্র ছবিটা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কখনও প্রতিবাদ করেন নাই। বরং বাড়িতে আসিয়া আমাদেরই বকিতেন—'তোমরা মন দিয়ে পড় না, তাইতো পণ্ডিত মশায় শাস্তি দেন তোমাদের।' একদিন কেবল আড়াল হইতে শুনিয়াছিলাম, বাবাকে মা বলিতেছেন—'এই পণ্ডিত মশাইটি একটু বুনো গোছের। বড্ড বেশী রাগী। আর ওর কথাও তো বুঝতে পারা যায় না।' বাবা এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। হরসুন্দর পণ্ডিত মহাশয়ও নিজে আলাদা রাঁধিয়া খাইতেন। মা তাঁহাকে রোজই কিছু না কিছু তরকারি পাঠাইয়া দিতেন। নিরামিষ তরকারি, মাছের তরকারি প্রায় রোজই আমাদের বাড়ি হইতে যাইত। আমরাই গিয়া দিয়া আসিতাম। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় একটু বেশী আমিষপ্রিয় ছিলেন। একদিন আবিষ্কার করিলাম তিনি আমাদের বাঁশঝাড় হইতে একটা ছোট কাছিম (কাঠুয়া) সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেটি রান্নাঘরে চিৎ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। নিজে সেটি সহস্তে বধ করিয়া আহার করিয়াছিলেন তিনি। হরসুন্দর পণ্ডিত শুধু স্কুলের পণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি আইনজ্ঞ লোক ছিলেন। মুখুজ্যে মশাই ইহা লইয়া অনেক মজা করিতেন তাঁহার সঙ্গে। মুখুজ্যে মশাইও একটি অদ্ভুত লোক ছিলেন। ইহার চরিত্র আমি আমার 'জঙ্গম' পুস্তকে আঁকিয়াছি। আমরা যখন খুব ছেলেমানুষ তখন হঠাৎ তিনি

আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন একদিন। কবে ঠিক জানি না। জ্ঞান হইয়া অবধি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি সদানন্দ প্রকৃতির ছিলেন, সর্বদা ফিক ফিক করিয়া হাসিতেন। মুখে দাড়ি ছিল, মাথায় চুলও বড় বড় ছিল। খালি পায়ে থাকিতেন। তাঁহার সম্বলের মধ্যে ছিল একটি পুঁটুলি। তাহাতে থাকিত দুইখানা কাপড়, একটা গামছা, একটা মোটা চাদর আর ছোট একটি হুঁকা ও কলিকা। জামা ছিল না। জামা গায়ে দিতেন না। ছোট ছেলেরাই তাঁহার বন্ধু ছিল। তিনি আসিলে আমাদের বড় আনন্দ হইত। পড়ার চাপটা লাঘব করিয়া দিতেন তিনি। বলিতেন, স্কুলে পাঁচ ছয় ঘণ্টা তো পড়িয়া আসিল, বাড়িতে আবার পড়া কেন। আমাদের নানারকম খেলা শিখাইয়াছিলেন। নানারকম গল্প বলিতেন। ইতিহাসের গল্প, শেকসপীয়ারের গল্প, নানারকম রূপকথা, ভ্রমণ কাহিনী তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। নিজের প্রকৃত পরিচয় কখনও কাহাকেও দেন নাই। তাঁহার নাম ছিল সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। এ নাম প্রকৃত নাম, না ছদ্মনাম তাহা নির্ণীত হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে হাসিতেন, কোন উত্তর দিতেন না। মুখুজ্যে মশাই নামেই পরিচিত ছিল তাঁহার। সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। নানাস্থান হইতে বাবাকে চিঠি লিখিতেন। যখন কাশী হইতে লিখিতেন--তখন পত্রের গোড়াতেই থাকিত, বাবা বিশ্বেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। যখন কামাখ্যা হইতে লিখিতেন তখন লিখিতেন—কামাখ্যা দেবী তোমাদের মঙ্গল করুন। এইরূপ প্রতি চিঠিতে নানা দেবদেবীর নাম থাকিত। তাহার পর হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে আসিতেন। আর একটা আশ্চর্যের বিষয়, যখনই আমাদের বাড়িতে কোন বিপদ উপস্থিত হইত তিনি আসিয়া হাজির হইতেন। একবার মায়ের খুব জ্বর, বাবা কলে বাহির হইয়া গিয়াছেন, আমাদের বাড়ির মৈথিল ঠাকুরটি পলাতক। দুর্যোধন কম্পাউণ্ডার মাকে কুইনিন মিকশ্চার দিয়া গিয়াছে। আমরা না খাইয়াই স্কুলে গিয়াছি। মধুয়া চাকর হঠাৎ স্কুলে গিয়া খবর দিল সাধুবাবাজী আসিয়াছেন, আমাদের বাড়িতে ডাকিতেছেন। দ্বিপ্রহরে তিনি কোথা হইতে আসিলেন? ঘাট ট্রেন তো সকালে একটা সন্ধ্যায় একটা। বাড়িতে আসিয়া দেখিলাম মুখুজ্যে মশাই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন। শুনিলাম নৌকায় পার হইয়া আসিয়াছেন। আমাদের বলিলেন—তোমাদের আমি আজ রেঁধে খাওয়াব। ভাজা মাছ আছে দেখছি, মাছের ঝোল করা যাবে। আগে মায়ের জন্য দুধ সাবুটা করি। আমাদের সমস্ত সমস্যার যেন সমাধান হইয়া

গেল। মায়েরও একটু পরে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, বাবাও ফিরিয়া আসিলেন। বাবার রান্নাও মুখুজ্যে মশাই করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজেও তিনি নিজের জন্য আলাদা হাঁড়িতে ভাতে ভাত ফুটাইয়া লইলেন। বাড়িতে দুধ-ঘির অভাব ছিল না। খানিকটা ঘি এবং একবাটি দুধ খাইয়া তিনি বলিলেন—আজ আমার ভূরিভোজন হয়ে গেল। মুখুজ্যে মশাই-এর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল তিনি বড়লোকদের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। তাঁহার প্রিয় ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের বালক বালিকারা। তাঁহার যাতায়াতও ছিল নিম্নমধ্যবিত্তদের ঘরে। তিনি ধনীর বাড়িতে কদাচিৎ আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আমাদের নানা উপদ্রব তিনি সহ্য করিতেন। কেবল সহ্য করিতেন না মিথ্যাভাষণ এবং ভণ্ডামি। আমাদের মধ্যে কাহারও মিথ্যা ভাষণ বা ভণ্ডামি ধরা পড়িয়া গেলে তিনি তাহার সহিত আড়ি করিয়া দিতেন। তাহার সহিত কথা বলিতেন না, তাহার সহিত খেলা করিতেন না, তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না পর্যন্ত। এ শাস্তি নিদারুণ শাস্তি ছিল আমাদের পক্ষে। জরিমানা দিয়া তাহার সহিত ভাব করিতে হইত। পূজায় দামী কাপড়-জামা মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া জরিমানা স্বরূপ তাঁহার নিকট দাখিল করিতে হইত। তিনি সেগুলি পুঁটুলি করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। আমাদের ধারণা হইত ওগুলি চিরদিনের জন্য বেহাত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পর আবিষ্কার করিতাম সেগুলি তিনি মায়ের কাছে গোপনে দিয়া গিয়াছেন। মুখুজ্যে মশাই কোনও ছদ্মবেশী বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এম-এ ক্লাশের ফিলসফির ছাত্রকে পড়া বলিয়া দিতে পারিতেন, জটিল মোকদ্দমায় সুনিপুণ ব্যারিষ্টারের মতো পরামর্শ দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসের মনোরম গল্প আমাদের শুনাইতেন। কিন্তু নিজেকে কখনও জাহির করেন নাই। আমরণ আত্মগোপন করিয়াছিলেন। বহু বাঙ্গালী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বন্ধু ছিলেন তিনি, কিন্তু কেহ তাঁহার পূর্ণ পরিচয় জানিতে পারে নাই। তিনি কত দুঃখী পরিবারকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যাদায় মুক্ত করা, বেকার ছেলেদের চাকুরি জোগাড় করিয়া দেওয়া, অসুস্থ রোগীর সেবা করা, মোকর্দ্দমাজালে জড়িত বিপন্ন বাঙ্গালীকে উদ্ধার করা—এই সবই তাঁহার কাজ ছিল। থিয়েটার দেখিতে খুব ভালোবাসিতেন। আর ভালবাসিতেন কাব্যপাঠ করিতে। নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'পলাশীর যুদ্ধ' খুব প্রিয় ছিল তাঁহার। আমরা পড়িতাম, সকলে বসিয়া শুনিত।

শ্রোতাদের মধ্যে মা-ও থাকিতেন। আমার মায়ের অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল। তিনি নিজে যদিও তেমন লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু যাহা শুনিতেন তাহা তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত। যাত্রা শুনিয়া তিনি সমস্ত যাত্রার পালাটাই বাড়িতে আসিয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। মুখুজ্যে মশাই আমাদের বাড়িতে এই সান্ধ্যপাঠ সভা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাবা যেদিন বাড়িতে থাকিতেন সেদিন বাবাই পড়িতেন। না থাকিলে আমরা পড়িতাম। সেকালে আমাদের দেশে যতগুলি নামজাদা কাগজ ছিল সবই বাবা কিনিতেন। বান্ধব, সুপ্রভাত, সাহিত্য, প্রদীপ, প্রবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী নিয়মিত আসিত আমাদের বাড়িতে। বসুমতী হইতে সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত বইগুলিও ছিল আমাদের। মোহিতবাবু রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি 'কাব্যগ্রন্থ' নাম দিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেগুলিও বাবা কিনিয়াছিলেন। আমার বাল্যকালটা এইভাবে একটা সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছিল। বাবার রোগীরাও আমার উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। মনে আছে আমার ছোট ভাই ভোলা এবং আমি ছুটির দিন দ্বিপ্রহরে রোগী-ডাক্তার খেলা খেলিতাম। ভোলা হইত রোগী, আমি ডাক্তার। একটা ঘরে বাবার ডাক্তারখানার ঔষধের খালি বোতলগুলি সাজানো থাকিত। আমি এক-একদিনে এক-একটা বোতলে জল পুরিয়া ভোলাকে সেগুলি খাওয়াইতাম। একদিন একটা খালি টিংচার নাক্স-ভোমিকা বোতলে জল পুরিয়াছিলাম। বোতলের তলায় বোধহয় একটু নাক্স-ভোমিকা ছিল। তাহা পান করিয়া ভোলা অসুস্থ হইয়া পড়িল। বাবার হাতে প্রহার খাইতে হইল সেদিন। বাড়িতে হৈ-হৈ কাণ্ড। ভোলাকে নুন জল খাওয়াইয়া বমি করানো হইল। সেদিন হইতেই বন্ধ হইয়া গেল আমাদের রোগী ডাক্তার খেলা। ছেলেবেলার আরও দুই একটা দুষ্কৃতি এইখানে বলিয়া লই।

আমার মা-বাবা দুইজনেই পান দোক্তা খাইতেন। মায়ের মুখ হইতে আমরা পান খাইতাম। সুতরাং খুব অল্প বয়স হইতেই দোক্তা খাওয়াটা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। ক্রমশঃ সেটা নেশায় পরিণত হইল। মা নানারকম মশলা দিয়া দোক্তা প্রস্তুত করিতেন। দোক্তা রোদে দিয়া, সেই দোক্তা গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত মৌরি ভাজা মিশাইতেন। তাহার পর তাহার সহিত সামান্য একটু চুয়া মাখিয়া দিতেন। অপূর্ব জিনিস হইত। মায়ের কৌটা হইতে সেই দোক্তা আমরা চুরি করিয়া খাইতাম এবং উপরের ঠোঁটের ডানদিকে সেটি রাখিতাম। বেশ ভাল লাগিত। বিনা পানেই আমরা দুই ভাই ছেলেবেলায়

দোক্তা খাইতে শিখিয়াছিলাম। চুরি বেশী দিন চলে না। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। মা তখন দোক্তার কৌটাটা লুকাইয়া রাখিতে লাগিলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে দমিলাম না। চুয়াগন্ধী-মশলা মিশ্রিত দোক্তার অভাব আমরা পূর্ণ করিলাম শুকনো দোক্তাপাতা দিয়া। আমাদের তখন তামাকের চাষ হইত। সুতরাং দোক্তাপাতার অভাব আমাদের হয় নাই। কিছু দোক্তাপাতা আমরা গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিতাম। আমাদের নিজেদের মধ্যে দোক্তাপাতার একটা সঙ্কেত নামও ছিল। আমরা দোক্তাকে 'সেই' বলিতাম। দোক্তা হইতে ক্রমশঃ বিড়িতে প্রমোশন হইল। আমাদের অনেক সহপাঠী তখন বিড়ি খাইত। তাহারা আমাদেরই দীক্ষা দিল। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে অধিকাংশই বেহারী ছিল। তাহাদের মায়েরাও বিড়ি এবং হুঁকার তামাক খাইতেন অনেকে। সুতরাং ছেলেদের বিড়ি তামাক খাওয়াটা তাহাদের চক্ষে বিশেষ দোষাবহ ছিল না। কিন্তু মা আমাদের মুখে বিড়ির গন্ধ পাইয়া একদিন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করিলেন। বিড়ি খাওয়া ত্যাগ করিতে হইল। আমাদের একজন সঙ্গী বলিল—সিগারেট খাও। সিগারেট খাইবার পর এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি চিবাইয়া ফেলিলে মুখে আর গন্ধ থাকিবে না। পরামর্শটা সমীচীন মনে হইল। কিন্তু সিগারেট পাই কোথা? বন্ধুরা দুই একদিন বিনা পয়সায় খাওয়াইল। ধরাও পড়িলাম না। যখন নেশা জমিয়া গেল তখন দেখিলাম বন্ধুরা আর দিতেছে না। নিজেদেরই কিনিতে হইবে। কোথায় পয়সা পাই? মা-বাবা আমাদের হাতে পয়সা দিতেন না। পয়সা চুরি করার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না। তবু শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বাহির করিয়া ফেলিলাম। আমাদের বাগানে অনেক ছাগল ঢুকিয়া আমাদের ফলগাছ নষ্ট করিত। আগে সেগুলিকে তাড়াইয়া দিতাম, আমাদের কুকুর কালো তাহাদের তাড়া করিয়া যাইত। এইবার ঠিক করিলাম তাহাদের তাড়াইয়া দিব না, ধরিয়া খোঁয়াড়ে দিব। তাহা হইলে কিছু পয়সা পাওয়া যাইবে। সপ্তাহে গোটা দুই পয়সা রোজগার করিলেই বেশ কয়েকদিন সিগারেট খাওয়া চলিবে। সেকালে 'রামরাম' নামে সিগারেট পয়সায় দশটা করিয়া পাওয়া যাইত। 'রেডল্যাম্প' পয়সায় পাঁচটা। 'হাওয়া গাড়ি' চার পয়সা প্যাকেট। আর একটা কি ঈষৎ গোলাপী রঙের সুগন্ধী সিগারেট পাওয়া যাইত—তাহার নামটা এখন মনে পড়িতেছে না (হয়তো মোহিনী)—সেটা আর একটু দামী। আমাদের বাড়ির সংলগ্ন আমবাগান প্রায় দশ বারো বিঘা জমির উপর। সেখানে অনেক ছাগল চরিত। আমি ভোলা এবং আর একটি

ছোঁড়া চাকর ( ভাগিয়া ) সপ্তাহে প্রায় ৮।১০টি ছাগল ধরিতাম। ভাগিয়া সেগুলি খোঁয়াড়ে দিয়া আসিত। আমাদের উপার্জনের কিছু অংশ অবশ্য ভাগিয়াকে দিতে হইত। ভাগিয়াকে আমরা সিগারেটও দুই একটা দিতাম। কিন্তু আর একটা মুস্কিল হইল। সিগারেট কিনিয়া রাখিব কোথা? বাড়িতে রাখা তো অসম্ভব। ভাগিযাই বুদ্ধি দিল। আমাদের বাগানে অনেক আমগাছ ছিল। ভাগিয়া বলিল আমগাছের ডালে অনেক 'খোতা' আছে, অর্থাৎ গর্ত আছে, যেখানে পাখিরা বাসা বানায়। সে সেইখানেই সিগারেটের বাক্স ও দেশলাই লুকাইয়া রাখিবার পরামর্শ দিল। আমরা বাগানে গিযাই সিগারেট ফুঁকিতাম। এইসব লিখিতে গিয়া ভাগিযার কথা মনে পড়িতেছে। তাহার বাবা বঙ্কু আমাদের চাকর ছিল। ভাগিয়া ছিল রাখাল। কিছুদিন পর ভাগিয়া কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। তখনও বাবা তাহাকে খাইতে দিতেন, সামান্য বেতনও দিতেন। সে আমাদের মাঠে বাগানে পাহারার কাজ করিত। তখনও কুষ্ঠরোগের সুচিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই। ভাগিয়ার ভাই ন্যাঙা পরে রাখাল হিসাবে বহাল হইয়াছিল। তাহার বোন কোশয়াও। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল এবং বড় বড় দাঁত ছিল তাহার। মণিহারীতে এখনও আমাদের বাড়ি এবং চাষবাস বাগানপুকুর সবই আছে। আমার পঞ্চম ভ্রাতা নির্মল ( কালু ) সে সবের দেখাশোনা করে। ন্যাংড়া নাকি এখনও কাজকর্ম করে। তাহার ছেলেরাও নাকি কাজে বহাল হইয়াছে শুনিয়াছি। সেই ছেলেবেলায় যে সিগারেট খাওয়া শিখিয়াছিলাম তাহা অনেক বড় বয়স পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমার 'নিকোটিন' প্রীতি শুধু সিগারেট খাওয়াতেই নিবদ্ধ থাকে নাই। তামাক পাতা তো চিবাইতামই, সিগারেটও ক্রমশঃ বেশী দামী সিগারেটে, সিগারে, পাইপে, গড়গড়ায়, সটকায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। এসব অবশ্য হইয়াছিল আমি যখন রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন। কলেজ জীবনে সিগারেট ফুঁকিতাম, নস্যও লইতাম। বাবার সামনে সিগারেট খাইবার সাহস সেকালের ছেলেদের ছিল না। বাবার জন্যই শেষকালে গড়গড়া, সটকা প্রভৃতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কারণ ওগুলি সহজে লুকানো যাইত না। বাবা কিন্তু একদিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন আমি নস্য লই। বলিলেন—দে তো দেখি, কেমন লাগে। বাবা নস্য লইয়া দুই একবার হাঁচিলেন কিন্তু নস্য লওয়া ত্যাগ করিলেন না। প্রায়ই আমার কৌটা হইতে নস্য লইতেন। তাহার পর ক্রমশঃ তিনিও একজন নস্য-খোর হইয়া উঠিলেন। আমি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছি এসব অবশ্য

তখনকার ঘটনা। তাহার পর আমি নস্য ত্যাগ করিয়াছিলাম, বাবার জন্য কিন্তু বরাবর র-মাদ্রাজী নস্য সরবরাহ করিতে হইয়াছে আমাকে। বিদেশ হইতে যখন বাড়ি যাইতাম বাবার জন্য দুইটি জিনিস অবশ্যই লইয়া যাইতে হইত—একটিন র-মাদ্রাজী নস্য এবং একটিন বিলাতী ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট। কয়েক বৎসর হইল বাবার মৃত্যু হইয়াছে, আমিও এখন বার্ধক্যে উপনীত। আমি আবার নস্য লইতে শুরু করিয়াছি। বাবার কথা প্রায়ই মনে পড়ে।

ছেলেবেলার কথায় আবার ফিরিয়া যাই। ছেলেবেলার আর একজন লোকের কথা মনে পড়ে। তাঁর নাম আশুতোষ চক্রবর্তী। আমরা তাঁহাকে জ্যাঠামশাই বলিয়া ডাকিতাম। যতদূর মনে পড়ে তিনি আমাদের বাড়িতে চাষ-বাস দেখাশোনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর কি সূত্রে পরিচয় হইল তাহা আমার জানা নাই। বাবা যদিও মোটেই বিষয়ী লোক ছিলেন না, কিন্তু তবু তাঁর কিছু জমি-জমা জুটিয়া গিয়াছিল। বাবা মণিহারী অঞ্চলের তিন চারজন জমিদারদের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা জোর করিয়া বাবাকে কিছু জমি গছাইয়া দিয়াছিলেন। বাবা প্র্যাকটিস লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, চাকর বাহাল করিয়া চাষ করিতে হইত। চাষের সম্বন্ধে বাবার অভিজ্ঞতাও তেমন কিছু ছিল না। ফলে চাষের পিছনে যদিও প্রচুর খরচ হইত, আমাদের পরিবার এবং বাবার বন্ধুবান্ধবদের পরিবারবর্গ যদিও আমাদের জমির পটল, বেগুন, কপি, আখ, ডাল, আম প্রভৃতি খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন কিন্তু চাষ হইতে লাভ তেমন কিছু হইত না। যে মুখুজ্যে মশাই-এর কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, তিনি একবার হিসাব করিয়া বাবাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে চাষ হইতে লাভ তো হইতেছেই না, লোকসান হইতেছে। তখন বাবা ঠিক করিলেন যে, একজন অভিজ্ঞ সৎ লোকের উপর চাষের ভার দিবেন। আমাদের দেশে অভিজ্ঞ লোক যদিও বা পাওয়া যায় সৎ লোক পাওয়া খুবই মুস্কিল। বাবা কি করিয়া আশু জ্যাঠামশাইয়ের নাগাল পাইয়াছিলেন তাহা জানি না। এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী পত্রিকা যখন প্রকাশিত হইত তখন সেই পত্রিকার অফিসে কাজ করিতেন জ্যাঠামশাই। 'প্রবাসী'র বৈষয়িক দিকটা তিনি দেখিতেন। রামানন্দবাবুর সহিত তিনি বেশীদিন কাজ করিতে পারেন নাই, কেন পারেন নাই, তাহা আমি জানি না। জ্যাঠামশাই সে যুগের ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাঁহাকে। শুনিয়াছি এইজন্যই তাঁহাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল নাকি। তাঁহার দেশ

যতদূর মনে পড়িতেছে যশোহর জেলায় ছিল। আমাদের বাড়িতে তিনি আমাদের বাড়িরই একজন হইয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বাবা তাঁহাকে কিছু বেতন দিতেন। যতদূর মনে পড়িতেছে সে বেতনের পরিমাণ মাসিক দশ টাকা। আমাদের বাড়িতেই তিনি থাকিতেন, আমাদের সঙ্গেই আহারাদি করিতেন। আমার তৃতীয় ভাই টুলু (গৌরমোহন) তখন কয়েক মাসের শিশু মাত্র। তাহাকে তিনি সর্বদা কোলে লইয়া থাকিতেন। টুলু বারবার তাঁহার কাপড় ভিজাইয়া দিত বলিয়া তিনি একাধিক কাঁথা লইয়া তবে তাহাকে কোলে করিতেন। টুলুকে তিনি 'মিনিট মুতো' আখ্যা দিয়াছিলেন। নিজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। তাঁহার তিন চারিটি গামছা এবং একাধিক ফতুয়া থাকিত। ফতুয়াই তিনি সাধারণত পরিতেন। তাঁহাকে কখনও গেঞ্জি পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি নিজের ফতুয়া, গামছা নিজের হাতে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিতেন, নিজের কাপড় নিজে কাচিতেন। পান খাওয়া অভ্যাস ছিল। নিজে পান সাজিয়া খাইতেন এবং পান সাজিবার সময় দুই চারি খিলি পান সাজিয়া বাটায় রাখিয়া দিতেন। তখন আমাদের বাড়িতে প্রকাণ্ড একটা পানের বাটা ভিতরের বারান্দায় এককোণে থাকিত। বহিরাগত অতিথিদের জন্য মাকেই পান সাজিতে হইত। মায়ের শ্রম লাঘব করিবার জন্য তিনি নিজের পান নিজে তো সাজিয়া খাইতেনই, দুই চারি খিলি বেশীও সাজিয়া বাটায় রাখিয়া দিতেন। সেকালে আমাদের বাড়িতে অনেক অতিথি-অভ্যাগতের সমাগত হইত। পানের খরচ প্রচুর ছিল। আমাদের বাড়িতে খাইতও অনেক লোক। জ্যাঠামশাই বাবাকে প্রায় উপদেশ দিতেন 'হেঁড়ো মেম্বার' বেশী জুটাইবেন না। কিন্তু বাবা কখনও কোনও অতিথিকে বিমুখ করিতে পারেন নাই। মুশকিল হইত যখন কোন খবর না দিয়া সদলবলে কোন পরিবার আসিয়া হাজির হইতেন, এ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। আমাদের বাড়িতে প্রথম 'বামুন দিদি' নামে একজন বুড়ী রাঁধুনী থাকিতেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় তাঁহার বাড়ি ছিল। বড়ই মুখরা ছিলেন তিনি। অসময়ে খবর না দিয়া লোকজন আসিলে তিনি বড় চেঁচামেচি করিতেন। বাবাকেও ভর্ৎসনা করিতেন খুব। বাবা কিন্তু নির্বিকার ছিলেন এ বিষয়ে। জ্যাঠামশাইয়ের উপদেশ বা বামুনদিদির ভর্ৎসনা তাঁহাকে অতিথিপরায়ণতা হইতে কখনও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। বামুন দিদি যখন মারা গেলেন, তখন আমাদের বাড়িতে 'ঠাকুর' আসিল। মৈথিলী পাচককে সাধারণত ওদেশে ঠাকুর বলা হইত। নানারূপ

বিচিত্র চরিত্রের 'ঠাকুর' জুটিয়াছিল আমাদের বাড়িতে। কেহ 'গায়ক' গান করিতে করিতেই রান্না করিত। কেহ খৈনী-খোর, খৈনী মুখে দিয়া বার বার রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া পচপচ করিয়া থুতু ফেলিত। কেহ বা চন্দন-চর্চিত অতি ধার্মিক। রান্নাঘরে 'চৌকার' ভিতর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। কেহ বা চোর, রাঁধিতে রাঁধিতে গরম গরম মাছ মাংস খাইয়া ফেলিত। মাকেই সমস্ত ব্যাপারটার হাল ধরিয়া থাকিতে হইত। ঠাকুর একটা থাকিত বটে, কিন্তু মা সর্বদা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। শেষ যে ঠাকুরটির কথা মনে পড়িতেছে সে খঞ্জ। যখন চলিত মনে হইত নাচিতে নাচিতে চলিতেছে। কথা কম বলিত, কিন্তু যেটি বলিত, সেটি অতি কর্কশ। কিন্তু রাঁধিত ভালো। হাটে-বাজারে গেলে চুরি করিত। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া সে একদিন প্রকাশ করিল যে এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। দেশ হইতে একটি পাত্রীর খবর আসিয়াছে, এইবার সে বিবাহ করিবে। বিবাহের জন্য কিছু অগ্রিম মাহিনা লইয়া সে দ্বারভাঙ্গায় চলিয়া গেল। ফিরিল মাস দুই পরে পরিধানে একটি হলদে রং-এর কাপড়। মা বলিলেন—তুমি বউকেও সঙ্গে করিয়া আনিলে না কেন। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তাহার পর বলিল, কনিয়া এখনও 'বুতরু' আছে। তাহার বয়স নাকি মাত্র নয় বৎসর! এইসব ঠাকুরদের ব্যাপার আমাদের বাল্যজীবনে নিত্যনূতন বৈচিত্র্যময় আলোকপাত করিত। বেজদার (আসল নাম ছিল ব্রজ) কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। বেজদা ছিল বাংলাদেশের চাকর। অত্যন্ত কদর্শন। বড় বড় হলদে দাঁত, মুখে দুর্গন্ধ, চোখে পিঁচুটি, রং কালো। কিন্তু সে এমন স্নেহময় ছিল যে আমরা তাহার সঙ্গ বড় ভালোবাসিতাম। সে আমাদের ঘুড়ি তৈয়ারি করিয়া দিত, কালীপূজার সময় আকাশপ্রদীপ দিবার জন্য ফানুস প্রস্তুত করিত, মা বাবার অগোচরে বেতবন হইতে পাকা বেত ফল পেয়ারা গাছের মগডাল হইতে পেয়ারা এবং বাগান হইতে করমচা সংগ্রহ করিয়া দিত। ভোলাকে সে বাল্যকাল হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। ভোলা সন্ধ্যার সময় তাহার বিছানাতেই ঘুমাইয়া পড়িত। ভোলা বেজদার খুব ন্যাওটা ছিল। ভোলা একবার একটা শৌখিন ফুলদানি ভাঙিয়া ফেলে। বেজদা দোষটা নিজের ঘাড়ে লইয়া বাবার নিকট হইতে প্রচণ্ড বকুনি খাইয়াছিল মনে পড়িতেছে। বেজদা একবার দেশে গেল। হুগলি জেলার কি একটা গ্রামে তাহার বাড়ি ছিল। অনেক দিন ফিরিল না। তাহার পর খবর পাওয়া গেল বেজদা মারা গিয়াছে।

জগন্নাথের কথাও মনে পড়িতেছে। মণিহারীতে তাহার বাড়ি। আগে ঘোড়ার পিঠে মাল গাদাই করিয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিত। কিন্তু সে ব্যবসাতে সুবিধা করিতে পারে নাই। অনেক লোকসান হইয়াছিল। তাই আমাদের বাড়িতে চাকররূপে বহাল হইয়াছিল। অনেকদিন আমাদের বাড়ির চাকর ছিল সে। খুব কুঁড়ে ছিল বলিয়া মায়ের কাছে প্রায়ই বকুনি খাইত। কিন্তু সে যে খুব কর্তব্যনিষ্ঠ ছিল, তাহার নৈষ্ঠ্য যে সাধারণ পর্যায়ের ছিল না ইহার একটি প্রমাণ আমার স্মৃতি চিত্রশালায় সঞ্চিত হইয়া আছে। আগেই বলিয়াছি আমাদের বাড়িতে প্রত্যহ অনেক অতিথি সমাগম হইত। বৈকালে সেদিন হাসপাতালের বারান্দায় চায়ের আসর বসিয়াছে। মা বাড়ির ভিতর চা প্রস্তুত করিতেছেন, জগন্নাথ দুইটি করিয়া কাপ হাতে লইয়া বার বাড়িতে আসিয়া সেগুলি বাহিরের আসরে পৌঁছাইয়া দিতেছে। তখনও আমাদের বাড়িতে 'ট্রে' নামক আসবাবটির আবির্ভাব হয় নাই। দুইটি দুইটি করিয়া কাপই লইয়া যাইত চাকরেরা। আমাদের বাড়ির খিড়কি দ্বার দিয়া বেশ কিছু দূর হাঁটিলে তবে চায়ের আসরে পৌঁছানো যায়। তখন খিড়কির নিকটই আমাদের 'ভুসকার' ছিল। এখানে গরুদের খাইবার জন্য নানা রকম ভুসি জমা থাকিত। সেই ভুসকারের কোথায় যেন একটা ভীমরুলের চাক হইয়াছিল। আমাদের গরুর চাকর ভুসকার হইতে ভুসি বাহির করিতে গিয়া সেই চাকে খোঁচা দেয়। ভীমরুল উড়িবামাত্র সে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। জগন্নাথ ঠিক সেই সময় দুই কাপ চা হাতে করিয়া খিড়কি দিয়া বাহির হইতেছিল। বাহির হইবামাত্র চার পাঁচটা ক্রুদ্ধ ভীমরুল উড়িয়া আসিয়া তাহার গালে কপালে মুখে খুতনিতে আক্রমণ করিয়া হুল ফুটাইতে লাগিল। জগন্নাথ অত্যন্ত কাতর হইল বটে, কিন্তু কর্তব্যচ্যুত হইল না। তাহার হাত হইতে চায়ের পেয়ালা পড়িল না। সেগুলি চায়ের আসরে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার পর হাত দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল ভীমরুলগুলিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত মুখটা ফুলিয়া উঠিল। জ্বর আসিল একটু পরে। তাহার পরদিন তাহার মুখের চেহারা যাহা হইল তাহা ভয়ঙ্কর। চোখ দুইটি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া গেল, ঠোঁট দুইটি এমন ফুলিয়া গেল যে সে মুখ খুলিতে পারিল না। গাল দুইটিও বিসদৃশ আকৃতি ধারণ করিল। জগন্নাথের মুখের এই বীভৎস ছবিটা এখনও আমার মনে আঁকা আছে। জগন্নাথ আমরণ আমাদের বাড়িতেই কাজ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলেরাও চাকর হিসাবে আমাদের বাড়িতে বাহাল হইয়াছিল। বড় ছেলে মোহন আর ছোট ছেলে যদু। মোহনকে মোহন বলিয়া কেহ ডাকিত

না। বলিত মোহনা আর যতকে যতুয়া। মোহনা কিছুদিন চাকরি করিয়া আবার ব্যবসায় আরম্ভ করে। আমার বাবাই তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। যতুয়া কিন্তু চাকর হিসাবে অনেক দিন ছিল। সে আমার পঞ্চমভ্রাতা কালুর বাহন ছিল। কালুকে সে কোলে করিয়া বেড়াইত। কালু কিছুতেই তাহার কোল হইতে নামিতে চাহিত না। যতুয়ার কোমরে এজন্য একটা কালো দাগই হইয়া গিয়াছিল। যতুয়া এখনও আমাদের বাড়িতে আছে, কালুই এখন চাষবাসের মালিক। যতুয়া তাহার সহকারী। যতুয়ার এখন চুল ভুরু সব পাকিয়া গিয়াছে। যতুয়ার ছেলে দশরথ লেখাপড়া শিখিয়াছে। সে এখন সাধারণ চাকরি করে না। মাষ্টারি না কেরাণীগিরি, কি একটা করে যেন। তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ হইবার পর কি একটা গোলযোগ হইয়াছিল। সেটা মিটাইয়া দিবার জন্য যতুয়া ভাগলপুরে আমার কাছে গিয়াছিল। সেকালে আমাদের বাড়িতে অনেক চাকর থাকিত। আমাদের জমিতে কাজ করিত তাহারা। হিন্দু মুসলমান দুই রকম চাকরই ছিল। ইংরেজের কূটনীতি তখনও হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মুসলমান চাকরদের মধ্যে ছিল ফরিদ, আশুয়া, কয়লা আর চামরু। ইহারা সপরিবারে আমাদের জমিতে কাজ করিত। মাহিনা পাইত এবং সিধা পাইত। সিধাটা দেওয়া হইত জমিতে উৎপন্ন ফসল হইতে। চামরুর বউএর কথা আগেই বলিয়াছি। তাহার দুধ খাইয়াই আমি আমার শৈশবের পুষ্টি আহরণ করিয়াছিলাম। আরও দুইজন আমাদের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিল। আশুয়ার মা এবং আশুয়ার নানী (দিদিমা)। আশুয়ার নানী খুব বৃদ্ধা ছিল। কথা বলিতে গেলে গলা কাঁপিয়া কাঁপিয়া যাইত। সে বুড়ি আমার মায়ের সেবা খুব করিত। মা যখন আঁতুড় ঘরে যাইতেন তখন একজন চামাইন তো থাকিতই। আশুয়ার নানীও থাকিত। গরম তেল মায়ের পিঠে কোমরে মালিশ করিয়া দিত।' মনে পড়িতেছে মায়ের একবার পেটে ব্যথা হইয়াছিল, আশুয়ার নানী সমস্ত রাত আসিয়া মায়ের পেটে গরম তেল দিয়া গমের চোকরের সেঁক দিয়াছিল। আশুয়ার মা-ও আমাদের বাড়ীর অনেক কাজ করিত। আমাদের বাড়িতে তখন গম পিষিবার জন্য জাঁতা ছিল। চাষের গম হইতে ঘরের জাঁতাতে পিষিয়াই আটা প্রস্তুত হইত তখন। ছাতুও হইত। বাজার হইতে আটা বা ছাতু কিনিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। মণিহারীর বাজারে ভাল আটা পাওয়াও যাইত না। এই জাঁতা চালাইতে

দুইজনের প্রয়োজন হইত। আওয়ার মা ও ভাখিয়ার বোন কেশিয়া প্রায়ই এ কাজ করিত। আমাদের গরুও ছিল অনেক। দুগ্ধবতী মহিষীও ছিল একটি। আমাদের বাড়ির দুধ দুহিত হোকরা গোয়ালা। লম্বা চেহারা। লম্বতঃ সাড়ে ছয় ফিট। তেমনি রোগা। তাহার ক্ষুদ্রকায়া বেঁটে বউও আসিত আমাদের বাড়িতে। আসিয়া মায়ের কাছে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া ফিস ফিস করিয়া গল্প করিত। মাঝে মাঝে ছোট ভাঁড়ে করিয়া 'দহি' আনিত আমাদের জন্য। ভাঁড়কে উহারা বলিত 'লদিয়া'। মাকে বলিত—খোকাবাবুদের জন্য এক 'লদিয়া' দহি আনিয়াছি। দহি খাঁটি, সুস্বাদুও খুব, কিন্তু ধোঁয়া গন্ধ। বহুয়ার মাও আমাদের জন্য নাড়ু আনিত নানারকম। মুড়ির নাড়ু, মুড়কির নাড়ু, চিঁড়ার নাড়ু, মকাই-এর খই-এর নাড়ু, তিলের নাড়ু, চিনি এবং তিল দিয়া প্রস্তুত তিলয়া—অনেক রকম খাবার আনিত সে। আমার সহপাঠী নিত্যগোপালের মাও—অনেক নাড়ু পাঠাইতেন আমাদের জন্য। তিনি আবার নাড়ুর সহিত ক্ষীরও পাঠাইতেন। সে সময় আমরা আর একরকম জিনিসও খাইতাম। তাহার নাম মাড়া। চীনা নামক এক প্রকার শস্যের ভর্জিত রূপই মাড়া। ভিজাইয়া দুগ্ধ সহযোগে খুবই সুখাদ্য। আর একরকম নাড়ু ছিল রামদানা। ছট পরব বিহারের একটা বড় পরব। সে সময় আর এক প্রকার খাদ্য আমাদের বাড়িতে আসিত। তাহার নাম 'ঠেকুয়া'। শুকনো পিঠে গোছের। বেশ সুস্বাদু।

ছেলেবেলায় বাহিরের আরও কয়েকটি বাঙালী পরিবারের সহিত আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা আমাদের আত্মীয়ের মতোই ছিলেন। প্রথমে যাঁহার কথা মনে পড়িতেছে তাঁহার নাম সূর্যকান্ত বাগচী। তাঁহাকে আমরা জ্যাঠামশাই বলিয়া ডাকিতাম। তিনি থাকিতেন পূর্ণিয়ায় (ভাট্টায়), পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হেড ক্লার্ক ছিলেন। খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুরু লেন্সের চশমা পরিতেন। পড়িবার সময় খালি চোখে পড়িতেন, বই চোখের খুব কাছে আনিয়া পড়িতে হইত। তাঁহার বড় ছেলে নীলকান্ত আমাদের নীলুদা ছিলেন। উনি [illegible] হইয়া পাটনা হইতে রিটায়ার করিয়াছিলেন। নীলুদার যখন বিবাহ হয়, তিনি [illegible] একবার [illegible]হারীতে আসিয়াছিলেন। আমরা [illegible] [illegible] মনে পড়িতেছে। আমাদের প্রায় [illegible] [illegible] [illegible] ভুলি নাই। [illegible] [illegible]

জ্যাঠাইমার কথাও মনে আছে। খুব স্নেহময়ী ছিলেন। নীলুদার বোন বীণুদি, মাতুদি এবং আছকেও ভুলি নাই। জানি না তাহারা এখন কোথায়। নীলুদার ছোট ভাই খুঁচু (বমলকান্তি) এখনও পূর্ণিয়ায় আছে। সেখানে ওকালতি করে। তাহার ছোট ভাই খোকন মারা গিয়াছে শুনিয়াছি।

জ্ঞানবাবু কাকা আমাদের পরিবারের আর একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকেও আমরা আমাদের পরিবারেরই একজন মনে করিতাম। মণিহারীতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের জমিদারী ছিল। জ্ঞানবাবু ছিলেন সেই জমিদারের নায়েব। পরে ম্যানেজারও হইয়াছিলেন। কার্যত তিনিই জমিদারীর সর্বেসর্বা ছিলেন। আমাদের বাড়ির সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁহাদের। কাকীমা (জ্ঞানবাবু কাকার স্ত্রী) সেকালের আধুনিকা ছিলেন। জুতা পরিতেন, কাপড় জামার ফ্যাশানও নূতন রকমের ছিল। তিনি কাপড়ের উপর সৌখীন সূচীকর্ম করিতে পারিতেন। উলও বুনিতেন। রান্নাও জানিতেন অনেক রকম। পূর্ববঙ্গের মেয়ে ছিলেন। বাঙালী রান্না তো জানিতেনই, বিদেশী রান্নাও জানিতেন অনেক রকম। মাংস রাঁধিতেন চমৎকার। আমার মা তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে চপ, কাটলেট এবং পটলের দোরমা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কৌশল তিনিই শিখাইয়াছিলেন মাকে। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই নূতন নূতন রকম খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিতেন। পুডিং বোধ হয় তিনিই প্রথম খাওয়ান আমাদের। তাঁহার দুইটি কন্যা ছিল—বড়টির নাম অরুণা। আমরা অরুণাদিদি বলিতাম, আমাদের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। ছোট মেয়ের নাম যতদূর মনে পড়িতেছে—বুলবুলি ছিল। বুলবুলি বিবাহের পর একটি মেয়ে রাখিয়া মারা গিয়াছিল। তাহার মেয়েটির নাম ছিল টুনটুনি। সেও কিছুদিন পরে মারা যায়। তাহার মৃত্যু লইয়া উঁহাদের পরিবারে শোকের যে তুফান বহিয়া যায় তাহা এখনও আমার মনে আছে। জ্ঞানবাবু কাকা ছোট ছেলের মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়াছিলেন।

জ্ঞানবাবু কাকা সত্যই আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে বাবাকে উপদেশ দিতেন। আমাদের বাড়িতে [illegible] যে প্রকার [illegible] তাহাতে অগ্রণী হইয়া [illegible] করিতেন জ্ঞানবাবু [illegible]। আমাদের উপনয়নের সময় [illegible] [illegible] [illegible] জ্ঞানবাবু [illegible]। জ্ঞানবাবু কাকার [illegible]

মুনিয়ালাল। তাহার অধীনে আরও পাচক বহাল করিয়া জ্ঞানবাবু কাকা সুষ্ঠুরূপে সমস্ত নির্বাহ করিতেন। বাবা ও-অঞ্চলের জনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন। সুতরাং কয়েকখানা গ্রামের লোক আসিয়া সমবেত হইতেন। হিন্দু মুসলমান বাঙালী বিহারী সব। নিমন্ত্রিত, অনাহূত, রবাহূত, সব রকম লোকই থাকিত এবং সকলকেই খাওয়াইতে হইত। এ সমস্ত ব্যাপারের ভার লইতেন জ্ঞানবাবু কাকা।

পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদারও এইসব ভোজকাজে প্রচুর সাহায্য করিতেন। মাছ মাছ এবং দই প্রচুর আসিত। আর আসিত বোঝা বোঝা কলাপাতা। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আমার বোন রাণীর বিবাহ। দিল্লীর দেওয়ান গয়এুর জমিদার গৌরবাবুকে যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি কিছু মাছ এবং কয়েক হাঁড়ি দই পাঠাইয়াছেন। কিন্তু বিবাহের দিন দুই পূর্বে কয়েকটি গরুর গাড়িতে চাল ডাল তরিতরকারি এবং গোটা দুই তাঁবু লইয়া কয়েকজন সমর্থ যুবকও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গৌরবাবুর একটি চিঠি আনিয়াছিল। সে চিঠিতে লেখা ছিল—কল্যাণীয়েষু, কয়েকটি সমর্থ যুবককে পাঠাইতেছি। ইহাদের ফরমাস করিবেন। বিবাহ বাড়িতে অনেক কাজ; ইহাদের দিয়া কাজ করাইয়া লইবেন। খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে না। আমি ইহাদের সহিত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য, একটি পাচক এবং দুইটি তাঁবু পাঠাইলাম।

বিবাহের দিন সকালে তিনি পালকি করিয়া আসিলেন। বলিলেন, আমি খাইয়া আসিয়াছি, এখন কিছু খাইব না।

তিনি বরযাত্রীদের সহিত আলাপ-আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। রাত্রে যতক্ষণ না কন্যা সম্প্রদান শেষ হইল, ততক্ষণ তিনি কিছু খাইলেন না। বাবা ব্যস্ত হওয়াতে বাবাকে বলিলেন—তুমি উপবাস করে আছ। যতক্ষণ না কন্যা সম্প্রদান হচ্ছে আমিও উপবাসী থাকব। খাওয়ানো আছেই, আগে আমরা দায়মুক্ত হই, তারপর খাওয়া যাবে।

ইহাই সেকালের আভিজাত্য ছিল। বাবা গৌরবাবুকে পিতৃবৎ মান্য করিতেন। আমরা তাঁহাকে ঠাকুরদা বলিতাম। তিনিও বরাবর আমাদের সহিত অন্তরঙ্গ ব্যবহার করিতেন। সেকালে প্রবাসী বাঙালীরা যেন বিরাট একটা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বহু বিশিষ্ট পরিবার যেন একটা অদৃশ্য সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ থাকিতেন, পরস্পরকে নিজের লোক মনে করিতেন। পরস্পরকে বিপদে সাহায্য করিতেন, উৎসবে সঙ্গী হইতেন, কোনও জনহিতকর কাজকে সফল করিবার জন্য [illegible] একজোট হইয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহার সংসারেই সে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন

তাহা নয়, কিন্তু তাঁহারা এমন একটি আভিজাত্যপূর্ণ অমায়িকতার সহিত পরস্পরের সুখে দুঃখে আবদ্ধ থাকিতেন যাহার তুলনা আজকাল আর বড় একটা পাই না। সে বিস্তৃত উদার মন আজকাল যেন আর নাই। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, বিহারী সবরকম পরিবারই এই বিরাট লিষ্টিভুক্ত ছিল। সুবাতালি, তহশিলদার, ভাদো মুন্সী, মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রাণের সম্পর্ক ছিল। বহু বিহারী পরিবার আমাদের পরিবারের সহিত প্রেমের বন্ধনে যুক্ত ছিলেন। এখনও অনেকে আছেন। রমজান আলী আমার সহপাঠী ছিল। রমজানের কথায় আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। মণিহারী স্কুলের কোন বোর্ডিং ছিল না। দূর হইতে যেসব ছেলেরা আসিত বাবা তাহাদের আমাদের হাতায় থাকিতে দিতেন। ছোট ছোট কুটির বানাইয়া তাহারা থাকিত। নিজেরাই খাইত, মা প্রায়ই উহাদের তরকারি রাঁধিয়া পাঠাইতেন। রমজান আলী এইরূপ একটি কুঁড়েঘরে থাকিত। খুব বন্ধুত্ব ছিল আমার সঙ্গে। পড়াশোনায় ভালো ছেলে ছিল। মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া আমরা দুইজনেই সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাই স্কুলে গিয়া ভরতি হই। আমি হিন্দু বোর্ডিংয়ে ছিলাম। রমজান বোধহয় তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিত। ঠিক মনে নাই। হাই স্কুলের রমজান আমার প্রতিযোগী ছিল। পরে সে পুলিশ লাইনে ঢুকিয়া দারোগা হয়। কাটিহারে কিছুদিন ছিল। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে গিয়াছিল সে। সেখানে পুলিশ বিভাগে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিল শুনিয়াছি। এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। এখন সে কোথায় আছে জানি না।

মণিহারীতে আমার বাল্য ও কৈশোর কাটিয়াছে। সব কথা মনে নাই, যাহা মনে আছে তাহার আভাসটুকু মাত্র এখানে দিলাম।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমি সাহেবগঞ্জে গিয়া সেখানকার রেলওয়ে হাইস্কুলে ভরতি হইয়াছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার ভাই ভোলা। আমরা দুজনেই গিয়া ফোর্থ-ক্লাসে ভরতি হইলাম। স্কুলের বোর্ডিংয়ে একটি ঘরে আমাদের দুই ভায়ের থাকিবার স্থান হইল। আমাদের ঘরে আরও দুইটি ছেলে থাকিত। তাহাদের একজনের নাম ছিল জান। সে আমাদের সঙ্গেই পড়িত, রেলের স্টেশন মাস্টারের ছেলে ছিল সে। খুব আমুদে। হো হো করিয়া হাসিত। বড় বড় দাঁত ছিল, হাসিতে হাসিতে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িত। দ্বিতীয় ছেলেটি আমাদের নীচে পড়িত। নাম মনে নাই। বরিশালে বাড়ি ছিল তাহার। পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলিত। খুব চালাক চতুর ছিল ছেলেটি। আমরা যে বছর সাহেব-

গঞ্জে যাই সে বছর প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়। মণিহারী ঘাট ও সকরিগলি ঘাটের মধ্যে যে স্টীমার সারভিস ছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল। শোনা গেল সব জাহাজ যুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে।

আমরা নৌকা করিয়া সাহেবগঞ্জে আসিলাম। মাঝে মাঝে ছুটিতে যখন বাড়ি যাইতাম তখন নৌকা করিয়াই যাতায়াত করিতে হইত। যে মাঝি আমাদের পারাপার করিত তাহার নাম ছিল ভগগু। রোগা পাতলা লোক ছিল সে। মুখে বসন্তের দাগ ছিল। আমাদের বাড়ি হইতে সাহেবগঞ্জ যাইতে প্রায় একদিন লাগিয়া যাইত। আমাদের স্কুল জীবনে এই নৌকা করিয়া যাওয়া আসা ভারি আনন্দজনক ছিল। অন্য কোন যাত্রী লইয়া ভগগু যখন সাহেবগঞ্জে আসিত, তখন আমাদের বাড়িতে খবর দিত, আমি সাহেবগঞ্জ যাইতেছি। মা প্রায়ই তাহার হাতে আমাদের জন্য নানারকম খাবার, কাপড় চোপড় প্রভৃতি পাঠাইতেন। কাচের জারে করিয়া ঘি, আচার প্রায়ই আসিত। সকলেই সেগুলি ভাগাভাগি করিয়া খাইতাম। মা প্রায়ই পিঠা এবং সন্দেশ পাঠাইতেন। আমের সময় পাঠাইতেন বাগানের আম। ভগগু আসিলেই আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। ছুটির সময় ভগগুই আমাদের লইয়া যাইবার জন্য নৌকা লইয়া আসিত। মাঝি হিসাবে ভগগু তো ভাল ছিলই, তাহার আর একটি গুণ ছিল। সে ভাল গান গাহিতে পারিত, ভালো গল্পও বলিতে পারিত। সুদীর্ঘ দিন গঙ্গা বক্ষে নৌকা-যাত্রা কখনও একঘেয়ে মনে হইত না।

একবারের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। কিছুদূর যাইবার পর গঙ্গা-বক্ষে একটি ছোট চর দেখা গেল। ভগগু তাড়াতাড়ি দাঁড় বাহিয়া সেই চরের দিকে নৌকাটাকে লইয়া যাইতে লাগিল। আমরা আশ্চর্য হইলাম। ভগগু চরের দিকে চলিয়াছে কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম। ভগগু উত্তর দিল—আজ রাতে বোধহয় চরেই কাটাইতে হইবে। তাহার পর সে আকাশে হাত তুলিয়া দেখাইল। দেখিলাম আকাশের এককোণে একটা কালো মেঘ উঠিয়াছে এবং ক্রমশঃ সেটা বড় হইতেছে। চরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। ভগগু এবং তাহার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি কয়েকটি লগি লগা পুঁতিয়া শক্ত দড়ি দিয়া নৌকাটিকে বাঁধিয়া ফেলিল। তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমরা দুই ভাই জড়োসড়ো হইয়া নৌকার ছইএর ভিতর থাকিয়া রহিলাম। ভগগু ছইয়ের ভিতর ঢুকিল এবং নৌকার খোল হইতে একটি পুঁটুলি বাহির করিল। পুঁটুলিতে ছিল কিছু ছাতু, আর কয়েকটা রামদানা। রামদানা একরকম নাড়ু জাতীয় খাবার। ভগগু ঘোষণা করিল—

আমরা ছাতু খাইব। তোমরা রামদানা খাও। তাহাই হইল। চরের উপর হু হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে। চারিদিকে অন্ধকার, আকাশে মেঘ, গঙ্গার কলকল ধ্বনি। আমাদের খাওয়া শেষ হইলে ভগ্‌গু আবার নৌকার খোল হইতে একটি কাঁথা বাহির করিয়া বলিল—ওটি কর শুতির। অর্থাৎ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড। তাহাই করিলাম। যখন ঘুম ভাঙিল তখন দেখি প্রভাত হইয়াছে। রৌদ্র কিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছে। আমাদের নৌকা গুন টানিয়া চলিতেছে। আমাদের স্কুল-জীবনে এই নৌকা-যাত্রাটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় জিনিস ছিল আমাদের কাছে। ভগ্‌গুর আগমণের জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতাম এবং আসিলেই উল্লসিত হইয়া উঠিতাম।

বাড়ির পরিবেশ হইতে বোর্ডিংএ স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রথম প্রথম ভালো লাগিত না। বাড়ির জন্য মন কেমন করিত। কিন্তু ক্রমে সবই সহিয়া যায়। আমাদেরও সহিয়া গেল। আমি প্রথমত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম আমার সুনাম রক্ষা করিবার জন্য। আমি পূর্ণিয়া জেলা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলাম।

সাহেবগঞ্জে আসিয়া আরও দুইজন প্রথম স্থান অধিকারীর সম্মুখীন হইতে হইল। একজন চণ্ডীচরণ চৌধুরী—সে ভাগলপুর জেলা হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। আর একজন প্রবোধ ঘোষ, সে পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম হইয়া ফোর্থ ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছে। এ দুজন ছাড়া ছিল রমজান আলী। সে মণিহারীতে আমার সহপাঠী ছিল, সে-ও বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিল। আর আমার ভাই ভোলা তো ছিলই। প্রতিযোগী হিসাবে সে-ও তুচ্ছ করিবার মত নহে। প্রথম প্রথম তাই পড়াশোনায় খুব মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। প্রথম কোয়ার্টালি পরীক্ষার পর দেখা গেল আমার প্রথম স্থানটা প্রথমেই আছে। রমজান দ্বিতীয়, চণ্ডী তৃতীয় এবং প্রবোধ চতুর্থ স্থান অধিকার করিল। ভোলা অসুখ করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। একটা বছরই নষ্ট হইল তাহার। আমাকে কেহ আর প্রথম স্থান হইতে সরাইতে পারে নাই। স্কুলের সব শিক্ষকেরই প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিলাম আমি। শিক্ষকদের পরিচয় দিবার আগে বোর্ডিং জীবনের দুই একটি ঘটনার কথা আগে বলি।

প্রথমেই মনে পড়িতেছে আমাদের সেই রুম-মেটটির কথা, যাহার বাড়ি ছিল বরিশাল জেলায়। ছেলেটি আমাদের চেয়ে নীচু ক্লাসে পড়িত। বেশ চালাক চতুর কর্মিংকর্মা ছেলে ছিল সে। সকলের ফরমাস খাটিত। সকলের ঘরে গিয়া আড্ডা দিত। কিছুদিন পরই কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিল:

আমাদের সকলেরই পয়সা হারাইতে লাগিল। আমার বাক্সে চাবি ছিল না। আমার সামান্য যা পয়সা-কড়ি হাতে থাকিত, তাহা টেবিলের উপরই ছড়ানো থাকিত। বোর্ডিংয়ের যে চাকরটা ছিল সেই মাঝে মাঝে আসিয়া আমার বিছানা ঝাড়িয়া দিত এবং টেবিল হইতে পয়সা তুলিয়া আমার খোলা বাক্সটাতেই রাখিয়া দিত। আমার কাপড়ও কাচিয়া দিত সে স্নানের পর। সকালে আমার জন্য খাবার আনিয়া দিত পাশের খাবার দোকান হইতে। সে-ই একদিন বলিল, আমার বাক্সে একটি পয়সাও নাই। আমি কি সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি?

আমি খরচ করি নাই। আমার অবস্থা অন্যান্য ছাত্রদের অপেক্ষা স্বচ্ছল ছিল। কারণ আমার স্কুলের বেতন লাগিত না, তাছাড়া মাসে চার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতাম। বাবা আমাকে মাসে দশ টাকা করিয়া পাঠাইতেন। বোর্ডিংযে খাওয়া থাকার জন্য দিতে হইত মাসে সাড়ে আট টাকা করিয়া। সাত টাকা খাওয়ার খরচ। দেড়টাকা সিট্ রেণ্ট। সাহেবগঞ্জে গিয়া সিগারেট খাওয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। রোজ খাইতাম না, মাঝে মাঝে খাইতাম গঙ্গার ধারে গিয়া। সিগারেটও শস্তা ছিল বেশ। এক পয়সায় দশটা রামরাম সিগারেট পাওয়া যাইত। তখনকার কালের অভিজাত সিগারেট 'হাওয়া-গাড়ি' চার পয়সায় দশটা মিলিত। পরে অবশ্য দাম কিছু বাড়িয়াছিল। কিন্তু সিগারেট খাইবার সুযোগ ছিল না বলিয়া সিগারেট প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

আমার সহপাঠী কালী মিত্তির একটি নূতন নেশা শিখাইয়াছিল। নস্য। এক-পয়সার নস্য কিনিলেই অনেকদিন চলিয়া যাইত। আর তাছাড়া ছিল আমাদের 'সেই'—তামাকপাতা। তাহাও এক পয়সার কিনিলে অনেকদিন চলিয়া যাইত। সুতরাং যদিও দুই একটা নেশায় অভ্যস্ত হইয়াছিলাম শস্তা-গণ্ডার দিন ছিল বলিয়া কখনই আমার পয়সার টানাটানি পড়িত না। কিন্তু চাকরটা যখন বলিল বাক্সে এক পয়সাও নাই তখন একটু অবিশ্বাস হইল। মনে হইল সে বোধহয় ভালো করিয়া দেখে নাই। কালও তো আমি দুই একটা টাকা দেখিয়াছি। বলিলাম, ভাল করিয়া দেখ্। কাপড় জামার নীচে নিশ্চয় ঢুকিয়া গিয়াছে। সে বাক্স হইতে সব কাপড় জামা বাহির করিয়া ফেলিল। টাকা নাই।

ইহার পর পাশের ঘর হইতে আর একজনের টাকা হারাইল। তাহার পর আমাদের ঘরের জ্ঞানের বাড়ি হইতে যেদিন মনি-অর্ডার আসিল সেদিন টাকাগুলি সে বিছানার নীচে রাখিয়াছিল। সে টাকাও উধাও হইয়া গেল বিকাল নাগাদ। আমাদের ঘরের সেই বরিশালবাসী ছোকরাটিকে আমাদের সন্দেহ হইল। সন্দেহ

হইবার কারণ—সে নানারকম শৌখীন জিনিস কিনিতে আরম্ভ করিল। আমরা সাধারণ লণ্ঠন জ্বালিয়া পড়িতাম। সে একদিন বেশ দামী একটা বড় কাচের ল্যাম্প কিনিয়া আনিল। তাহার পর কিনিল একটা এয়ার-গান। কয়েকদিন পরে দোকান হইতে একটা দামী বুক-খোলা কোট কিনিয়া ফেলিল। তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি এসব দামী জিনিস কিনিতেছ। টাকা কোথায় পাও?' সে উত্তর দিল—'বাবা পাঠায়। আমার বাবা দারোগা। অনেক টাকা রোজগার তাঁর।' আমরা চুপ করিয়া গেলাম।

ইহার দিন দুই পরে তাহার টেবিলে একটা পোস্টকার্ড পাইলাম। তাহাতে তাহার বাবার ঠিকানা লেখা ছিল। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। একটা খামে সব কথা খুলিয়া তাহার বাবাকে আমি একটা চিঠি লিখিয়া দিলাম। বিশেষ করিয়া লিখিলাম আমাদের প্রায়ই টাকা-পয়সা চুরি যাইতেছে। কিন্তু আপনার ছেলের একটি পয়সাও চুরি হয় নাই। সে বরং অনেক শৌখীন মূল্যবান জিনিস কিনিতেছে। জিজ্ঞাসা কবাতে বলিল—আপনি তাহাকে নাকি বেশী টাকা পাঠান। আপনি উহাকে বেশী টাকা পাঠান কিনা অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন। আমাদের সকলেই উহাকে সন্দেহ করিতেছে।

চিঠির উত্তর আসিল না। কিন্তু প্রায় দিন কুড়ি পরে অপ্রত্যাশিতভাবে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিল। সেদিন কি একটা ছুটির দিন ছিল। আমাদের বোর্ডিং-এর সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া থামিল। গাড়ি হইতে নামিলেন দীর্ঘকায় ফরসা একটি লোক। তাঁহার মুখে সূচ্যগ্র ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, হাতে একটি বেত। তিনি আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন, আমার ছ্যামড়াটা কোথায়?' তাহার পর তিনি দ্বিতলে উঠিয়া আসিয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার ছ্যামড়া আমাদের ঘরের সেই ছেলেটি। নিজের সীটে বসিয়াছিল। পিতার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। তিনি তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া সপাসপ বেত চালাইতে লাগিলেন। হৈ হৈ কাণ্ড পড়িয়া গেল। আমাদের বোর্ডিংয়ের রুদ্রপণ্ডিত মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন। তিনি হুমড়ি খাইয়া ছেলেটাকে রক্ষা করিতে গিয়া দুই এক ঘা বেত খাইলেন। তাহার পর ভদ্রলোক আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমাদের কত টাকা চুরি গিয়াছে?

আমি বলিলাম—কুড়ি টাকা।

তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাগ খুলিয়া কুড়িটি টাকা বাহির করিয়া টেবিলের উপর

রাখিলেন। তাহার পর আবার ছেলের ঝুটি ধরিয়া চাবকাইতে চাবকাইতে তাহাকে নীচে লইয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন—আমি দারোগা, অনেক চোরকে শায়েস্তা করেছি। তোকেও করব। ছেলেকে লইয়া তিনি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন। কয়েকদিন পর তাঁহার ভাই আসিয়া ছেলেটার জিনিসপত্র লইয়া গেলেন। স্কুল হইতে তাহার নামও কাটাইয়া দিলেন। তাহার পর তাহার কোন খবর আর আমি জানি না। এই ঘটনাটি মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। তাই এখনও মনে আছে।

বোর্ডিং জীবনের আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। এই ঘটনার একটি পশ্চাৎপট আছে। ঠিক কোন্ সময়ে মনে নাই, কিন্তু মনে হয় আমি যখন থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছি তখনই আমার মনে সাহিত্য প্রেরণা উদ্বেল হইয়া ওঠে। আগেই বলিয়াছি আমাদের বাড়িতে বাংলা সাহিত্য পরিবেশনের মধ্যেই আমাদের শৈশবের ক্রমোন্মেষ হইয়াছিল। তখন দুই একটি কবিতাও লিখিয়াছি। সাহেবগঞ্জে বোর্ডিং-এ আসিয়া ঠিক করিলাম এবার একটা হাতে-লেখা মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। সেকালে বেশ ভাল একরকম ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ পাওয়া যাইত। তাহাই দুই ভাঁজ করিয়া একসারসাইজ বুকের মতো আয়তন হইত। ঠিক করিলাম এই মাপেরই কাগজ করিব। কাগজের নাম দিলাম 'বিকাশ'।

স্কুলে আমার প্রথম স্থান বজায় রাখিবার জন্য আমি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ্যপুস্তকেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখিতাম। 'বিকাশ' পত্রিকার জন্য প্রতিদিন বৈকালে এবং রাত্রে খাওয়ার পর রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমাকে খাটিতে হইত। ইহার ফলে আমি স্কুলের খেলা-ধূলায় যোগ দিতে পারিতাম না। 'বিকাশ' পত্রিকায় আমি ছাড়া ভোলা মাঝে মাঝে লিখিত। আমার বন্ধু প্রবোধ ঘোষ লিখিত, আরও দুই একজন লিখিত, নাম ঠিক মনে পড়িতেছে না। তবে বেশীর ভাগ আমিই লিখিতাম। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, অনুবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য সব আমাকেই লিখিতে হইত। কি লিখিয়াছি তাহা এখন মনে নাই। তবে এই 'বিকাশ'কে কেন্দ্র করিয়াই আমার আলাপ হইয়াছিল তারকদাস মজুমদারের সঙ্গে এবং তাঁহার ভাই বটুদার সঙ্গে।

বটুদার ভাল নাম ছিল সুধাংশুশেখর মজুমদার। আমরা যখন সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ি বটুদা তখন ভাগলপুরে টি এন জে (T.N J) কলেজে বি. এ. পড়েন। বটুদার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন—নাম প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি রেলে কাজ করিতেন। বুকিং ক্লার্ক ছিলেন, যতদূর মনে পড়ে। বিকাশ পত্রিকা যখন

আরম্ভ করি তখন প্রথম যে সমস্যায় পড়িয়াছিলাম তাহা এই—মাসিকপত্রের একটা সুন্দর প্রচ্ছদ চাই। সেটা কে আঁকিয়া দিবে? একজন বলিল—আর্ট লজের (Art Lodge) তারক মজুমদার এখানে থিয়েটার 'সিন' আঁকেন। তাঁকে বললেই তিনি এঁকে দেবেন। তারক মজুমদারের সঙ্গে একদিন গিয়া দেখা করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেলেন। বলিলেন—আমাকে তারকবাবু বলবে না। তারকদা বলবে। তোমাদের কাগজের মলাট নিশ্চয়ই এঁকে দেব। মলাটের কাগজটা আনবে আর আনবে একটা 'আইডিয়া', যা বলবে তাই এঁকে দেব। পরদিনই কাগজ লইয়া গেলাম এবং বলিলাম একটা ঊষার ছবি আঁকিয়া দিন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আঁকিয়া দিলেন। তাহার পর চন্দ্রোদয়, ডিম ভাঙিয়া পাখীর ছানা বাহির হইতেছে, আমের আঁটি হইতে শিশু আমগাছের আত্মপ্রকাশ—এইরকম নানা ধরণের 'আইডিয়া' লইয়া তারকদার কাছে যাইতাম, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আঁকিয়া দিতেন। তারকদা শুধু যে ভাল ছবি আঁকিতেন তাহা নয়, তিনি খুব সুরসিকও ছিলেন। পরে জানিয়াছিলাম কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। কুমুদরঞ্জনের 'চুনকালি' নামক একটি ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন তখন প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মলাট তারকদা আঁকিয়াছিলেন। তারকদার সহিত আলাপ হইবার পর ক্রমশ বটুদা এবং পরে তাঁহার সমস্ত পরিবারের সহিতও আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। ক্রমশ আমি তাঁহাদের ঘরের ছেলে হইয়া গেলাম।

বটুদার বন্ধু ছিলেন প্রবোধদা। তিনিও খুব সাহিত্যোৎসাহী ছিলেন। তিনিও 'বীণাপাণি' নামে একটি হাতের লেখা কাগজ বাহির করিতেন। মনে পড়িতেছে এই 'বীণাপাণি' কাগজেও আমি একবার কি যেন একটা লিখিয়াছিলাম। কি লিখিয়াছিলাম মনে নাই। এই প্রবোধদাই একদিন আমাদের বোর্ডিংয়ে ফরসা ছিপছিপে রোগা বেশ বাবু গোছের একটি ছেলেকে লইয়া আসিলেন। ছেলেটি প্রায় আমাদেরই সমবয়সী। গলায় একটি শৌখীন কমফর্টার জড়ানো। গায়ের পাঞ্জাবীটিও সুরুচির পরিচয় বহন করিতেছে। নাম পরিমল গোস্বামী। শুনিলাম দেশে (রতন দিঘায়) শরীর খুব ভাল থাকে না। এখানে যদি শরীর ভালো থাকে তাহা হইলে এখানেই পড়িতে পারে। পরিমল কিন্তু সাহেবগঞ্জে দুই-চারিদিনের বেশী থাকে নাই। এই সময়—যে সময় আমার সাহিত্য-জীবনের সবে আরম্ভ—সেই সময় পরিমলের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বেশ ইঙ্গিতবহ বলিয়া মনে হয়। কারণ আমার পরবর্তী সাহিত্য-জীবনে পরিমলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাহারই আগ্রহে

আমি পরে 'শনিবারের চিঠি'তে নিয়মিত লিখিতে আরম্ভ করি। সে অবশ্য অনেক পরের কথা। তখন আমি ভাগলপুরে ডাক্তারি করি। আমি যখন কলিকাতায় ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিকেল কলেজে ভরতি হই, তখন পরিমলের সঙ্গে আবার দেখা হয় এবং ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহার অনেক সত্য বর্ণনা পরিমলের স্মৃতিচারণ গ্রন্থে আছে।

সাহেবগঞ্জ স্কুলের ছাত্রমহলে 'বিকাশ' কাগজটির আদর হইয়াছিল। অনেক ছাত্র এবং শিক্ষক কাগজটি পাঠ করিতেন। এক-কপি মাত্র কাগজ। হাতে হাতে ঘুরিয়া প্রায়ই ছিঁড়িয়া যাইত। সেগুলিকে মজবুত করিয়া বাঁধাইবার মতো আর্থিক ক্ষমতা আমার যে ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু মনে হইত বাঁধাইলে তাহা একটা সাধারণ একসারসাইজ খাতার মতো দেখাইবে, তাহার সৌন্দর্য্য-হানি হইবে। এই ভয়ে আমি তাহা বাঁধাইতাম না। ফলে হাতে হাতে ঘুরিয়া কাগজগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই হতশ্রী হইয়া পড়িত। কিন্তু এই হতশ্রী কাগজগুলিই একদিন বটুদার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিল। তিনি একদিন আমার বোর্ডিংয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন খুব সকালেই আসিলেন। দেখিলাম তাহার হাতে কয়েক সংখ্যা 'বিকাশ'। বিকাশ পত্রিকার কয়েকটি কবিতা দেখাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—এগুলি কার লেখা? বলিলাম—আমার। বটুদা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—চমৎকার কবিতা। এগুলো কোন ভালো মাসিকপত্রে পাঠাইয়া দাও। আমি বলিলাম—আমার লেখা কোন্ মাসিকপত্র ছাপাইবে? বটুদা বলিলেন—আচ্ছা, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।

বটুদাই আমার কয়েকটি কবিতা লইয়া বিভিন্ন মাসিকপত্রে পাঠাইয়া দিলেন। যতদূর মনে পড়ে আমি তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত মালঞ্চ পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা ছাপা হইল। আমার স্বনামেই ছাপা হইল সেটি। আমার নামে বোর্ডিংয়ের ঠিকানায় যখন কাগজ আসিল তখন হৈ হৈ পড়িয়া গেল একটা। ছাপা মাসিকপত্রে বলাইয়ের লেখা কবিতা ছাপা হইয়াছে—কি আশ্চর্য কাণ্ড! সকলেই খুব খুশী। বটুদা আমাকে উৎসাহ দিয়া গেলেন। বলিলেন, আরও লেখ। চটিলেন কেবল একজন। আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয়। তিনি আমাদের সংস্কৃত পড়াইতেন। দ্বারভাঙার লোক। নাম ছিল রামচন্দ্র ঝা। আমি তাহার খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম। সংস্কৃতে প্রতিবারই প্রায় শতকরা আশি নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতাম। পণ্ডিত মহাশয় আমাদের বোর্ডিংয়েই থাকিতেন। আলাদা একটা রান্নাঘরে নিজে

রাঁধিয়া খাইতেন। শুদ্ধাচারী লোক ছিলেন তিনি। টকটকে গৌরবর্ণ, কপালে সিঁদুরের বা চন্দনের ফোঁটা, মাথায় প্রকাণ্ড শিখা। তিনি হঠাৎ খড়ম চটচট করিতে করিতে আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

'তুমি না কি কবিতা লিখে কাগজে ছাপাচ্ছ?'

'হাঁ। একটা কবিতা ছাপা হয়েছে।'

ভাবিলাম ইহার পরই বুঝি তিনিও উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার প্রশংসা করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া বলিলেন—'তোমার বাবা যে পয়সা খরচ করে তোমাকে বোর্ডিংয়ে রেখেছেন, তা কি কবিতা লেখার জন্য?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া চলিলেন—'সংস্কৃতে তোমার ফুল মার্কস পাওয়া উচিত। কিন্তু তুমি তা পাও না। এর কারণ তোমার পড়ায় অমনোযোগ। আর এই অমনোযোগের কারণ—এই কবিতা। আর কবিতা লিখো না।' পণ্ডিত মহাশয় নিজে কাব্যতীর্থ ছিলেন। কিন্তু আমাকে কাব্যচর্চায় তিনি বাধা দিলেন দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কিন্তু ভয়ে প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম।

সেই দিনই খেলার মাঠে বৈকালে বটুদার সহিত দেখা হইল। বটুদা ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। লেফট্ আউট হইতে খেলিতেন। খেলার পর বটুদাকে পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধের কথা বলিলাম। অনুরোধ করিলাম আর যেন তিনি কোন কবিতা কাগজে না পাঠান। বটুদা খানিকক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন—'তুমি একটা ছদ্মনাম ঠিক কর, সেই নামেই লেখা প্রকাশিত হোক।'

ছেলেবেলায় ভৃত্য মহলে আমার নাম ছিল ভংলিবাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালবাসি। বাল্যকালে অনেক কীট পতঙ্গ প্রজাপতির পেছনে ঘুরিয়াছি। পরিণত বয়সেও পাখী চিনিবার জন্য অনেক জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে হইয়াছে। বন চিরকালই আমার নিকট রহস্য-নিকেতন। এই জন্যই বোধ হয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম। আগেও বোধহয় 'বিকাশ' পত্রিকায় বনফুল নাম দিয়া দুই একটা কবিতা লিখিয়াছি। বটুদাকে কথাটা বলিলাম—তিনিও রাজি হইয়া গেলেন। ইহার পর হইতেই আমার কবিতা বনফুল নাম দিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। অনেক পাঠক-পাঠিকার ধারণা জন্মিয়াছিল 'বনফুল' কোন মহিলার ছদ্মনাম। 'বনফুল' যে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম কবিতা-গ্রন্থ—এ খবরও তখন আমি জানিতাম

না। অনেক পরে খবরটা শুনি। যাই হোক 'বনফুল' দিয়ে আমার কবিতা কুচবিহার হইতে প্রকাশিত 'পরিচারিকা' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইল। অন্যান্য দুই একটা কাগজেও বাহির হইতে লাগিল।

পণ্ডিত রামচন্দ্র ঝা কিছুদিন বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিলেন আমি কবিতা লেখা বন্ধ করি নাই। তিনি আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সত্য কথাই বলিলাম। বলিলাম—না লিখিয়া পারি না, লিখিতে বড়ই ইচ্ছা করে, তাই লিখি। জানি না বড়দা এ সম্বন্ধে তাহার সহিত কোন আলোচনা করিয়াছিলেন কিনা, কিন্তু এবার দেখিলাম তিনি আমাকে কবিতা লিখিবার অনুমতি দিলেন। বলিলেন, 'বেশ, কবিতা লেখ। আমি তোমাকে সংস্কৃত শ্লোক দিব, সেগুলি তুমি কবিতাতে অনুবাদ কর।'

তিনি আমাকে দিয়া অনেক সংস্কৃত শ্লোক অনুবাদ করাইয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া একাজ আমি করিয়াছি। 'প্রবাসী' পত্রিকা তখন আমাদের মনে সর্বাধিক সম্ভ্রম উদ্রেক করিত। প্রবাসীতে লেখা প্রকাশ হওয়াটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল তখন। আমি স্কুল জীবনেই প্রবাসীতে অনেক কবিতা পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সেগুলি মনোনীত হয় নাই। সবই ফেরত আসিত। আমার উৎসাহ কিন্তু অদম্য। আমি কিছুতেই দমিতাম না। ক্রমাগত পাঠাইতাম। ক্রমাগত ফেরত আসিত। অবশেষে আমি যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি (১৯১৮) প্রবাসীতে আমার সংস্কৃত হইতে অনূদিত একটি চার লাইনের কবিতা প্রকাশিত হইল। সে যে কি আনন্দ, তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। ইহার কিছুদিন পরে 'ভারতী' পত্রিকাতেও আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হইল। অনুভব করিলাম—হয়তো ভুল করিয়াই করিলাম—যে এইবার আমি সাহিত্যের অভিজাত মহলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছি।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হইতেছে। রামচন্দ্র ঝা—আমাদের স্কুলের হেডপণ্ডিত মহাশয়—আমার হিতৈষী ছিলেন বলিয়াই আমার কবিতা লেখায় এবং সাহিত্য-চর্চায় বাধা দিয়াছিলেন। যদিও আমি ক্লাসে বরাবর সব বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিতাম, কিন্তু একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে [illegible] হইয়াও আমি [illegible] নম্বর লাভ করিতেছিলাম। সাহিত্যের নেশা যদি আমাকে অভিভূত না করিত তাহা হইলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনেক ভালো ফল করিতে পারিতাম। আমার পরবর্তী ছাত্রজীবনেও কলেজের পাঠ্যপুস্তক-এর পরিবর্তে

আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল সাহিত্য। তাই শিক্ষা-জীবনে সাধারণ ছাত্ররূপেই আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, অসাধারণ ছাত্রদের দলে স্থান করিয়া লইতে পারি নাই। সাহিত্যের ভূত যদি ঘাড়ে না চাপিত তাহা হইলে হয়তো পারিতাম। আমি সাহিত্য-চর্চা করি বলিয়া আমার শিক্ষকরা—এমন কি মেডিকেল কলেজে যখন পড়ি তখন সেখানকার বাঙালী শিক্ষকেরাও আমাকে খাতির করিতেন।

এইবার আমার স্কুলের শিক্ষকদের কথা বলি। হেডমাস্টার ছিলেন মহাদেব বিশ্বাস। অতিশয় গম্ভীর লোক ছিলেন। খুব কম কথা বলিতেন। কিন্তু তাহার এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। ছেলেরা গোলমাল করিতেছে, তিনি কাছে আসিলেই সবাই চুপ করিয়া যাইত। ইংরেজি খুব ভালো পড়াইতেন। ভালো বক্তৃতাও দিতে পারিতেন। মনে আছে একবার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—**Let the Hun hordes hammer their heads at the gate of our impenitrable citadel —we will win the war.** খুব হাততালি পড়িয়াছিল। আমাকে স্নেহ করিতেন খুব। কিন্তু সে স্নেহের বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

সুধীর মৈত্র মহাশয় আমাদের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন। আমাদের ইতিহাস পড়াইতেন। চেয়ারে বসিয়া পড়াইতেন না। ক্লাসে পায়চারি করিয়া পড়াইতেন। ডান হাতটি তুলিয়া এবং মাঝে মাঝে ডান হাতের তর্জ্জনীটি উৎক্ষিপ্ত করিয়া ইংরেজিতে পড়াইতেন তিনি। বেশ ভাল ইংরেজি বলিতে পারিতেন। সাধারণত কাহাকেও শাস্তি দিতেন না। কোন ছেলে পড়াইবার সময় গোলমাল করিলে তাহার কাছে গিয়া তাহার কানের পাশের চুল একটু টানিয়া বলিতেন, 'খুব দুষ্টু হয়েছ তুমি দেখছি।' গম্ভীর ছিলেন খুব। আমার সহিত খুব স্নেহের সম্পর্ক ছিল। আমি বরাবর তাঁহার সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছি। আমি যখন ভাগলপুরে ডাক্তারি করি তখনও তিনি কয়েকবার আমার বাড়িতে আসিয়াছেন। সাহেবগঞ্জেই শেষ পর্যন্ত বাড়ি করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পড়াইতেন। প্রকৃত সজ্জন ছিলেন।

থার্ড মাষ্টার মহাশয় সুরেন্দ্রনাথ পাল ছিলেন ভিন্ন ধরণের লোক। তাঁহার প্রকৃতিটা ছিল ঝড়ের মতো। ঝড়ের মত বেগে পড়াইতেন, কোন ছেলে দুষ্টুমি করিলে ঝড়ের বেগে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া দেওয়ালের কাছে লইয়া গিয়া তাহার মাথা ঠুকিয়া দিতেন দেওয়ালে।' যখন জ্যামিতি পড়াইতেন তখন বোর্ডের উপর গিয়া কেবল ছবি

আঁকিতেন এবং বই দেখিয়া আমাদের উচ্চকণ্ঠে তাহার অর্থ বলিতে হইত। বোর্ডে গিয়া হয়তো তিনি একটা সরলরেখা আঁকিয়া তাহার নাম দিলেন AB—আমাদের উচ্চকণ্ঠে বলিতে হইত : **Let AB be a straight line.** তাহার পর তিনি তাহার উপর CD আর একটি সরলরেখা দাঁড় করাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বই দেখিয়া বলিতে হইত : **Let another straight line CD stand upon it.** এইভাবে অনেকগুলি **Theorem** তিনি প্রত্যহ পড়াইতেন। তাহার পর বাড়িতে **Extra** করিবার জন্য দিতেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের জ্যামিতির চারটি বই-ই শেষ হইয়া গেল এবং বারবার নামতার মতো ঘুসিয়া ঘুসিয়া সেগুলি প্রায় মুখস্থ হইয়া গেল। অ্যালজাব্রা এবং পাটিগণিতও তিনি ঝড়ের বেগে পড়াইতেন। এক একটা উদাহরণের কয়েকটা অঙ্ক বোর্ডে কষিয়া দেখাইয়া দিতেন, তাহার পর আমাদের বলিতেন, 'বাকি অঙ্ক বাড়ি থেকে কষে নিয়ে এসো। যেটা পারবে না সেটাতে দাগ দিয়ে রেখো, আমি করে দেব।'

স্থতরাং অনেক অঙ্ক বাড়িতেও কষিতে হইত। সব খাতা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন। যে ছেলে যে অঙ্ক করিতে পারিত না সে ছেলেকে তিনি যে ছেলে অঙ্কটা পারিয়াছে, তাহার খাতা দেখিতে বলিতেন। যে অঙ্ক কেহই পরিত না তাহা তিনি ক্লাসে ব্ল্যাক বোর্ডে কষিয়া দিতেন। ছেলেদের জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেন তিনি। কিন্তু তাঁহার একটি মহৎ দোষ ছিল। তিনি মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। মুসলমানদের সম্বন্ধে খোলাখুলিই বলিতেন—'তেঁতুলে নেই মিষ্টি, নেড়েতে নেই ইষ্টি'। মুসলমান ছাত্রদের উপর তাঁহার বিশেষ বিরূপতা ছিল। বিহারীদের লইয়াও তিনি মর্মান্তিক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের প্যারডি করিয়া লিখিয়াছিলেন 'বিহার আমার মাসীমা আমার ধাইমা আমার আমার দেশ।'

এই গানটার খানিকটা অংশ আমি আমার একটা ছোটগল্পে ব্যবহার করিয়াছি। তাঁহার এই মনোভাবের জন্য তাঁহাকে অবশেষে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। আমরা স্কুলের ছেলেরা তাঁহাকে খুব বড় একটা 'ফেয়ার ওয়েল' ( **farewell** ) দিয়াছিলাম। প্রবোধ ঘোষ খুব কাঁদিয়াছিল। প্রবোধকে থার্ড মাস্টার মহাশয় খুবই ভালবাসিতেন। প্রবোধের বাবা মা যখন প্লেগে মারা যান তখন প্রবোধের খুব কম বয়স। থার্ডমাস্টারই মানুষ করিয়াছিলেন তাহাকে। গুজব উঠিয়াছিল প্রবোধও তাঁহার সহিত চলিয়া যাইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

সে তাহার মামার কাছে রহিয়া গেল। থার্ড মাস্টারের বিদায় উপলক্ষে আমিও একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। কবিতাটা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে। সাহেবগঞ্জ হইতে চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান।

ইহার পর ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কথা। তাঁহার নাম ছিল রামতারণ নলিপুরী। খুব ছোটখাটো মানুষ ছিলেন। মাথার চুল সোজাভাবে আঁচড়াইতেন, অর্থাৎ টেঁড়ি কাটিতেন না। চুল সোজা কপালের উপর ঝুলিত। কথাও আস্তে আস্তে বলিতেন। সাহেবগঞ্জেই একটি ছোট বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। আমাদের পড়াইতেন অঙ্ক ও বাংলা। থার্ড মাস্টার মশাই অঙ্ক পড়াইতেন ফোর্থ ক্লাসে ও থার্ড ক্লাসে। ফোর্থ মাস্টার মশাই পড়াইতেন সেকেণ্ড ক্লাস ও ফার্স্ট ক্লাসে। থার্ড মাস্টার মহাশয় ঝড়ের বেগে পড়াইতেন। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় পড়াইতেন খুব আস্তে আস্তে। থার্ড মাস্টার মহাশয়ের দাপটে আমাদের জ্যামিতির সবটাই প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় সেইগুলি পুনরাবৃত্তি করাইতেন। করাইতেন কিন্তু অতি ধীরে ধীরে। তাঁর আর একটা বিশেষত্ব ছিল। তিনি ক্লাসের খারাপ ছেলেদের ডাকিয়া সামনের বেঞ্চে বসাইতেন। একটা উদাহরণ দিতেছি।

"পিছনের বেঞ্চে ঘুটে বসে আছিস নাকি? পিছনে কেন, সামনে আয়।"

ঘুটে সসঙ্কোচে আসিয়া বসিল।

"শুনছি তুই আজকাল পড়াশোনায় মন দিয়েছিস। বোর্ডে গিয়ে একটা সরলরেখা আঁক, দেখি কেমন হয়।" ঘুটে মুচকি হাসিতে হাসিতে বোর্ডে গিয়া একটি সরলরেখা আঁকিল।

"বাঃ, এতো চমৎকার হয়েছে। এইবার একটা নাম দে। না—AB নয়, ও নামটা বড় পুরোনো হয়ে গেছে। PQ দে—"

এইভাবে ঘুটেকে ফার্স্ট বুকের ফার্স্ট থিয়োরেমটা আস্তে আস্তে সমস্ত ঘণ্টা ধরিয়া পড়াইয়া দিলেন। অন্য ছেলেদের সে সময় তিনি Extra কষিতে বলিতেন। না পারিলে দেখাইয়া দিতেন। ভালো ছেলেদের তিনি গৌরীশঙ্করের জ্যামিতি, অ্যালজ্যাব্রা এবং পাটিগণিত পড়িতে উৎসাহ দিতেন। এ বিষয়ে সাহায্যও করিতেন।

তাঁহার আর একটা কাজ ছিল। লাইব্রেরী হইতে ছেলেদের তিনি বই দিতেন। প্রতি শনিবারে একটা হইতে দুইটা পর্যন্ত লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া থাকিতেন। আমি প্রথম যেদিন বই লইতে গেলাম, দেখিলাম নিজেই তিনি মনোযোগ সহকারে একটি মোটা বই পড়িতেছেন। আমি গিয়া বই চাহিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন—'এর আগে তুমি বই নিয়েছ কি?'

'না।'

'তাহলে ওই এক নম্বর আলমারির প্রথম তাকের প্রথম বইটা নাও।'

চাবি দিলেন আমাকে। আমি নিজেই গিয়া চাবি খুলিয়া বইটি বাহির করিয়া আনিলাম। বেশ মোটা লাল রঙের বই। সোনার জলে নাম লেখা—**OLIVER TWIST.** নীচে লেখা—**Charles Dickens.** রেজিস্টারে নাম লিখিয়া সে বইখানা লইয়া গেলাম। এমন একটা মোটা বাহারের বই পাইয়া ভারী আনন্দ হইল। তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। পড়িবার সময় দেখিলাম এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না। বইটাতে অনেকগুলি ছবি ছিল। সেগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিলাম। অভিধান দেখিয়া সাতদিনে পাতা চারেক পড়িলাম বটে, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হইল না। সাতদিন পরে বই ফিরাইয়া দিবার কথা। ফোর্থ মাস্টারকে সসঙ্কোচে বলিলাম—'এ বইটা বড় শক্ত স্যর। চারপাতার বেশী পড়তে পারিনি।'

'তুমি ডিক্‌শনারি দেখে দেখে পড়েছ নাকি?'

'হঁ্যা।'

'আউট বই ডিক্‌শনারি দেখে পড়বার দরকার নেই। একটা রিডিং দিয়ে দাও খালি। যতটুকু বুঝলে বুঝলে। নতুন শহরে যখন বেড়াতে যাও তখন সব লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় ।ক? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে চলে আসতে হয়। এ-ও তেমনি। টেক্‌স্‌ট বুক খুব খুঁটিয়ে পড়তে হয়, আউট বুক একটা রিডিং দিয়ে যাও খালি। এ বইটা আজও নিয়ে যাও, একটা রিডিং দিয়ে নিয়ে এস। পরে যদি ইংরেজি সাহিত্য পড় তখন এই বই ভাল করে পড়বে। এখন শুধু রিডিং দিয়ে নিয়ে এস।'

তাহাই করিলাম। সাত দিনে এক একটা বই পড়িয়া ফেরত দিতে লাগিলাম। তিনমাসের মধ্যে ডিকেন্স, স্কট, থ্যাকারে এবং আরও অনেক বই পড়িয়া ফেলিলাম। আলমারির নীচের থাকে বাংলা বই থাকিত। দীনেশ সেনের লেখা লাল রঙের বাঁধানো ছোট ছোট বই। একখানা বই ছিল 'জড়ভরত'। সে বইগুলি যখন পড়িতে শুরু করিলাম তখন তাহা একদিনে শেষ হইয়া যাইত। বাংলা বই পড়িতে বেশীক্ষণ লাগিত না। একদিন ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বলিলেন—'তুমি তো এতো ইংরেজি বই পড়লে, এইবার এই বাংলা বইগুলোর ইংরেজিতে অনুবাদ কর না? পারবে না?' বলিলাম, 'পারব না কেন? কিন্তু অনেক ভুলও হবে, সেগুলো ঠিক করে দেবে কে?'

ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বলিলেন—'তুমি যদি অনুবাদ কর, আমি সন্ধ্যের পর বোর্ডিংয়ে গিয়ে দেখে দেবো সেটা।'

তাহাই হইয়াছিল। দীর্ঘকাল আমি বাংলা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছি এবং ফোর্থ মাস্টার মশাই প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়াছেন। আমার কাছে একটিও পয়সাও লইতেন না। তিনি রোজ সন্ধ্যা সাতটার সময় রাতের খাওয়া শেষ করিতেন। খাওয়া শেষ করিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। সেই বেড়াইবার সময়ই রোজ বোর্ডিংয়ে আসিয়া আমার অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন। সেকালে স্কুলের শিক্ষকরা প্রাইভেট ট্যুশন করিতেন। বড়লোকের ছেলেরা বেশ মোটা দক্ষিণা দিয়া অনেক শিক্ষককেই পড়াইবার জন্য বাড়িতে নিযুক্ত করিত। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র গোবরাদাকে ফোর্থ মাস্টার মহাশয় রোজ বৈকালে স্কুলের ছুটির পর একঘণ্টা পড়াইতেন। কত বেতন লইতেন তাহা জানি না।

গোবরাদা বড়লোকের ছেলে ছিলেন। আমাদের চেয়ে দুই ক্লাস উপরে পড়িতেন। একদিন শুনিলাম গোবরাদা ফোর্থ মাস্টারের নির্দেশ অনুসারে অনেক ভালো ভালো ইংরেজী বই কেনেন। গোবরাদা ইংরেজীতে কাঁচা ছিলেন বলিয়া সম্ভবত ফোর্থ মাস্টার মহাশয় তাঁহাকে বেশী করিয়া 'আউট বুক' পড়াইতেন। এ খবর পাইয়া আমিও গোবরাদার সহিত গিয়া একদিন ভাব করিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার লাইব্রেরি দেখাইলেন। আমি তাঁহার নিকট বই চাহিলাম। তিনি আপত্তি করিলেন না। আমার তখন ভালো ছেলে বলিয়া একটা নাম-ডাক হইয়া গিয়াছিল। 'বিকাশ' পত্রিকার সম্পাদক রূপেও আমার খ্যাতি হইয়াছিল। গোবরদাও সম্ভবত 'বিকাশ' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। গোবরাদার নিকট বই পাওয়া তাই আমার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। বেশ ভালো ভালো বই ছিল গোবরাদার। সহজ ভাষায় লেখা অনেক ভ্রমণ কাহিনী, বড় বড় অক্ষরে ছাপা অনেক ইংরেজী উপন্যাসের মূল্যবান সংস্করণ গোবরাদার লাইব্রেরিতে ছিল। অনেক বই পড়িয়াছিলাম সেখান হইতে। গোবরাদার ফটোগ্রাফির শখও ছিল। মনে পড়িতেছে যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি তখন তাহাদের বাড়ির বাগানের বেড়ার ধারে তিনি আমার একটি ফটো তুলিয়াছিলেন। সে ফটো এখনও আমার কাছে আছে। ফটোটিতে হাতে যে বইখানি আছে সেটা ডিকেন্সের 'পিকুইক পেপার্স।'

গোবরাদার নিকট হইতে আসিয়া বই পড়িতেছি শুনিয়া ফোর্থ মাস্টার মহাশয় খুব খুশি হইয়াছিলেন। গোবরাদার লেখাপড়া বেশী দূর হয় নাই, যতদূর

মনে পড়িতেছে তিনি পুলিশ লাইনে ঢুকিয়া দারোগা হইয়াছিলেন। ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কথাটা শেষ করিয়া লই। আমাদের ছাত্রজীবনে তাঁহার সম্যক পরিচয় পাই নাই। তিনি যে ভালো শিক্ষক ছিলেন, আমার প্রতি তাঁহার যে একটা বিশেষ কৃপা ছিল—এইটুকুই শুধু জানিতাম। তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম অনেক পরে, যখন আমি ভাগলপুরে ডাক্তারি করি এবং যখন আমার সাহিত্যিক হিসাবে কিছু সুনাম হইয়াছে। দুই একখানা গ্রন্থও বাজারে বাহির হইয়াছে তখন। বিবাহও হইয়াছে বছর কয়েক আগে। আমার বড় মেয়ে কেয়া তখন বোধ হয় বছর চারেকের। বড় ছেলে অসীম তখন কোলে। আমি বাবার চিঠি পাইয়া ভাগলপুর হইতে মনিহারী যাইতেছিলাম। মনিহারী যাইতে হইলে সাহেবগঞ্জে গাড়ি বদল করিয়া সকরিগলি ঘাটের গাড়িতে চড়িতে হয়। আমি রাত্রি দশটা নাগাদ সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌছিয়া[illegible] [illegible]রদিন সকালে সকরিগলির গাড়ি পাওয়া যাইবে। লীলা, কে[illegible]সীমকে ফিমেল ওয়েটিং রুমে রাখিয়া নির্জন প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছিলাম। তখন বোধহয় রাত এগারোটা। প্ল্যাটফর্মটিও বেশ লম্বা। তখন খুব সিগারেট খাইতাম। দৈনিক প্রায় একটিন সিগারেট লাগিত। সিগারেট খাইবার নানাবিধ পাইপও কিনিয়াছিলাম তখন। একটি সিগারেট ধরাইয়া মনের আনন্দে প্ল্যাটফর্মের উপর বেড়াইতেছিলাম—হঠাৎ কানে গেল—'কে, বলাই নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা ফেলিয়া দিলাম। ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কণ্ঠস্বর। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কেহ নাই। তবে কি ভুল শুনিলাম? কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙিল। সেকালে বড় বড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের উপর হুইলার কোম্পানীর কাঠের তৈয়ারী পুস্তকের দোকান থাকিত। সাহেবগঞ্জে সে রকম দোকান ছিল একটা। দোকানের পাশটা অন্ধকারে ঢাকা ছিল। দেখিলাম সেই ছায়ার ভিতর হইতে ঐ ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি ওইখানে ওই প্ল্যাটফর্মের উপরেই ছোট একটি শতরঞ্চি বিছাইয়া এবং ছোট একটি পুঁটুলি মাথায় দিয়া শুইয়াছিলেন।

তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিলাম।

'কেমন আছ? অনেকদিন পরে দেখা হল—'

চুপ করিয়া রহিলাম।

'তোমার খবর কিন্তু কিছু কিছু রাখি। তুমি তো ভাগলপুরে প্র্যাকটিস করছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তুমি সাহিত্যচর্চা করছ তাও আমি জানি। তোমার লেখা উপন্যাস আমি পড়েছি। বেশ ভাল হয়েছে—'

এই বলিয়া তিনি আমার উপন্যাসের খানিকটা গড়গড় করিয়া মুখস্থ বলিয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন—'এখনও কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার ব্যাকরণ ভুল হচ্ছে। তুমি 'ভীষণ' রজনী লিখেছ। লেখা উচিত ছিল 'ভীষণা' রজনী।'

আমি বলিলাম—'আজকাল বাংলায় বিশেষণের লিঙ্গ বদলায় না।'

'ভুলটাই চলে বলছ?'

চুপ করিয়া রহিলাম। থার্ড মাস্টার মহাশয় প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

'বিয়ে-থা করেছ?'

'আজ্ঞে হ্যা।'

'ছেলে পিলে হয়েছে?'

'হয়েছে। একটি মেয়ে, একটি ছেলে—'

'কোথায় আছে তারা?'

'আমার কাছেই থাকে। আজ তাদের নিয়ে মণিহারীতে যাচ্ছি। বাবা ডেকেছেন—'

'কোথায় আছে তারা?'

'ওয়েটিং-রুমে আছে—'

'চল দেখে আসি—'

ফোর্থ মাস্টার মহাশয় ছোট পুঁটুলিটি হাতে করিয়া আমার সহিত ওয়েটিং-রুমে গেলেন। আমার স্ত্রীকে উঠাইলাম। সে আসিয়া প্রণাম করিল। কেয়া সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া এক কোণে শুইয়াছিল। তাহাকে আর উঠাইলাম না। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় অসীমের মুখ দেখিলেন এবং পুঁটুলি খুলিয়া দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

আমি বলিলাম—'ও কি করছেন সার?'

মাস্টার মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন—'পৌত্রমুখ দেখলাম, কিছু দেব না, তা কি হয়?'

ইহার পর আর কি বলিব?

ওয়েটিং-রুম হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি সাহেবগঞ্জে কোথায় এসেছিলেন?'

'একটু কাজ ছিল। এই ট্রেনেই ফিরে যাব। আমার ট্রেন এখনি আসবে।'

তাহার পর হঠাৎ তিনি আমাকে যাহা বলিলেন তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বলিলেন—'সিগারেট খাওয়াটা কি ভাল? তুমি নিজেই ডাক্তার, তোমাকে আর কি বলব আমি—।'

আমি লজ্জায় অধোবদন হইলাম। কোনও উত্তর দিলাম না। একটু পরে তাহার গাড়ি আসিয়া পড়িল। তাঁহার থার্ড ক্লাসের টিকিট ছিল। কিন্তু থার্ড ক্লাসে ভয়ানক ভীড়। অনেক ছুটোছুটি করিয়াও বসিবার জায়গা পাওয়া গেল না। আমি বলিলাম—'আপনি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়ুন। আমি টিকিটটা change করে দিচ্ছি।'

মাস্টার মহাশয় কিছুতেই রাজি হইলেন না। অবশেষে থার্ড ক্লাসের একটা কামরায় চড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন—'বেশী দূর যাব না তো। অনর্থক পয়সা খরচ করবে কেন? আমি রামপুরহাটে নেমে যাব।'

তাহার পর ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের সহিত বহুকাল আর দেখা হয় নাই। এই ঘটনাটি কোনও একটি গল্পে লিখিয়াছি বোধহয়, ঠিক মনে নাই।

ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের আবার একবার দেখা পাইলাম, মাত্র কিছুদিন আগে। তখন আমি ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক সভায় আমি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি। 'কাঁদি'তে সভা হইবে কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে। হঠাৎ একদিন কাঁদি হইতে ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন—'তুমি এখানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়া আসিতেছ এ সংবাদে খুবই আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি এখানে আসিয়া কোথায় উঠিবে আমাকে জানাইও, আমি তোমার সহিত দেখা করিব। আমার মেয়ে এখানকার মেয়ে স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, আমি তাহার বাসাতেই আছি।' আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম—'কাঁদি-তে গিয়া আমি প্রথমেই আপনার সহিত দেখা করিব। আপনি আসিবেন কেন, আমিই যাইব।'

কাঁদিতে নামিয়াই মাস্টার মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। দাঁড়াইতে গেলে পা কাঁপে। আমাকে দেখিয়া খুবই খুশী হইলেন। আমার সঙ্গে লীলাও ছিল। বলিলেন—'তুমি আর বৌমা এখানে খাবে। তুমি কি কি ভালবাস আমার মনে আছে। হরিপ্রিয়া নিজে রান্না করবে—'

হরিপ্রিয়া তাঁহার মেয়ে। সেই হেড মিস্ট্রেস মাছ মাংস প্রচুর রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছিল আমাদের। আমরা যখন খাইতেছিলাম মাস্টার মহাশয় সম্মুখে উদ্ভাসিত মুখে বসিয়াছিলেন। আর তাঁহার খবর পাই নাই।

স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের সম্বন্ধে এত বিস্তৃতভাবে লিখিতেছি না। কিন্তু একথা অবশ্যই বলিব সকল শিক্ষকদের সহিতই আমার আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। আমি খুব 'দুষ্টু' ছেলে ছিলাম না, কিন্তু রগ-চটা ছিলাম। মাঝে মাঝে হঠাৎ চটিয়া যাইতাম। বোর্ডিংয়ের খাওয়াই অনেক সময় আমাদের অসন্তোষের কারণ হইত। ভাত, ডাল, একটা নিরামিষ তরকারি এবং মাছের ঝোল ইহাই ছিল আমাদের দৈনিক বরাদ্দ। ক্রোধের কারণ ঘটিত যখন মোটা চালে কাঁকর থাকিত, যখন ডালে ডাল অপেক্ষা জলের আধিক্য ঘটিত। দুই টুক্‌রা মাছ পাইতাম। কিন্তু সেই টুক্‌রাগুলির আয়তন অতি ক্ষুদ্র হইলে হই-চই করিতাম আমরা। আমাদের মধ্যে যেসব ছেলেদের বেশী আর্থিক সঙ্গতি ছিল, তাহারা কেহ কেহ বাজার হইতে দই আনাইয়া লইত। অনেকে আলাদা করিয়া ঘি-ও খাইত নিজেদের পয়সায়। আচারও। অনেকেরই ঘরে ঘি এবং আচারের শিশি থাকিত। আমাদের বাড়ি হইতেও ঘি আসিত। কিন্তু সেটা আমরা কেবল নিজেরাই খাইতাম না, আমাদের ঘরের সকলেই ভাগ করিয়া খাইতাম। সুতরাং তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইত। বাড়ি হইতে পুনরায় ঘি না আসা পর্যন্ত আমাদের ঘৃত-হীন অন্নই খাইতে হইত। কারণ বোর্ডিংয়েব কোন ব্যঞ্জনেই কোনদিন ঘৃতেব অস্তিত্ব টের পাই নাই।

আমাদের বোর্ডিংয়ের ম্যানেজার ছিলেন আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত দুর্গাদাস রুদ্র মহাশয়। তিনি নীচের ক্লাসে পড়াইতেন। আমাদের বোর্ডিংয়েরও ম্যানেজার ছিলেন তিনি। তিনিই চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাজার-হাট করিতেন। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা তাঁহার নির্দেশেই হইত। সুতরাং আমরা যখন বিক্ষোভ করিতাম তখন তিনি তাহার লক্ষ্যস্থল হইতেন। তাঁহার অক্ষিগোলক দুইটি এমনিই একটু বহির্মুখী ছিল। মনে হইত কটমট করিয়া চাহিয়া আছেন। চটিয়া গেলে মনে হইত সেগুলি বুঝি ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। আর একটি মুদ্রাদোষও ছিল তাঁহার। চটিয়া গেলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সহযোগে বার বার নিজের নাকটা টানিতেন। পটপট করিয়া শব্দ হইত। খাইবার সময় প্রত্যহ তিনি একটি বড় চামচে ঘি লইয়া এবং তাহার উপর একটি লাল লঙ্কা বসাইয়া আমাদের ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিতেন এবং ভাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চামচটি গরম ভাতের ভিতর ঢুকাইয়া দিতেন। ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। একদিন প্রবোধ—আমার সহপাঠী প্রবোধ ঘোষ—ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিল। সে পণ্ডিত মহাশয়ের হাত হইতে ঘিয়ের

চামচটি কাড়িয়া লইয়া নিজের ভাতে সেটি গুঁজিয়া দিল। বলিল—'আপনি তো রোজ খান। আজ আমি খাচ্ছি। অখাদ্য রান্না রোজ রোজ আর খেতে পারি না।

পণ্ডিত মহাশয়ের অক্ষিগোলক দুইটি ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। নাক টানিয়া তিনি পটপট শব্দ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—'এরকম অসভ্যতা না করিলেই পারতে। বেশ, আমি আর ঘি খাব না। আমার ঘি তুমিই খেও।'

তিনি উঠিয়া গেলেন এবং নিজের ঘর হইতে তাঁহার ঘিয়ের শিশিটা আনিয়া প্রবোধের থালার সামনে রাখিলেন। খাওয়ার 'হলে' একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় ঘি কিছুতেই খাইবেন না, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম—'না, আপনি ঘি খান, প্রবোধের দোষ হয়েছে।'

শেষে প্রবোধ সর্বসমক্ষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া আবার ঘি খাইতে লাগিলেন।

বোর্ডিংয়ের ছেলেদের খাওয়া খুব খারাপ হইতেছে এই খবরটা ক্রমশ হেডমাস্টার মহাশয় মহাদেববাবুর কানে পৌঁছিল। তিনি এক রবিবারে আমাদের খাওয়ার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সব দেখিয়া রুদ্র পণ্ডিত মহাশয়কে তিনি কি বলিলেন জানি না, কিন্তু ব্যবস্থা হইল চাল এবং মাছ একজন বোর্ডিংয়ের ছেলে চাকরকে সঙ্গে লইয়া গিয়া কিনিবে। আমার মনে আছে আমি বাজারে গিয়া একদিন একটি আট সের ওজনের রুইমাছ দুই টাকা দিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলাম। ইহাতে রুদ্র পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—'আট-সের মাছ তোমরা একদিনে খাবে? দু'দিনে খাও। সমস্ত মাছটার অম্বল করে ফেল। বাসী অম্বল বেশ ভাল লাগবে কাল।'

তাহাই হইল। রুদ্র মহাশয়ের সহিত খাওয়া-দাওয়া লইয়া আমাদের কলহ হইত। রুদ্র মহাশয় বলিতেন—'মাসে তোমরা মাত্র সাত টাকা করে দাও। এ টাকায় এর চেয়ে ভালো খাওয়া-দাওয়া সম্ভব নয়।'

হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমরা ঝগড়া করিতাম। আমরা সকালে এবং বিকালে নিজেরা খাবার কিনিয়া খাইতাম। আমি এবং ভোলা সকালে আদা ও ছোলা-ভিজানো খাইতাম। বোর্ডিংয়ের পাশেই ছিল রাজেনবাবুর দোকান। বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া বোর্ডিংয়ের সব ছেলেরা ভীড় করিত সেখানে। ভীড়ের মধ্যে কোন্ ছেলে কোন্ খাবার লইতেছে তাহা অনেক সময় তিনি ঠিক করিতে পারিতেন না। আমরা তাহার দোকানে বসিয়াই খাইতাম। কে কত

খাই তাহার হিসাবে তিনি গোলমাল করিয়া ফেলিতেন। আমরা যে যাহা দিতাম তাহাই তিনি লইতেন। বলিতেন—'আমি তোমাদের বিশ্বাস করি। তোমরা সব ভালো ছেলে, সোনা ছেলে।' আমার যতদূর মনে পড়ে আমরা কেহ তাঁহাকে চটাইতাম না। যেদিন বেশী খাইয়া ফেলিতাম সেদিন বলিতাম—'আজ বেশী খেয়েছি, বাকি পয়সা পরে শোধ করব।' রাজেনবাবু আপত্তি করিতেন না।

আমার সাহেবগঞ্জের জীবনে আর একটি পরিবারের কথা উজ্জ্বল হইয়া আঁকা আছে। আমি আমার বাবার বন্ধু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা আগেই বলিয়াছি। আমরা যখন সাহেবগঞ্জে পড়িতে যাই তাহার অনেক পূর্বেই প্রমথনাথ মারা গিয়াছেন। তাঁহার দাদা অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখনও জীবিত। তিনি ছিলেন আমাদের জ্যাঠামশাই। আমার বাবা তাঁহাকে দাদার মতই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও মাঝে মাঝে মণিহারী যাইতেন এবং আমাদের বাড়ীতে দিন কয়েক কাটাইয়া আসিতেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের দুই ছেলে: আমাদের ফণীদা এবং মণিদা। ফণীদা বড় ডাক্তার হইয়া রেডিওলজিষ্ট রূপে বিখ্যাত হন। তিনি ছাত্রজীবনে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে যাইতেন। জ্যাঠামশাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন আমাদের জ্যাঠাইমা। এরকম স্নেহময়ী নারী বিরল। বোর্ডিং হইতে আমরা প্রায়ই তাঁহার কাছে যাইতাম। এবং ভালো-মন্দ খাইয়া আসিতাম। সে বাড়িতে কি স্নেহ ও আদর যে পাইতাম তাহা কথায় বলিয়া বুঝানো শক্ত। তাহাতে কোনও লোক দেখানো লৌকিকতা ছিল না, জাঁকজমকও ছিল না। তাহা ছিল সরল অনাড়ম্বর এবং খাঁটি। জ্যাঠামশাইয়ের একটি বোন ছিলেন। আমরা তাঁহাকে মানা বলিয়া ডাকিতাম। তিনি খুব সুরসিকা এবং সদাহাস্যময়ী ছিলেন। আর ছিলেন স্থূলকায়া সেজ জ্যাঠাইমা—স্বর্গীয় প্রমথনাথের স্ত্রী। আমরা গেলে তিনিও খুশি হইতেন। তাঁহার পুত্র হাবুলদা আমার সহপাঠী ছিল। অনুকূলবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের ছেলে বুড়ো, (ভাল নাম ইন্দু), ক্যাবলা আমাদের ভাইয়ের মতোই ছিল। সাহেবগঞ্জের স্কুল জীবনে এই বাড়িটি আমাদের আশ্রয় ছিল। অনুকূল জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমারা অনেকদিন আগেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। ফণীদা, মণিদা, বুড়ো, ক্যাবলা কেহই এখন বাঁচিয়া নাই। বাঁচিয়া আছে কেবল তাহাদের স্নেহের উজ্জ্বল স্মৃতি।

সাহেবগঞ্জে স্কুল জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটি জীবন আরম্ভ হয়। তাহা লোকসেবার জীবন। আমাদের নেতা ছিলেন বটুদা। তিনি গঙ্গার ধারে একটি ভাঙা নীলকুঠিতে নাইট স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক প্রৌঢ়,

বৃদ্ধ, যুবককে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিতাম আমরা। তাহাদের রামায়ণ-মহাভারত হইতে গল্প পড়িয়া শুনাইতাম। ইহা ছাড়া, মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন বটুদা। আমরা পরিচিত মহলে অনেকের বাড়িতে ছোট ছোট হাঁড়ি কিনিয়া দিয়া আসিতাম। অনুরোধ করিয়া আসিতাম, রাঁধিবার সময় একমুঠো চাল যেন তাঁহারা হাঁড়িতে দেন। এই চাল সংগৃহীত হইয়া হাটে বিক্রয় হইত। সে টাকা বিতরিত হইত দুঃস্থদের জন্য।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন বটুদা। সারাটা জীবনই তিনি পরের উপকারের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। আমরা আমাদের অবসর মতো তাঁহার কাজে সাহায্য করিতাম। তাঁহার বাড়ির বাহিরের দিকে বারান্দায় ছোট একটা লাইব্রেরিও স্থাপন করিয়াছিলাম। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়, তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন—'শারদা ভবন'। এই লাইব্রেরিতে সন্ধ্যার সময় আমরা প্রায়ই যাইতাম। ক্রমশ বটুদার পরিবারের বাড়ির লোক হইয়া গেলাম আমরা। বটুদারা বৈষ্ণব ছিলেন। বাড়িতে বাল-গোপালের মূর্তি ছিল একটি। রোজ সন্ধ্যার সময় পূজা হইত। আমরা প্রসাদ পাইতাম। বটুদার বাবা পূজো করিতেন। প্রকৃত ভক্ত ছিলেন একজন। ওই বাল-গোপালটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্য কথা মনে পড়িল। বটুদার বাবাকে কি একটা কাজের জন্য দিল্লী যাইতে হইয়াছিল। যেদিন তিনি দিল্লী হইতে ফেরেন সেদিন কি একটা কাজে—(খুব সম্ভবত হুইলারের দোকান হইতে বই কিনিবার জন্য, বই কিনিবার জন্য প্রায়ই যাইতাম সেখানে) আমি স্টেশনে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়াই বটুদার বাবা প্রশ্ন করিলেন—'আমাদের বাড়িতে কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ—'

'গোপালের প্রসাদ খেয়েছিলি? গোপালকে ওরা আজকাল রোজই ছোলা-ভিজানো দিচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন থেকে ছোলা-ভিজানো আর বাতাসা প্রসাদই তো খাচ্ছি—'

'ওই দেখ। গোপাল আমাকে স্বপ্নে তাই বললে—রোজ ছোলা ভিজে খেয়ে আমার পেট কামড়াচ্ছে। স্বপ্ন দেখে তাই আমি তাড়াতাড়ি দিল্লী থেকে চলে এলাম।'

কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। এখনও সে বিস্ময় কাটে নাই।

সাহেবগঞ্জের স্কুল জীবনে আরও অনেক লোকের ছায়া আমাদের জীবনে পড়িয়াছিল। ডাক্তার পশুপতিবাবুর কথা মনে পড়িতেছে। তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। বাবা যখন সাহেবগঞ্জে মাতুলালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা

করিতেন তখন পশুপতিবাবুর স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। সে স্নেহের ধারা বংশানুক্রমে আজও প্রবাহিত আছে। পশুপতিবাবুর তিন ছেলে বিশুদা, ঢলাদা এবং ডলাদাকে আমরা দাদার মতই খাতির করিতাম। আমি যখন পরে মেডিকেল কলেজে পড়ি তখন বিশুদা এবং ডলাদা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তাহার পরও সম্বন্ধ বহুকাল অটুট ছিল। আমার ল্যাবরেটরিতে বিশুদা প্রায়ই রোগী পাঠাইতেন। ডলাদাও। এখনও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ডলাদার মেয়ে মণ্টু এখনও মাঝে মাঝে খবর নেয়। পশুপতিবাবুর সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়িতেছে। তিনি রোজ সন্ধ্যার সময় নিজের বাড়ির রাস্তায় পায়চারি করিতেন। কখনও আমাদের সহিত দেখা হইলে বলিতেন—'কে রে?'

নিজের পরিচয় দিতে হইত। তখন তিনি বলিতেন—'এখনও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিস, পড়তে বসিসনি! তোর বাবাকে আমি চিঠি লিখে দেব।'

সুতরাং কোনদিন কোন কারণে কোথাও দেরী হইলে পশুপতিবাবুর বাড়ির রাস্তা দিয়া যাইতাম না। ঘুরিয়া অন্য রাস্তা দিয়া যাইতাম। সেকালে সব ছেলেদেরই সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরিতে হইত, না ফিরিলে গার্জেনরা কৈফিয়ৎ তলব করিতেন। আমাদের বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট মহাশয় (থার্ড মাষ্টার) এ বিষয়ে বড় কড়া লোক ছিলেন।

মনে পড়িতেছে আমার সাহেবগঞ্জের স্কুল জীবনের আরও কয়েকজন লোক আমাদের নিকট 'হীরো' ছিলেন। বটুদা তো ছিলেনই, আরও কয়েকজন ছিলেন। আমি যদিও ফুটবল খেলিতাম না, কিন্তু ফুটবল খেলায় পারদর্শী খেলোয়াড়দের মনে মনে খুব খাতির করিতাম। সুধন্বুদা, পঙ্কজদা, বিজয়দা, হাওয়া, বাদলা (ইহারা বোধ হয় সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন না), সামাদ প্রভৃতি আমাদের নিকট 'হীরো' ছিলেন। আমাদের স্কুলেও ফকাস্‌ কাপ প্রতিযোগিতায় যাহারা যোগ দিত তাহাদের আমরা খুব সমীহ করিতাম। আমাদের স্কুলের কালী মিস্ত্রিরকে এজন্য খুব খাতির করিতাম আমরা।

সাহেবগঞ্জে একটি এমেচার থিয়েটার ক্লাব ছিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা থিয়েটার করিতেন। তখন ডি. এল. রায়ের নাটকগুলি বাজার গরম করিয়া রাখিয়াছে। সাহেবগঞ্জ থিয়েটার ক্লাবের থিয়েটার দেখিয়া আমি দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্ত হইয়া পড়ি। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, মেবার পতন, রাণা প্রতাপ সিংহ, বিরহ প্রভৃতি নাটক অভিনয় করিয়া সাহেবগঞ্জ থিয়েটার ক্লাব আমার মনে এমন একটা ছাপ রাখিয়া গিয়াছে যে আজিও তাহা মোছে নাই। সেই থিয়েটার ক্লাবের

কৃতী অভিনেতারা আমাদের নিকট শ্রদ্ধেয় ছিলেন। আজও আছেন। কেশবদা, ফণীদা, বিজয়দা, সুধন্যদা, জ্যোতিষদা আজও আমার মনে জাগরূক আছেন। তাঁহাদের থিয়েটারে হয়তো অনেক ত্রুটি ছিল। তখন পুরুষরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। স্টেজও ছিল একটা জোড়া-তাড়া ব্যাপার। কিন্তু কি ভালই যে লাগিত। তখন মনটাই অন্যরকম ছিল।

এই সূত্রে একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। খুব ছেলেবেলা বাবার সহিত আমি কোথায় যেন (খুব সম্ভবত সাহেবগঞ্জেই) নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যায়, যাত্রা হইবার কথা। কিন্তু শুনিলাম সন্ধ্যায় যাত্রা হইবে না। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি যাত্রা শুরু করিবেন এবং সকাল আটটা নাগাদ শেষ করিয়া দিবেন। ইহাতে রাতের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে না। সকালে কাজের ব্যাঘাত হইবে না। খুব ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তেই আমরা যাত্রার আসরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বহু লোক সমবেত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের তখন বিপুল খ্যাতি। হঠাৎ নীলকণ্ঠ একটি কালো রঙের জোব্বা পরিয়া আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম তিনি বৃদ্ধ। মাথার চুল পাকা। মুখমণ্ডলে কয়েকদিনের না কামানো গোঁফ-দাড়ি। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'আজ মাথুর গাইব। কিন্তু যে ছেলেটির বৃন্দা সাজবার কথা, তার খুব জ্বর এসেছে। সে অভিনয় করতে পারবে না। আপনারা যদি অনুমতি করেন আমিই বৃন্দা সাজবো।'

নীলকণ্ঠের এ প্রস্তাবে কেহ আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু মনে মনে সবাই বোধহয় হতাশ হইয়াছিলেন। একটু পরে নীলকণ্ঠ বৃন্দা বেশে আসরে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলাম তিনি দাড়ি কামান নাই। পোষাকও বদলান নাই। ওই কালো জোব্বা এবং পেন্টালুনের উপর একটি গোলাপী রঙের বৃন্দাবনী চাদর গায়ে দিয়াছেন। সেই চাদরটিই মাথার উপর টানিয়া অবগুণ্ঠন দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন গান ধরিলেন তখন তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদের কথা আমরা ভুলিয়া গেলাম। সে কি কণ্ঠস্বর, সে কি আকুতি! সে কি সুর! মনে হইল আমরা সকলেই যেন মথুরা চলিয়া গিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছি—তোমার রাজ্যপাট লইয়া কি করিবে! তোমার রাই যে মর মর। চল চল শীঘ্র চল। তাঁহার অভিনয়ের গুণে এবং গানের অলৌকিক ক্ষমতায় আমরা কয়েক ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়াছিলাম। আজ-কালকার থিয়েটারে বাহ্যিক আড়ম্বর বেশী। অভিনয় প্রাণহীন।

আমাদের সাহেবগঞ্জের সেই ক্লাবের থিয়েটার কিন্তু প্রাণহীন ছিল না। কেশবদার চাণক্য, ফণীদার গোবিন্দ পন্থ আজও আমার মনে সজীব হইয়া আছে।

সাহেবগঞ্জের আর একটি লোককে মনে পড়িতেছে—মাসি গার্ড। ভাল নাম ছিল বোধ হয় হরিসাধনবাবু। আমরা তখন কিশোব, আর তিনি তখন প্রৌঢত্বের শেষ সীমায়। তবু তিনি আমাদের সমবয়সী ছিলেন। আমাদের সঙ্গে নানারূপ কৌতুক করিতেন। স্কুলের ছুটি হইয়াছে। স্কুলের গেট দিয়া পিলপিল করিয়া ছেলের দল বাহিব হইতেছে। মাসি গার্ড গেটের সামনে আকাশেব দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'বাঃ, বেশ কেটেছে।'

ছেলের দল অমনি দাঁড়াইয়া গেল। তখন ঘুড়ি ওড়ানোর সময়। ছেলেরা ভাবিল—কোথাও কাহারও ঘুড়ি কাটিয়াছে বোধহয়। উন্মুখ হইয়া আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল তাহারা। কোথাও কাটা ঘুড়ি দেখিতে না পাইয়া যখন তাহারা মাসি গার্ডকে প্রশ্ন কবিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল—তখন দেখিল তিনি নাই, নিঃশব্দে অন্তর্ধান করিয়াছেন। এরকম মজা তিনি মাঝে মাঝে করিতেন। তাঁহাব ছেলের নাম ছিল মাখন। একদিন বেলা দশটা নাগাদ তাঁহাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া 'মাখন মাখন' বলিয়া ডাকিতেছি। মাসি গার্ড বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন—'তুই কি বোকারে। এই গ্রীষ্মকালে বেলা দশটার সময় মাখন কি মাখন থাকে? গলে যায়। তুই বরং ঘি ঘি বলে ডাক, হয়তো সাড়া পাবি।'

বলিয়াই ভিতরে চলিয়া গেলেন। এই ধরণের রসিকতা তিনি প্রায়ই করিতেন আমাদের সঙ্গে। রেলের গার্ড ছিলেন, কিন্তু সাহেবগঞ্জের বাঙালী সমাজের অপবিহার্য অঙ্গ ছিলেন তিনি। তাঁহাকে ভোজের বাড়িতে পরিবেশন করিতে দেখিয়াছি, থিয়েটারের স্টেজ বাঁধিতে দেখিয়াছি, আবার মড়া পোড়াইতেও দেখিয়াছি। সাহেবগঞ্জের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে তাঁহাকে মান্য করিত। মনটা ছিল কৌতুক-প্রবণ, স্টেশনের কুলির সঙ্গেও যেমন সহজভাবে রসিকতা করিতেন, তেমনি সহজভাবেই ডি টি.এম আপিসের বড়বাবুর সহিতও করিতে তাঁহার বাধিত না। পুণ্যবান লোক ছিলেন। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ছেলে লালা, শুঁটি আর মাখনের কথা এখনও মনে আছে। জানি না তাহারা এখন কোথায়।

সাহেবগঞ্জের কথা শেষ করিবার আগে প্রবোধ ঘোষের কথা বলি। আগেই বলিয়াছি প্রবোধ ঘোষ আমার সহপাঠী ছিল। এখন তাহার সহিত ভাব হইয়া

গেল আমার সাহিত্য-চর্চার জন্যই। সম্ভবত সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ছেলেবেলাতেই তাহার বাবা ও মা প্লেগে মারা যান। স্কুলের থার্ড মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে মানুষ করেন নিজের বাড়িতে। থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের খুব প্রিয় ছিল সে।

থার্ড মাষ্টার মহাশয় যখন সাহেবগঞ্জ স্কুল হইতে চলিয়া গেলেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল প্রবোধও তাহার সহিত চলিয়া যাইবে। সে কিন্তু গেল না। আমার সহিত তাহার যখন খুব ভাব, তখন একবার ছুটিতে সে আমাদের সহিত মণিহারী গেল। তাহার পর হইতে প্রায় প্রতি ছুটিতে সে আমাদের বাড়িতে যাইত। ক্রমে আমার মাকে মা, এবং বাবাকে বাবা বলিতে শুরু করিল। অর্থাৎ সে আমাদের বাড়ির ছেলে হইয়া গেল। একবার কোন একটা দীর্ঘ ছুটিতে— গ্রীষ্মে কি পূজায় তাহা মনে নাই—প্রবোধ আমাদের বাড়িতে গিয়াছিল। সে সময় তাহার নিমনিয়া হয়। বাবা তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন—মা করিয়াছিলেন শুশ্রূষা। যমে মানুষে টানাটানি হইয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। সেই হইতে প্রবোধ আমাদের আত্মীয় হইয়া যায়। যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন আমাদের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ ছিল তাহার। তাহার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার আঝাপুর গ্রামে। সেখানে সে মাষ্টারী করিত। যখন ছুটি পাইত আমাদের বাড়ি চলিয়া আসিত। আঝাপুরে এক সাহিত্য-সভায় সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আমি যাইতে পারি নাই। ইহার কিছুদিন পরে প্রবোধ মারা যায়। তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া আজও যেন তাহার নিকট অপরাধী হইয়া আছি।

আমি ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। ১০ টাকার একটি বৃত্তিও আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল, কিন্তু বাঙালী বলিয়া সে বৃত্তি আমাকে দেওয়া হয় নাই। কথাটা স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের মুখে শুনিয়াছিলাম—সত্য মিথ্যা জানি না।

১৯১৮ কিন্তু আমার স্মৃতিতে জাগরূক হইয়া আছে দুটি কারণে। প্রথম কারণ ঐ বৎসরই আমার একটি চার লাইনের কবিতা 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়। কবিতাটি একটি সংস্কৃত কবিশ্লোক-এর অনুবাদ। 'প্রবাসী'-তে লেখা বাহির হওয়া তখন বিশেষ গৌরবের ছিল। তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর কয়েক মাস। আগেই বলিয়াছি আমার পড়া বিলম্বে শুরু হইয়াছিল। তাই ১৬ বৎসরে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারি নাই। ১৯১৮ আমার মনে আর একটি কারণে

উজ্জ্বল হইয়া আছে। ঐ বৎসর আমার ছোট বোন রানীর বিবাহ হয়। রানী আমাদের বাড়ির ফুটবল টিমের 'ব্যাক' ছিল। পেয়ারা গাছে, আমগাছে চড়িতে সে দক্ষ ছিল। বাড়ির বিড়াল কুকুরগুলি খুব প্রিয় ছিল তাহার। একবার এক বিড়াল ছানা পাগল হইয়া তাহাকে কামড়াইয়া দেয়। এজন্য বাবা তাহাকে কশোউড়ি লইয়া গিয়াছিলেন। তখন সব হাসপাতালে 'এ্যান্টি রেবিজ' ইঞ্জেকশন পাওয়া যাইত না। সেই রানীর ১১ বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। তখনও জাহাজ বন্ধ। নৌকাযোগে গঙ্গা পারাপার হইতে হয়। কয়েকটি নৌকা লইয়া আমি সাহেবগঞ্জে গিয়াছিলাম বরযাত্রী আনিবার জন্য। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে তাহাদের স্নানাহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শুধু সাহেবগঞ্জে নয়, বর্ধমানেও তাহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা বাবা করিয়াছিলেন। বর্ধমান স্টেশনে বাবার একজন পরিচিত লোক স্টেশনমাষ্টার ছিলেন। বর্ধমানে রাত্রি ১২টার সময় গাড়ি পৌঁছাইত তখন। স্টেশনমাষ্টারমশাই তখন প্রতি কামরা খোঁজ করিয়াছিলেন—মণিহারী ডাক্তারবাবুর বাড়িতে বিবাহের বরযাত্রী কেহ ছিলেন কিনা। বরযাত্রীদেরও তিনি জলখাবার খাওয়াইয়াছিলেন। নৌকাযোগে আমরা যখন বাড়ির কাছাকাছি আসিলাম তখন নৌকা হইতে উপর্যুপরি কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ করা হইল। মণিহারীর ঘাটে একজন ঘোড়সওয়ার বন্দুকের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বন্দুকের শব্দ পাওয়া মাত্র সে ঘোড়া ছুটাইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া খবর দিল —বরযাত্রীর নৌকা দেখা গিয়াছে। বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

মণিহারী কুঠিতে বরযাত্রীদের রাখা হইয়াছিল। যোগেশকাকা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় বরযাত্রী যখন আমাদের বাড়ীতে আসিলেন, তখন ঘোড়া, পাল্কি, হাতি, গরুর গাড়ি সবরকম যানেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দেশী ঢাক, ঢোল, ভেঁপুও ছিল প্রচুর। বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি একটি গান লিখিয়াছিলাম। বাবার থিয়েটারপার্টির এক ভদ্রলোক, নামটি ঠিক মনে পড়িতেছে না, তাহাতে সুর বসাইয়া গাহিয়াছিলেন। সকলে খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন গানটির। তখন আমি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর খুব ভক্ত। তাঁহারই লেখা গান, 'জাগো জাগো পুরবাসী' গানটির ধাঁচে গানটি লেখা হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম অংশটি এখনও মনে আছে :

এসো এসো গুণী-মানী,
পুলকে ভরিয়া উজল করিয়া
মোদের কুটিরখানি

পর্ণ কুটির করিয়া ধন্য
এসেছো গো হে মহামান্য,
গৌরবময় করি লহ সব
সৌরভ-কণা জানি।

বরযাত্রীরা তিনদিন ছিলেন। আত্মীয়-স্বজনরাও বেশ কিছুদিন। সাত-আট দিন ধরিয়া বাড়িতে ভোজ চলিয়াছিল। বাবার বন্ধু জমিদাররা এত মাছ পাঠাইয়াছিলেন যে সব ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। তিনমণ মাছ পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছিল। দুধ-দইও প্রচুর আসিয়াছিল। ক্ষীরও। মণিহারীর কাছাকাছি দশ-পনেরোটি গ্রাম হইতে নিমন্ত্রিতরা আসিয়াছিলেন। তাছাড়া ছিল অনাহুত, রবাহুত-র দল। এরকম ভোজ আজকাল আর হয় না। হওয়া সম্ভব নয়।

সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া আমি যেদিন চলিয়া আসি, সেদিনের কথা বিশেষ করিয়া মনে নাই। পরীক্ষা দিবার পরই সোজা বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের পরীক্ষার সেণ্টার ছিল ভাগলপুর 'টি এন জুবিলি' কলেজে। সেই সময় সেখানকার বিখ্যাত অধ্যাপক প্রিন্সিপাল এন. এন. রায়কেও দেখিয়াছিলাম। ও-রকম কুৎসিত-দর্শন লোক বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহার গুণের আলোয় তিনি প্রদীপ্ত ছিলেন—যখন বক্তৃতা দিতেন তখন সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। পরে আমারও একবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শুনিয়া সত্যি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

সাহেবগঞ্জে আমার কৈশোর জীবন কাটিয়াছে। বলিতে গেলে আমার জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব—এই সাহেবগঞ্জে। সেখানকার শিক্ষকদের নিকট আমি ঋণী। বটুদার কাছেও আমি ঋণী। বটুদার সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে হয়ত আমি সাহিত্য-জগতে প্রবেশই করিতাম না। আমি স্কুলে পড়াশুনায় ভালোই ছিলাম। বরাবরই আমি প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। কিন্তু যে ধরণের পুস্তককীট হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ছেলে বলিয়া পরিচিত হওয়া যায় সে রকম পুস্তককীট হইবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না। তা ছাড়া সাহিত্যের ভূত ঘাড়ে চাপিয়াছে। আমি অনেক বাজে বই পড়িয়া সময় কাটাইতাম, প্রায় রোজই কিছু না কিছু লিখিতাম। কাগজে পাঠাইতাম, প্রায়ই ফেরত আসিত। তবু দমিতাম না, আবার লিখিতাম, আবার কাগজে পাঠাইতাম। সাহেবগঞ্জে যতদিন ছিলাম বটুদার উৎসাহ পাইয়াছি। সাহেবগঞ্জ হইতে চলিয়া যাইবার পরও বটুদার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট ছিল। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি

আমার ছেলের বিবাহে ভাগলপুরের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। বটুদার ছেলে নেপু, ভালো নাম 'সরিৎশেখর মজুমদার' এখনও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। সেও একজন রসিক এবং সাহিত্যশিল্পী।

বহুকাল পূর্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সাহেবগঞ্জকে এখনও ভুলি নাই। সাহেবগঞ্জও এখন সাহিবগঞ্জ হইয়াছে। আমাদের সেই ছোট স্কুল অনেক বড় হইয়াছে। তাহার ঐশ্বর্য, তাহার ঘর-বাড়ি অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের সেই ছোট স্কুল বাড়িটি আমার সেই নাতিবৃহৎ বোর্ডিং-হাউসটি আজও অমর হইয়া আছে আমার মনে।

সাহেবগঞ্জের পাহাড়তলী, পাহাড়ের ঝর্ণা, সাহেবগঞ্জেব ধারে নীলকুঠি, সেখানে বটুদার নাইট-স্কুল—এসব ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার ভাই ভোলা অসুখে পড়িয়াছিল। তাই এক বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। আমি যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই, ভোলা সে বৎসর দিতে পারে নাই। আমি চলিয়া আসিবার পরও সে সাহেবগঞ্জ বোর্ডিংএ এক বৎসর ছিল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার সময় আমার জীবনে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া-ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার ঠিক আগে মণিহারী হইতে একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একটি মাদুলি ও বাবার একটি পত্র আনিয়াছিল। বাবা লিখিয়াছিলেন, পরীক্ষা দিতে যাইবার আগে আমি যেন মাদুলিটি ধারণ করি। যে চাকরটি মাদুলি আনিয়াছিল সেই আমার বাম বাহুমূলে শক্ত সুতার দ্বারা মাদুলিটি বাঁধিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিসের মাদুলি এটা ?'

সে যাহা বলিল তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। আমাদের বাড়িতে নাকি প্রচণ্ড একটি গোক্ষুর সর্প মারা পড়ে। তাহার প্রকাণ্ড ফণার ঠিক মাঝখানে একটি সাদা রংএর এঁটুলি ছিল। সেই এঁটুলিটি তুলিয়া এই মাদুলির ভিতর রাখা হইয়াছে। কে যেন বাবা-মাকে বলিয়াছে এ এঁটুলি সঙ্গে থাকিলে যে কোন কাজে সিদ্ধি অনিবার্য। তাই মা এঁটুলি-গর্ভ মাদুলিটি পরিয়া পরীক্ষা দিতে বলিয়াছেন। যিনি এঁটুলিটির বিশেষ গুণের কথা বলিয়াছিলেন তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, এ এঁটুলি কাহারও কাছে বেশিদিন থাকে না। এই এঁটুলি আবার একটা গোখরো সাপ খুঁজিয়া তাহার মাথায় গিয়া বসিবে। সুতরাং মা আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন আমি যেন মাদুলিটি খুব যত্ন করিয়া রাখি।

আমি যত্ন করিয়াই রাখিয়াছিলাম। যে কয়দিন পরীক্ষা দিয়াছিলাম সেই কয়দিন আমার হাতেও তাহা ছিল। পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলাম। কিন্তু

তাহার পর যখন বাড়ি গেলাম তখন দেখিলাম হাতে মাদুলিটি নাই। সুতাটি আছে কেবল। তাহার পর আরেকটি দুশ্চিন্তার কারণ হইল, আমি জ্বরে পড়িয়া গেলাম। মায়ের মনে হইল এই এঁটুলির আবির্ভাব এবং তিরোভাব-এর সহিত আমার জ্বরের নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে। বাবা বলিলেন, 'প্যারা টাইফয়েড' হইয়াছে। মা পীরবাবার কাছে সিন্নি মানত করিলেন।

পীরবাবার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। পীরবাবা আমাদের বাড়ির কাছেই ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি সিদ্ধ পীরের কবর-স্থান। খুব জাগ্রত ইনি। ও অঞ্চলের সকলেই পীরবাবার ভক্ত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই বিপদে পড়িলে পীরবাবার নিকট মানত করেন। এইরকম পীর একটি সক্‌রি পাহাড়ে' আছে, মুঙ্গেরেও আছে। জানি না, ইহাদের পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না। জনশ্রুতি, মুসলমান আমলে এই সব উঁচু টিলায় ফৌজি পাহারা থাকিত। ছোটখাটো দুর্গও ছিল নাকি প্রত্যেক জায়গায়। মণিহারী পীরবাবার পাহাড়ের ধারে অনেক পুরাতন ইটের স্তূপ এবং কারুকর্ম অলংকৃত বড় বড় অনেক পাথর দেখিতে পাওয়া যাইত। একজন মাড়োওয়াড়ি এই অঞ্চল হইতে পাথর তুলিয়া ব্যবসা করিত। আমাদের আত্মীয় অতুলদা —'বাবার মামার শালা'—তাহার অধান চাকরিতে বহাল হইয়াছিল। লোকে বলে তিনি ওই পাথর খুঁড়িতে খুঁড়িতে নাকি মোহরের ঘড়া পান। তাহার পর হইতে নাকি অতুলদার অবস্থা ফিরিয়া যায়। ইহা কতদূর সত্য জানি না, কিন্তু ইহা জানি, অতুলদা পীরবাবার কবরটি ঘিরিয়া একটি পাকা ঘর করাইয়া দিয়াছিলেন। এবং পাহাড়ে উঠিবার জন্য পাকা সিঁড়িও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

পীরবাবার পাহাড়ের একধারে রঙিন খড়ি পাওয়া যাইত। আমরা ছেলেবেলায় খড়ি আনিবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতাম। কুল গাছ এবং বেত গাছের জঙ্গল ছিল চারদিকে। তাহার ভিতর ছিল নানারকম পাখীর বাসা। বুলবুলি, দরজি পাখী, মুনিয়া, বগেরি পাখীর আড্ডা ছিল স্থানটি।

এই পীরবাবার কৃপায় কিছুদিন পরে আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল। কিন্তু আমি দুবল হইয়া পড়িলাম। আমাদের বাড়ির কাছে নিকটতম কলেজ ভাগলপুরের টি এন. জুবিলি কলেজ। আমার সেইখানেই পড়িবার কথা। কিন্তু বাবা স্থির করিলেন আমাকে হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বাস কলেজে পাঠাইবেন। সেখানকার জল-হাওয়া ভালো। আমার শরীরটা সারিয়া যাইবে। হাজারিবাগে দরখাস্ত করা হইল। কলেজ কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি পাইবার পর বাবা ভরতির জন্য টাকাকড়ি পাঠাইয়া

দিলেন। আমার যাইবার দিনও নির্দিষ্ট হইয়া গেল। সাহেবগঞ্জে আমরা বাড়ির কাছেই ছিলাম—প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাড়ি আসিতাম। বাড়ি হইতেও কেহ না কেহ গিয়া আমাদের খবরাখবর করিতেন। বিদেশ-বাসের ব্যথা এত তীব্র অনুভব করি নাই। হাজারিবাগ গেলে করিতে হইবে। মনে মনে একটু ভয় হইল। মা তো খুব দমিয়া গেলেন। কিন্তু তবু যখন সবকিছু হইয়া গিয়াছে—তখন একদিন যাত্রা করিতে হইল। পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া, ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করিয়া, পীরবাবার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া, পুজোর ফুল, বিল্বপত্র পকেটে লইয়া একদিন হাজারিবাগের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে কেহ ছিল না। আমি একাই গেলাম। মনে আছে সাহেবগঞ্জে গিয়া থার্ডক্লাসের টিকিট কাটিয়া গয়া-গামী একটি ট্রেনে চড়িয়া বসিয়াছিলাম। গয়া হইতে হাজারিবাগের ট্রেন পাওয়া যায়।

## হাজারিবাগ

হাজারিবাগ শহরে কোনও রেলওয়ে স্টেশন নাই। চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত হাজারিবাগ রোড স্টেশনে নামিয়া 'বাস'-এ করিয়া হাজারিবাগে যাইতে হয়। আমি ইতিপূর্বে বাড়ি হইতে বেশী দূরে একটা কখনও যাই নাই। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে গয়া-গামী একটি ট্রেনে আমাকে চড়াইয়া কাকাবাবু যখন চলিয়া গেলেন তখন মনে মনে আমি যেন অকূল পাথারে পড়িলাম। বলা বাহুল্য, টিকিট ছিল থার্ড-ক্লাসের। লটবহর লইয়া বহু অবাঙালীই ছিল সে কামরায়। একটি বিহারী বৃদ্ধাই আমাকে বসিতে জায়গা দিলেন, বলিলেন—'খোকাবাবু, আরো, জাগ্‌হা (জায়গা) ছে—।'

আমার সঙ্গে একটি তোরঙ্গ ও বিছানা ছিল। সেগুলিরও ব্যবস্থা বৃদ্ধাই করিলেন। বেঞ্চের তলায় 'ঘুসাইয়া' দিলেন। ট্রেন যতক্ষণ চলিয়াছিল, ততক্ষণ বৃদ্ধা ঢুলিয়াছিলেন। গয়া স্টেশনে যখন ট্রেন পৌছিল, তখন ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাজারিবাগের ট্রেন কোথায় মিলবে ?'

যে কুলিটি আমার মালপত্র নামাইতে আসিল, বৃদ্ধা তাহাকেই আদেশ দিলেন, 'বুত্‌রুকে' (খোকাকে) হাজারিবাগের ট্রেনে একটা ভালো জায়গায় চড়াইয়া দাও।

হাজারিবাগের ট্রেনে সত্যিই একটা ভালো জায়গা আমি পাইয়াছিলাম। কোণের দিকে জানলার ধারে। ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। আমি সেই সময় গয়ার কয়েকটি প্যাঁড়া লুচি সহযোগে উদরস্থ করিয়া ফেলিলাম। গাড়িটি প্রথমে যাত্রীতে ভরিয়া গেল। মনে হইল, বেশীর ভাগ যাত্রীই সাঁওতাল জাতীয়। একজনের কাঁধে একটি মাদলও ছিল, মনে পড়িতেছে। ট্রেন ছাড়িয়া দিল এবং ট্রেনের দোলানিতে কিছুক্ষণ পরে আমার ঘুম আসিল। আমি জানলার উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। বাহিরে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। বেশ জোরে একটা হাওয়া বহিতেছিল। আমি আমার র‍্যাপারটা কানে জড়াইয়া লইলাম। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখি সকাল হইয়াছে। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। অনুভব করিলাম ডানদিকের কানের কাছটা বেশ ভারি হইয়া আছে। কিন্তু সেদিকে তখন আর বেশীক্ষণ মন দিতে পারিলাম না। কারণ, কয়েক মিনিট পরই হাজারিবাগ-রোড স্টেশনে গাড়ি থামিল।

ট্রেন বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না। কুলি ডাকিয়া জিনিশপত্র লইয়া হুড়মুড় করিয়া নামিয়া পড়িলাম। অনেকেই নামিলেন। হাজারিবাগ-রোড স্টেশন তখন খুব বড় স্টেশন ছিল না। আমাদের সাহেবগঞ্জ স্টেশনের তুলনায় নগণ্য মনে হইল। খোঁজ করিলাম, মোটর কোথায় পাওয়া যাইবে? একজন বলিলেন—'এখানে দিগ্‌বাবুর লাল মোটর পাবেন। ওরাই এখানকার ভাল মোটর কম্পানি।'

স্টেশনের বাহিরে গিয়া সত্যই একটি লাল রং এর মোটর-গাড়ি দেখিলাম। সেখানে গিয়া ড্রাইভারকে বলিলাম, আমি সেণ্ট কলম্বাস কলেজে যাইব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি টিকিটের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমার মালপত্র গাড়ির মাথায় চাপানো হইল। টিকিট কিনিয়া আমি মোটরের ভিতর গিয়া একটি সিট অধিকার করিলাম। দেখিলাম গাড়িতে দুই-একজন মিশনারি সাহেবও উঠিয়াছেন। অনেক বাঙালীও। আমি গায়ে পড়িয়া কাহারও সহিত আলাপ করিতে পারি না। সমস্ত পথটাই চুপ করিয়া রহিলাম। বিকালে, প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি সেণ্ট কলম্বাস কলেজের সামনে গাড়ি দাঁড়াইল। আমি নামিলাম। মিশনারি সাহেবটিও নামিলেন। শুধু নামিলেন না, তিনিও কলেজের গেট দিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। আমিও ঢুকিলাম। হঠাৎ তিনি ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন—'**Are you a new student?**'

বলিলাম—'**Yes.**'

তিনি বলিলেন—'**Come with me.**'

তাঁহার হাতে আমার পরিচয়-পত্রটি দিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া অফিসে লইয়া গেলেন। নর্থ-ব্লকের নীচের তলায় আমার ঘর ঠিক করাই ছিল। সেইখানেই আমি ঢুকিয়া পড়িলাম। সেণ্ট কলম্বাস কলেজ হস্টেলে প্রত্যেকটি ঘরে একজন ছাত্র থাকে। সব রুমই সিংগল-সীটেড। প্রত্যেক ঘরে একটি নম্বর। আমার ঘরের নম্বরটি ভুলিয়া গিয়াছি।

কানে ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। রাত্রে কান কটকট করিতে লাগিল। বাবা আমার সঙ্গে একটি ছোট **Primus Stove** দিয়াছিলেন। সেরকম স্টোভ আজকাল পাওয়া যায় না। ছোট একটি স্টোভ, ছোট একটি বাক্সে প্যাক করা থাকিত। সেই স্টোভটি বাহির করিয়া জল গরম করিলাম। একটা পুরানো কাপড় ছিঁড়িয়া ন্যাকড়া করিয়া কানের গোড়ায় সেঁক দিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ঘরে আলো ছিল না। কারণ যদিও ঘরে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ঠিক এগারোটার সময় আলো নিবিয়া যাইত। স্টোভের আলোতেই বসিয়া কানে

সেঁক দিতেছিলাম। হঠাৎ আমার বন্ধ দুয়ারে টুকটুক করিয়া শব্দ হইল। কবাট খুলিয়া দেখিতে পাইলাম—সেই সাহেবটি দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি আমার ভরতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, ইহার নাম রেভারেণ্ড কেনেডি। ইনি কলেজের অধ্যক্ষ এবং নর্থ-ব্লকের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। স্টোভের শব্দ পাইয়া কবাটে টোকা দিয়াছেন।

'কি ব্যাপার? স্টোভ জ্বেলেছ কেন?'

'কান ব্যথা করছে। সেঁক দিচ্ছি, তাই।'

'ও, আই সি।'

পকেট হইতে টচ বাহির করিয়া আমার কানটা দেখিলেন। তাহার পর নিজের ঘর হইতে আসপিরিন জাতীয় কি একটা বড়ি আনিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিলেন। নিজের ঘর হইতে একটি মোমবাতি আনিয়া সেটি জ্বালিলেন। তাহার পর নিজেই বসিয়া আমার কানে সেঁক দিলেন অনেকক্ষণ। আমাকে ঘুম পাড়াইয়া তবে তিনি গেলেন।

পরদিন অতি ভোরেই হস্টেলের ডাক্তার আশুবাবু আসিয়া হাজির। বলিলেন—'কেনেডি সাহেবের আর্জেণ্ট কলের তাড়ায় এই সকালে আসতে হল আমাকে। কি হয়েছে তোমার?'

বলিলাম—'কানে ব্যথা হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, মিশনারি রেসিডেন্‌শাল হস্টেল, কায়দাকানুন অনেক রকম। প্রত্যহ ভোরে পাঁচটার সময় এবং রাত্রে নয়টার সময় রোল কল হয়। রাত্রে রোল কলের পর কেহ কাহারও ঘরে যাইতে পারে না। রাত্রে এগারোটার সময় ইলেকট্রিক আলো নিবিয়া যায়। কলেজেরই ডায়ানামো। আলোর জন্য শহরের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কলেজের তিনটি ব্লক, প্রত্যেক ব্লকেই একতলা, দোতলা আছে। নর্থ-ব্লক, সাউথ-ব্লক এবং কিংস-ব্লক ছাড়া আর একটি ব্লক আছে। সেটির নাম অ্যানেক্স। কোন ছাত্র অসুস্থ হইয়া পড়িলে সেখানে গিয়া থাকিত। হস্টেলের সামনেই রাস্তা। তাহার পরই খেলিবার প্রকাণ্ড মাঠ। চারদিকে পাহাড়। দূরে যে পাহাড়টি দেখা যাইত, সেটির নাম ছিল কেনেরি পাহাড়। চারদিক খোলা একটা উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে সেণ্ট কলম্বাস কলেজ।

কলেজে মিশনারি সাহেব অধ্যাপক ছিলেন কেনেডি, স্টিভেন্‌সন এবং উইনটার। ফরেস্টার সাহেব ছিলেন তখন মিশনের সর্বময় কর্তা। আগে অঙ্কের অধ্যাপক

ছিলেন তিনি। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন অঙ্কেব অধ্যাপক ছিলেন চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী। বাংলা তিনি পড়াইতেন। কেমিষ্ট্রী পড়াইতেন হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভূদেববাবুর আত্মীয় ছিলেন উনি। ইনিও বি. এ. ক্লাসে বাংলা পড়াইতেন। আমাদের বটানির অধ্যাপক ছিলেন মিস্টার ডি. কে. রায়। একজন বাঙালী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান। বিবাহ করেন নাই। হাতে সর্বদা একটি সিগার থাকিত। অনেকে বলাবলি করিতেন তিনি মদও খান। লোক ছিলেন অতি চমৎকাব। উদ্ভিদ জগতের অনেক আশ্চর্য গল্প বলিতেন আমাদের। তাঁহাব বাড়িতে ছাত্রদেব অবাধ যাতায়াত ছিল। যখনই যাইতাম, নিজে হাতে চা কবিয়া খাওয়াইতেন।

তাঁহার বাড়িতেই আলাপ হইয়াছিল নীবজ মিশ্রেব সঙ্গে। তিনি বি. এ. পড়িতেন। কিংস ব্লক-এ থাকিতেন। চমৎকার মানুষ, হাসি-খুশী, বিনয়-আভিজাত্যের আলোকে মুখখানি সদা সমুজ্জ্বল। সাহেবি পোষাক ছাড়া অন্য পোষাক পরিতেন না। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান ছিলেন। ইঁহার সহিত আলাপ পরে গাঢতব হইয়াছিল। কারণও ছিল ইহার। আমি যদিও তখন সবে ফার্স্ট-ইয়ারে ঢুকিয়াছি, তবু কিছুদিন পরেই ফোর্থ ইয়াবের ভালো ছেলে নীরজবাবু যাচিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কারণ, আমি হস্টেলে আসিবার কয়েকদিন পরই প্রচার হইয়া গেল যে আমি 'বনফুল' নামে 'প্রবাসী'তে কবিতা লিখি। তখন 'প্রবাসী'তে লেখা প্রকাশ হওয়া খুব গৌরবের ব্যাপার ছিল। ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়িল বাংলা ক্লাসে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী আমাদের বাংলা এবং অঙ্ক পড়াইতেন। প্রথম দিন তিনি বাংলা ক্লাসে আসিয়া বলিলেন—'আপনাদের আজ আমি ছুটি দিয়ে দেবো। কারণ, আজ আমি বক্তৃতা দিতে পারব না। শবীর ভালো নয়। আপনাদের একটি essay লিখতে দিচ্ছি। আপনারা কাল সেটি লিখে আনবেন। পদ্যেও লিখে আনতে পারেন। বিষয় হচ্ছে 'গরু', ফুল মার্কস কুড়ি। দেখি আপনারা কে কত পান।'

এই বলিয়া তিনি ক্লাস হইতে চলিয়া গেলেন। আমরা গেলাম নিজেদের নিজেদের ঘরে। হস্টেল আর ক্লাশ-রুম লাগোয়া ছিল। একই বিল্ডিং। আমি ঠিক করিলাম রচনাটি কবিতায় লিখিব। এই কবিতাটি লিখিলাম—

মানুষ তোমায় বেজায় খাটায়,
টানায় তোমায লাঙল গাড়ি
একটু যদি দোষ করেছ—
অমনি পড়ে লাঠির বাড়ি।

আপন জিনিশ বলতে তোমার
নাই ক' কিছুই এ বিশ্বেতে
তোমার বাঁটের দুধ-টুকু তা-ও
বাছুর তোমার পায় না খেতে।
মানুষ তোমার মাংস খাবে,
অস্থি দেবে জমিতে সাবে,
চামড়া দিয়ে পরবে জুতো
বারণ কে তায় করতে পারে!
তোমার পরেই এ অত্যাচার
হে মরতের কল্প-তরু,
কারণ নহ সিংহ কি বাঘ
কারণ তুমি নেহাৎ গরু।

পরের দিন ক্লাসে আমরা চারুবাবুর কাছে খাতা জমা দিলাম। তিনি সেগুলি বাড়ি লইয়া গেলেন। দুইদিন পরে ক্লাসে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—'বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কে? দয়া করে উঠে দাড়ান।'

উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

চারুবাবু বলিলেন—'আপনার রচনাটি সব থেকে ভালো হয়েছে। আমি এক-নম্বরও কাটেনি। কুড়ির মধ্যে কুড়িই দিয়েছি। কবিতাটি চমৎকার হয়েছে।'

কবিতাটি জোরে জোরে পড়িতে লাগিলেন তিনি। তাহার পর বলিলেন—'এ কবিতাটি কাগজে বেরোনো উচিত। আপনি কোনো কাগজে লিখেছেন কখনও? মনে হচ্ছে পাকা হাত।'

আমি খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে সলজ্জে বলিলাম—'আমি মাঝে মাঝে 'বনফুল' ছদ্মনামে 'প্রবাসী'তে লিখি।'

সেইদিনই কথাটা প্রচার হইয়া গেল। অধ্যাপক চারুবাবুর কথা অনুসারে কবিতাটি 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু 'প্রবাসী'র চারুবাবু কবিতাটি ছাপিলেন না। ফেরত দিলেন। কবিতাটি পরে অন্য পত্রিকায় ছাপা হইয়াছিল। বোধহয় 'ভারতী'তে, ঠিক মনে নাই।

আমি যে লেখক এ খবরটি প্রকাশ হওয়ার পর অনেকেই আমার সহিত আলাপ করিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সরোজ আই. এ. পড়িত। নর্থ-ব্লক-এ থাকিত। সে

তখন সাহিত্যচর্চা করিত কি না আমি জানি না। সে আমাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু তাহার সহিত ভাব হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরই নীরজ মিশ্র আমার ঘরে আসিয়া আলাপ করিলেন। বলিলেন—'আপনি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন, আমাকে একটা কবিতা লিখে দেবেন?'

'কি বিষয়ে'?

'বিষয়টা হচ্ছে মানে—'

অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন—'মানে, একটা প্রাইভেট ব্যাপার। আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি। তার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাকে আমি মাঝে মাঝে চিঠি লিখি। ইচ্ছে করে কবিতায় চিঠি লিখি। কিন্তু পারি না। আপনি দেবেন একটা কবিতা লিখে? টুকে পাঠিয়ে দেব—'

নীরজবাবুর অনুরোধ রাখিয়াছিলাম।

বি. এ. পরীক্ষা দিয়া নীরজবাবু হাজারিবাগ ত্যাগ করেন। তাহার পর তাঁহার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। তাঁহার বিবাহের নিমন্ত্রণ অবশ্যই পাইয়াছিলাম। বহুদিন পরে আমি যখন ভাগলপুরে ডাক্তারী করিতেছি—তখন হঠাৎ নীরজবাবুর একটি পত্র পাই আফ্রিকা হইতে। সেখানে তিনি কোনও রেলওয়ে নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত তখন। তাহার পর আর খবর নাই।

আমি খুব মিশুক প্রকৃতির ছেলে ছিলাম না। আগ বাড়াইয়া কাহারও সহিত গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে পারিতাম না। তবু একসঙ্গে থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে অনেকের সহিত আলাপ হইয়া গেল। কয়েকটি নাম মনে পড়িতেছে। বিশ্বেশ্বর রায় (ইহাকে কেন জানি না আমরা 'বিশু-তিশু' বলিয়া ডাকিতাম), রবি ঘোষ, ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য, শচীনবাবু, পার্বতী সেন, সরলেন্দু সেন (আমাদের সময় ম্যাট্রিকে প্রথম স্থান অধিকার করেন)। সরলেন্দুবাবু কাহারও সহিত মিশিতেন না। নিজের ঘরেই নিবদ্ধ থাকিতেন। অতিশয় ভালো ছেলে বলিয়া আমরাও উঁহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিতাম। কিন্তু তাঁহার চেহারায়, স্বল্প কথাবার্তায় এমন একটি আভিজাত্য দেখিয়াছিলাম, যাহার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। তাঁহার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, শেষে তিনি কোথায় যেন জজ হইয়াছিলেন।

আমাদের 'মেসে' আরও কয়েকজনের সহিত আলাপ হইল। অমিয় চক্রবর্তী

এবং প্রমথ রায়ও নর্থ-ব্লকেই থাকিতেন। ইঁহারা কেহই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না বলিয়া ইঁহাদের সহিত আলাপ হইতে দেরি হইয়াছিল। অমিয় চক্রবর্তী ( ইনি পরে রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারি হন ) সাধারণ পর্যায়ের লোক নন। ইঁহাকে একটু অদ্ভুত ধরনের মনে হইয়াছিল। পায়ে সৌখীন নাগরা-জুতো, গায়ে সৌখীন পাঞ্জাবী এবং চাদর তো ছিলই। মুখে পাউডারও মাখিতেন তিনি এবং প্রচুর সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন। পাশ দিয়া যখন চলিয়া যাইতেন, তখন ভুরভুর করিয়া গন্ধ ছাড়িত। মনে পড়িতেছে, একবার মেসের কে একজন তাঁহার সহিত একটু বাড়াবাড়ি রকমের অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া তিনি কিছুদিন মেসে খাইতে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবতী ( আমাদের মেসের চাকর ) তাঁহার ঘরে খাবার দিয়া আসিত। পরে একদিন তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। বুঝিলাম তিনি সাহিত্য-প্রাণ ব্যক্তি। পৃথিবীর যাবতীয় বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। একটা বাক্সে গাদা গাদা চিঠি--পৃথিবীর বড় বড় লেখকদের। জি. বি. এস, মেটারলিংক, রবীন্দ্রনাথ, আরও কত। আমি মফঃস্বলের ছেলে। অবাক হইয়া গেলাম। ভগবতী তখন চা করিতে আসিয়াছিল। তিনি ভগবতীকে বলিলেন — 'কোকো' করো।'

আমি কোকো এর আগে কখনও খাই নাই। সেই প্রথম খাইলাম। কোকোর সহিত দু'একটি দামী বিস্কুটও খাওয়াইলেন। সব বিষয়েই সৌখীন ছিলেন অমিয়বাবু। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া খুবই খুশি হইলাম। তিনি ব্যবহারে খুবই ভদ্র ছিলেন। কিন্তু স্বভাবটা একটু চাপা গোছের ছিল। প্রাণ খুলিয়া মিশিতে হইলে যে মন-খোলা স্বভাব থাকা প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' গোছের ভাব ছিল, স্বাভাবিক মনে হইত না, মনে হইত যেন মুখোশ পরিয়া আছেন। তথাপি তাঁহাকে ভালো লাগিত। প্রায়ই তাঁহার ঘরে গিয়া আড্ডা জমাইতাম, তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির জন্য। ক্রমশই বুঝিতে পারিলাম ইংরাজি সাহিত্যে তাঁহার অনেক পড়াশুনা। আমার পড়াশুনা কম ছিল, তাই তাঁহাকে আমি বরাবর সমীহ করিয়া চলিয়াছি। তাঁহার আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা হুবহু নকল করিয়াছিলেন।

প্রমথ রায়ও একটি আশ্চর্য চরিত্র ছিলেন। প্রায় কাহারও সহিত মিশিতেন না। কথাও খুব কম বলিতেন। প্রায়ই দেখিতাম তাঁহার ঘরের কবাট বন্ধ।

প্যাশনে চশমা পরিতেন। মনে হইত খুব হাই পাওয়ারের লেন্স। চোখের কোণে সামান্য পিচুঁটি প্রায়ই দেখা যাইত। আমার লেখক-খ্যাতির জন্যেই সম্ভবত তাঁহার কাছে আমল পাইয়াছিলাম। লক্ষ্য করিয়াছিলাম ইটালিয়ান সাহিত্যের দিকে তাঁহার খুব রুচি। ইংরাজিতে অনূদিত ইটালিয়ান নভেল নাটক প্রায়ই পড়িতেন। তাঁহার নিকটেই আমি প্রথম দান্নুনজিওর নাম শুনি। তাঁহার লেখা একটা উচ্ছ্বাস-পূর্ণ উপন্যাস পড়িয়াছিলাম। আমার খুব ভালো লাগে নাই। বইটির নামও এখন মনে পড়িতেছে না।

আমাদের অপেক্ষা 'সিনিয়র' অর্থাৎ বি. এ ক্লাসে পড়িতেন এইরকম অনেকের সঙ্গেও ক্রমশ আলাপ হইল। যোগেশদা, জ্যোতিদা, ভবতোষদা, কালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম মনে আছে। অনেকের মুখ মনে আছে, নামটা ভুলিয়াছি। যোগেশদা খুব ভালো বক্তা ছিলেন। ইংরাজিতে খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারিতেন। স্বদেশী ভাবে তাঁহার প্রাণ সর্বদাই পূর্ণ হইয়া থাকিত এবং সুযোগ পাইলেই তাহা তিনি উদগীরণ করিতেন। শুনিয়াছি পরে তিনি উকিল হইয়া খুব নাম করিয়াছিলেন।

ভবতোষ সেন ছিলেন পুরুলিয়ার উকিল শরৎ সেনের ছেলে। খুব মজলিশি এবং খুব আড্ডাবাজ। ভালো খাইতে পারিতেন, ভালো থিয়েটার করিতেন। আমরা একবার 'সাজাহান' থিয়েটার করি। ভবতোষদা 'সুজা' সাজিয়াছিলেন। আর আমি ( অমিয় ) সাজিয়াছিল 'সাজাহান'। সে হস্টেলে থাকিত না। হাজারিবাগ শহর হইতে কলেজে পড়িতে আসিত। আমি সাজিয়াছিলাম 'দারা', নৃপেন সাজিয়াছিল 'নাদিরা' আর সরোজ রায়চৌধুরী 'সিপার।' খুব জমিয়াছিল নাটকটা। নৃপেন আই. এ. পড়িত। হস্টেলেই থাকিত। ভালো ছেলে ছিল। আমাদের সঙ্গে আই. এ. পড়িত এবং হস্টেলে থাকিত, ইহাদের মধ্যে অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি। সন্তোষ সেন ( বাকা ), সলিল দত্ত ( গয়ায় বাড়ি ছিল ), আর একটি ফুটফুটে সুন্দর মুসলমান ছেলে ( নাম লতিফ কি? ঠিক মনে নাই ),—ইহাদের কথা মনে পড়িতেছে। পার্বতীর কথা আগেই লিখিয়াছি।

অতীতের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া যাইতেছি। যে অতীত একদা জীবন্ত, বর্তমান ছিল, তাহা আর জীবন্ত নাই ; তবু তাহাকে সম্পূর্ণ মৃত বলিতেও মন ইতস্তত করিতেছে। যে অতীতকে মন এখন সৃষ্টি করিতেছে—তাহা আমারই

সৃষ্টি—নতুন অতীত, সে জীবন্ত। তাহার আলো-আঁধারির ভিতর হইতে আরও দুইটা নাম এবং মুখ ভাসিয়া উঠিল। গোপা আর পলানডু। গোপা আই. এ পড়িত, আর পলানডু পড়িত আই. এস সি। তাহার পিতৃদত্ত নাম অন্য ছিল (সেটা ভুলিয়াছি), আমরা তাকে পলানডু বলিয়া ডাকিতাম, কারণ রাঁচির কাছে পলানডু গ্রামে তাহার বাড়ি ছিল। আমরা তাহাকে লর্ড অফ পলানডু বলিতাম। যদিও শুনিতে অবিশ্বাস্য মনে হইবে, তবু এটা সত্য কথা যে, পলানডু-র সহিত আমার ছোট ছেলেদের মত হাতাহাতি মারামারি হইত। সে আমাকে কখনও মারিয়া কাবু করিয়া ফেলিত, কখনও আমি ধ্বস্তাইয়া দিতাম।

পলানডু এখন কোথায় জানি না। গোপা যতদূর মনে পড়িতেছে, আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়িত। আমি যখন সেকেণ্ড-ইয়ারের ছাত্র, তখন সে ফাস্ট-ইয়ারে আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। গোপা কেন জানি না, আমার ঢিলেঢালা অগোছাল ভাব সহ্য করতে পারিত না। আমার বিছানা কোঁচকানো, বালিস দোমড়ানো, আমার পড়িবার টেবিল এলোমেলো, আমার সেল্‌ফে বইগুলি যথাস্থানে রাখা নেই, হয় বিছানায় না হয় টেবিলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, আমার মাথার চুলে চিরুণি পড়িত না, কারণ আমার আয়না-চিরুণি কিছুই ছিল না। গোপা এসব সহ্য করিতে পারিত না। নিজে হাতে সে আমার বিছানা করিয়া দিত, ঘর গুছাইয়া দিত, মাথার চুলও আঁচড়াইয়া দিত মাঝে মাঝে। আমার প্রতি তাঁহার এই অহেতুক ভালোবাসা যেন একটা অজানা অমরাবতীর আলোর মত আমার জীবনে পড়িয়াছিল। সে আলো এখন আর নাই। গোপার ভালো নাম ছিল অমিয়। ডালটনগঞ্জে বাড়ি ছিল তাহার। অনেক পরে—যখন আমি ভাগলপুরে ডাক্তারী করি, তখন সে সস্ত্রীক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। ডালটনগঞ্জের নামজাদা উকিল হইয়াছিল সে। এম. এস. এ-ও হইয়াছিল। দশাসই চেহারা, গম্ভীর অমিয়র মধ্যে আমার সেই গোপাকে আর দেখিতে পাইলাম না। শুনিয়াছি, কিছুদিন আগে সে মারা গিয়াছে।

আমাদের কলেজ যদিও রেসিডেন্‌শাল কলেজ ছিল, তবু হাজারিবাগ শহর হইতে অনেক 'পে স্কলার' ( **Pay Scholar** ) পড়িতে আসিত। তাহাদের মধ্যে মোটা প্রফুল্ল, অমিয় ( যে সাজাহান সাজিয়াছিল ) এবং ফণীকে মনে পড়িতেছে। ফণী খুব ভালো ফুটবল খেলিত। মোটা প্রফুল্লও। যতদূর মনে পড়িতেছে 'হকি'ও খেলিত ইহারা। 'কেনেডি' সাহেব চলিয়া গিয়াছিলেন। আসিয়াছিলেন 'কার' সাহেব। তিনিও ভালো হকি খেলোয়াড় ছিলেন।

এইবার আমাদের কলেজের আর হস্টেলের কথা কিছু লিখি। আমাদের কলেজ আর হস্টেল একই বাড়িতে ছিল তাহা আগে বলিয়াছি। কলেজের ভিতর ছিল 'হুইট্‌লে হল'। প্রকাণ্ড হল। সেখানে বাইবেল-ক্লাস হইত। অন্য ক্লাসেও হইত। মাঝে মাঝে বাহিরের অধ্যাপকরা আসিয়া এখানে বক্তৃতাও দিতেন। সেখানেই অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। ইতিহাসের অধ্যাপক জ্ঞানবাবুও মানবের অতীত লইয়া একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমার মনে 'স্থাবর' লিখিবার কল্পনা প্রথম অঙ্কুরিত হয়। মনে হইয়াছিল, অতীতের এই মানব-সমাজ যেন রূপকথার দেশের সমাজ। সে রূপকথা কি লেখায় মূর্ত করিতে পারিব? সে সময় হইতেই নৃতত্ত্ব-বিষয়ক বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম। প্রফেসর ডি. কে. রায় মাঝে মাঝে উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। হাজারিবাগে তখন একপ্রকার কীটভুক ছোট ছোট শাকের মত গাছ পাওয়া যাইত। যতদূর মনে পড়ে পাতাগুলি ছিল লালচে ধরনের। পাতার উপর অনেক শোঁয়ার মত থাকিত। একরকম আঁঠার মত জিনিস পাতার উপর ক্ষরিত হইত। মনে হইত যেন, মধু লাগিয়া আছে। কোনো পোকা তাহার উপর বসিলে তাহার পা জড়াইয়া যাইত। আর সে পলাইয়া যাইতে পারিত না। তাহার পর পাতাটি আস্তে আস্তে মুড়িয়া বন্দী করিয়া ফেলিত তাহাকে। অবশেষে জীর্ণ করিয়া ফেলিত। প্রফেসর টি রায় বক্তৃতার সময় এই গাছ এবং লজ্জাবতী লতা আনিয়া আমাদের দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল হাজারিবাগের আশেপাশের গাছপালা। হাজারিবাগেই আমি প্রথম ইউ-ক্যালিপ্‌টাস গাছ দেখি। শাল গাছও। হুইট্‌লে হলের এই বক্তৃতাগুলির নাম ছিল —এক্সটেন্‌শন লেক্‌চারস। এগুলি খুবই ভালো লাগিত। অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন গণিতজ্ঞ। একসময় হাজারিবাগ কলেজেই অঙ্ক পড়াইতেন। কিন্তু আমাদের সময় তিনি বক্তৃতা দিতেন দর্শন বিষয়ে। তাঁহার বক্তৃতার সবটা বুঝিবার মত বিদ্যা তখন ছিল না। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা মনে স্বপ্ন জাগাইত।

সে সময় আমি একটা হাস্যকর কাজ করিয়াছিলাম। দুইটি ছোট টবে দুইটি ছোট ছোট গাছ পুঁতিয়াছিলাম আমার ঘরে। একটি লজ্জাবতী লতা আর একটি কীটভুক গাছ। লজ্জাবতী লতার পাতা ছুঁলেই সে সমস্ত পাতা মুড়িয়া লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। দেখিতে বেশ লাগিত গাছটি। সকলেই আসিয়া একবার ছুঁইত তাহাকে। ক্রমশ দেখিলাম, সে নির্লজ্জ হইয়া গেল। ছুঁইলেও আর পাতা মুড়িয়া ঘোমটা দিত না। অনেকদিন বাঁচিয়াছিল আমার ঘরে। কীটভুক

গাছও কিন্তু বেশিদিন বাঁচে নাই। আমার ঘরে বেশী কাট আসিত না। মাঝে মাঝে পিঁপড়া ধরিয়া দিতাম। কিন্তু পিঁপড়া তাহার সহ্য হইল না বোধহয়। কিছুকাল পরে মরিয়া গেল।

আমাদের চারটি 'মেস' ছিল। অর্থাৎ সবাই আমরা একসঙ্গে থাকিতাম না। হিন্দু মেস দুইটি। একটি কন্‌জারভেটিভ অর্থাৎ গোঁড়াদের জন্য। এটির বিশেষত্ব, এ মেসে মুরগীর মাংস বা মুরগীর ডিম রান্না হইত না। পাঁঠার মাংস, বড় জোর ভেঁড়ার মাংস চলিত। এইখানেই একেবারে নিরামিষাশীদের জন্যেও ব্যবস্থা ছিল। ইহারা আলুর দম এবং ছানার ডালনা খাইতেন। দ্বিতীয় হিন্দু মেসটি ছিল লিবারেল, হিন্দু ছাত্রদের জন্য। ইহাতে মুরগী, মাটন সবই চলিত। গোমাংস চলিত না। ইহা ছাড়া ছিল মুসলমানদের মেস, এবং ক্রিস্টানদের মেস। এখানে সম্ভবত সবই চলিত। যে কোন ছাত্র যে কোন মেসের মেম্বার হইতে পারিত নিজের রুচি ও সংস্কার অনুসারে। আমি হিন্দু কন্‌জারভেটিভ মেসের মেম্বার হইলাম। হাজারিবাগে ভালো মাছ পাওয়া যাইত না। তরিতরকারীও তেমন প্রচুর ছিল না। আমি প্রত্যহ মাছ খাইতে অভ্যস্ত। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধাই হইত। ডাল, আলুর দম, ছানার ডালনা দিয়া মাছের অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন ম্যানেজার। আমাদের ভিতর হইতেই প্রতি মাসে ভোট দিয়া একজন ম্যানেজার নির্বাচিত হইতেন। বয়োঃজ্যেষ্ঠ সিনিয়ার ছাত্ররাই নির্বাচিত হইতেন। জ্যোতি-দাদাকেই আমরা প্রায়ই নির্বাচিত করিতাম।

আমাদের কলেজে নিয়ম ছিল, প্রতি মাসে বেতনের সহিত মেসের খরচের মাথা পিছু ১৪ টাকা করিয়া কলেজের অফিসে জমা দিতে হইত। যিনি যে মাসে ম্যানেজার হইতেন, তিনি কলেজের অফিস হইতে প্রতি সপ্তাহের খরচের জন্য টাকা লইয়া আসিতেন। সে টাকার হিসাব তাঁহাকে রাখিতে হইত এবং মাসের শেষে সে হিসাব কলেজের প্রিন্সিপালকে বুঝাইয়া দিতে হইত। যদি কোন মাসে ১৪ টাকার কম খরচ পড়িত আমরা বাকি টাকা ফেরত পাইতাম। খরচ বেশী পড়িলে বেশী টাকাটা আমাদের পরের মাসে জমা দিতে হইত। প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। আমি একবার ম্যানেজার ছিলাম। মাছ দুর্লভ, তরকারিও পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যহই আমি 'শালন' আনাইতাম। ওখানে মাংসকে 'শালন' বলিত। অন্তত আমাদের ভগবতী এবং টহল নামক চাকর দুইটি মাংসকে 'শালন' বলিত। সে মাসে খরচ পড়িয়া গেল মাথাপিছু ১৮ টাকা করিয়া।

জ্যোতিদাদা একটু কষ্ট হইযাছিলেন। তিনি বলিলেন—'বলাই, তুমি আমাদেব বাঘ বানাবে নাকি? বোজ মাংস খাওযাচ্ছ?'

আমি উত্তব দিলাম—'হাজাবিবাগে এসেছি। বাঘেব কাছাকাছি কিছু একটা তো হওয়া উচিত।'

সবচেয়ে মুশকিলে পডিলাম কিন্তু প্রিন্সিপাল 'কাব' সাহেবের কাছে হিসাব দিতে গিয়া। তিনি আমাব গা টিপিযা টিপিযা দেখিলেন, তাহাব পব বলিলেন—'এত মাংস খেয়েছো কিন্তু মোটা তো হওনি। তেমনি বোগাই আছো। তুমি বুঝি মাংস খুব ভালবাসো?'

বলিলাম—'মাছ, তবি-তবকাবি, কিছুই তো পাওযা যায না, তাই মাংস দিয়ে সে অভাব পূরণ কবছি।'

'কার' সাহেব বলিলেন—'অলবাইট, এবার হিসাবটা দেখি।'

দেখিলাম, প্রতিদিন কি দবে কোন জিনিশ বাজাবে বিক্রয হয তাহাব একটা ফর্দ তাঁহাব কাছে আছে। সেটা হইতে মিলাইযা মিলাইযা তিনি তিরিশ দিনেব হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন। দেখিযা সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—'তোমাদেব তরি-তরকারীব অভাবে বড কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা, আমি এব ব্যবস্থা কবছি।'

পরের দিন তিনি আমাদেব মেসে আসিযা হাজিব হইলেন। আমাদেব মেসের সামনে খানিকটা পডতি জমি ছিল, আব তাহাব পাশে ছিল একটা ইঁদারা। 'কার' সাহেব বলিলেন—এই জমি খুঁডিযা আমবা সবজি বাগান তৈয়াবি করিব। জমিটা খুঁড়িয়া, উহাব উপর সাব ফেলিলে ভালো ফসল ফলিবে। সারের ব্যবস্থাও আমি কবিয়াছি। জমিটা খুঁডিযা আগে ইট-পাটকেল বাছিযা ফেলিতে হইবে। আমি তোমাদেব সহিত প্রত্যহ জমি খুঁডিব—বিকাল পাঁচটা হইতে। তোমরা কে কবে আমাব সহিত বসিবে ঠিক কবিযা লও। অন্তত ছ-জন করিয়া প্রত্যহ কাজ না কবিলে এখানি জমি এক সপ্তাহের মধ্যে কোপানো যাইবে না। আমি রোজ থাকিব। তোমবা পাঁচজন কবিযা থাকিবে। কে কে কবে থাকিবে তাহাব একটা তালিকা আমার আফিসে পাঠাইয়া দাও। আমি আফিসেব নোটিশ-বোর্ডে টাইপ করিযা টাঙাইয়া দিবো।

দিন দুই পর হইতেই কাজ আবম্ভ হইয়া গেল। কার সাহেব ছ্যটা কোদাল লইয়া যথাসময়ে মাঠে দেখা দিলেন। ইতিপূর্বে কার সাহেব কোদাল চালান নাই। আমরাও না। একটা মালীব নিকট হইতে আমরা শিক্ষা লাভ কবিলাম, কিভাবে কোদাল চালাইতে হইবে। আমবা সকলেই একটু-আধটু প্রথম

হইলাম, কার সাহেবও। তিনি কিন্তু থামিলেন না, আমাদেরও থামিতে দিলেন না। মাঠটা সম্পূর্ণ খোঁড়া হইল। ইঁট-পাথর বাছা হইল। তাহার পর শাক-সবজির বিচি এবং চারা পোঁতা হইল। এইবার ইঁদারা হইতে জল-সেচন করিবার পালা। টোমাটো, ভিন্‌ডি, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লেটুস শাক, পালং শাকের গাছগুলির চারপাশে ছোট ছোট নালী তৈয়ারী করা হইল। ইঁদারার গায়েও বেশ প্রশস্ত একটা নালী করাই ছিল। ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া সেই নালীতে ঢালিলে আমাদের বাগানের প্রতি গাছের গোড়ায় সে জল যাইবে। কিন্তু ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া সেই নালীতে ঢালা সহজ ছিল না। ইঁদারার উপর প্রকাণ্ড একটি বাঁশের একপ্রান্তে দড়ি দিয়া বাঁধা এমন একটি বালতি ছিল যাহার নিম্নভাগে সূচোল (**conical**), তাহা কোথাও বসানো যায় না। বাঁশের আর একপ্রান্তে বাঁধা একটি ভারী ওজন। ওখানে সবাই উহাকে 'লাট' বলিত। মালীরা সাধারণত সেই লাটের সাহায্যে জল তুলিয়া বালতিটি বড় নালীর উপর বসাইয়া দিত। কিন্তু তাহা বসিত না। সঙ্গে সঙ্গে কাত হইয়া যাইত এবং সমস্ত জলটা নালীর ভিতর গিয়া পড়িত। আমরা এ কৌশলে জল তুলিতে পারিতাম না। আমি তো আর একটু হইলেই উহার ভিতর পড়িয়া যাইতাম! মালী বলিল--আমি বাবু রোজ আপনাদের বাগানে জল 'পটাইব' (সেচ করিয়া দিব), আপনারা মাসে আমাকে কিছু বেতন দিবেন।

কার সাহেব উহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন--আমরা নিজেরাই সেচ করিব। বাহিরের কোন সাহায্য লইব না। তোমরা যদি জল তুলিতে না পারো, আমি নিজেই তুলিব। অবশ্য জল তোলার কায়দাটা আমাকে মালীর নিকট শিখিয়া লইতে হইবে।

কার সাহেব আইরিশ ছিলেন। জিদি একগুঁয়ে লোক। অনেকবার ভুল করিয়া, অনেকবার অন্য জায়গায় জল ঢালিয়া, অনেকবার কুয়ায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়া অবশেষে তিনি ঠিকমত জল তুলিতে সক্ষম হইলেন এবং পঞ্চাশ বালতি জল ঠিক মত তুলিয়া আমাদের বাগান ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন—এখন সাতদিন আর জল দিব না। **Poor plants have been flooded.**

প্রচুর তরিতরকারি ফলিয়াছিল। আমরাই শুধু খাই নাই, বিতরণ করিয়াছিলাম, বিক্রিও করিয়াছিলাম কিছু।

আমাদের প্রিন্সিপাল কার সাহেব একটি অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন। যাদের হোস্টেলের নিয়ম ছিল সকালে ভোর পাঁচটায় এবং প্রত্যহ রাত্রি ন-টায়

রোলকল হইত। নর্থ-ব্লকে যতদিন ছিলাম, ততদিন মিঃ কচ্ছব আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আদিবাসী ক্রিশ্চান ভদ্রলোক। অতিশয় ভালোমানুষ। কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন না। আমি প্রায়ই অত ভোরে উঠিয়া সকালের রোলকলে যাইতে পারিতাম না। তিনি দুই একদিন আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতেন—রোলকলে না যাওয়াটা বে-আইনী। আমি বলিতাম—আমি উঠিতে পারি না, কি করিয়া যাইব। তিনি বলিতেন—বেশ, উঠিবামাত্র আমার সহিত গিয়া দেখা করিবে।

এইভাবেই চলিতেছিল। এমন সময়ে কিংস-ব্লকে একটি ভালো ঘর খালি হইল। ঘরটি দোতলায়। জানলা দিয়া পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায়। ঘরটি পাইবার জন্য আমি দরখাস্ত করিলাম। এবং ভাগ্যক্রমে পাইয়াও গেলাম। কিংস-ব্লকের সুপারিনণ্টেণ্ডেণ্ট তখন ছিলেন 'কার' সাহেব। যখন রুমটি পাইলাম, তখনও বুঝি নাই যে, কি ভীষণ খপ্পরে পড়িয়াছি। তখন শীতকাল। ঘোর শীত। ঠিক পাঁচটার সময় যথারীতি অনুপস্থিত হইতে লাগিলাম। তৃতীয় দিন কার সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি মর্ণিং রোলকলে থাক না কেন? That's bad. I shall not tolerate it.

আমি বলিলাম, সার, মর্ণিং রোলকল মর্ণিংয়ে হওয়া উচিত। আপনি মর্ণিং রোলকল করেন গভীর রাত্রে। তখন চারিদিকে অন্ধকার। আমি ঘুমাইয়া থাকি। রোলকলের ঘণ্টা শুনিতে পাই না।

কার সাহেব কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—বেশ, তুমি তোমার ঘরের কবাট খুলিয়া রাখিও, আমি যথাসময়ে উঠাইয়া দিব।

পরদিন, তখন বোধ হয় ভোর চারটে। কার সাহেব আসিয়া আমার লেপ ধরিয়া টান দিলেন—It is time now, get up, get up.

দেখি, তিনি দাড়িতে সাবান লাগাইতে লাগাইতে আসিয়াছেন। রোজ ভোরে উঠিয়া তিনি কামান। আমি বলিলাম—Yes Sir, I am getting up.

কার সাহেব নিজের ঘরে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু আমি উঠিতাম না, আবার ঘুমাইয়া পড়িতাম। কার সাহেব কামাইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেন এবং আমার লেপটা কাড়িয়া লইতেন। নিজে দাঁড়াইয়া আমার চোখে-মুখে জল দেওয়াইতেন। তাহার পর আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার ঘরের সম্মুখে লইয়া যাইতেন। তাঁহার ঘরের সম্মুখেই রোলকল হইত। দিন দশেক পরে আমার আপনিই ঘুম ভাঙিয়া

যাইত। কার সাহেব আসিয়া দেখিতেন আমি মুখ ধুইয়া বসিয়া আছি। হাসিয়া হাসিয়া বলিতেন Good, good, very good.

হোস্টেলের নিয়ম ছিল নটার পর কেহ কাহারও ঘরে যাইতে পারিবে না। একটা নিয়ম থাকিলেই সেটা ভাঙিবার প্রবৃত্তি হয়। আমরাও লুকাইয়া প্রয়োজন-বোধে একে অন্যের ঘরে যাইতাম। অনেক সময় দু'জন একঘরে বসিয়া পড়াশুনাও করিতাম ঘরে খিল দিয়া। সলিল দত্ত প্রায়ই আমার ঘরে পড়িবার জন্য আসিত। আমি জোরে জোরে পড়িতাম, সে বসিয়া শুনিত। একদিন বিপদে পড়িয়া গেলাম। সলিল তখন আমার ছোট প্রাইমাস স্টোভটি ধরাইয়া চায়ের জল চড়াইয়াছে। রাত্রি প্রায় দশটা। পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইলে আমরা রাত দশটা নাগাদ এক-কাপ করিয়া চা পান করিয়া 'ইস্টিম' করিয়া লইতাম। হঠাৎ আমার দুয়ারে খুটখুট করিয়া কড়া নড়িল। বুঝিলাম, কার সাহেব স্টোভের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আমার ঘরের সামনে থামিয়াছেন। তিনি 'রবার-সোল' জুতা পায়ে দিয়া সারা হোস্টেলের বারান্দায় বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তখন শীতকাল, আমি সলিলকে ইঙ্গিত করিলাম—তুই বিছানায় শুয়ে পড়। সে শুইবামাত্র তাহার উপর লেপ, কম্বল সব চাপাইয়া দিলাম। তাহার পর কবাট খুলিলাম। দেখিলাম কার সাহেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। বলিলেন—চা চড়াইয়াছ নাকি? আমাকেও এক কাপ দাও।

আমার বিছানায় আসিয়া বসিলেন এবং মাঝে মাঝে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে স্তূপীকৃত লেপ-কম্বলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু সেগুলি তুলিবার চেষ্টা করিলেন না। কিংবা সে সম্বন্ধে কিছু বলিলেনও না। আমার অস্বস্তি হইতে লাগিল, সলিলটা দম বন্ধ হইয়া মারা না যায়। কার সাহেবকে এক কাপ চা করিয়া দিলাম। চা-পান করিয়া খুশি হইলেন সাহেব। কোথা হইতে চা কিনি জানিতে চাহিলেন। পড়াশুনা কেমন হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। মোট কথা, আমার ঘরে প্রায় মিনিট পনেরো-কুড়ি রহিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—কোন বন্ধুর সহিত তুমি যদি পড়িতে চাও, আমার কাছে একটা দরখাস্ত দিও। আমি দরখাস্ত মঞ্জুর করিব।

কার সাহেব সম্বন্ধে আর একটি গল্প মনে পড়িল। আমি একটা ক্লাশ সারিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছি, কার সাহেব সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছেন বাইবেল ক্লাস লইবার জন্য। আমাদের সকলকেই বাইবেল ক্লাসে যাইতে হইত। নিয়ম

ছিল ৫০% লেকচার শুনিতেই হইবে। না শুনিলে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে দিবেন না কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আমাকে দেখিয়া কার সাহেব প্রশ্ন করিলেন—তুমি চলে আসছ যে? বাইবেল-ক্লাসে যাবে না? আমি বলিলাম—না। আমার ৫০% হয়ে গেছে। এর পরই আমার কেমিস্ট্রি প্যাকটিক্যাল ক্লাস—আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই।

কার সাহেব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—তুমি কেবল পারসেনটেজের জন্য বাইবেল ক্লাসে যাও? **Have you no love for Bible?**

বলিলাম—লাভ যথেষ্ট আছে। আমি দু-বার বাইবেল পড়েছি।

'বেশ আমি আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার ঘরে গিয়ে দেখব তোমার বাইবেল বিদ্যার দৌড় কতদূর?' সেদিন ঠিক সন্ধ্যায় কার সাহেব আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। **New Tastament** সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু আমাকে ঠেকাইতে পারিলেন না। বাইবেলটা তখন আমার ভালোই পড়া ছিল। খুশী হইয়া কার সাহেব বলিলেন—তোমাকে বাইবেল ক্লাসে যাইতে হইবে না। তোমাকে আমি একটা বই উপহার দিচ্ছি। নিজের ঘরে গিয়া তিনি ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট বইটি আনিয়া আমাকে উপহার দিলেন। আমি বলিলাম—ধন্যবাদ স্যার। আমি কিন্তু আপনার ক্লাসে যেতে রাজি আছি, যদি আপনি আপনার ক্লাসে পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য, জরথুষ্ট্র, মহম্মদ—কার সাহেব হাসিয়া উত্তর দিলেন—বাইবেল ক্লাসে তাহা করা সম্ভব নয়।

কার সাহেবের আর একটি গল্প। কোনও উৎসব উপলক্ষে কার সাহেব হোষ্টেলের প্রায় সব ছেলেকে তাঁহার মিশনে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গেলাম। গিয়া দেখি সবই সাহেবী বন্দোবস্ত। টেবিলে কাঁটা-চামচ দিয়া খাইতে হইবে। আবি কাঁটা-চামচ দিয়া কখনও খাই নাই। অনেকে খাইতে বসিল। আমি চলিয়া আসিলাম। পরদিন কার সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে কাল দেখিনি তো। যাওনি না কি?' বলিলাম 'গিয়াছিলাম। কিন্তু কাঁটা-চামচে খেতে আমি জানি না। তাই চলে এলাম। আমার আশ্চর্য লাগছে, আপনি ভারতীয় ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করে সাহেবী ধরনের ব্যবস্থা করেছেন কেন?'

কার সাহেব হাসিয়া বলিলেন—**I am so sorry.** কাল আবার তুমি এসো মিশনে। **Indian** ব্যবস্থা থাকবে।

গেলাম। ভারতীয় রীতিতেই ভাত রুটি এবং মাংসের ব্যবস্থা ছিল।

কার সাহেবের আর একটি গল্প।

তখন হাজারীবাগ অঞ্চলে খুব কলেরা এপিডেমিক হইয়াছিল। হাজারীবাগ শহরের কাছাকাছি অনেক গ্রামে বহু লোক মারা যাইতেছিল। মিশনারি সাহেব-মেমেরা চারিদিক ভলান্টিয়ার হইয়া রোগীদের সেবা, তাহাদের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া, চতুর্দিক ঔষধ ছিটাইয়া ডিস্‌ইনফেক্ট করা, কুয়ার মধ্যে **potassiam permanganate** দেওয়া প্রভৃতি কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একদিন নোটিশ-বোর্ডে একটি নোটিশ দেখিলাম—হস্টেলের কোন ছেলে যদি ভলান্টিয়ারের কাজ করিতে চায় সে যেন প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে। আমি গেলাম। কার সাহেব বলিলেন—তুমি আগে তোমার বাবার নিকট হইতে অনুমতি নাও। তিনি যদি আপত্তি না করেন তাহা হইলে তোমাকে ভলান্টিয়ারের দলে ভর্তি করিয়া লইব। বাবাকে চিঠি লিখিলাম। তিনি আপত্তি করিলেন না। কেবল লিখিলেন বাইরের কোন জিনিশ খাইও না এবং কার্বলিক সোপ দিয়া গরম জলে হাত ধুইয়া বাড়ি আসিবে। বাড়িতেও ফুটানো জল খাইবে এবং ঠাণ্ডা জিনিশ একেবারে খাইবে না।

কার সাহেব আমাকে ভলান্টিয়ার করিয়া লইলেন। কার সাহেব সাইকেল করিয়া যাইতেন, আমি তাহার পিছোন দিকে পিনের উপর পা রাখিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

প্রথম দিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। ফাঁকা জায়গায় একটি কুটিরের সামনে আসিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। কুটিরের দ্বার এত ছোট যে হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিতে হয়। কার সাহেব ঢুকিয়া গেলেন। তারপর আমিও তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। ভিতরে ঘোর অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। কার সাহেব টর্চ জ্বালিলেন। দেখিলাম কয়েকটি শূকর রহিয়াছে। আর ঘরের একধারে একটা লোক শুইয়া আছে। মনে হইল তাঁহার চোখে ঠুলি বা গগলস্ জাতীয় চশমা রহিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙিল। কার সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার মুখে বাতাস দিতেই ভনভন করিয়া মাছি উড়িয়া গেল। কোটরগত চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। কার সাহেব লোকটিকে কোলে করিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। আমি বলিলাম ইহারা কি জঘন্য ভাবে থাকে। কার সাহেব বলিলেন—**Remember my boy, your country lives in these huts and not in palaces.**

কার সাহেব তাহাকে কাঁধে করিয়া হাসপাতালে লইয়া গেলেন। আমি চারিদিকে ফিনাইল ছিটাইতে লাগিলাম।

ও অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেকেই খৃস্টধর্ম বরণ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহাদের বিপদ-আপদের সময় আমরা গিয়া দাঁড়াই না। খৃস্টান মিশনারীরা গিয়া দাঁড়ান। আমরা আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র ছুঁৎমার্গ লইয়া আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বা বৈঠকখানায় বসিয়া হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন যতদিন হইতে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন ততদিন হইতে বোধহয় ধর্মান্তরিত লোকের সংখ্যা কমিয়াছে। সেবা-যত্ন ভালো-বাসাই লোককে আপন করে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং কুসংস্কার আমাদের ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু করিতেছে। বর্তমানে জাতি-ভেদের সাবেক রূপ আর নাই। এখন নতুন রকম জাতি-ভেদ। আজকাল আর্থিক মানদণ্ডেই নতুন নতুন জাতির সৃষ্টি হইতেছে। এই কাঞ্চন-কৌলিন্য লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং শুদ্রেরা চুরি ডাকাতি অথবা ভোটের শরণাপন্ন হইতেছে। এখন শিক্ষা, সাহিত্য, গণতন্ত্র, সবই টাকার মাপে এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের মাপে নির্দিষ্ট হইতেছে। প্রগতির নামে নতুন দুর্গতি আমাদের কোন রসাতলের দিকে যে লইয়া যাইতেছে জানি না, আমরা এখনও একজাতি এক প্রাণ হইতে পারি নাই। আশঙ্কা হয় এই সুড়ঙ্গ পথে আসিয়া আবার কোনও বিদেশী শত্রু না হানা দেয়। দেশে বিশ্বাসঘাতকের তো অভাব নাই।

অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। এবার হাজারিবাগের কথায় ফিরিয়া যাই। হাজারিবাগে আমাদের ইংলিশ পোয়ট্রি পড়াইতেন 'স্টিভেনসন্' সাহেব। টেনিশন আমাদের পাঠ্য ছিল। প্রথম প্রায় তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতাম না। পরে সরগড় হইয়া গেল। তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনও মনে আছে। চোখের দুইপাশে ত্যাডচা ভাবে দুই দিকে গোঁফ রাখিয়াছিলেন তিনি। একদিন কৌতূহল-বশতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আসল গোঁফ কামাইয়া তিনি চোখের পাশে গোঁফ রাখিয়াছেন কেন? তিনি বলিলেন, আমার দাড়ি প্রায় চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই জন্যেই দাড়ির সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছি! তাহা না হইলে আমার চোখ ঢাকিয়া যাইবে। কারণ যাই হোক তাহার এই নতুন রকমের গোঁফের জন্য তাহাকে আমি মনে মনে বেশী খাতির করিতাম। পণ্ডিত লোক ছিলেন তিনি। ইংরাজি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সমালোচক 'স্টপ্‌ফোর্ড এ ব্রুক'-এর সন্ধান তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।

আমাদের কলেজে যে লাইব্রেরী ছিল সেটি আমার খুব কাজে লাগিয়াছিল। অনেক ভালো বই পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমাদের ইংরাজি প্রোজ পড়াইতেন, বৃদ্ধ একজন প্রফেসর। নাম প্রফেসর নন্দী। সেকালের গুরু মশাই-এর মত ছিলেন তিনি। ক্লাসময় বেড়াইয়া বেড়াইয়া পড়াইতেন তিনি। প্রত্যেক ছেলের পিছোনে গিয়া দাঁড়াইতেন। বই-এর শক্ত জায়গায় 'আণ্ডারলাইন' করিয়া মানে লিখিয়া দিতেন। সব শেষে যতটা পড়ানো হইত তাহার 'সামারি' রোজ লিখিয়া দিতেন, প্রত্যেক ছেলের পাতায়। কলেজের কাছেই কোয়ার্টার্স ছিল তাঁহার। বাড়ি গেলে খুব খুসী হইতেন। খৃস্টান ছিলেন তিনি। তার কাছে আমরা **Vicar of Wakefield** এবং **Helps' Essays** পড়িয়াছিলাম। তিনিই আমাকে প্রথমে টলস্টয়ের বই পড়িতে বলেন। প্রথমবার **War and Peace** সেই সময়েই পড়ি। তাহার পর আরও দুইবার পড়িয়াছি। **Victor Hugo**-র সাহিত্যের পরিচয় সেই সময় হইযাছিল। অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দেশে আরও কয়েকজন ইংরেজ কবি যেমন **Wordsworth** এবং **Burns**-এর কবিতা কিছু কিছু পড়িতে চেষ্টা করি তখন। মিল্টন পড়িবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কিন্তু দন্তস্ফুট করিতে পারি নাই। **Shakespeare**-ও তখন ভালো বুঝিতে পারি নাই। সাহেবদের নোটওয়ালা বই—যেমন 'চেরিটি' বাঙালী ছেলেদের খুব সহায়ক ছিল না। পরে বাঙালী প্রফেসরের লেখা ( **Prof. Banerji, Prof. Sen** ) বিশদ নোট-সমষ্টি শেক্‌সপীয়র পড়িয়া বুঝিয়াছি।

আমাদের কেমিস্ট্রি পড়াইতেন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহারও সাহিত্যের দিকে প্রবণতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়া তাহার কি যেন সম্পর্ক ছিল একটা। তিনি বি.এ ক্লাশে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পড়াইতেন। আমাকে তাঁহার ক্লাসে যাইবার জন্য মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিতেন। আমি কবিতা লিখিতে পারি বলিয়া আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন তিনি। ভালোবাসিতেন খুব। 'সায়েন্স-ব্লকে' তাঁহার আহ্বানে প্রায়ই যাইতে হইত। হাজারিবাগে তখন ফিজিক্স পড়ানো হইত না। আমরা 'কেমিস্ট্রি', 'ম্যাথামেটিকস', এবং 'বটানি' লইয়া আই. এস. সি. পড়িয়াছিলাম। 'বটানি'র প্রফেসর মিঃ ডি. কে রায়ের কথা আগেই বলিয়াছি।

চারুবাবু আমাদের বাংলা পড়াইতেন, অঙ্ক শেখাইতেন। একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। গলাবন্ধ কোট গায়ে দিয়া, কাপড় পরিয়া কলেজে

আসিতেন। পায়ে থাকিত অতি সাধারণ একটা ক্যামবিসের জুতো। বৃষ্টি পড়িলে খালি পায়ে আসিতেন।

একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন খুব বৃষ্টি। আমরা সবাই ক্লাশে বসিয়া আছি। চারুবাবু আসেন নাই। তিনি শহরে থাকিতেন। লাল মোটর কম্পানির মালিক দিগ্‌বাবু তাহার আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার বাড়িতেই তিনি থাকিতেন। রোজ হাঁটিয়া কলেজে আসিতেন। সেদিন তুমুল বৃষ্টি। আমরা ভাবিলাম তিনি বুঝি আসিবেন না। কিন্তু একটু পরে আপাদমস্তক ভিজিয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—আপনারা আকাশের নীলজটা দেখছেন, আমি কিন্তু দেখবার অবসর পেলাম না। বৃষ্টির ভিতর আকাশের নীলজটা দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

আমরা ছুটিয়া তাহার জন্য কাপড় আনিয়া দিলাম। বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি কাপড় ছাড়িলেন। জামা পরিলেন না। খালি গায়ে আসিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। একটা কথা বলিয়াছিলেন, আজও মনে আছে। বলিয়াছিলেন, কোন শক্ত অঙ্ক যদি কষতে না পারো উপোষ আরম্ভ করে দিও, যতক্ষণ না অঙ্কটা হয় উপোষ করে থেকো। দেখো, অঙ্ক ঠিক মিলে যাবে। মাঝে মাঝে তিনি আমার ঘরে গিয়া হাজির হইতেন।—বলিতেন, নতুন কি কবিতা লিখেছ, দেখাও।

তখন আমার কবিতার একটা খাতা ছিল বটে, কিন্তু প্রায় সকল কবিতা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সে সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান নাটকের একটি গান বেশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আমি এসেছি, এসেছি এসেছি বঁধু হে, নিয়ে এই হাসি-রূপ গান। সে সময় আমাদের কলেজে ইতিহাস পরীক্ষা চলিতেছিল। আমি এই গানটির একটি প্যারডি রচনা করিয়াছিলাম।

আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে
ঠোঁটে করে সারা ইতিহাস
আমার যেটুকু আছে, এনেছি তোমার কাছে
দয়া করে করে দিও নাশ।
ঐ ভেসে আসে উচ্ছল ইতিহাস—গৌরব
ভেসে আসে আকবর বাবরের কলরব
ভেসে আসে অবিরত 'ডেট' রাশি শত শত
ভেসে আসে পাল, সেন, দাস

ওগো, অনেক লিখেছি আজি
কম দাও তাও রাজি
একেবারে কোরনা হতাশ।

আমার ঘরে আসিয়া আমার মুখে এই কবিতাটি শুনিয়া খুব খুশী হইলেন। বলিলেন,—কবিতাটি আমাকে লিখে দাও।

আমি লিখিয়া দিলাম। কবিতাটি লইয়া তিনি যাহা কহিলেন, তাহা অপ্রত্যাশিত এবং তাহাতে আমি একটু বিপদে পড়িয়া গেলাম। তখন ইতিহাসের পরীক্ষা চলিতেছিল। চারুবাবু কবিতাটি লইয়া গিয়া, জানি না, কি উপায়ে কলেজের 'নোটিশ বোর্ডে' টাঙাইয়া দিলেন। কলেজে হই-হই পড়িয়া গেল। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা ইতিহাসের ছাত্রদের দেখিলেই ওই কবিতাটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের অধ্যাপক জ্ঞানবাবু আমার নামে প্রিন্সিপাল 'কাব' সাহেবের কাছে নালিশ করিলেন। কাব সাহেব তখন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, দেখিলাম কবিতাটি ইংরাজিতে অনূদিত হইয়া তাঁহার টেবিলের উপর রাখা আছে। **I appreciate this fine piece of poem. But I would request you to contribute to our college magazine and not to our Notice Board Please, go and see the professor of the History and facify him. He feels offended.**

আমি জ্ঞানবাবুকে গিয়া বলিলাম, আমাকে ক্ষমা করুন। কাহাকেও আমার অপমান কবা উদ্দেশ্য নয়। আমি কবিতাটি চারুবাবুকে লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহার পর সেটি কি করিয়া নোটিশ-বোর্ডে হাজির হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। জ্ঞানবাবু সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমি ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কবিতা লেখ।

তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম লিখিব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারি নাই। তিনি পৃথ্বীরাজ, রানা প্রতাপ সিংহ, রাজা গনেশ, মহারাজ শশাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ও নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ফরমাসি লেখা আমি কখনও প্রায় লিখিতে পারি নাই। তাই উক্ত ঐতিহাসিক বীরবৃন্দ কেবল আমায় এড়াইয়া গিয়াছেন। ফরমাসি লেখা লিখি নাই তাহাও সত্য নয়। বিবাহের অনেক প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি। সুখের বিষয় সেগুলির অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে।

কলেজের সাহেব অধ্যাপকেরা সকলেই ভালো ছিলেন। ভালো পড়াইতেন,

আমাদের ভালো করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা 'সাহেব' বলিয়া আমরা মনে মনে তাঁহাদের উপর চটিয়াছিলাম। তাঁহাদের অনেক গুণ থাকা সত্বেও তাঁহাদের আপন লোক মনে করিতে পারি নাই। তখন দেশে অগ্নিযুগের বিস্ফোরণ মাঝে মাঝে হইতেছিল। আমরা সকলেই বোমারুদের দলে ছিলাম।

একদিন একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিল। আমাদের প্রিন্সিপাল কার সাহেব 'হুইট্‌লে হলে' আমাদের সমবেত হইতে বলিলেন। আমরা সকলে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন—পুলিশ সাহেব হস্টেল সার্চ করিতে আসিবেন বলিয়া আমাকে খবর পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সন্দেহ এখানে বোমার দলের কোনও ছেলে আছে। আমি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি। তবু তিনি কাল আসিবেন। আশা করি তোমরা আমার মান রক্ষা করিবে।

পরদিন দেখা গেল হস্টেল হইতে একটি ছেলে অন্তর্ধান করিয়াছে। শুনিলাম সে না কি ক্রিশ্চান মেসে থাইত। কাহারও সহিত বড় একটা মিশিত না। পরদিন পুলিশ সাহেব আসিলেন, সব ছেলেদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন। কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার এখন মনে হয় কার সাহেব বোধহয় জানিতেন যে একটি স্বদেশী ছেলে তাঁহার হস্টেলে আছে। তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কার সাহেব আইরিশম্যান ছিলেন এবং স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন।

একটি গল্প মনে পড়িল। আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি। দুপুরে কলেজ হইতে মেসে আসিয়া দেখি কার সাহেব আমার ঘরে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিলেন—আমি এবার এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি। তাই আমার যেসব ছাত্রের ঠিকানা জোগাড় করিতে পারিয়াছি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি। আর তো দেখা হইবে না। বলাবাহুল্য আমি খুবই আনন্দিত হইলাম। বলিলাম দেশে গিয়া এখন কি করিবেন? কার সাহেব উত্তর দিলেন— বিবাহ করিব। আমাকে কি কোন মেয়ে পছন্দ করিবে না? আমি হাসিয়া ফেলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনার এখন বয়স কত? কার সাহেব একটি অদ্ভুত উত্তর দিলেন। বলিলেন—আমার দেশকে, আমার সমাজকে সন্তান দেওয়া একটি মহৎ কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিব এবার। বেশীক্ষণ বসিলেন না। চলিয়া গেলেন।

অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন কার সাহেব।

তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প মনে পড়িতেছে। ইহা হইতে আপনারা তাঁহার চরিত্রের কিছুটা আভাস পাইবেন।

কার সাহেব খেলাধূলা খুব পছন্দ করিতেন। একজন ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন। তিনি নিজেদের দেশে কলেজে পড়িবার সময় একবার এক সুদীর্ঘ রেসে (বোধহয় পঞ্চাশ মাইল) প্রথম হইয়াছিলেন। প্রাইজ পাইয়াছিলেন একটি চমৎকার লাল কোট। সেটি প্রায়ই আমাদের দেখাইতেন। আমার স্পোর্টসের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। ওই সব গুঁতাগুতি হুড়াহুড়ি হইতে আমি বরাবরই এড়াইয়া চলিতাম। চারদিকে প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। বেড়াইতে খুব ভালোলাগিত।

একদিন বৈকালে বেড়াইয়া ফিরিতেছি তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম আমাদের কলেজের সামনের মাঠে কে একজন হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে। কাছে গিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমাদের প্রিন্সিপাল কার সাহেব। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে স্যার?

আমি একটু আগে ছেলেদের সহিত হকি খেলিতে ছিলাম, আমার প্যাণ্টের পকেটে আমার পাইপটা ছিল, সেটা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আমিও খুঁজিতে লাগিলাম। একটু খুঁজিবার পর বলিলাম—এখন না পাওয়া গেলে সকালে আসিয়া খুঁজিব। সকালে পাওয়া যাইবে—

কার সাহেব উত্তর দিলেন—পাইপ না লইয়া আমি ফিরিব না। পাইপটি আমার নিকট খুবই মূল্যবান। সোনার বা রূপোর নাকি?

কার সাহেব বলিলেন, তাঁহার চেয়েও মূল্যবান। ওটি আমি এ্যাকর্ণ (Acorn শুক গাছের ফল) হইতে নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়াছি। ও জিনিশ বাজারে পাওয়া যায় না।

উভয়েই আবার খুঁজিতে লাগিলাম। একটু পরেই আমি পাইপটি দূরে দেখিতে পাইলাম।

বলিলাম—'আমি যদি খুঁজিয়া পাই, কি দিবেন?'

'তুমি যাহা চাও তাহাই দিব, যদি তাহা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত না হয়।'

পাইপটি আনিয়া তাঁহার হাতে দিতে খুব খুসী হইলেন তিনি।

বলিলেন—'কি চাও তুমি?'

বলিলাম—'ভোরে উঠিতে বড়ই কষ্ট হয়। আমাকে মর্নিং রোলকলটা হইতে অব্যাহতি দিন।'

কার সাহেব উত্তর দিলেন—'তাহা পারিব না। হস্টেলের আইন অমান্য করা আমার সাধ্যাতীত। তুমি অন্য কিছু চাও।'

বলিলাম, 'আচ্ছা, ভাবিয়া পরে বলিব।'

'বেশ, চল এখন তোমাকে এক কাপ চা খাওয়াই। আজ আমাকে এক বন্ধু ভাল কন্‌ডেন্‌সড্‌ মিল্ক পাঠাইয়া দিয়াছে।'

কার সাহেবের নিকট আমার পাওনার দাবীটি অনেক পরে পেশ করিয়াছিলাম।

তাহা বলিবার পূর্বে আর একটি গল্প বলা দরকার। লাল মোটর কোম্পানীর মালিক ছিলেন দিগ্‌বাবু। একদিন শুনিলাম তিনি অত্যন্ত স্থূলকায়। তাঁহার জন্য নাকি ফরমাস দিয়া বড় একটি চেয়ার করানো হইয়াছে। সাধারন চেয়ারে তিনি বসিতে পারেন না। আমার কৌতুহল হইল তাঁহাকে দেখিতে যাইব। কিন্তু কি করিয়া দেখা যায়। তিনি বাহির হন না, অন্দর মহলে থাকেন। আমাদের বাংলা ও অঙ্কের অধ্যাপক চারুবাবু দিগ্‌বাবুর আত্মীয় ছিলেন। তিনি দিগ্‌বাবুর বাড়িতেই থাকিতেন। চারুবাবুর নিকট আমার মনের বাসনাটি একদিন নিবেদন করিলাম। শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

'তুমি দিগ্‌বাবুকে দেখতে চাও? কেন?'

চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম—'উনি একজন অদ্ভুত অসাধারণ পুরুষ। তাই দেখবার ইচ্ছে হয়েছে। আপনি সাহায্য না করলে তো দেখা পাব না। শুনেছি তিনি বাইরে আসেন না।'

'না ,ভিতরেই থাকেন তিনি। কিন্তু তার কাছে তোমাকে হঠাৎ নিয়ে যাব কি করে? তাঁর সঙ্গে দেখা করার একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই তো। কেন তার সঙ্গে দেখা করছ তার একটা ভদ্র কারণ ঠিক করো আগে।'

তাহার পর নিজেই তিনি বলিলেন —'সামনে তো দোলের ছুটি। তুমি গিয়ে বলতে পারো, আমরা এই ছুটিতে পরেশনাথ পাহাড়ে বেড়াতে যাব। আপনি যদি কন্‌সেশন রেটে আমাদের একটি ট্যাক্সি দেন, এই অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি—' আমি তোমাকে আমার ছাত্র বলে পরিচয় করে দেব।

তাহাই হইল। চারুবাবু আমাকে দিগ্‌বাবুর সম্মুখে লইয়া গেলেন। আমি গিয়া প্রণাম করিলাম। দেখিলাম তিনি বিরাট একটি স্তূপের মত প্রকাণ্ড একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহার সবকিছু কাপড় দিয়া ঢাকা। মুখটি ছোট। গলার স্বরও সরু।

চারুবাবু পরিচয় করিয়া দিলেন। 'এটি আমার একটি ছাত্র। আপনার কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছে।'

আমি অনুরোধটি ব্যক্ত করিলাম।

দিগ্‌বাবু বলিলেন—'তুমি চারুর ছাত্র তোমার কাছে থেকে আর কি ভাড়া নেব। পেট্রোলের যা খরচ লাগবে আর ড্রাইভারকে খাই-খরচ দিও। আমাকে কিছু দিতে হবে না।'

এই সংবাদটি লইয়া আমি হোস্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল একটা বড় ট্যাক্সিতে ছ-জন অনায়াসেই যাওয়া যাইবে। কিন্তু আরতী রবি এবং আরও একজন (নাম মনে পড়িতেছে না) সোৎসাহে বলিল—'চল ঘুরেই আসা যাক্ তা হলে। পাহাড়ের উপর ডাক-বাংলো আছে, সেখানে আমরা রান্না করে খাবো। কিছু চাল, ডাল, আলু আর ডিম সঙ্গে নেব। সেখানে গিয়ে সিদ্ধ করে খেলেই চলবে।' আমি ব্রাহ্মণ, ঠিক হইল রান্নাটা আমাকে করিতে হইবে। রাজি হইলাম।

কিন্তু হোস্টেল ত্যাগ করিয়া বাহিরে কোথাও বেড়াইতে গেলে প্রিন্সিপালের অনুমতি লইতে হয়। আমি কার সাহেবের কাছে গেলাম। বলিলাম, 'আপনার পাইপ খুঁজিয়া দিয়াছিলাম। আপনি এখনও আমাকে কিছু দেন নাই। আপনি আমাদের পরেশনাথে বেড়াইতে যাইবার অনুমতি দিন।'

কার সাহেব কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'বিনা গার্জেনে এতগুলি সুবোধ বালককে আমি এতদূর যাইতে দিতে পারি না। আমার এখন মিশনের কাজ আছে, আমার যাইবার সময় নাই। সময় থাকিলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইতাম। তোমরা অন্য কোন প্রফেসরকে, যদি তোমাদের সঙ্গে যাইতে রাজি করাইতে পারো, আমি অনুমতি দিব। কিন্তু কোন প্রফেসর যদি রাজি না হন আমি অনুমতি দিব না।'

আমাদের কলেজে যাহারা বাঙালী প্রফেসর ছিলেন যেমন কেমিষ্ট্রির প্রফেসর হেমন্তবাবু ইতিহাসের প্রফেসর জ্ঞানবাবু, দর্শনের প্রফেসর খড়্গবাবু, ইংরাজীর প্রফেসর নন্দী সাহেব, বাংলার প্রফেসর চারুবাবু—সকলকে অনুরোধ করিলাম। কেহই রাজি হইলেন না। কেনেডি সাহেব, স্টিভেনসন সাহেব বলিলেন, তাহাদের মিশনের কাজ আছে। আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম। কেনেডি সাহেব বলিলেন—**you may request Rev. Winter.**

Winter সাহেব কিছুদিন আগেই ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবু তাঁহাকে গিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, পরেশনাথ একটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। আমার দেখিবার খুবই ইচ্ছে কিন্তু আমি গরীব মানুষ। মোটরে করিয়া এমন ব্যয়সাধ্য ভ্রমণ-বিলাস যাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমরা বলিলাম—আপনার এক পয়সাও খরচ লাগিবে না। আমরাই আপনার সমস্ত ব্যায়ভার বহণ করিব। আপনি শুধু রাজি হোন। তিনি বলিলেন—'ছাত্রদের পয়সায় যাওয়াটা কি উচিৎ হইবে?' আমরা তখন বলিলাম—'আপনি রাজি না হইলে আমাদের যাওয়া হইবে না। নেভারেও কার সাহেব অনুমতি দিবেন না।' তিনি কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন—বেশ আমি যাইব। তোমাদের জন্য সামান্য কিছু ব্রেকফাস্ট লইবার ব্যবস্থা বোধহয় করিতে পারিব। তিনি কার সাহেবকে চিঠি লিখিয়া দিলেন—আমি ছেলেদের সহিত পরেশনাথ যাইব।

কার সাহেবের অনুমতি পাওয়া গেল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম লাল মোটর কোম্পানিতে। দিগ্‌বাবুর আদেশে একটা ভালো বড় মোটর গাড়ির ব্যবস্থা হইল। ঠিক হইল গাড়িটি আমাদের লইয়া পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে নামাইয়া দিবে। আমরা পাহাড়ে উঠিয়া যাইব, যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ মোটরটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে। ড্রাইভারকে খাওয়া খরচ বাবদ দৈনিক দুই-টাকা দিতে হইবে। স্থির হইল পরদিন সকালে আমরা পরেশনাথ অভিমুখে যাত্রা করিব। কার সাহেবকে খবরটি জানাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন—'ভেরি গুড'।

পরেশনাথ ভ্রমণ আমার জীবনে একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা। উইনটার সাহেবের একটি ক্যামেরা ছিল। তিনি সেটি সঙ্গে লইলেন এবং মোটর ছাড়িবার পূর্বেই বলিলেন—মোটরটার সুস্থ অবস্থায় তাহার একটা ফটো লওয়া যাক। তোমরা সব মটোরটার পাশে দাঁড়াও। আমরা দাঁড়াইলাম। তিনি ফটো তুলিলেন। তাহার পর যাত্রা শুরু হইল।

গাড়ির যখন বেগ বাড়িল, তখন আমরা সমস্বরে গান ধরিয়া দিলাম। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম বেসুরো এবং প্রত্যেকে বোধহয় আলাদা গান গাহিতে ছিলাম। উইনটার সাহেব হাসি মুখে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এবং বেতালা ভাবে হাততালি দিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ঐকতানে মগ্ন হইয়া আমরা কতক্ষণ ছিলাম জানি না। হঠাৎ ফটাস করিয়া একটা আওয়াজ হইল। গাড়ি থামিয়া গেল। ড্রাইভার বলিল—চাকার টিউব ফাটিয়া গিয়াছে।

কাছেই একটি মুদির দোকান ছিল, দোকানদারের সাহায্য লইয়া ড্রাইভার চাকা ঠিক করিতে লাগিল। আমরা সকলে নামিয়া পড়িলাম। উইনটার সাহেব বলিলেন—এইবার অসুস্থ মোটরের একটি ফটো তোলা যাক। তোমরা মটরটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াও। মুদির দোকানে এক ঝুড়ি রামদানার লাড্ডু ছিল। আমরা এক টাকার লাড্ডু কিনিয়া লইলাম। একটাকায় অনেকগুলি লাড্ডু পাওয়া গেল। বত্রিশটা। দেখিলাম দোকানে কাগজ ও পেন্সিলও পাওয়া যায়। আমি একটা পেন্সিল এবং কিছু কাগজও কিনিয়া ফেলিলাম। কাগজ কলম দেখিলেই কিনিতে ইচ্ছে করে। এখনও সে স্বভাব যায় নাই। উইনটার সাহেবের চাবির রিং-এ ছোট একটি ছুরি ছিল। তিনি আমার পেন্সিল কাটিয়া দিলেন।

মোটর ঠিক হইলে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হইল। কিছু দূর গিয়া একটা মেলার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সেখানে দেখিলাম একদল লোক হোলি খেলিতেছে প্রত্যেকের মুখে মাথায় আবীর, নূতন কাপড় এবং জামায় রং, সকলেরই চক্ষু প্রায় ঢুলু-ঢুলু। মুখে হোলির গান। দুটি লোক ঢোল ও খঞ্জনী বাজাইতেছে। তাহারও আপাদমস্তক রঞ্জিত। তাহারা আমাদের গাড়ি থামাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ছা-রা-রা-রা—হোলি হ্যায়।

আমরা নামিয়া পড়িলাম। তাহারা আমাদের আবীর মাখাইয়া দিল। উইনটার সাহেব ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাহারাও সাহেব দেখিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। আমি সাহেবের কানে কানে বলিলাম—সাহেব তুমি আগাইয়া গিয়া উহাদের রং মাখো। তাহা না হইলে উহারা অপমানিত হইবেন। উইনটার সাহেব বলিলেন—**Is it so ? I don't understand what is happening !** তিনি মাত্র কয়েকদিন আগে বিলাত থেকে আসিয়াছিলেন। এ দেশের দোল সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা ছিল না। আমি তাহাকে বুঝাইলাম **To-day we are offering our colour of love to all. The colour is the symbol of love You should accept it.** উইনটার সাহেব উদ্ভাসিত মুখে উত্তর দিলেন—**Oh, certainly.** তিনিও মোটর হইতে নামিয়া মাথা পাতিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে তাঁহার মুখে মাথায় আবীর মাখাইয়া দিল। একজন পিচকারি সহযোগে তাঁহার সাদা প্যাণ্টে রং দিতেই লাফাইয়া আসিলেন উইনটার সাহেব। বলিলেন—'আমার এই একটি মাত্রই ভাল প্যাণ্ট আছে। এটি খারাপ হইলে আমি ভদ্র-সমাজে বাহির হইতে পারিব না।'

আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম—পাকা রং নয়। কাচিলেই উঠিয়া যাইবে।

আবার আমাদের মোটর চলিতে শুরু করিল। আমি উইনটার সাহেবকে প্রশ্ন করিলাম—আপনার মাত্র একটি প্যাণ্ট ?

তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ, ভাল প্যাণ্ট একটিই। বাকিগুলো সব তালি লাগানো।'

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আমি কখনও নতুন প্যাণ্ট বা কোট কবিতে পারি নাই। আমার চারজন দাদা। তাহাদের পুবানো জামা-কাপড পরিয়াই আমি কাটাইয়াছি। এখন মিশনেব কাজ লইয়া এখানে আসিয়াছি। আমাকে উহারা নামে-মাত্র ২৫ টাকা 'পকেট-ম্যানি' দেন। অবশ্য আমাদের খাওয়া-খরচ মিশনেব। সুতবাং বুঝিতেই পাবো ঘন ঘন নতুন প্যাণ্ট কবা আমাব সাধ্যাতীত।

শুনিয়াছিলাম উইনটার সাহেব কোন বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বড ডিগ্রাধাবী। মিশনের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং কষ্ট করিয়া এদেশে আছেন। শুধু এ-দেশের অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত লোকদের খৃস্টানই করিতেছেন না, নানা ভাবে তাহাদের সেবাও করিতেছেন। অবশ্য তাঁহাদের পিছোনে রাজশক্তির দোর্দণ্ড-প্রতাপ বর্ত্তমান। এখন আমরা স্বাধীন হইয়াছি। এখনও আমাদের দেশে এ-রকম মিশনারির আবির্ভাব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম দেশের অনেক সেবা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ঠিক ওই সাহেব মিশনারিদের মতো লোক তাঁহাদের মধ্যে আছে কিনা জানি না। থাকিলেও আমার চোখে পড়ে নাই। অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা সীমিত, ইহাও স্বীকার করি।

সন্ধ্যার একটু পুর্বে আমরা পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিলাম। যেখান হইতে পাহাড়ের উপর উঠিবার পথ, সেখানে দু'ই একটি দোকান ছিল। খাবারের দোকান, চায়ের দোকান তো ছিলই, একটি মনিহারি দোকানও ছিল মনে পড়িতেছে।

আমরা সকলে একবার করিয়া চা-পান কবিয়া লইলাম। লক্ষ্য করিলাম একটি লাঠির দোকানও রহিয়াছে। অনেকেই লাঠি কিনিল। উইনটার সাহেবও একটি লাঠি কিনিলেন। তাহার পর পাহাড়ে চড়া শুরু হইল।

আমার বন্ধুরা দেখিলাম পর্ব্বতারোহণে দক্ষ। তাহারা দেখিতে দেখিতে আগাইয়া গেল। আমি ইহার আগে বড় পাহাড়ে কখনও চড়ি নাই। সাহেব-গঞ্জের পাহাড়ে অবশ্য দুই একবার চড়িয়াছি। কিন্তু পরেশনাথের পাহাড়ের তুলনায় ইহা তেমন কিছু নয়। আমি প্রথমে খানিকটা বেশ দ্রুত-গতিতেই উঠিয়াছিলাম, কিন্তু একটু পরেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। উইনটার সাহেব

আর পার্ব্বতী সেন আমার সঙ্গে ছিল। উইনটার সাহেব বলিলেন—খুব আস্তে আস্তে চল। আস্তে, আস্তে চলিয়াও কিন্তু বেশী দূর উঠিতে পারিলাম না। দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। উইনটার সাহেব বলিলেন—একটু বস। খানিক্ষণ বিশ্রামের পর আবার উঠা যাইবে। উইনটার সাহেব বসিলেন। পার্ব্বতী উঠিয়া গেল। খানিক্ষণ বিশ্রামের পর উইনটাব সাহেব উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন এইবার ওঠ। আস্তে আস্তে চল। কিছুদূর উঠিয়া আবার আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। শ্বাসকষ্ট হইতেছিল, পা-ও ব্যাথা করিতে লাগিল। তখন উইনটার সাহেব একটি অদ্ভুত কাণ্ড করিলেন। তিনি আমার সম্মুখে হঠাৎ উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমাকে বলিলেন—'তুমি আমার কাঁধে চড়।' আমি তো অবাক। বলিলাম—আমাকে কাঁধে লইয়া আপনি উঠিতে পারিবেন? তিনি হাসি মুখে বলিলেন—'নিশ্চয় পারিব। তোমাব ওজন আর কতটুকু? আমি তখন আলপ্স (Alps) পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। তখন আমার পিঠে মস্ত একটা বোঝা ছিল। ওঠো।' উইনটার সাহেবের কাঁধে উঠিলাম। কিছুদূর তিনি অবলীলাক্রমে লইয়া গেলেন। আমার কিন্তু বড় লজ্জা করিতেছিল। একটু দূরে গিয়া নামিয়া পড়িলাম। উইনটার সাহেবেব কাঁধে হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। সেই মুহূর্তে উইনটার সাহেবকে আমার পরম এবং একমাত্র হিতৈষী আত্মীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। আজ তিনি কোথায়। তিনি বাঁচিয়া আছেন কি না তাহাও তো জানি না। তিনি কিন্তু আমার মনে অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

উঠিতে উঠিতে আমার আর একটা দুশ্চিন্তা হইতেছিল। উঠিবার পর আমাকে গিয়া রাঁধিতে হইবে। তাহার পর খাওয়া-দাওয়া। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। চারিদিকে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্রান্ত, ক্লান্ত ক্ষুধিত ছিলাম। জ্যোৎস্না আমার চিত্তে তেমন সাড়া জাগাইতে পারিল না। সম্মুখের ঊর্দ্ধগামী পথটাই তখন আমার কাছে একমাত্র বাস্তব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। উইনটার সাহেবের কাঁধটাও। তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া, কখনও বা থামিয়া অবশেষে পরেশনাথের পাহাড়ের শিখরস্থিত ডাক-বাংলোয় পৌঁছিলাম। আমার বন্ধুরা আগেই পৌঁছিয়া গিয়াছিল। আমরা পৌঁছিবামাত্র ডাকবাংলার চাপরাসি আগাইয়া আসিল; এবং মোলায়েম করিয়া জানাইল 'আস্নান কা লিয়ে গরম জল তৈয়ার হ্যায়। খানা ভি বন গিয়া হ্যায়—'

আমি তো আকাশ হইতে পড়িলাম। শুনিলাম আমাদের প্রিন্সিপাল কার

সাহেব নাকি আমরা চলিয়া আসিবার পূর্বেই এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন—**A Professor with five students leaving by car for Pareshnath Hill. Please arrange food and lodge for them at the Duk Bungalow.** ভাষাটা ঠিক হইল কিনা জানি না, কারণ টেলিগ্রামটা স্বচক্ষে দেখি নাই। ডাকবাংলোর চাপরাসি তাহার মাতৃভাষায় যাহা জানাইল, তাহার ইংরাজি অনুবাদ উহাই। বেশ বড় ডাকবাংলো। স্নানাহার সারিয়া যখন বাহিরে আসিয়া 'ডেক চেয়ারে' বসিলাম তখন মনে কবিত্ব জাগিয়া উঠিল। মনে হইল—

নিজেকে উজাড় করি মহাকাশে ভেসেছে কে
জ্যোৎস্নার ছদ্মবেশে এসেছে কে !

অনেক কবিতা লিখিয়াছিলাম সেদিন। ওই দুইটি লাইন ছাড়া আর কিছু মনে নাই। কবিতা অনুবাদ করিয়া উইনটার সাহেবকে শুনাইয়াছিলাম। তিনি তো মুগ্ধ। আমাদের অনেক দেশী রূপকথাও সেদিন অনুবাদ করিয়া শুনাইয়াছিলাম তাঁহাকে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সব শুনিয়াছিলেন। সেদিন প্রায় সমস্ত রাত্রি যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়া কাটিয়া গেল। ভোরবেলা ঘুমাইয়া যখন উঠিলাম তখন বেলা প্রায় দশটা। চা খাইবার সময় দেখি উইনটার সাহেব একটা সিদ্ধ মুরগীর বাচ্চা আর দু'ই টুকরা পাউরুটি দিলেন। সসঙ্কোচে বলিলেন,—'তোমাদের জন্য এই সামান্য কিছু এনে ছিলাম। খাও।' খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া আমরা ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমে পরেশনাথের মন্দিরে গিয়া পরেশনাথজীকে দর্শন করিলাম। আরও যে সব মূর্ত্তি ছিল, সব দেখিলাম। উইনটার সাহেব কয়েকটি ফটো তুলিয়া লইলেন। তাহার পর আমাদের এলোমেলো ভ্রমণ আরম্ভ হইল। এলোমেলো মানে লক্ষ্য স্থির নাই। হুড়মুড় করিয়া যে-দিকে দু-চক্ষু গেল সেই দিকেই আমরা ঢালু পাহাড় বাহিয়া নামিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম একটা বেশ বড় বন্যলতায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। ইচ্ছা হইল ওই লতায় নিজেকে আবৃত করি। লতাটা ছিঁড়িয়া গাছ হইতে নামাইয়া লইলাম তাহার পর সেটিকে নিজের গায়ে জড়াইলাম। প্রকাণ্ড লতা। সকলের গায়েই পুষ্পিত লতাটি টুকরা টুকরা জড়ানো হইল। উইনটার সাহেবেরও। উইনটার সাহেব মহা খুসী। তিনি এই অবস্থায় আমাদের কয়েকটি ফটো তুলিলেন। তাহার পর আমরা চতুর্দিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। বেশ খানিক্ষণ বেড়াইবার পর ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তখন

আমরা জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। যে পথ আমাদের ডাক-বাংলোয় লইয়া যাইবে সে পথ কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুক্ষণ ঘুরিবার পর দূরে একটি বাড়ি দেখা গেল। সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মনে হইল সেখানে হয়ত হাবানো পথের সন্ধান মিলিবে। বাড়িটি ফরেস্ট রেন্‌জাবের। আমাদের তিনি সমাদবে বসাইলেন। ভদ্রলোক মুসলমান। মনে হইল খানদানী ঘরের ছেলে। আমাদের কথা শুনিয়া, এবং আমাদের লতামণ্ডিত চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন ভদ্রলোক। বলিলেন—আপনারা এখন এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন তাহার পর আমি আপনাদের সঙ্গে লোক দিব। সেই আপনাদের পৌছাইয়া দিয়া আসিবে। তাহাই হইল। তিনি আমাদের জন্য কয়েকটি মুরগী জবাই করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাব বাবুর্চি চমৎকার 'কারি' বানাইল। গরম ভাতের সহিত পবম তৃপ্তি সহকারে আমরা আহার সম্পন্ন করিলাম। সেদিনের আনন্দময় স্মৃতি আজও আমার মনে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে। খাওয়া দাওয়ার পর ফরেস্ট রেঞ্জারের সহিত আর একবার ফটো তোলা হইল। তাহার পর ডাক-বাংলোয় ফিরিয়া গিয়া সকলেই শুইয়া পড়িলাম। ফিরিলাম তাহার পরদিন সকালে। মোটর আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

হাজারিবাগের অনেক স্মৃতি মনে আছে। বেশীর ভাগই আনন্দময়। দু'ই একটি বিশ্রী কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের পায়খানার দেয়ালে অনেক বিশ্রী অশ্লীল কথা লেখা থাকিত। অনেক সময় সচিত্র। কে বা কাহারা লিখিত জানি না। আমাদের মধ্যে কাহারও রুচি বিকার ছিল নিশ্চয়। কিন্তু বাহিরে তাহাদের ভদ্রতার মুখোস ছিল, তাই তাহাদের সনাক্ত করিতে পারি নাই। আমি সকলের সহিত ভালোভাবে মিশিতে পারিতাম না। সাহিত্যের ভূত অনেক আগেই আমার কাঁধে চাপিয়াছিল। অবসর পাইলেই কবিতা লিখিতাম আর ডাক-যোগে 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দিতাম। তাহা হইতে মাঝে মাঝে 'প্রবাসী' সম্পাদক দুই একটি কবিতা ছাপিতেন। বাকিগুলি 'অ' (অর্থাৎ অমনোনীত) চিহ্নিত হইয়া ফিরিয়া আসিত। এই ভাবেই আমার সাহিত্য-চর্চা চলিতেছিল তখন! কবিতাই লিখিতাম কেবল।

হাজারিবাগের আর বিশেষ কোন স্মৃতি মনে পডিতেছে না। কেবল পরীক্ষার সময় যে দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছিল সেটি মনে আছে। আই, এস, সি পরীক্ষায় আমার বিষয় ছিল অঙ্ক, রসায়ন বিদ্যা (কেমিস্ট্রি) এবং উদ্ভিদ-বিদ্যা (বটানি)। পরীক্ষার

সময় সব বিষয়ই মোটামুটি ভাল করিয়া দিলাম। কিন্তু বটানির প্রাকটিকালের সময় প্রায় অকূলপাথারে পড়িয়া গেলাম। বটানি প্রাকটিকালে বাহিরের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তিনি কটক কলেজ বটানির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য কটক হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেইগুলি আমাদের দিয়া বলিলেন 'ওভারি' (ovary) কাটিয়া নির্ণয় কর, ইহা কোন জাতের ফুল। ফুলগুলি ছোট ছোট এবং কালো রঙের, শুকনো। এ ফুলের ওভারির সেকশন করা আমাদের সাধ্যে কুলাইল না। আমাদের প্রফেসর মিঃ ডি, কে, রায়ও একজন পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহাকে আমরা বলিলাম। তিনি যোগেশবাবুকে গিয়া বলিলেন। তাহার পর আমাদের জবা-ফুল দেওয়া হইল। জবা আমাদের খুব চেনা ফুল। আমরা পরীক্ষা দিয়া সানন্দে ফিরিয়া আসিলাম। জবাফুলে আমাদের কোন রকম ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পরে শুনিলাম যোগেশবাবু আমাদের সকলকেই ন্যূনতম পাশ নাম্বার মাত্র দিয়াছেন। এই পরীক্ষার ফল খুব ভালো হইল না। সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করিলাম। সেবার মাত্র আটজন ছেলে ফাষ্ট ডিভিশন পাইয়াছিল। বাবা চিঠি লিখিলেন তোমাদের অফিসেই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার ফর্ম পাওয়া যাইবে। তুমি ফর্মটি পূরণ করিয়া প্রিন্সিপালের হাতে দিয়া আসিও। তাহাই করিলাম। আমাদের মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে দরখাস্ত করিতে হইত না। করিতে হইত—Inspector General of Civil Hospital-এর কাছে পাটনায়। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল প্রত্যেক দরখাস্তের পাশে নিজের মন্তব্য লিখিয়া I. G. C. H. আফিসে পাঠাইয়া দিতেন। Inspector General—বিহার হইতে বারো জন ছাত্রকে নির্বাচিত করিতেন।

দরখাস্ত দিয়া আমি বাড়ি চলিয়া গেলাম। সাহেবগঞ্জ হইতে চলিয়া আসিবার সময় যেমন কষ্ট হইয়াছিল, হাজারীবাগ হইতে চলিয়া আসিবার সময় তেমনি বিয়োগ বেদনা অনুভব করিলাম। আমরা যখন যেখানে থাকি সেখানকার সহিত দৃশ্য-অদৃশ্য নানা সূত্রে আমাদের মন বাঁধা পড়ে। চলিয়া আসিবার সময় সেসব বাঁধনে টান পড়ে। ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিতে বড়ই কষ্ট হয়। হাজারীবাগ ছাড়িয়া আসিবার আগে আমরা একটি রোমান্টিক ব্যাপার করিয়াছিলাম। দশখানা মোটা কাগজে লিখিয়াছিলাম—'আমরা শপথ করিতেছি যে আমরা কখনও কাহাকেও ভুলিব না। এবং যতদিন বাঁচিব পরস্পরের খোঁজ করিব। নীচে আমরা দশজন সই করিয়াছিলাম। কিন্তু জীবন বড় আশ্চর্যের জিনিশ।' ভোলাই

তাহার স্বভাব। সে কাগজটি তো হারাইয়াছিই, সকলের নামও আজ মনে নাই। পার্ব্বতীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়! আর কাহারও সহিত হয় না। বিশুর কথা, রবির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। গোপাকেও মনে পড়ে এখনও। গোপা কিছুদিন আগে মারা গিয়াছে। আরও অনেকে হয়ত গিয়াছে। খবর পাই নাই। কাল-স্রোতের টানে কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছি।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, মা খুব অসুস্থ। Sprne হইয়াছে। মুখে ঘা। কিছু খাইতে পারেন না। শুনিয়াছিলাম আমার একটি ছোট ভাই হইয়াছে। সে আঁতুরেই মরিয়া গিয়াছে। দশদিন মাত্র বাঁচিয়াছিল। আমার ছোট ভাই ঢুলুর পর তাহার জন্ম হইয়াছিল। মায়ের অসুখ যখন কিছুতেই সারিল না, তখন সাহেবগঞ্জের অনুকূল জ্যাঠামশাই ( বাবার বন্ধু প্রমথনাথের বড় দাদা ) বলিলেন, সাকরিগাল পাহাড়ের উপর আমার একটি বাংলো আছে। সেখানকার জল হাওয়া খুব ভালো। বৌমাকে সেখানে লইয়া যাও। তিনি ভালো হইয়া যাইবেন।

সেখানে আমরা একদিন সপরিবারে হাজির হইলাম। সাকরিগলি ঘাট স্টেশন হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে ছোট একটি পাহাড় এবং তাহার উপর চমৎকার একটি বাংলো। পাহাড় বাহিয়া অনেকদূর কিন্তু উঠিতে হয়। মা তো ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মাঝে একবার বিশ্রাম করিলেন। আমরা অবশ্য একবারে উঠিয়া গেলাম। মুসকিল হইল আমাদের জিনিশপত্র লইয়া। আমাদের সঙ্গে একটা সংসারের জাবতীয় জিনিশ ছিল। কয়েকটা ট্রাঙ্ক। কয়েকটা বিছানার বড় বাণ্ডিল। তাহা ছাড়া বাসনপত্র এবং আরো নানা রকম জিনিশ। আমরা স্টেশন হইতে হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। মা-বাবা বোধহয় গিয়াছিলেন কাহারও গাড়িতে। ঠিক মনে নাই। সঙ্গে কয়েকটি কুলি গিয়াছিল। তাহারা বলিল যে হালকা মালগুলি তাহারা বাংলোয় পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু ভারী ভারী ট্রাঙ্ক এবং বিছানার বাণ্ডিল লইয়া তাহারা পাহাড়ে চড়িতে পারিবে না। শক্তিতে কুলাইবে না। তাহারা ভারী জিনিশগুলি পাহাড়ের পাদমূলে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভাগ্যক্রমে আমাদের চাকর রামকিষনা আমাদের সঙ্গে ছিল। সে জাতিতে তুরী, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত বেঁটে। সে বাবাকে আশ্বাস দিল, চিন্তার কোন কারণ নাই। আমিই একে একে সব তুলিয়া দিব। সত্যিই দিল। একে একে জিনিশগুলি পিঠের উপর তুলিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে পাহাড়ের

উপর উঠিয়া আসিল। আমাদের এই খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ রামকিষনা যে এত শক্তিধর তাহা জানা ছিল না। পাহাড়ে তো ওঠা গেল। দৃশ্য অতি চমৎকার। কিন্তু আমরা ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করিলাম শুধু দৃশ্য দেখিয়া পেট ভরিবে না। রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাজার হাট হইতে জিনিশ কিনিয়া আনিতে হইবে। অর্থাৎ বারবার পাহাড় হইতে ওঠানামা না করিলে চলিবে না। রামকিষনা পাহাড়ের নীচের একটি ইঁদারা হইতে কলসী কলসী জল তুলিয়া আনিয়া স্নান করাইত। একটি মৈথীলি চাকর ছিল। সে প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিত এবং ফিরিবার সময় একঘড়া গঙ্গাজল লইয়া আসিত। সেই জলে রান্না হইত। সেই পাহাড়ের গায়ে পিছোন দিকে একটি ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে ছোট ছোট পাখি সর্বদা ডাকাডাকি করিত। সেই জঙ্গলে সহসা একদিন আর একটি জিনিশ আবিষ্কার করিলাম। কাঁকড়া বিছা। একটা দু'টো নয়, অনেক। বিষাক্ত পুচ্ছটি পিঠের উপর তুলিয়া দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাঁকড়া বিছা আগে দেখি নাই। এই প্রথম দেখিলাম। পরে যখন আকাশ-চর্চা করিয়াছিলাম, তখন বৃশ্চিক রাশিতে এই কাঁকড়ার প্রতিরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ঘরের ভিতরও দুই একটি কাঁকড়া দেখা যাইতে লাগিল। রামকিষনা বলিল, এই জঙ্গলে 'গহুমনা' ( গোখরা ) সাপও আছে। মা বলিলেন, এই রকম জায়গায় ছেলেদের লইয়া থাকিব না। চল বাড়ি ফিরিয়া যাই।

কিন্তু বাড়ি ফিরিতে হইল না। বাবার এক বন্ধু পাঁচুবাবু আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। গঙ্গার ধারে দ্বিতলে তাহার একটি বাড়ি খালি পড়িয়া ছিল। তিনি বলিলেন—আপনারা আমাদের বাড়িতে চলুন।

পাঁচুবাবুর বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম আমরা। মায়ের অসুখ কিন্তু সারিল না। উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। শেষে দুধ ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারিতেন না। দুধও হজম হইত না। তখন বাবা স্থির করিলেন, মা-কে লইয়া কলিকাতায় আসিবেন। হাতি বাগানের কোনও স্থানে তাহাদের বাড়ি ছিল। ঠিক মনে নাই। বড় মাসির বাসায় আমাদের সকলের স্থান-সঙ্কুলান হইবে না ভাবিয়া বাবা আমাদের মণিহারী পৌঁছাইয়া দিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া বাবা তাঁহার আর এক বন্ধু বিনোদবাবুর বাসায় চলিয়া যান। সেই বাসায় বিধানবাবু আসিয়া মা-কে দেখেন। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যেই মা ভালো হইয়া যান। বিনোদবাবুর বাসায় থাকিতে থাকিতেই তিনি তাঁহার আর এক সহপাঠির খবর পান। তিনি হ ঁার সহিত ক্যাম্বেল-স্কুলে ডাক্তারী পড়িতেন। কিন্তু তিনি ডাক্তারী করেন

নাই, ব্যবসা করিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন। বাবা মা-কে লইয়া তাহার বাসাতেও ছিলেন কিছুদিন। এই সময় আমি মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া মার কাছে থাকিয়াছি। যতদূর মনে পড়িতেছে বিধানবাবু মায়ের মুখের ঘা **Borogleycerine** এবং সঙ্গে **Electrargal** লাগাইয়া সারাইয়া দিয়াছিলেন। বিধানবাবু **Bengers-fred** এবং **Paincreation** দিয়া মাকে প্রত্যহ দেড়সের দুধ হজম করাইতেন। মায়ের অসুখের সময়ই বিধান রায়ের সহিত আমাদেব পরিচয়।

বাড়িতে আসিবার কিছুদিন পরেই আমাদের কর্ণেল আণ্ডারসন আসিয়া পড়িলেন এবং আমাকে কর্ণেল অস্টো স্মিথের নামে একটি চিঠি দিয়া বলিলেন 'তুমি এই চিঠি লইয়া নিজে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করো। এ-কথা আগেই আমি লিখিয়াছি। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা আমি লিখিয়াছি আমার 'নির্মোক' উপন্যাসের গোড়ার দিকে। সেখান হইতেই উদ্ধৃতি করিতেছি।

'পিতামাতার পদধূলি এবং দেবতার নির্মাল্য মাথায় ধারণ করিয়া কম্পিত বক্ষে বড় সাহেবের (কর্ণেল অস্টেন স্মিথ) দ্বারস্থ হইলাম। দ্বারে কিন্তু দারোয়ান ছিল। পেটি-পাগরি-লাগানো বেশ কায়দা দুরস্ত দারোয়ান। অগ্রাহ্য করা চলে না। তাহাকে বলিলাম যে আমি বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে চাই। সে বার কয়েক আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বলিল যে সাহেব এখন ব্যস্ত আছে। অপেক্ষা করিতে হইবে। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সময় কিন্তু কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে একটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পা ব্যথা করিতে লাগিল। এবং অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ বেঞ্চিটাতে সসঙ্কোচে উপবেশন করিলাম। শহুরে ছেলে হইলে আমার হয়ত এই সঙ্কোচটুকু থাকিত না। কিন্তু আমি পাড়া গাঁ হইতে আসিয়াছিলাম, কোথায় কি প্রকার আচরণ শোভন হইবে ঠিক জানা ছিল না। কাঠের বেঞ্চিতে বসিলে হয়ত বে-আইনী হইবে, এই ভয় ছিল। দারোয়ান কিন্তু কিছু বলিল না। বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইত জানি না, এমন সময় অনাদিবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। অনাদিবাবু আমাদের পূর্ব-পরিচিত লোক, এককালে আমাদের বাড়ির সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

'আরে তুমি হঠাৎ এখানে যে?' উঠিয়া গিয়া সমস্ত কথা তাহাকে বলিলাম। তিনিও বারকয়েক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন 'এস আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ি কাছেই।'

'আমাকে যে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'সেই জন্যেই তো বলছি, এস আমার সঙ্গে,' সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ভাবিলাম, হয়ত অনাদিবাবুব সঙ্গে আপিসেব কাহারও সহিত আলাপ আছে এবং তিনিও হয়ত একটি সুপাবিস-পত্র দিবেন। তাঁহাব অনুগমন করিলাম। কিছু দূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—'উঠলে কোথায় ?'

'একটি হোটেলে।'

হোটেলের নাম ঠিকানা দিলাম।

'আমাদেব বাড়িতে উঠলেই পারতে।'

'আপনি যে এখানে আছেন, তা তো জানতাম না।'

আমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া অনাদিবাবু বলিলেন—'তুমি এই বেশে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে, মাথা খারাপ নাকি তোমার। এই আধ-ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী আর তালি-লাগানো জুতো—মাই গড।

অত্যন্ত চটিয়া গেলাম।

অনাদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—'ভাগ্যিস আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়া গেল, তা না হোলে হয়েছিল আর কি। এস, এই গলিটার ভিতর।'

গলির ভিতর ঢুকিয়া অনাদিবাবুর বাসায় উপনীত হইলাম।

অনাদিবাবু প্রথমে বাড়িতে ঢুকিয়া চাকরকে একটা নাপিত ডাকিতে বলিলেন এবং আমাকে বৈঠকখানার ঘরে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া তাঁহার বৈঠকখানা পর্যবেক্ষন করিতে লাগিলাম। ভদ্রলোকের রুচি যে বেশ সুসজ্জিত তাহাতে সন্দেহ নেই। ঘরখানি ছোট কিন্তু চমৎকার সাজানো। প্রতিটি জিনিসে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিবার ছোট প্রস্তর খণ্ডটি, দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানি, কোনের শেলফে চমৎকার করিয়া সাজানো বইগুলি, তাহার উপর ছোট 'টাইমপিস'টি—সমস্তই সুন্দর।

এক পেয়ালা চা লইয়া অনাদিবাবু প্রবেশ করিলেন।

'যদিও এখন ঠিক চা খাবার সময় নয়, তৈরি হচ্ছিল যখন—' মৃদু হাসিয়া তিনি চায়ের পেয়ালাটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, 'চা-টা খেয়ে তুমি মাথার চুলগুলো কেটে ফেলো দিকি আগে, ওই যে নাপিতও এসে গেছে। ওরে, বাবুর চুলটা বেশ ভালো করে কেটে দে দিকি। বেশ দশ-আনা, ছ-আনা করে। নাও চা-টা খেয়ে নাও তুমি।'

বাল্যকাল হইতে যে আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলাম সে আবহাওয়ায় দশ-আনা, ছ-আনা চুল কাটা চলিত না। অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে দশ-আনা, ছ-আনা

চুলকাটা লোককে মেথর কিংবা গাড়োয়ান পর্যায়ে ফেলিতাম। অনাদিবাবুর কথায় একটু বিচলিত হইলাম। হঠাৎ চুল কাটিবার প্রস্তাবে কম বিস্মিত হই নাই। আমার মুখ ভাবে অনাদিবাবু কথাটা বুঝিতে পারিলেন বোধহয়। বলিলেন—'অমন নো বা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে কোট-প্যাণ্ট আছে ?'

'না।'

'আচ্ছা' আমি সে সব ঠিক করে দিচ্ছি। অনিলের স্যুটটা তোমার গায়ে ফিট করবে হয়ত। দেখি—'

আবার তিনি ত্বরিতপদে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। আমি চা-পান করিয়া দ্বিধাগ্রস্থ-চিত্তে ভাবিতেছিলাম ওই টেরিকাটা টিনের-বাক্স-হাতে ছোকরা নাপিতটার হাতে আত্মসমর্পণ করিব কিনা। এমন সময়, অনাদিবাবু একটি পত্র লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

বলিলেন—'ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—এই দেখ তোমার বাড়ির চিঠি এসেছে।'

দেখিলাম বাবা লিখিতেছেন যে, অনাদিবাবু যেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আমি মফঃস্বলের কলেজ হইতে পাশ করিয়াছি। বড় শহর সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। ছুটি পাইলে তিনি নিজেই সঙ্গে আসিতেন। কিন্তু কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না। এদিকে ভর্ত্তি হইবার শেষ দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছে। সেজন্য একাই পাঠাইতে হইল। অনাদিবাবু যে এখানে আছেন তাহা বাবা জানিতেন না। জানিলে আমার সঙ্গেই তিনি পত্র দিয়া অনাদিবাবুর স্মরনাপন্ন হইবার পরামর্শ দিতেন। নরেনবাবুর মুখে অনাদিবাবুর খবর লইয়া এই পত্র লিখিতেছেন। অনাদিবাবু যেন—ইত্যাদি।

অনাদিবাবু বলিলেন—চুলটা কেটে ফেল, দেরি কোর না। উঠিয়া গিয়া নাপিতের হস্তে মুণ্ডটি বাড়াইয়া দিলাম।

অনাদিবাবুর ভাই অনিলবাবুর স্যুটটা আমাকে ঠিক 'ফিট' করে নাই। অপরের জন্য যাহা প্রস্তুত, তাহা আমাকে ঠিক 'ফিট' করিবেই বা কেন। জামাটা একটু ঢিলা, আর প্যাণ্টালুনটা একটু আট হইল। অনাদিবাবু কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইলেন না। আমার কলার এবং টাইটা স্বহস্তে বাঁধিয়া দিয়া একটু

দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এবং সোৎসাহে বলিলেন—'বা চমৎকার হয়েছে—ফেমাস্।'

সবচেয়ে মুশকিল হইল জুতা লইয়া। অনদিবাবুর আগ্রহাতিশয্যে অনিলবাবুর জুতা— জোড়াতেই পা ঢুকাইতে হইল।

'ফস্, ফস্ করছে নাকি? ঠিক উলটা, ভয়নক আঁট হইয়াছে। তাহাই বলিলাম। অনাদিবাবু বলিলেন, 'ফিতেগুলি একটু আলগা করে দাও। হাঁটতে গেলে যদি লাগে একটা গাড়ি করেই না হয় চল। পাঁচ—মিনিটের তো ব্যাপার। দেখাটা হয়ে গেলেই সব চুকে গেল।'

সত্য সত্যই গাড়ি করিয়া যাইতে হইল। অত আঁট জুতা পায়ে দিয়া বেশী দূরে হাঁটা সম্ভবপর ছিল না। স্যুটের সঙ্গে আমার তালি দেওয়া জুতো পরিয়া যাওয়া আরো অসম্ভব ছিল। সুতরাং গাড়িই একটা ডাকিতে হইল।

আফিসে গিয়া শুনিলাম সাহেব টিফিন খাইতেছেন। আধ-ঘণ্টা পর দেখা হইবে। অনাদিবাবু চাপরাসীকে আড়ালে ডাকিয়া প্রায় প্রকাশ্যভাবেই একটা টাকা বকশিস দিলেন। দেখা হইয়া গেল। বড় সাহেব তাহার বাল্যবন্ধুর চিঠি পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন যে আমি দরখাস্ত করিয়াছি কিনা। বলিলাম করিয়াছি। সাহেব ঘণ্টা টিপিতেই, তাঁহার একজন সাহেব অ্যাসিস্টেণ্ট আসিয়া দাঁড়াইল। বড় সাহেব হুকুম করিলেন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবাব জন্য যতগুলি দরখাস্ত আসিয়াছে আনিয়া হাজির কর। ক্ষণপরেই তিনি একবোঝা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিলেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, 'তোমার দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির কর।' দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দেখিলাম যে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল (পূর্ব্ব—বর্ণিত কার সাহেব) আমার দরখাস্তের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে অনেকখানি কি যেন লিখিয়াছেন। বাইবেল ক্লাসে কামাই করিতাম বলিয়া পাদ্রী প্রিন্সিপাল আমার উপর একটু চটা ছিলেন। ভয় হইতে লাগিল তিনি আমার বিরুদ্ধে কিছু যদি লিখিয়া থাকেন। সে ভয় কিন্তু অপনোদিত হইল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন যে, প্রিন্সিপাল আমার খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। পাদ্রি প্রিন্সিপালের বিচিত্র মতিগতি কোনদিনই বুঝিতে পারি নাই। আজও পারিলাম না। সাহেব লাল পেন্সিল লইয়া আমাব দরখাস্তের উপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখিলেন—'সিলেকটেড'। ধন্যবাদ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আসিয়াই শুনিতে পাইলাম অনাদিবাবুর সাহিত হেডক্লার্ক মহাশয় আলাপ করিতেছেন। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়াতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন মনে হইল।'

উপরোক্ত অংশটুকু আমার উপন্যাস 'নির্মোক' হইতে উদ্ধৃতি তাহা আগেই লিখিয়াছি। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা নির্মোকে নাই।

আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়িতে বসিয়াছিলাম। কারণ, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলাম যে সাহেব আমার দরখাস্তের উপর 'সিলেকটেড' লিখিয়াছেন। কিন্তু পনেরো দিন কাটিয়া যাওয়ার পর সাহেবের অফিস থেকে 'অফিসিয়াল' কোন পত্র আসিল না। আরও সাত-আটদিন অপেক্ষা করিলাম, তবু আসিল না। বাবা চিন্তিত হইলেন, আমিও হইলাম। কলিকাতা হইতে খবর আসিল যে ৫-ই জুন ভর্ত্তি হইবার শেষ দিন। ব্যাকুল হইয়া শেষে অস্টেন স্মিথের নামে একটি প্রাইভেট চিঠি রেজিষ্ট্রি করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে লিখিয়া দিলাম আপনি আমাকে মেডিকেল কলেজে ভরতি হইবার জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন বলিয়া আমি অন্য কোথাও দরখাস্ত করি নাই। শুনিতেছি মেডিকেল কলেজে ভরতির শেষ দিন ৫-ই জুন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার অনুমোদন পত্র ৫-ই জুনের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন। সে পত্র ৩-রা জুন না পাইলে আমি কলিকাতায় ৫-ই জুন পৌঁছিতে পারিব না। আমি যেখানে থাকি সেখান হইতে কলিকাতা প্রায় একদিনের পথ। ১লা জুন পর্যন্ত কোন উত্তর আসিল না। ২রা জুন সন্ধ্যায় একটি প্রকাণ্ড টেলিগ্রাম পাইলাম। অফিসের নম্বর তারিখ দেওয়া একটি অফিসিয়াল টেলিগ্রাম। সেই টেলিগ্রাম লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আফিসে গিয়া আর এক বাধার সম্মুখিন হইতে হইল। সেদিন ভরতির শেষ দিন। তদানীন্তন হেডক্লার্ক বলিলেন—টেলিগ্রামে তো আই, জি, সাহেবের স্বহস্তের সই নাই। টেলিগ্রাম জাল হইতে পারে। আমি বলিলাম, আমি এই টেলিগ্রামই পাইয়াছি চিঠি পাই নাই। আপনি যদি ভরতি না করেন তবে এই টেলিগ্রামের পিঠে লিখিয়া দিন এই ছেলেটি ঠিক তারিখে এই টেলিগ্রাম লইয়া আসিয়াছিল কিন্তু আমি ভর্ত্তি করি নাই। ক্লার্ক মহাশয় কিন্তু তাহাতেও রাজি হইলেন না। আমি কি করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। আমার পাশেই আর একটি ছেলে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল আপনি প্রিন্সিপাল ডিয়ার সাহেবের কাছে যান। ভাগ্যক্রমে ডিয়ার সাহেব তখন অফিসের বারান্দা দিয়া যাইতেছিলেন, তাহাকে গিয়া ধরিলাম। তিনি টেলিগ্রাম দেখিলেন এবং অফিসে আসিয়া ক্লার্ক-কে বলিলেন **'Admit him.'** ক্লার্ক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—**'Yes, Sir'** ভরতি-পর্ব নির্বিঘ্নে শেষ হইল। কিন্তু তখন আমি বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম

যে উক্ত ক্লার্কটি আমার একটি প্রচ্ছন্ন শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পরে তিনি আমাকে মহা বিপদে ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা ঘুস দিয়া তবে উদ্ধার পাই। এ কাহিনী পরে যথাস্থানে বলিব।

কলিকাতায় আমি আসি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। প্রথমেই সমস্যায় পড়িলাম কোথায় থাকিব? তখন মেডিকেল কলেজে হোস্টেল ছিল না। ছাত্ররা মেসে থাকিত। ৩নং মির্জাপুর স্ট্রীটে আমাদের চেনা বিশুদা ছিলেন। তিনি সাহেব গঞ্জের পশুপতিবাবু ডাক্তারের বড় ছেলে। বিশুদার ছোট ভাই ডাক্তারী পড়িতেন। এবং তিনি ৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট-এ থাকিতেন। তাঁহাদের আমার সমস্যার কথা বলিলাম। বিশুদা বলিলেন—আমাদের মেসে ১২ জন ছাত্র। তাহার মধ্যে তিনজন ছাত্র আগামী ছ-মাসের মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষা দিবে। একটা না একটা সীট খালি হইবেই। তুমি সুপারিনটেণ্ডকে বলিয়া রাখো। তখন মেসগুলির তত্ত্বাবধান করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একজন করিয়া সুপারিনটেনড্ নিযুক্ত হইতেন। আমি বিশুদার কাছে একটি দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া আসিলাম। বিশুদা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, হইয়া যাইবে। যে ছাত্রটি ভরতির দিন আমাকে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে যাইতে বলিয়াছিল, তাহার নাম শৈলেন সেন। পরে এই শৈলেন সেনেই কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার শৈলেন সেন হইয়াছিলেন। শৈলেনের সঙ্গেই মেডিকেল কলেজে আমার প্রথম ভাব। আমি দেহাতের ছেলে, শৈলেন শহুরে। তাহার বাবাও ডাক্তার। সে-ই আমাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মেডিকেল কলেজ দেখাইল। সেই আবার আমাদের ফার্স্ট-ইয়ারের রুটিন কি তাহাও বলিল। তাহার মুখেই শুনিলাম অ্যানাটমির লেকচারার পান সাহেব দিবেন। সকাল সাতটা হইতে আট-টা পর্যন্ত হইবে। কলেজ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া আমি সেওড়াফুলি চলিয়া গেলাম। সেখানে আমার বাবার মামা—আমার দাদামশায় বাস করিতেন। আর তাহার কাছে থাকিতেন তাঁহার দৌহিত্র শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন এম, এ, পড়িতেছেন। সব শুনিয়া দাদামশায় বলিলেন—'যতদিন না মেসে সীট পাওয়া যায় ততদিন তুমি এখান থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি কর। কানাই নিজের পড়াশুনার জন্য পাশেই ছোট একটা দোতলা ভাড়া করেছে। সেখানে তুমিও থাক। জায়গা যথেষ্ট আছে।' আমার বিহারে জন্ম। বাংলা দেশের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। সেওড়াফুলি হইতে কলিকাতায় ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করিতে করিতে আমার সে পরিচয় হইয়া গেল। নানা রকম বাঙালী দেখিলাম এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী

চরিত্রের আভাসও পাইলাম। যাহাদের প্রত্যহ দেখিতাম, তাহারা অধিকাংশই আফিস-গামী কেরাণী। ছাত্রও কিছু কিছু থাকিত। কিছু ব্যবসায়ী, কিছু ভিক্ষুক প্রত্যহ আমার সঙ্গী হইত। সমস্ত মিলাইয়া মনে সেদিন যে ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহাতে নানা রং। স্বর্থপরতার রং, নীচুভাব রং, কলহ-প্রবনতার রং, রসিকতার রং। ভাব-প্রবনতার রং, ছ্যাবলামির রং, অসভ্যতার রং, ভদ্রতার রং—অনেক রঙের বিচিত্র ছবি সেটি। এই ডেলিপ্যাসেনজারদের একটি সমাজও গড়িয়া উঠিয়াছিল ট্রেনের মধ্যে। খুড়ো, জ্যাঠা, মামা, দাদা প্রভৃতি সম্বোধনে অনেকে অনেককে ডাকিতেন। অনেকে অনেকের জন্য কোনের সীটটি রিজার্ভ করিয়া রাখিতেন। বেঞ্চির শেষ প্রান্তে এ বেঞ্চিতে দুইজন সামনের বেঞ্চিতে দুইজন বসিয়া এবং হাঠুর উপর চাদর বা খবরকাগজ বিছাইয়া তাসও খেলিতেন। পরনিন্দা এবং পরচর্চার আমেজে কামরা অনেক সময় গুলজার হইয়া উঠিত। ফেরিওয়ালাদের নানারকম মজাদার ছড়াও ভালোলাগিত খুব। দাদের মলম, দাঁতের মাজন, চিরুণী-ফিতা চানাচুর, সব রকম গাড়িতে উঠিত। অনেক ডেলি প্যাসেনজার ছোট ছোট কৌটায় বা সিগারেটের টিনে খাবার লইয়া যাইতেন। একজন ডেলিপ্যাসেনজার একবার চাদরের বদলে একটা মশারী ঘাড়ে করিয়া আসিয়াছিলেন। টেন ধরিবার তাড়ায় এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন যে চাদর আর মশারীর তফাত ঠিক করিতে পারেন নাই। ট্রেনে আর একটি জিনিশ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ট্রেনের টাইম সম্বন্ধে ডেলিপ্যাসেনজারদের জ্ঞান নির্ভুল। অনেকের পকেটেই মান্থলি টিকিটের সঙ্গে পাতলা একটা টাইম টেবিল থাকিত। ৭টা ৩২ ফেল করিলে তাহার পর ৮-১২ পাওয়া যাইবে। বর্দ্ধমান লোকাল ঠিক সময়ে কোন্নগরে পৌছিল কি না—এ ধরনের আলোচনা প্রায়ই শুনিতে পাইতাম। ট্রেনে বইও ফেরি করিত ফেরিওয়ালা। কিন্তু তাহাদের ভাণ্ডারে প্রায়ই বাজে বই থাকিত। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের দেখা কচিৎ পাইতাম। একবার 'চাঁদমুখ' প্রনেতা একজন শরৎচন্দ্রের দেখা পাইয়াছিলাম। 'চাঁদমুখ' এককপি কিনিয়া ভুলটি ভাঙিয়াছিল। ডেলি-প্যাসেনজারদের মধ্যে কিন্তু নাটকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল না। তাঁহারা বাড়ি হইতে ভালো বই আনিতেন। ডেলি-প্যাসেনজারদের মধ্যে প্রবীন বয়সের একজন ডিকেন্স-পাঠককেও আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তবে অধিকাংশ লোকই খবরের কাগজ পড়িতেন। সিনেমা পত্রিকাও অনেকের হাতে দেখিতাম।

আমি যখন মেডিকেল কলেজে ঢুকিলাম তখন কবি হিসাবে জনসমাজে

আমার কিঞ্চিৎ পরিচিতি ঘটিয়াছে। 'প্রবাসী' 'ভারতী' 'পরিচারিকা' 'কল্লোল' প্রভৃতি কাগজে আমার কবিতা তখন প্রকাশিত হইয়াছে। কলেজের অনেক বাঙালী ছেলেরা এবং দু-একজন বাঙালী শিক্ষকও আমার লেখা পড়িয়াছেন। সুতরাং কলেজে আমাকে ঘিরিয়া একটা কৌতূহল অনেকের মনে জাগিল। অনেকে যাচিয়া আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিল। কিন্তু আমি একটু মুখচোরা প্রকৃতির ছিলাম। কাহারও সহিত বড় একটা আলাপ জমাইতে পারিতাম না। সোমনাথ সাহা নামক একটি ছেলের সহিত কিন্তু একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হইল। সে বলিল যে 'ঝর্ণা' নাম দিয়া একটি পত্রিকা বাহির করিতে চায়। আমার একটি কবিতা চাই। কবিতা দিলাম তাহাকে। কিছুদিন পর 'ঝর্ণা' বাহির হইল। দেখিলাম আমার কবিতাটি ছাপা হইয়াছে। সে আরও বলিল, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত না কি কাগজটি দেখিয়াছেন এবং আমার কবিতাটি নাকি তাঁহার ভালো লাগিয়াছে। বলাবাহুল্য এ-সংবাদে খুবই উৎফুল্ল হইলাম। সোমনাথ বলিল সত্যেন্দ্রনাথ 'ঝর্ণা-তে একটি কবিতা দিবেন বলিয়াছেন। তাঁহার সুবিখ্যাত 'ঝর্ণা' কবিতাটি সোমনাথের 'ঝর্ণা'-তেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ কবিতাটি পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। তখন 'প্রবাসী'-র কষ্টিপাথর বিভাগে ভালো ভালো লেখা পুনর্মুদ্রিত হইত। কাজি নজরুলের 'বল বীর চির উন্নত মম শির।' কবিতাটিও প্রথমে আমি খণ্ডিত আকারে প্রবাসী পত্রিকায় কষ্টিপাথরেই পড়িয়াছিলাম। আমিও তখন কবিতা লিখিলেই প্রবাসীতে পাঠাইতাম, কিছু ছাপা হইত, কিছু ফেরত আসিত। মেডিকেল কলেজে এইভাবে আমার সাহিত্যচর্চা চলিতেছিল। আমি কবিতা লিখিয়া প্রায়ই কাহাকেও শুনাইতাম না। কেবল একটি ছেলেকে মাঝে মাঝে শুনাইতাম, কিন্তু এখন তাহার নামটি মনে পড়িতেছে না। বিস্মৃতির 'রবার' সর্বাগ্রে মানুষের নামটি স্মৃতি হইতে মুছিয়া দেয়। তাহার নামটি ভুলিয়াছি, কিন্তু আর সব মনে আছে। তাহার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। তাহার বাড়িতে আমি দুই-একবার গিয়াছিলাম। তাহার মা আমাকে যত্ন করিয়া খাবার খাওয়াইয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে ভবানীপুরে তাহার বাড়ি ছিল। মেডিকেল কলেজে তিনবৎসর আমরা একসঙ্গে পড়িয়াছি। ফোর্থ-ইয়ারে তাহার টাইফয়েড হয়। সেকালে টাইফয়েড মারাত্মক অসুখ বলিয়া গণ্য হইত। কারণ তখনও ক্লোরোমাইসেটিন বাহির হয় নাই। টাইফয়েডেই মারা গেল সে। তাহার শ্রাদ্ধ বাসরে আমি গিয়াছিলাম। সে সময় একটি কবিতাও লিখিয়াছিলাম মনে

পড়িতেছে। জানি না কবিতাটি তাহার বাড়িতে এখনও আছে কি-না। কবিতার খানিকটা আমার এখনও মনে আছে।

আমাদের ফেলে গেছ তুমি চলে
গেছ কি গো সেই দেশে
উষার কনক কিরণ যেথায়
সন্ধ্যায় নামে এসে
ঘুমোয় যেথা ঝরা ফুলদল
অধরের হাসি নয়নের জল
জ্যোৎস্নাব ধারা হেয় যেথা হারা
পূর্ণিমা নিশি শেষে

বিশ্বের ধন দু-দিনের লাগি
ছিলে আমাদের তীবে
কত সাধ-আশা স্নেহ-ভালোবাসা
গড়েছি তোমারে ঘিবে

ইহার পর আর ঠিক মনে পড়িতেছে না। যেটুকু লিখিলাম তাহাও হয়ত আসল কবিতার হুবহু প্রতিচ্ছবি হইল না। বিস্মৃতির কবল হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে পড়িল। কথাটা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এখনই বলিয়া রাখা ভালো। পরে হয়ত ভুলিয়া যাইব।

আমরা যখন প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন কাহারও প্রভাব অতিক্রম করিয়া এরূপ কোন সজ্ঞান চেষ্টা আমাদের ছিল না। আমরা যে যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতাম। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা পড়িতাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সেন, অনুপমা দেবী, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এবং আরো অনেক উদীয়মান কবির কবিতা সাগ্রহে পড়িতাম। ইহাদের সকলের প্রভাব নিশ্চয় আমাদের মনের উপর এবং লেখার উপর পড়িত। কিন্তু আমরা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই যে এইসব মনীষীদের প্রভাব মুক্ত না হইতে পারিলে বড় সাহিত্যিক হইতে পারা যাইবে না। আমাদের প্রায় সমকালীন একদল সাহিত্যিকের মনে কিন্তু এ চিন্তা জাগিয়াছিল। তাঁহারা সর্বশক্তি ব্যায় করিয়া অবনীন্দ্রনাথ হইতে চেষ্টা করিতেন। পরে দেখা

গিয়াছে তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাঁহারা যেখানেই অবনীন্দ্রনাথ হইয়াছেন, সেখানেই উদ্ভট, হাস্যকর, বা রসহীন হইয়া পড়িয়াছেন। দু-একজন লেখকের অবনীন্দ্রনাথ—অনন্যতার মধ্যে বিদেশী কন্‌টিনেন্‌টাল লেখকদের নির্লজ্জ নকলও দেখা গেল। হুবহু চুরিও ধরা পড়িল, দু-এক জায়গায়। আমার মনে এ ধরনের কোনও চিন্তা জাগে নাই তাহার কারণ আমার সাহিত্য-চর্চা কলিকাতার বাইরে শুরু হইয়াছিল। এ ধরনের হুজুগে মাতিয়া উঠিবার কোন সুযোগই আমি পাই নাই। যাহা যখন মনে হইয়াছে, লিখিয়াছি। এবং কাগজে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাহার বেশী আর কিছু করিবার ইচ্ছা আমার হয় নাই। শ্রী অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' লিখিয়াছেন। বইটি সুখপাঠ্য। কিন্তু আমার মনে হয় নাম করণে কিঞ্চিৎ ভুল হইযাছে। নামটা হওয়া উচিত ছিল 'কল্লোল হুজুগ'। একটা স্বপ্ন-জীবী মাসিক পত্রিকা যুগান্তর আনিয়াছে এ কথা হাস্যকর। বাংলা সাহিত্যে এখনও রবীন্দ্রযুগ চলিতেছে। রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগেও অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অকপট সাহিত্য-সাধনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহারা নিজ নিজ স্বকীয়তায় সমুজ্জল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপরই কি কম লোকের প্রভাব পড়িয়াছিল? বিহারীলাল, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, শেক্সপীয়র, শেলী, কীটস্‌, ব্রাউনিং, বৈষ্ণব-পদাবলী, কালিদাস, বাউলসংগীত,—কত নাম করিব। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ। তিনি কাহারও প্রভাব অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন নাই। কাহারও নকল করেন নাই। চেষ্টা করিয়া কেহ অনন্য হইতে পারে না। অনন্যতা অর্জন করা যায় না, ইহা বিধাতার দান।

এবার মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্‌। মেডিকেল কলেজে তখন সব প্রফেসারই সাহেব ছিলেন। কেবল অ্যানাটমি ও কেমিষ্ট্রি ফিজিক্‌-এর প্রফেসর ছিলেন বাঙালী। অ্যানাটমির ছিলেন ডাক্তার ননীলাল পাল। কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্সের প্রফেসারের নাম মনে নাই। অ্যানাটমির ডিমনস্ট্রেটাররা সবাই বাঙালী ছিলেন। নগেন চ্যাটুজ্যে খুড়ো, ( তাঁহার আসল নাম ভুলিয়াছি ) ডক্টর দবীরাদ্দিন আমেদ, ডক্টর বসাক। জ্ঞানবাবু নামেও একজন ছিলেন বোধহয়। ফিজিওলজির ভার চারুব্রত রায়, দুর্গাপদবাবু, অমূল্যরতন চক্রবর্তী প্রভৃতির কথা আজও ভুলি নাই। ফিজিওলজির প্রফেসর ছিলেন Shorten সাহেব। ইহাদের মধ্যে অনেকেই লেখক 'বনফুল'-এর সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং সে জন্য আমাকে স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের অনেকের স্নেহধারা আমার ছাত্রজীবনকে স্নিগ্ধ

করিয়াছে, আমার উত্তরজীবনেও তাহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ডাক্তার চারুব্রত রায়ের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। পরে তাহার নিকট আমি প্যাথলজির কাজ শিখিয়াছি। যথাস্থানে সে কথা বলিব।

কিছুদিন ডোল প্যাসেনজারি করিয়া আমি অবশেষে তিননম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে দ্বিতলে একটি সীট পাইলাম। সেখানে আমার সহপাঠী ননী সাহা, গৌর সাহা, এবং হরেন ছিল। অবিলম্বে তাহাদের সহিত ভাব হইয়া গেল। ননীর সহিত ভাবটা বেশী হইল। তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমশ সে সকলের দাদা হইয়া গেল। ননী ক্রমশ গার্জেন হইয়া উঠিল আমার। আমার জামা-কাপড় ঠিক করিয়া রাখা, আমার বিছানার চাদর পাতিয়া দেওয়া, শেলফের বই গুছাইয়া দেওয়া, আমার ট্রাঙ্কে তালা থাকিত না বলিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করা—আমাকে ভোরে উঠাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি...। বাড়ি হইতে টাকা আসিতে দেরী হইলে দাদাই আমার খরচ চালাইয়া দিত। আমি বরাবরই একটু কাছাখোলা, আগোছালো প্রকৃতির লোক। ভগবান কিন্তু বরাবরই আমাকে সামলাইবার জন্যে একজন না একজন লোক জুটাইয়া দিয়াছেন। যখন সাহেব-গঞ্জের স্কুল বোর্ডিংয়ে ছিলাম তখন ছিল মুন্সী নামে একটা চাকর। আমার প্রতি তাহার অহেতুক স্নেহ ছিল। স্নানের পর সব ছেলেরাই নিজেদের কাপড় নিজে কাচিয়া লইত। আমিও কাচিতাম। কিন্তু ঠিকমত কাচিতে পারিতাম না। কোন রকমে জলে ডুবাইয়া ভাল করিয়া না নিংড়াইয়া শুকাইতে দিতাম। মুন্সী দু-একদিন দেখিল তারপর বলিল, 'বুতুরু তু কাপড়া রাখি দ। হম খিচি দেবো'. সেই হইতে সে বরাবর আমার কাপড় কাচিত, বিছানা করিত। টেবিলটাও মাঝে মাঝে ঝাড়িয়া দিত। হাজারীবাগ কলেজ-হস্টেলে জুটিয়াছিল গোপা। সে আমার সব করিয়া দিত। মেডিকেল কলেজ মেসে দাদা আমার ভার লইল। দাদার সম্পর্কে আর একটি মজার ঘটনা মনে পড়িতেছে। দাদার যখন বিবাহ হইল আমরা অনেকে কুষ্টিয়ায় বরযাত্রী গেলাম। আমাদের সঙ্গে গেলেন খগেনদা। খগেনদার মত আমুদে সরল লোক বিরল। তিনি পরে মেজর কে, কে, ঘোষ হইয়া কর্ণনামা কণ্ঠরোগ বিশারদ হিসাবে খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। খগেনদার কিন্তু আরো নানারকম গুণ। তিনি ভালো গান গাইতে পারেন, গানে সুর দিতে পারেন, ফুটবল ও ক্রিকেট সম্বন্ধে চির-উৎসুক তিনি। চমৎকার প্রাণ খোলা লোক। খগেন দত্ত দাদার বিবাহে

বরযাত্রী গেলেন। বিবাহ-বাসবে গিয়া দেখিলাম নববধূটি দাদার দেহায়তনের তুলনায় খুবই ছোট। উচ্চতায় দাদার বুক পর্যন্ত পৌঁছোয় না। আমি একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম।

গাও আনন্দে গাও
দাদার মস্ত জীবনে একটা
এসেছে ছোট্ট ফাও
মোদের দাদার জীবনে মস্ত
এসেছেরে ফাও আড়াই হস্ত
তাইতেই ওগো দাদা যে ত্রস্ত
উৎসাহ তারে দাও।

খগেনদা এই গানেব স্থর দিলেন এবং পবদিন আমরা কুষ্টিয়ার রাস্তায় এই গান গাহিতে গাহিতে একটা শোভাযাত্রা বাহির কবিলাম। খগেনদাব গলায় হার্মোনিয়ম ঝোলানো আর বাকি সকলের কণ্ঠে সমস্বরে এই গান। আর একটি গানও লিখিয়াছিলাম, চলিয়া আসিবার দিন বিদায়-সঙ্গীত। প্রথম কথা, লাইন মনে আছে।

এবার তবে যাচ্ছি মশাই
নেহাত তবে যাচ্ছি এবার
দিয়ে গেলাম পা টুকুতে ( মানে শ্রীচরণে )
যতটুকু কষ্ট দেবার।

বাকিটা মনে নাই। খগেনদার হয়ত আছে। তিনিই সভায় গানটি গাহিয়াছিলেন। দাদার বিবাহে খুবই আনন্দ করিয়াছিলাম আমরা। অনেক কিছু ভুলিয়া গিয়াছি। দুইটি জিনিস কিন্তু এখনও ভুলিতে পারি নাই। বিবাহের ভোজে টাটকা টাঁই মাছের যে চমৎকার ঝোল হইয়াছিল তাহার স্বাদটি এখনও মুখে লাগিয়া আছে। আর মনে আছে দাদার কিশোর বয়স্ক শ্যামবর্ণের ছটফটে ভাইটিকে। সে যে কতবার ছোটাছুটি করিয়া আমাদের ফাই-ফরমাস খাটিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাকে দেখিয়া বুধ-গ্রহের কথা মনে পড়িয়াছিল আমার। কিছুদিন আগে দাদা মারা গিয়াছে। তাহার সেই ভাইটি কোথায় আছে জানি না। কিছুদিন আগে বৈষ্ণবদের এক সভায় দাদার সহিত আমার শেষবার দেখা হয়। দাদা শেষে বৈষ্ণব ভক্ত হইয়াছিল।

মেডিক্যল কলেজের আর একটি বন্ধুর কথা মনে পড়িল। সমরেশ ভট্টাচার্য।

সে আমাদের মেসে থাকিত না। নিমতলা স্ট্রীটে তাহার বাড়ি ছিল। সে ছিল সেকালের সুবিখ্যাত ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। আমার সঙ্গে যখন তাহার আলাপ হয় তখন তাহার বাবা মারা গিয়াছেন। তাহার দাদা সমরেশ তখন সবে ডাক্তার হইয়াছেন। সমরেশের সঙ্গে আমার আলাপের সূত্র অবশ্য সাহিত্য। খুব রসগ্রাহী লোক ছিল সে। এখনও বাঁচিয়া আছেন। পারত পক্ষে বাড়ির বাহির হইত না। শুনিয়াছি রোজ সকালে নিজে বাজার করে। তাহার সহিত আলাপের সূত্রপাত একটি কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটি এই—

মোর নেশা হয় যদি লাল
আর সবুজ রঙের মন যদি পাই
গোলাপী রঙের গাল
আর হ'য়ে যদি কল্পনা মম
সাঁঝের সোনালি সাগরের সম
আমি খুলে দিতে পারি মনের তরণী
তুলে দিতে পারি পাল।

আরও খানিকটা ছিল, মনে পড়িতেছে না। এই কবিতাটা কোন কাগজে বাহির হইয়াছিল বোধহয়, কিংবা আমার মুখেই সমর হয়ত কবিতাটি শুনিয়াছিল। তখন আমার সব কবিতাই মুখস্থ থাকিত। মোট কথা এ কবিতাটা সমরের খুব ভালো লাগিয়াছিল। বোধহয় সে ইহাতে সুরও বসাইয়াছিল। তখন সে গান-বাজনার চর্চাও করিত। তিমিরবরণের সহিত ভাব ছিল তাহার। সমরই আমাকে তিমিরবরণের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিল। একটি রাত্রির কথা মনে হয় এখনও। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি। সমরদের বাড়ির ছাদে বসিয়া তিমির বাঁশী বাজাইয়াছিল। তাহার পর তিমিরের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় নাই। তবে সমরের বাড়িতে আমি প্রায়ই যাইতাম। তাহার মা খুব স্নেহময়ী ছিলেন। খুব যত্ন করিতেন। সমরের মত ধীমান ছেলে আমি বড় একটা দেখি নাই। সে কখনও বই পড়িত না আমরা জোরে জোরে পড়িতাম। সে চোখ বুজিয়া শুনিত। তাহাতেই সে পরীক্ষায় পাশ করিয়া যাইত। সে বড় লোকের ছেলে ছিল। দামী দামী ডাক্তারী বই কিনিতে কখনও কার্পণ্য করে নাই। আমি সব বই কিনিতে পারিতাম না। তাই সমরের বাড়িতে গিয়া সেগুলি পড়িতাম। আমি জোরে জোরে পড়িতাম। ঘরের একপাশে ছিল একটি বড় পালঙ্ক। আর

একদিকে একটা গোল টেবিল। চেয়ারও ছিল খান দুই-তিন। আর ছিল একটি গ্রামোফোন। আর খান দুই রেকর্ড। একটি লালা চাঁদ বড়ালের—কাদের কূলের বউ গো তুমি, কাদের কূলের বউ। আর একটি বিশ্বনাথ রাওয়ের হর হর হর, বোম বোম বোম বামে শোভে গৌরী। আমরা যখন পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া যাইতাম তখন এক-কাপ করিয়া চায়ের অর্ডার দেওয়া হইত। চা খাইতে খাইতে আমরা গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চাপাইয়া দিতাম। কখনও লালা চাঁদ, কখনও বিশ্বনাথ রাও। 'কাদের কূলের বউ' শেষ হইলেই—'হর হর হর, বোম বোম'——তাহার পর আবার, 'কাদের কূলের বউ' যতক্ষণ আমাদের পড়ার 'মুড' আবার ফিরিয়া না আসিত ততক্ষণ আমরা এই দুটি রেকর্ড বাজাইতাম।

এই সময় শিশির কুমার ভাদুড়ী আমাদের খুব অভিভূত করিয়াছিলেন। তাহার 'সীতা' আমাদের খুব মুগ্ধ করিয়াছিল। উপর্যুপরি ছয়-সাতবার বইটি দেখিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। এই সময়ের আগে বা পরে পরিমল গোস্বামীর সহিত আমার পুনর্মিলন ঘটে। সে তখন বোধ হয় জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে থাকিয়া এম এ পড়িত। মনে পড়িতেছে এই সময় তাহার সহিত আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম প্রণাম করিয়া আসি। তিনি জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দার মাঝখানে বসিয়া ছিলেন। আর এক প্রান্তে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ আর একপ্রান্তে গগনেন্দ্র নাথ। বিরাট বারান্দা, তিনজন নিবিষ্ট চিত্তে কাজে মগ্ন। আমি রবীন্দ্রনাথকে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি দু-ই একটি কি কথা বলিয়া ছিলেন মনে নাই। সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াই নাই, তিনজন তপস্বীর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার সাহস ছিল না।

পরিমল গোস্বামীর কথা বলিতেছিলাম। সে এ সময় প্রায়ই আমার সঙ্গে জুটিয়া যাইত। তাহার সহিত অনেক থিয়েটার দেখিয়াছি। রাস্তায় রাস্তায় টো টো করিয়া বেড়াইয়াছি। মাঝে মাঝে সাহেবগঞ্জ হইতে প্রবোধদাও আসিতেন, প্রবোধদার কথা আগে বলিয়াছি। প্রবোধদার কোমল অন্তঃকরণ ছিল। তিনি দুঃখের গল্প পড়িতে পড়িতে কাঁদিয়া ফেলিতেন। একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমরা একবার ট্রেনে করিয়া কোথায় যেন যাইতেছিলাম। তখন শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' আট আনা সিরিজ-সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবোধদা একখণ্ড কিনিয়াছেন এবং ট্রেনে পড়িতে পড়িতে চলিয়াছেন। দেখিলাম ক্রমশঃ তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। অবশেষে গণ্ড বহিয়া অশ্রু-ধারা নামিতে লাগিল। তাহার পর তিনি যাহা করিলেন. তাহা অপ্রত্যাশিত। 'উঃ.

আর পড়তে পারছি না', বলে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়া সদ্য-কেনা বইটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। প্রবোধদা (প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) একটি অদ্ভুত সুন্দর চরিত্র। আদর্শবাদী, স্বদেশ-প্রেমিক, হঠাৎ চটিয়া যান, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলেন বন্ধুবৎসল বিদগ্ধ পুরুষ। তিনি এখন কোথায় আছেন জানি না। লিলুয়ায় বাড়ি করিয়াছিলেন। কিছুদিন আগে সেখানে চিঠি লিখিয়াছিলাম। উত্তর আসে নাই। বাঁচিয়া আছেন তো? সমরেশের বাড়ি যখন যাইতাম তখন আমি 'রূপকথা' নামে একটি নাটক লিখিয়াছিলাম। রূপক একটা। সমরেশের খুব ভালো লাগিয়া গেল। সে প্রস্তাব করিল—'চল এটা শিশির ভাদুড়ীকে শুনিয়ে আসি।'

'শিশির ভাদুড়ীকে পাব কোথায়?'

'চল না, থিয়েটার থেকে তাঁর বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করব –'

উভয়ে পথে বাহির হইয়া পরিলাম। বেলা তখন দশটা। রবিবার। কলেজ ছুটি। থিয়েটারে গিয়া তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করিল সমরেশ। মনে হইতেছে বাদুর-বাগানে তখন তিনি থাকিতেন। আমরা বাদুরবাগানে গিয়া তাহার বাসাটাও বাহির করিলাম। বাসার সামনে ছোট বারান্দা ছিল, আমি তাহার উপর বসিয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সমর দুয়ারের কড়া নাড়িতে লাগিল। একটি খাঁকি হাফ-প্যান্ট-পরা কিশোর ছেলে কপাট খুলিয়া বলিল, 'বাবা বাড়ি নেই।'

'তুমি কে?'

'আমরা শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমি তাঁর ছেলে. উনি সকালবেলায়ই বেরিয়ে গেছেন। এক্ষুণি ফিরবেন। দুপুরে এখানেই খাবেন, খেয়ে যান নি।'

এই বলিয়া সে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। আমরা দু-জন বারান্দায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় আধ-ঘণ্টা পর একটা ঝরঝরে মোটর সামনে আসিয়া থামিল। সেই প্রথম শিশির ভাদুড়ীকে দেখিলাম, যিনি রাম-বেশে সজ্জিত নন। যাঁহার পরিধান আমাদেরই মত পাঞ্জাবী আর কাপড়। আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিলাম।

'কে আপনারা?'

আমি বলিলাম, 'আমরা দুইজনেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আমি একটা ছোট নাটক লিখেছি। আপনাকে শোনাবার ইচ্ছা। শুনবেন কি?'

'নিশ্চয় শুনবো।'

'কখন আসব তা-হলে ?'

'এখুনি শুনবো। আগে খেয়ে নিই। আপনারা খেয়ে এসেছেন তো ?'

'আমরা খেয়ে এসেছি।'

'তাহলে আসুন।'

ভিতরে গিয়ে দেখিলাম গামলায় তাঁহার ভাত ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তাহার ছেলেই আসিয়া আসন পাতিয়া দিল, জল দিল, এবং ভাতের থালাটি তাঁহার সম্মুখে আগাইয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গেল আমাদেব দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'এইবার চলুন। থিয়েটারে যাওয়া যাক্ সেইখানেই আপনার নাটক শুনবো—।' গাড়িটি দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাতে চড়িয়া আমরা থিয়েটারে গেলাম। থিয়েটারের নামটা 'নাট্য-নিকেতন' না 'নাট্য-মন্দির' তাহা ঠিক মনে নাই।

থিয়েটারের ভিতর গিয়া দেখিলাম একটি প্রকাণ্ড ঘরের এক-কোণে একটি খাটে বিছানা-পাতা আছে। চেয়ারও ছিল কয়েকখানা। আমাদের বলিলেন— 'আপনারা ওই চেয়ারে বসুন। আমি খাটে শুয়ে শুনবো।'

তিনি খাটে উঠিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া চোখ বুজিলেন।

'পড়ুন।'

আমি নাটক পড়িতে লাগিলাম। তিনি সর্বক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হইতে লাগিল তিনি বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু আমি থামি নাই। পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। 'ছোট নাটক' অল্পক্ষণেই পড়া শেষ হইয়া গেল। শেষ হইবামাত্র শিশিরবাবু বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

বলিলেন, 'নাটক খুব ভালো হয়েছে আপনার। আমার যদি পয়সা থাকত আমি এটাকে মঞ্চস্থ করতাম। কিন্তু ঋণে আমার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে, আমি পারব না।'

সমর বলিল 'কত টাকা লাগবে ?'

'এক লক্ষ টাকা। উনি কল্পনার যে দৌড় দেখাইয়াছেন স্টেজে সেটা ফুটিয়ে তুলতে গেলে ওর কমে হবে না। তবে আপনার নাটক লেখায় হাত আছে ছোটখাটো সামাজিক বিষয় নিয়ে কিংবা আরব্য-উপন্যাসের গল্প নিয়ে নাটক লিখুন। আমি অভিনয় করব।'

এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই কক্ষে আমাদের মাস্টারমশাই ফিজিওলজির

ডেমন্‌সস্ট্রেটার ডাক্তার চারুব্রত রায় প্রবেশ করিলেন এবং শিশিরবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,

'আমাকে ফোন করেছিলে কেন ? আমি যা বলেছি, তা কোরছ ?'

শিশিরবাবু যেন কেঁচোটি হইয়া গেলেন।

বলিলেন—'এইবার করব। লিভারের ব্যথাটা কমছে না।'

'মদ না ছাড়লে ও ব্যথা ছাড়বে না। ফোন কবে আমাকে বিরক্ত কোর না। মানে যা বলেছি, তাই করো। তারপর আসব—'

বলিয়া তিনি গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমাদের সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। আমরা কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন মাস্টারমশায়ের সহিত আবার দেখা হইল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করিলেন—'শিশির ভাদুড়ীর কাছে গিয়েছিলে কেন ?'

'আমি একটা নাটক লিখেছি। সেটাই ওকে শোনাতে গিয়েছিলাম।'

'আগে এম. বি. পাশ করে ডাক্তার হও, তারপর নাটক লিখো। এখন থেকে যদি শিশিরের কাছে যাও, আর তোমার টিকিটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

উজ্জ্বল উৎসাহের আগুনে মাস্টার মশায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিলেন। এম.বি. পাশ করিবার আগে আর নাটক লিখিবার চেষ্টা করি নাই। তাঁহার থিয়েটার অবশ্য দেখিতাম 'পীটে'র সিটে বসিয়া। তাঁহার অভিনীত প্রায় সব নাটকই বোধহয় দেখিয়াছি। অভিনেতা হিসেবে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মাস্টার-মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রকৃত সম্পর্ক পরে জানিয়াছিলাম। মাস্টার মশাই শিশির ভাদুড়ীর প্রতিভাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। স্নেহ করিতেন খুব। উভয়ই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। মাস্টার মশাই কিন্তু সিনিয়র ছিলেন। শিশিরবাবু তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন এবং দাদার মতই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিই তাহার চিকিৎসক ছিলেন। বিপদে পড়িলে তাঁহাকেই ডাকিতেন। অনেকদিন পরের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তখন আমি এম. বি. পাশ করিয়া মাস্টার মশায়ের নিকট ল্যাবরেটরি ট্রেনিং লইতেছিলাম। সেদিন সন্ধ্যা, আন্দাজ ৭টার সময় মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে আমি মাইক্রোস্কোপে একটি স্লাইড পরীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় ফোনটা ঝনঝন করিয়া বাজিয়া

'হ্যালো, চারুবাবু আছেন ?'

'আছেন, উনি এখন স্নান করছেন, বাথরুমে ঢুকেছেন।'

'ওকে বলুন, এখখুনি যেন একবার আসেন, শিশিরবাবু রামের পার্ট প্লে করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, ড্রপ সিন ফেলে দেওয়া হয়েছে। অডিটোরিয়মে ভয়ানক হৈ-চৈ হচ্ছে।'

'বলছি, এখুনি।'

আমি বাথরুমের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া খবরটি মাস্টারমশায়কে দিলাম। মনে হইল অস্ফুট স্বরে কি যেন একটা বলিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'বলে দাও আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।' ওকে যেন শুইয়ে রেখে দেয়।'

বাথরুম হইতে বাহির হইয়া মাস্টারমশাই আমাকে বলিলেন 'তুমিও আমার সঙ্গে চল। রাস্তায় গাড়ি থামাইয়া একটি বরফের slat ( চাঙড় ) কিনিয়া লইলেন। একটা ওষুধের দোকান হইতে কিছু ওষুধ কিনিলেন।

থিয়েটারে গিয়া আমরা সোজা গ্রীনরুমে ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম একটি সোফায় রামবেশী শিশিরকুমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। চারুবাবু বরফগুলি ভাঙিয়া তাঁহার মাথায় চাপাইয়া দিলেন। তাহার পর বরফ শীতল জলে তোয়ালে ভিজাইয়া তাহা নিঙড়াইয়া তাহার মুখে জল দিতে লাগিলেন। অডিটোরিয়মে তুমুল চীৎকার চলিতেছে। একটু পরে শিশিরবাবুর জ্ঞান ফিরিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। শেষ পযন্ত আবার গিয়া সেই দিনই দর্শকদের অভিবাদনও না কি করিয়াছিলেন। আমরা অবশ্য শেষ পযন্ত ছিলাম না। তাঁহার জ্ঞান হইবার পরই আমরা চলিয়া আসিলাম।

মেডিকেল কলেজে আরও তিনজন বন্ধুর কথা মনে পড়িল। অখিলদা ( অখিলকৃষ্ণ দত্ত ) ক্ষিতীশ সর্বাধিকারী এবং শিবদাস বসু মল্লিক। অখিলদা আমাদের অপেক্ষা অনেক সিনিয়র ছিলেন। আমরা যখন সেকেণ্ড-ইয়ারে তিনি তখন বোধহয় সিক্‌স্‌থ ইয়ারে পড়িতেন। আমাদের অনেক আগে তিনি ডাক্তার হইয়া প্রাক্‌টিস আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন আমার কবিতা পড়িয়া। আমার যে সব কবিতা কাগজে বাহির হইয়াছিল, সেগুলি তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। একদিন হঠাৎ আসিয়া বলিলেন, 'তোমার কবিতার খাতাটা দেখি তো।' তখন আমার কোন কবিতার খাতা ছিল না। যে সব কবিতা ছাপা হইত, সেগুলিও সংগ্রহ করিয়া রাখিবার মত বৈষয়িক বুদ্ধি আমার ছিল না। মাসিক পত্রিকা হইতে ছিঁড়িয়া এলোমেলোভাবে সেগুলি আমার তোরঙ্গে রাখা থাকিত। তখনও সুটকেস্ জিনিসটা এত প্রচলিত হয় নাই,

তোরঙ্গের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হইত। আমার খাতা নাই বলিয়া অখিলদা আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

বলিলেন, 'তুমি কবিতা লেখ কিসে?'

'কলেজের এক্সারসাইজ বুকে।'

অবাক হইয়া গেলেন অখিলদা। তাহার পর হাসিতে লাগিলেন। কথায় কথায় হাসিতেন তিনি।

কয়েকদিন পরে অখিলদা একটি মোটা বাঁধানো খাতা লইয়া হাজির হইলেন। চামড়া দিয়া বাঁধানো কাগজগুলি প্রায় আর্ট পেপারের মতো।

অখিলদা খাতাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'বলাই এটি তোমাকে দিলাম। এই খাতাতেই কবিতা লিখো।'

আমি অবাক হইয়া গেলাম। আনন্দ হইল খুব। আমার সাহিত্যজীবনে এইটেই প্রথম অকৃত্রিম স্নেহের উপহার। ভালো মন্দ অনেক কবিতা লিখিয়া সে খাতা ভরাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে খাতাটিও আমার কাছে রাখিতে পারি নাই। আমার বন্ধু শিবদাস বসু মল্লিকের যখন বিবাহ হয় তখন খাতাটি শিবদাসের স্ত্রী হাসিকে উপহার দিয়াছিলাম। হাসি এখন বৃদ্ধা হইয়াছে, কোথায় যেন ডাক্তারি করে। আমার সেই খাতাটি এখনও তাহার কাছে আছে কিনা জানি না। শিবদাস বসুমল্লিক আমার মেডিকেল কলেজের জীবনে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলিব।

ক্ষিতীশ সর্বাধিকারীর সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল একটু অদ্ভুতরকমে। একদিন ক্লাসে দেখি ঠিক আমার পিছনে বসিয়া একটি ছেলে আমার কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখিলাম একটি চশমাপরা ছেলে আমার দিকে চাহিয়া আছে। মুখে দুষ্টুমি-ভরা হাসি। ক্ষিতীশের সহিত তখনই আলাপ হইল। আলাপ ক্রমশ বন্ধুত্বে পরিণত হইল। সে বন্ধুত্ব আজও অটুট আছে। যদিও তাহার কর্মস্থল মেদিনীপুর এবং আমার ভাগলপুর ছিল, তবুও মাঝে মাঝে পত্রালাপ হইত। মেদিনীপুরে একবার সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি হই আমি। ক্ষিতীশের বাড়িতেই ছিলাম। তাহার ছেলেদের সঙ্গে এবং কন্যা দীপার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল তখন। দীপা এখনও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। ক্ষিতীশ অন্ধ হইয়া গিয়াছে। অমন একটা প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের চোখের আলো হঠাৎ নিবিয়া গিয়াছে এ কথা যেন

কল্পনাও করা যায় না। প্রাণবন্ত লোক ছিল ক্ষিতীশ। জোরে জোরে কথা বলিত, হা হা করিয়া হাসিত। যে কোন হুজুগে মাতিবার জন্য পা বাড়াইয়া থাকিত। ক্ষিতীশ আমাকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে মাংস রাঁধিতে শিখাইয়াছিল। সুযোগ পাইলে এখনও সেই পদ্ধতিতেই মাংস রাঁধি। সে পদ্ধতিতে আমি মাছ, এমনকি তরিতরকারীও রাঁধিয়াছি। খুব সুস্বাদু হয়।

এইবার শিবদাস বসুমল্লিকের কথা বলি। শিবদাস আমার মেডিকেল কলেজের জীবনের অনেকখানি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। ক্লাসে ঠিক আমার পরেই শিবদাসের নাম ছিল। কিন্তু ক্লাসে কোনদিন তাহাকে দেখি নাই। থিয়োরিটিকাল ক্লাসগুলিতে কেহ বোধ হয় তাহার হইয়া **proxy** দিত। প্রাকটিকাল ক্লাসেও তাহাকে কোনদিন দেখি নাই। আমার পাশের স্থানটা বরাবর খালিই থাকিত। ফার্স্ট-ইয়ারের শেষে একদিন জুওলজি প্রাকটিকাল ক্লাস হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম ক্লাসের বাহিরে মাঠের উপর একটি মোটাসোটা ছেলে আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার পরনের কাপড় মালকোচা দেওয়া। ডান হাতে একটি বাইক ধরিয়া আছে। আমি মাঠে নাবিতেই সে আমার দিকে আগাইয়া আসিল এবং প্রশ্ন করিল 'আপনার নামই কি বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় ?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ—।'

সঙ্গে সঙ্গে সে আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম আমি।

'আমার নাম শিবদাস বসুমল্লিক।'

'রোগ অব দি ফার্স্ট ওয়াটার' অদ্ভুত লোকটিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম এবং তাহার হাসি দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্টও হইলাম। কলেজে তখন নীলমণির দোকানই আমাদের একমাত্র রেস্তরাঁ ছিল। সেখানে গিয়া উভয়ে চা-পান করিলাম, ডিমের মামলেট সহ।

'এতদিন কলেজে আসনি কেন ?'

'আমি একটি আফিসে চাকরী করছি।'

'চাকরি ? সে কি !'

'চাকরি না করলে আমরা গুষ্টিসুদ্ধ না খেয়ে মরব। দাদা এখন আমাদের বাড়িতে একমাত্র উপার্জনক্ষম লোক। তিনি অসুস্থ হয়ে চেঞ্জে গেছেন। হাফ-পে পান এখন। সে টাকা তাঁর চেঞ্জের খরচেই চলে যায়। আমি একটা আফিসে

চাকরি করে সংসার চালাচ্ছি। তাই কলেজে আসতে পারি নি। অর্থাৎ আমি একটা চাম-চামাটু।'

বলিয়া সে হাসিল। তাহার হাসিটি অবর্ণনীয়। তাহাতে ব্যঙ্গ ও করুণ রসের সহিত এমন একটা বেপরোয়া নির্ভীকতার আমেজ ছিল যে আমি সত্যিই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। শিবদাস বলিল, 'আমি আসছে বছব পরীক্ষা দেব ঠিক করেছি। বইপত্র এখন কিছু নেই। পরে সে সব জোগাড় করতে হবে। দাদা যতদিন না ফিরে এসে কাজে জয়েন করছেন ততদিন কিছু হবে না। পরে আবার আপনার কাছে আসব। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তো? আমাকে পড়িয়ে দিতে হবে। আমি বি. এস. সি. পাশ। আমাকে কেমিষ্ট্রি ফিজিকস্ দিতে হবে না, কিন্তু বায়োলজিটা দিতে হবে। সে সম্বন্ধে আপনার সাহায্য চাই—।'

প্রতিশ্রুতি দিলাম সাহায্য করিব।

এই সূত্রে ক্রমশ তাহার সহিত আলাপ ঘনিষ্টতর হইতে লাগিল। সে মাঝে মাঝে আমার মেসে আসিত এবং পড়াশুনো করিত। বছর দুই-এর মধ্যে এই ঘনিষ্টতা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইল। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব, তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কথাবার্তার মধ্যে তাহার নিজের সৃষ্ট অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দাবলী, তাহার হিউমার আমাকে বড়ই মুগ্ধ করিত। এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে কিছুদিন মেস পরিত্যাগ করিয়া তাহার বাড়িতে পেইং-গেষ্ট হিসাবে বাস করিয়াছিলাম। ফলে তাহার পরিবারের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্টতা হইয়া গেল। ঘনিষ্টতা না বলিয়া আত্মীয়তা বলাই উচিত। ভণ্টুর বাবা, দাদা, মেজদা, ছোট ভাই, ভণ্টুর বউ-দিদিরা, বিশেষ করিয়া বড় বউদি, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার পরম আত্মীয় হইয়া গেল। ইহাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমি অনেকদিন ঘনিষ্ট-ভাবে যুক্ত ছিলাম। এই সবের ছাপ আমার পরবর্ত্তীকালে রচিত উপন্যাস 'জঙ্গম' বইটিতে আছে। 'জঙ্গমের' ভণ্টু চরিত্রের ভিত্তি শিবদাস। যদিও তাহাতে অনেক রং লাগাইয়াছি, তাহার জীবন চরিতের সহিত শিবদাসের জীবন চরিতের অনেক অমিল আছে, তবু ভণ্টু চরিত্রের কাঠামোটা শিবদাস বসু মল্লিকেরই। তাহার পরিবারবর্গের অনেকের চিত্রও উক্ত উপন্যাসে আছে। কিন্তু সেগুলি বাস্তব-কল্পনায় মেশানো চিত্র কোনটিই হুবহু ফটোগ্রাফ নহে। এই সময় পরিমল গোস্বামীও কলিকাতায় পড়াশুনো করিত। সেও আমার ও শিবদাসের সহিত আসিয়া প্রায়ই জুটিত। শিবদাসদের বাড়ি কিছুদিন থাকিবার পর আমি আবার চলিয়া আসিলাম। কারণ তাহারা অনেক সময় অনেক দূরে চলিয়া যাইত,

আমার কলেজের ডিউটির অসুবিধা হইত। শিবদাস অবশ্য চেষ্টার ক্রুটি করে নাই। আমি প্রত্যহ খুব ভোরে উঠিয়া চলিয়া আসিতাম। শিবদাস কিম্বা তাহার মেজদা আমার জন্য ডিমের তরকারি ও রুটি বা লুচি প্রত্যহ মেডিকেল কলেজে পৌঁছাইয়া দিত। তবু কিন্তু অসুবিধা হইতে লাগিল। আমি শেষে কলেজের কাছাকাছি একটা বোর্ডিংয়ে উঠিয়া আসিলাম। সেখানে পরিমল ও আমার সহপাঠী অমিয় সেনও ছিল। তিন-নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে আমি আর সীট পাই নাই। কিন্তু ওই ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিংয়েও আমার জীবন আনন্দময় ছিল। আমার সে সময়কার জীবনের কিছু সত্য ছবি পরিমল তাহার স্মৃতিচারণ গ্রন্থে দিয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলিতে পারি যে যদিও তখন আমি কলিকাতা শহরে বাস করিতাম, কিন্তু আসলে আমি বাস করিতাম একটা আদর্শ স্বপ্নলোকে। যে স্বপ্নলোকে আমার প্রধান সঙ্গী ছিল, আনন্দ, আদর্শ, এবং নির্ভীকতা। উৎকেন্দ্রিক গোছের হইয়া পড়িয়াছিলাম অনেকের কাছে। অনেকে বিস্মিত হইত, অনেকে মজার খোরাক পাইত। সে সময় আমার সাহিত্য-চর্চাও অব্যাহত ছিল। কবিতাই লিখিতাম। অধিকাংশই হাসির কবিতা বা ব্যঙ্গ কবিতা। নানা কাগজে প্রকাশিত হইত। বেশীর ভাগ 'প্রবাসী'তে। যতদূর মনে পড়িতেছে আমি যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি তখনই আমার 'বিবাহের ব্যাকরণ' 'ছারপোকা' প্রভৃতি কবিতা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। সাল-তারিখ ঠিক মনে নাই। যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি তখন কাজি নজরুল ইসলামের কাগজ 'বিজলী'-তে 'ফরমায়েসি প্রিয়া' কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। পবিত্রদা আমার মেসে আসিয়া কবিতাটি লইয়া গিয়াছিলেন। তখন আমি তিনি নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটেই থাকিতাম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আছে। পবিত্রদা আসিয়া প্রথমেই আমাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। যেন কতকালের চেনা। পবিত্রদা কিছুদিন আগে মারা গিয়াছেন, যতদিন বাঁচিয়াছিলেন আমাকে ঠিক ছোট ভাইএর মত স্নেহ করিতেন। প্রকৃত স্নেহ-পরায়ন লোক ক্রমশ বিরল হইয়া পড়িতেছে।

মেডিকেল কলেজে থাকিবার সময়ই আমি ছোট-গল্প লিখিতে আরম্ভ করি। মেডিকেল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাস-রুমে বসিয়া থাকিতাম। প্রকাণ্ড ঘরে নির্জন গ্যালারিতে বসিয়া থাকিতে খুব ভালো লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখিতে পারি না। মেডিকেল কলেজে খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন 'বাড়ুতি-মাশুল' 'অজান্তে' প্রভৃতি চার-

পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইল তো? 'প্রবাসী'-তেই সব গল্পগুলি পাঠাইয়া দিলাম। সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলাম—এগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ—রচনা হইল কিনা বুঝিতে পারিতেছি না। রচনাগুলির নামকরণও করিতে পারি নাই। আপনাদের যদি ভালো লাগে এগুলির নামকরণ করিয়া 'প্রবাসী'-তে ছাপিবেন। আর ভালো যদি না লাগে ফেরত দিবেন, সঙ্গে টিকিট দিলাম। 'প্রবাসীতে' লেখা পাঠাইবার এই রীতি ছিল তখন। লেখা পাঠাইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইত। তখন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসীর সহ-সম্পাদক ছিলেন। কয়েকদিন পর তাহার একটি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন—গল্পগুলি পছন্দ হইয়াছে। সবগুলিই 'প্রবাসী'-তে ছাপিব। আপনার ঠিকানা দেখিতেছি কলাকাতার। একদিন আমাদের অফিসে আসুন। বলাবাহুল্য খুব আনন্দ-চিত্তে গেলাম। চারুবাবু প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কোন প্রৌঢ়-ব্যক্তি আসিবেন বোধহয়। আমার কম বয়স দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

'আপনার বয়স এত কম তা ভাবতে পারিনি। কি করেন আপনি?'

'আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র।'

'বাঃ বাঃ বসুন।'

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন আমি কি কি ইংরাজি গল্পের বই পড়ি। খুব বেশী পড়ি নাই। যাহা পড়িয়াছিলাম, বলিলাম। আমি তখনও কোন কন্‌টিনেন্‌টাল লেখকের বই পড়ি নাই শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইলেন। বলিলেন ওগুলো একটু-আধটু পড়ে দেখবেন—ভালো লাগবে।

মেডিকেল কলেজে তখন আমাকে পাঠ্যপুস্তকগুলি লইয়া বিব্রত থাকিতে হইত। বাহিরের বই ক্বচিৎ পড়িবার অবসর পাইতাম। সুযোগও তেমন ছিল না। মাঝে মাঝে পুরানো পুস্তকের দোকান হইতে দুই-একটা বই কিনিয়া পড়িয়াছিলাম। পুরানো পুস্তকের দোকানেই জর্জ বার্ণার্ডশ'-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার মিসেস্ ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশন বইটি বড়ই ভালো লাগিয়াছিল। পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে মেটারলিংকের বইও কিনিয়াছিলাম। ব্লু-বার্ড মুগ্ধ করিয়াছিল আমাকে। আর একটি পড়িয়াছিলাম বোধহয় 'মোনা ভানা।' সে সময় বেশী বাহিরের বই পড়িবার সময় পাইতাম না। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় 'শনিবারের চিঠি'-র সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। ঘটিয়াছিল এক অপ্রত্যাশিত জায়গায়। পানের দোকানে। একদিন একটি পানের দোকানে সিগারেট কিনিতে গিয়া দেখিলাম এককোণে কয়েকটি লম্বা-গোছের খাম

রহিয়াছে। তাহার উপর ছাপা 'শনিবারের চিঠি।' দাম প্রতি-খণ্ড দুই আনা। একখণ্ড কিনিয়া লইলাম। পড়িয়া দেখিলাম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাগজ। সব লেখকেরই ছদ্ম-নাম। অনেকের লেখার মুন্সীয়ানা এবং বৈদগ্ধ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তবু আমি তাহার পর আর 'শনিবারের চিঠি'-র খোঁজ করি নাই। সময়ের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। মেডিকেল কলেজের ক্লাস, ডিউটি, এবং পড়াশুনা কবিয়াই সময় চলিয়া যাইত। ইহার বেশ কিছুদিন পরে 'শনিবারেব চিঠি'-র সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়া গেল, 'প্রবাসী' আফিসে।' 'প্রবাসী'-তে আমার একটি কবিতা বাহিব হইয়াছিল। 'সেই কপি'-টি আনিতে আমি 'প্রবাসী' অফিসে গিয়াছিলাম। সজনীকান্ত ভিতবে ছিল, বাহিবে আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল এবং আলাপ করিল। অনুবোধ কবিল আমি যেন তাহার 'শনিবারের চিঠি'র জন্য মাঝে মাঝে কিছু লিখি। তাহাব সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়িতেছে তাঁহাকে এ-সময় গোটা দুই লেখা দিয়াছিলাম। 'কাঁচি' নামক একটি কবিতা আর একটা কি গল্প লেখা। নাম ঠিক মনে নাই। তাহার পর শনিবারের চিঠির সহিত অনেকদিন আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। অনেক পরে আবার সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। সে কথা পরে বলিব।

মেডিকেল কলেজের জীবনে আমার আর একটি পরম-প্রাপ্তির কথা এইখানেই বলি। সেটি ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয়। তাঁহার সহিত পূর্বেই সামান্য পরিচয় ছিল, যখন তিনি কাটিহারে রেলওয়ে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। আমাদের বাড়ি মনিহারী হইতে কাটিহার খুবই কাছে। আমার বাবা কখনও কখনও 'কন্‌সাল্‌ট' করিবার জন্য তাঁহাকে 'কল' দিতেন। সেইসময় মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মেডিকেল কলেজে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল, খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। আমার সহিত পূর্বপরিচয়ের জন্য হোক, কিংবা আমি লেখক বলিয়াই হোক, আমাকে কিছু আমল দিয়াছিলেন। আমি আমার লেখা তাঁহাকে দেখাইতে সাহস করি নাই। তিনি নিজেই একদিন বলিলেন, 'তোমার 'প্রবাসী'র কবিতাটা ভালো হয়েছে।' বনবিহারীবাবু প্রথমে মেডিকেল কলেজে সার্জিকাল আউটডোরে আসিয়াছিলেন, পরে সার্জিকাল রেজিস্টার হন। সেই সময় আমি তাঁহার সহকারী ছাত্র ছিলাম। সেই সময় আমি তাঁহার বাসাতেও দুই একবার গিয়াছি। তাহার প্রাক্‌টিস একেবারেই ছিল না। প্রাক্‌টিস করিতে হইলে যে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন সেইটারই অভাব ছিল তাঁহার। দুই-একটি রুগী জুটিলে টিকিত না তিনি

কাহারও সহিত দুর্ব্যবহার করিতেন না।. কিন্তু প্রখরতা এত অধিক ছিল যে যে কোনও রোগীর আত্মীয়স্বজনের কোনরূপ বেচাল তিনি সহ্য করিতেন না। তাহাদের হামবড়া-ভাব বা ডাক্তার বিদ্যা ফলানোর চেষ্টা দেখিলেই তিনি মুখের উপর এমন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করিতেন যে লোকটা চুপ হইয়া যাইত। যাহাকে মোটা ফি দিয়া ডাকিয়াছি তিনি বিনীত লোক হইবেন ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিত। কিন্তু বনবিহারীবাবু সে জাতীয় লোক ছিলেন না। তিনি নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিতে চাহিতেন না। সুতরাং তাহার প্রাক্‌টিস ছিল না। কিন্তু ডাক্তার হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার ছিলেন। মেডিকেল কলেজে নামকরা ছাত্র ছিলেন তিনি। শুধু ডাক্তাবী জ্ঞান নয়, সাহিত্য জ্ঞানও তাঁহার গভীর ছিল। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, ইংরাজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরেও তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম আমি। মাঝে মাঝে যেদিন তিনি 'প্রাইভেট কল' পাইতেন সেদিন তিনি আমাদের সিনেমা দেখাইতেন, এবং হোটেলে খাওয়াইতেন। বলিতেন, খোঁজ কর কোন সিনেমায় কম ভীড় সেইখানেই যাব। এখানে ভালো সিনেমায় ভীড় হয় না। হোটেলে গিয়াও তিনি মেনুতে সেই খাবারগুলি বাছিয়া বাছিয়া দাগ দিতেন যেগুলি সাধারণতঃ লোকে খায় না। বলিতেন, চপ, কাটলেট, রুটি, অমলেট তো সবাই খায়—অন্য জিনিস খেয়ে দেখ। মনে পড়িতেছে একবার কি একটা ষ্ট্যু লইয়া আমরা একটু বিপদে পড়িয়াছিলাম। চেহারাটা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গেলাম সকলে। দেখিতে অনেকটা যেন বমির মত। বনবিহারীবাবু ওয়েটারকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ ষ্ট্যু আর কাউকে খেতে দেখেছো তুমি? খেয়ে বেশ সুস্থ—চিত্তে ফিরে গেছে? ওয়েটার বলিল—হ্যাঁ, ভালো জিনিস। আপনারা খান। খাইয়া খুব খারাপ লাগে নাই। বনবিহারীবাবুর সহিত তাঁহার বাসায় গিয়াছি কয়েকবার। তাঁহার মোটর ছিল না। বৈকালে তিনি হাঁটিয়া তাঁহার সহপাঠী ডাক্তার তুলসীচরণ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যাইতেন। তাঁহার বাড়ি ছিল রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে। বনবিহারীবাবু তাঁহার বাড়ির সম্মুখে আসিয়া —'ও—' বলিয়া জোরে একটা চীৎকার করিতেন। বলিতেন—এই চীৎকারেই ও বেরিয়ে আসবে যদি বাড়িতে থাকে। বুঝবে আমি এসেছি। বনবিহারীবাবুর আর একজন বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক চারু ভট্টাচার্য মহাশয়। ইহারা 'বেপরোয়া' নামে একটি কাগজ বাহির করিতেন। কয়েকটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বনবিহারীবাবুর কয়েকটি উজ্জ্বল, ব্যঙ্গ রচনা আছে। বনবিহারীর ব্যঙ্গ-রচনা ও তাঁহার আঁকা কার্টুনগুলি অপূর্ব।

তাঁহার পূর্বে ডি. এল. রায় বঙ্গসাহিত্যকে সার্থক ব্যঙ্গ রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সেগুলি তাঁহার রচনাবলীতে সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বনবিহারীবাবুর রচনাগুলি হারাইয়া গেল। নানা পত্রিকায় সেগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেগুলি একত্রিত করিয়া একটি গ্রন্থে নিবদ্ধ করিলে বাংলা সাহিত্য রসিকরা একটি অমূল্য সম্পদ পাইতেন। কিন্তু কেহই সে বিষয়ে উদ্যোগী নহেন। তাঁহার পুত্র বাঁচিয়া আছেন। তিনিই আইনত ইহা করিবার একমাত্র অধিকারী। কিন্তু তাহার এ-বিষয়ে উৎসাহ নাই। দুর্ভাগ্য!

ব্যঙ্গ-সাহিত্য রচনার দিকে আমারও প্রবণতা অনেকদিন হইতে ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা হইতেই আমি বোধহয় প্রথম প্রেরণা পাই। তাহার পর বনবিহারীবাবু আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বনবিহারীবাবুর কাছে আমার ঋণ অনেক। আগেই বলিয়াছি কিছুদিন আমি শিবদাসের বাড়িতে পেইং গেষ্ট হইয়াছিলাম। শিবদাসের মেজদা তখন ট্রেন-কনট্রোলার হইয়া শিয়ালদহে ছিলেন। চারতলার উপর তাঁহার বেশ বড় কোয়ার্টরস ছিল। আমরা সকলেই সেখানে থাকিতাম। সেই সময় বনবিহারী-বাবুর সহিত শিবদাসেরও খুব ঘনিষ্টতা হইয়াছিল। বনবিহারীবাবু সে সময় একটা কথা বলিয়াছিলেন মনে আছে। বলিয়াছিলেন—তোমাদের দু-জনের মধ্যে একজন যদি স্ত্রীলোক হইতে, তাহলে তোমরা আদর্শ দম্পতি হইতে পারিতে। কিন্তু তোমাদের ভগবান তো ঠিক কাজটি কখনও করেন না।

শিবদাসের সহিত শেয়ালদহ স্টেশনের কোয়ার্টাসে যখন ছিলাম সেই সময় একদিন চন্দ্রগ্রহণ হয়। শিবদাস ও আমি বাহির হইতেছিলাম, বউদিদি বলিলেন 'একটু পরেই গ্রহণ লাগবে, আমার রান্না হয়ে গেছে; তোমরা খেয়ে বেরোও।'

আমরা যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক আমরা কি সে কথা শুনি? বলিলাম 'আমরা গ্রহণের সময়ই খাব। তোমরা আগে খেয়ে নাও।'

আমরা বাহির হইয়া গেলাম। রাস্তাতেই দেখিতে পাইলাম চন্দ্রগ্রহণ শুরু হইয়া গিয়াছে। অনেক বাড়ি হইতে শাঁখ বাজিতেছে। হঠাৎ একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক শঙ্খধ্বনি শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—
'What's happening? What's this noise about?'

শিবদাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'Do you know what is happening in the moon? Look up and see.'

'There is a shadow on the moon. I think it is eclipse.'

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—'**You are ignorant, that's why you are seeing a shadow. It is not shadow, it is Rahu who is swallowing the moon as the English pour swallows India. But both will go away soon.**'

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরা আমার কথা শুনিয়া একটু খাবড়াইয়া গেল। এবং কালবিলম্ব না করিয়া সরিয়া পড়িল।

আমরা যখন বাড়ি ফিরিলাম, তখন পূর্ণগ্রহণ। ছাদের উপর আকাশের নীচে বসিয়া বউদিদিকে বলিলাম—'আমাদের ভাত এখানেই দিয়ে যাও। গ্রহণ দেখতে দেখতে ভাত খাব।'

বউদি একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন 'অতোটা ভালো নয়।' কিন্তু আমাদের জেদাজেদিতে ছাদেই ভাত দিযা গেলেন। আমরা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের সম্মুখে বসিয়াই আহারাদি শেষ করিলাম। শিবদাসেব কিছুই হইল না, কিন্তু আমার সেদিন রাত্রেই খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল। আমি গুডিভ্ পরীক্ষা দিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু সে পরীক্ষা আমি আর দিতেপারি নাই। আমার মেডিকেল কলেজের জীবনে অসুখের জন্যে ঠিক সময়ে সব পরীক্ষা দিতে পারি নাই। **Prelimiary** সায়েন্টিফিক এম. বি. পরীক্ষার সময় অর্থাৎ ফার্স্ট-ইয়ারের শেষে—আমি ঠিক সময়ে পরীক্ষা দিতে পারি নাই বাবার অসুখেব জন্যে। বাবাব অসুখের খবর পাইয়া আমাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। ছ-মাস পরে সেপরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু **irregular student** হইয়া গেলাম। এই জন্যে কলেজের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে (অ্যানাটামি, ফিজিওলজি। ফার্মাকোলজি, বিষয়ে) বসিবার অনুমতি পাই নাই। **First M. B** পরীক্ষা দিয়া **regular student** হইলাম। ঠিক করিলাম গুডিভ্ পরীক্ষা দিব। কিন্তু জ্বরে পড়িয়া গেলাম। পরীক্ষা দেওয়া হইল না। তিনদিন কুইনিয়ন খাইয়া যখন জ্বর ছাড়িল, তখন বনবিহারীবাবুকে খবর দিল শিবদাস। তিনি আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন লোবারনিউমোনিয়া হইয়াছে। বাবাকে খবর দেওয়া হইল। বাবা-মা দু-জনেই আসিয়া পড়িলেন। বনবিহারীবাবু আমাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন। শ্যামবাজারের নিকট তাঁহার বাসা ছিল। সেখান হইতে হাঁটিয়া প্রত্যহ আসিতেন। ট্যাক্সি চড়িয়া আসিতেন না। বলিতেন —কয়েক মিনিট আগে এসে কিছু লাভ তো হবে না। মাঝখান থেকে কিছু পয়সা নষ্ট হবে তোমাদের। আমি রোজই সন্ধ্যায় হেঁটে বেড়াই। আমার

কিছু কষ্ট হয় না। বনবিহারীবাবু আসিয়া অনেকক্ষণ আমার বিছানার পাশে বসিয়া থাকিতেন। তখন পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং নিউমোনিয়া তখন ভয়াবহ অসুখ ছিল। আমার অসুখও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিল। ক্রমশ আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। সেদিন আমি খুব প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমার মনে হইতেছিল যেন একসারি লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং আব একটি লোক একটা তরবারি দিয়া কচাকচ তাহাদের মুণ্ড কাটিয়া চলিয়াছে। তাহাদের কবন্ধ হইতে ফোয়ারার মত রক্তধারা বাহির হইতেছে। চতুর্দ্দিকে ছিন্ন মুণ্ডের ছড়াছড়ি। আমি উত্তেজিত হইয়া বনবিহাবী-বাবুকে বলিতেছি 'স্যার বসে বসে দেখছেন কি? থানায খবর দিন।' বনবিহারী-বাবু ধীরকণ্ঠে বলিতেছেন—'তুমি ঘুমোও। চোখ বুজে চুপ করো, শুয়ে থাকো।'

'চোখের সামনে এতগুলো খুন হযে যাচ্ছে, আর আমি চুপ করে শুয়ে থাকবো! কি বলছেন আপনি স্যার? আপনারা কেউ থানায় খবর না দেন তো আমি দেব।'

আমি বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বনবিহারীবাবু এবং শিবদাস আমাকে জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইটুকু আমার মনে আছে। তাহার পরের ঘটনাটা পরে আমি বনবিহারীবাবুব মুখে শুনিয়াছি।

আমার বাবা খুব ঘাবড়াইয়া গেলেন। আমার মা পাশের ঘরে ঢুকিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। বনবিহাবীবাবু বলিলেন, 'আমার মনে হচ্ছে মরফিন্ ইন্‌জেকশন না দিলে এ ডিলিরিয়াম থামানো যাবে না। কিন্তু নিউমোনিয়া অসুখে মরফিন দেওয়া মানা। তাই আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে কন্‌সাল্ট করতে চাই। আপনিও ডাক্তার, কিন্তু আপনার ছেলের অসুখ, তাই আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করাটা ঠিক হবে না। পাড়ায় যদি অন্য কোন ডাক্তার থাকে তাকেই ডেকে আনুন।'

বাবা বলিলেন—'আমার পক্ষে তো এতো রাতে ডাক্তার খুঁজে বার করা শক্ত। এ-সব পাড়ার কোন খবরই আমি জানি না—'

শিবদাসের দাদা নারানদা বলিলেন—'আমি এ-পাড়ায় একজন ডাক্তারের বাসা চিনি। চলুন আমার সঙ্গে।'

বাবা ও নারানদা বাহির হইয়া গেলেন। মা পাশের ঘরে বসিয়া ঠাকুর ডাকিতেছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

বনবিহারীবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, 'এদের কাউকে দেখছিনা। এরা কোথায় গেলেন এতো রাতে।'

'ওদের পাঠিয়েছি একজন ডাক্তারের কাছে। বলাইকে একটা ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া দরকার। সেটা একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে চাই।' ইহার উত্তরে মা যাহা বলিলেন তাহা বনবিহারীবাবু প্রত্যাশা করেন নাই।

মা বলিলেন—আমার ঠাকুর বলেছেন তোর ছেলে ভালো হয়ে যাবে। আপনি যে ইন্‌জেক্‌শন্ দেবেন ঠিক করেছেন তা এখনি দিয়ে দিন। দেরী করে কি হবে। অন্য ডাক্তার কি আপনার চেয়ে ভালো ডাক্তার? আপনার উপর আমার খুব বিশ্বাস। যা করবার আপনিই করুন। এখনি ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে দিন।'

বনবিহারীবাবুর ঠাকুরদেবতায় আস্থা ছিল না। কিন্তু মায়ের কথায় এমন একটা জোর পাইলেন যে ডাক্তার আসিবার পূর্বেই আমাকে ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়া দিলেন। বনবিহারীবাবুর মুখেই ঘটনাটি শুনিয়াছি। আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু দুই-তিনদিন পর আবার রোজ সন্ধ্যায় কম্প দিয়া জ্বর আসিতে লাগিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-কে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া আমাকে ভালো করিয়া দেখিলেন। অবশেষে বলিলেন 'প্লুরায়' নাকি পুঁজ জমিয়া আছে। পাঁজরের হাড় কাটিয়া পুঁজটি বাহির করিয়া দিতে হইবে। তিনি চলিয়া গেলে বনবিহারীবাবু বাবাকে বলিলেন 'এই সব মহারথী ডাক্তারদের পাল্লায় পড়িলে বলাই আর বাঁচিবে না। আপনি ওকে নিয়ে পালান। আপনার বাগান আছে। সেখানে একটা গাছের তলায় একটা চৌকি-পাতা বিছানা করে দেবেন। বলাই সকালবেলা আপনার ঘরের গাই-এর দুধ খেয়ে চলে যাবে। দুপুরে ভাত আর মুর্গীর ঝোল বাগানেই পাঠিয়ে দেবেন। ওষুধের মধ্যে কেবল কডলিভার অয়েল খাবে খাওয়ার পর। তারপর বিকেলে বাড়িতে এসে জ্বরের জন্যে অপেক্ষা করবে। জ্বরের সময় দুধ-সাবু খেতে দেবেন। আমার বিশ্বাস এতেই জ্বর বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা বনবিহারীবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। আমাকে লইয়া মণিহারী চলিয়া গেলেন। আমাদের বাগানের মুক্ত বাতাসে কাঁচামিঠে আমগাছের তলায় বেশ একটি বড় চৌকির উপর আমার বিছানা পাতা হইল। আমি সকাল সাতটার মধ্যে একগ্লাস দুধ খাইয়া এবং সঙ্গে কিছু বই লইয়া সেখানে চলিয়া যাইতাম। আর শুইয়া শুইয়া কখনও ডাক্তারী বই, কখনও সাহিত্যের বই পড়িতাম। কাছে এক কুঁজো জল ও একটি গ্লাস থাকিত। আর থাকিত একজন চাকর। উৎপাত ছিল

কাট-পিঁপড়ায়। গাছ হইতে সেগুলি বিছানায় পড়িত। আমার চাকরটি (ভাগিয়া ছিল নাম) একদিন একটা ঝাঁটা'লইয়া আসিল এবং সমস্ত পিঁপড়াকে ঝাঁটা-পেটা করিয়া বিদায় করিল। গাছে পিঁপড়াদের বাসা ছিল। ভাগিয়া বাসাগুলিও বিধ্বস্ত করিল। দুই-তিনদিন জেহাদ ঘোষণার ফলে পিঁপড়ারা আর আমার কাছে আসিত না।

মুরগীর ব্যাপার লইয়া একটু গোলযোগ ঘটিয়াছিল। মা খুব নিষ্ঠাবতী ছিলেন। প্রথম দুই-একদিন আমাদের পশ্চিম বারান্দায় একটা তোলা-উনুনে আমাদেরই একটা মুসলমান চাকর মুরগী রান্না করিয়া দিত। কিন্তু মা লক্ষ্য করিলেন ইহা ঠিক রোগীর পথ্য হইতেছে না, মশলা-গরগরে কালিয়া হইতেছে। মা তখন নিজেই রাঁধিবেন স্থির করিলেন। কম মশলা দেওয়া পাতলা মুরগীর ঝোলে নতুন রকম স্বাদ পাইলাম। মুরগী রাঁধিয়া মা স্নান করিতেন। আমার খাওয়ার জন্য আলাদা এক সেট বাসন তিনি আলাদা করিয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি ভাগিয়া মাজিয়া আলাদা একটি তাকে রাখিয়া দিত। এখন যুগ বদলাইয়াছে। এখন হিন্দুর বাড়িতে মুরগী নিজের অধিকার জারি করিয়াছে। এখন মুরগী আর অচ্ছুৎ নয়। কয়েকটা গোঁড়া লোক অবশ্য থাকিবেই। এখনও আছে। তাহাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাইরে মুরগী খাইয়া আসে। ইহাতে অভিভাবকেরা আপত্তি করেন না। ঘরের হাঁড়ির জাত তাঁহারা বাঁচাইয়া চলিতেছেন।

প্রায় মাসখানেক পরে আমি বিজ্বর হইলাম। বনবিহারীবাবুকে চিঠি লেখা হইল। এখন কি করা হইবে? আর একটি মুসকিল হইতেছে, রোজ মুরগী পাওয়া যাইতেছে না। মণিহারীতে তখন মাংস বা মুরগীর দোকান ছিল না। বাবার চেনাশোনা মুসলমান রোগীরাই প্রত্যহ মুরগী আনিত। বনবিহারীবাবু উত্তর দিলেন বলাই, আরও তিনমাস ওখানে থাকুক। এখন কলিকাতায় আসিবার দরকার নাই। মুরগীর বদলে পায়রার বাচ্ছা, মাগুরমাছ বা কচি-পাঁঠা লাগিতে পারে। প্রতিদিন অন্তত একসের করিয়া দুধ খাওয়া চাই। কড্-লিভার অয়েলও চলিবে।

বনবিহারীবাবুর নির্দেশ মান্য করিয়া আমি বেশ মোটা হইয়া গেলাম। ভুঁড়ি হইয়া গেল।

তিনমাস কামাই করিবার ফলে আমি অনেক পিছাইয়া গেলাম। কলিকাতায় আসিয়া আর শিবদাসের বাড়িতে গেলাম না। বাবা মত করিলেন না।

তিন নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসেও আর স্থান পাইলাম না। একটু মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। শুনিলাম বহুবাজার ষ্ট্রীটে 'ডায়মণ্ড বোর্ডিং হাউস' বলিয়া একটি ভালো বোর্ডিং আছে। সেখানে গিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলাম। খুব ভদ্রলোক। নামটা মনে পড়িতেছে না। তিনি বলিলেন 'চারতলার উপর একটি ঘর খালি আছে। সে ঘরটি আমাকে তিনি দিতে পারেন। ভাড়া মাসিক কুড়ি টাকা। আমি বোর্ডিং-এ একবেলা খাইয়া দেখিলাম। মোটা সেদ্ধ চালের ভাত। অত্যন্ত পাতলা ডাল, চচ্চড়ি গোছের একটা ঘ্যাঁট। মাছের ঝোলে খুব ক্ষীণকায় দুটি মাছের টুকরো এবং অম্বল। এ খাওয়া পছন্দ হইল না। ম্যানেজারকে বলিলাম—আমি ঘরটি ভাড়া লইব কিন্তু বোর্ডিংএ খাইব না। নিজে ইক্‌মিক্ কুকারে রাঁধিয়া খাইব। আপনাদের চাকরটি যদি আমাকে সাহায্য করে তবে তাহাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব। আমার প্রস্তাবে ম্যানেজারবাবু রাজি হইলেন। আমি একটি ছোট ইক্‌মিক্ কুকার বসাইবার জন্যে একটি ছোট stand এবং একটি টেবিল কিনিয়া ফেলিলাম। ম্যানেজারবাবু একটি চেয়ার এবং চৌকি আমাকে দিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ইক্‌মিকে ভাত এবং মাংস সুসিদ্ধ হইতে প্রায় দুই-ঘণ্টা সময় এবং তিন আউন্স কেরাসিন তেল লাগে। বোর্ডিং-য়ের চাকর রোজ মাংস, তরিতরকারী কিনিয়া আনিত। সের পাঁচেক ভালো চালও আমি কিনিয়া আনিলাম। কিছু গুঁড়া-মশলা, ঘি, তেল, একটি ছোট কড়া, খুনতি এবং একটি ছোট প্রাইমাস স্টোভও কিনিলাম। স্টোভে মশলা ভাজিয়া দধিসহযোগে মাংসটা কিঞ্চিৎ 'কষিয়া' লইয়া তাহার পর ইক্‌মিকে চড়াইতাম। ভোরে সাতটার আগেই ইক্‌মিক্ ঠিক করিয়া জুয়েল-ল্যাম্পে সাড়ে-তিন আউন্স তেল দিয়া ল্যাম্পটি জ্বালিয়া ইক্‌মিক্ চড়াইয়া কলেজে চলিয়া যাইতাম। কলেজে নীলমণির ক্যান্টিনে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া বড় আনন্দ হইত। অমন 'ডবল-ডিমের' ওম্‌লেট্ আর কোথাও খাই নাই। ওম্‌লেট্, দু-টুকরো পাঁউরুটি, পুডিং এবং চা—এই ছিল আমার প্রাতরাশ। কখনও পুডিং-এর বদলে কেক্ খাইতাম। নীলমণির পুডিংও চমৎকার ছিল। তারপর ওয়ার্ডে যাইতাম। বোর্ডিংয়ে ফিরিতাম বেলা বারোটা নাগাদ। দেখিতাম জুয়েল ল্যাম্পের আলো নিবিয়া গিয়াছে। ইক্‌মিকে গরম মাংস, ভাত প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

সে সময়ে ওয়ার্ডে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার ছিল না। মাঝে মাঝে ইমার্জেন্সি ডিউটি এবং নাইট ডিউটি অবশ্য থাকিত।

সার্জারি (Surgery) পড়িতে গিয়া Anatomy প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। মনে হইল Anatomyটা আর একবার পড়িয়া লইলে মন্দ হয় না। Anatomyর প্রফেসর ডাঃ ননীলাল পাল এবং অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ নগেন চ্যাটুজ্জ্যে আমাকে স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের গিয়া বলিলাম এখন Body অর্থাৎ ডিসেক্‌শন্ করিবার জন্ম মড়া পাওয়া যাইবে কি না। যদি যায় তবে আমি আবার Anatomyটা পড়িয়া ফেলিব। তাঁহারা বলিলেন—কলেজে ৪০৲ জমা দিলে একটা Body তাঁহারা দিতে পারিবেন। আমাদের কলেজে তখন নিয়ম ছিল ৪০৲ জমা দিলে যে কোনও বিষয় আবার পড়া যায়। তাহাই করিলাম—৪০৲ জমা দিয়া দিলাম। কয়েকদিনের মধ্যে নগেনবাবু একটা মড়ারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন ক্লাস নাই। Anatomy Hall খালি। আমার জন্মে Prosector's Room এ 'বডি' দেওয়া হইল। আমি সময় পাইলেই সেখানে গিয়া ডিসেকশন্ করিতাম। কারণ অ্যানাটমি ক্লাস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমাকে ডিসেক্‌শন্ শেষ করিতে হইবে। সেজন্যে সন্ধ্যার পর গিয়াও অনেক সময় ডিসেক্‌শন্ করিতে হইত। মুন্না ডোম আমাকে খুব সাহায্য করিত। অ্যানাটমি হলের বাহিরের বারান্দায় থাকিত সে, তাহাকে ডাকিলেই সাড়া পাওয়া যায়। একদিন একটু বিপদে পড়িলাম। রাতে ডিসেক্‌শন্ করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিটা নিবিয়া গেল। আমি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ডাক দিলাম—মুন্না। কাহারও সাড়াশব্দ নাই। আবার ডাকিলাম—মুন্না। মুন্না সাড়া দিল না। একটু পরে খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। প্রোসেক্টর রুমের দরজাটা ক্যাঁক্ করিয়া খুলিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ একবার শিহরিয়া উঠিল। আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম—যে হও, কাছে এলেই ছুরি বসিয়ে দেব। হাতে আমার ছুরি আছে। সঙ্গে সঙ্গে আলো জলিয়া উঠিল। দ্বারপ্রান্তে দেখিলাম সমরেশ ভট্টাচার্য ও আর একজন কে। ইহার নামটা মনে নাই। আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছিল। নিজেরাই অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

অনেক তাড়াতাড়ি করিয়াও কিন্তু ডিসেক্‌শন্ শেষ করিতে পারি নাই। থোরাক্‌স্ (Thorax), অ্যাবডোমেন (Abdomen) বাকী রহিয়া গেল। মানে বুক আর পেট। তখন আমি একটি দুঃসাহসিক কাজ করিলাম। শুধু দুঃসাহসিক নহে, বেআইনীও, আমি Heart, Lungs, Liver, Spleen এবং Kidney কাটিয়া একটি বড় হাঁড়িতে পুঁরিয়া Tormalin-এ ভিজাইয়া দিলাম। Thorax, Abdomen মোটা কাগজে জড়াইয়া একটি ট্রাঙ্কে পুরিয়া ফেলিলাম এবং

সমস্তটাই লইয়া গেলাম Diamond Boarding-এ আমার সেই চারতলার ঘরটিতে। বোর্ডিংয়ের কাহাকেও খবরটা জানাইলাম না। বোর্ডিংবাসীরা আমার ঘরে কেহই প্রায় আসিতেন না। দুপুরে তাঁহারা সকলে বাহির হইয়া যাইতেন, আমি একা ঘরে খিল দিয়া ডিসেক্শন্ করিতাম। আমি ঘরে যে মড়া লইয়া বাস করিতেছি তাহা অবশ্য আমার বন্ধুবান্ধবরা—শিবদাস এবং সমরেশ জানিত। ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ও জানিতেন। শিবদাস আমার ঘরটির নাম দিয়েছিল Devil's den. সে ঘরে আমার পড়িবার টেবিল ছিল, সেই টেবিলে ইক্‌মিকের stand-এর তলায় জুয়েল-ল্যাম্প জ্বলিত। সেই ল্যাম্পেও আমার রাত্রের রান্নাও হইত। লেখাপড়াও চলিত। সে সময় মাঝে মাঝে কবিতা বা ছোট গল্প লিখিতাম। কোথায় কখন লিখিতাম ভালো করিয়া মনে নাই। প্রতি লেখাই প্রথমে 'প্রবাসী'তে পাঠাইতাম। প্রবাসী না ছাপিলে অন্যত্র দিতাম। আমি যখন মিরজাপুর স্ট্রীটের মেসে থাকিতাম তখন মনোজ বসু ( বিখ্যাত লেখক তখন) আমার মেসে 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজের জন্যে লেখা চাহিতে আসিত। তখন সে বোধ হয় কোথাও শিক্ষকতা করিত। তখন 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজে মাঝে মাঝে লিখিয়াছি। আমার সেই Devil's den ঘরটিতে সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে আড্ডা বসিত। বনবিহারীবাবুও তাহাতে যোগ দিতেন। আনন্দের স্রোত বহিত। এইরূপ কোন একটা আড্ডায় একদিন Tragedy ও Comedy লইয়া আলোচনা শুরু হইয়া গেল। আমি বলিলাম, একই গল্পে Tragic বা Comic হইতে পারে। বনবিহারীবাবু বলিলেন 'আলিবাবা' নাটকটি কি Tragedy করা সম্ভব? আমি বলিলাম—আমার মনে হয় সম্ভব। বনবিহারীবাবু বলিলেন—সম্ভব বললে হবে না। হাতেকলমে করে দেখিয়ে দাও। সেই সময় 'আলিবাবা' গল্পটা লইয়া 'রূপান্তর' নাটকটি লিখিয়াছিলাম। মাস্টার মশাই ( বনবিহারীবাবু) খুশী হইয়াছিলেন। এটা সংশোধন করিয়া পরে কোথাও প্রকাশিত হইয়াছিল। ঠিক কোথায় তাহা এখন মনে নাই। 'মিত্র ও ঘোষ' পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

'ডায়মণ্ড বোর্ডিং'য়েও আমার ডিসেক্শন্ শেষ হইল না। মণিহারী হইতে চিঠি পাইলাম, বাবা অসুস্থ। আমি যেন শীঘ্র বাড়ি চলিয়া যাই। মড়ার যে অংশটুকু ডিসেক্শন্ করিয়াছিলাম abdomen এবং ভিসেরাগল ( Visara—লাংস, হার্ট, লিভার, পিলে, কিডনি ) সেগুলিকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া আসিলাম। একটা কাঠের বাক্সে পুরিয়া লইয়া গেলাম। কোনও অসুবিধা হইল না।

Thorax-এর কিছুটা বাকি ছিল। সেটাকে ট্রাংকে পুরিয়া মণিহারী লইয়া গেলাম। আমাদের আমবাগানে বসিয়া ডিসেক্শন্ শেষ করিলাম এবং শেষ করিয়া সেটিকেও মণিহারীর গঙ্গায় বিসর্জন দিলাম।

বাবার রোজ জ্বর হইতেছিল। প্রচুর কুইনাইন খাইয়া জ্বর কিছু কমিয়াছিল বটে কিন্তু রোজ সন্ধ্যা নাগাদ ৯৯ ডিগ্রী, কোনদিন ১০০° ডিগ্রী উঠিত। কাটিহার হইতে রেলওয়ে মেডিকেল আফসার আসিয়া তাঁহাকে দেখিলেন, পূর্ণিয়া হইতে সিভিল সার্জন একদিন আসিলেন। তাঁহাদের চিকিৎসা কিছুদিন চলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। শেষে ঠিক হইল বাবাকে কলিকাতায় আনিতে হইবে। শেওড়াফুলি বাবার মামার বাড়ি। সেখানেই প্রথমে আমরা গেলাম। তাহার পর কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া করা হইল। সরকার বাই লেন। বাবাকে সেখানে আনিয়া প্রথমে ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখানো হইল। তাঁহারই পরামর্শমত দিনকতক চিকিৎসা চলিল। তিনিই শেষে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন—'ইহা মেলিরিয়া এবং কালাজ্বরের সংমিশ্রণজাত অসুখ। রক্ত পরীক্ষা করিয়া কিন্তু কালাজ্বরের Testগুলি Negative হইল। তবু ধীরেনবাবু সপ্তাহে একটি করিয়া Sodima Antimarg tatarat ইন্জেক্শন্ দিতে লাগিলেন। পথ্যের সম্বন্ধে খুব ধরাকাট করিলেন তিনি। বাবাকে মাগুর মাছের ঝোল এবং অতি পুরাতন চালের ভাত দেওয়া হইতে লাগিল। জলখাবার দুধ-সাবু, খই। ধীরেনবাবু ঘিয়ের খাবার দিতে একেবারে বারণ করিয়া দিলেন। বলিলেন 'কালাজ্বরে যদি পেট ভাঙে আর বাঁচানো যাইবে না। বাবা কিন্তু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তিনি বরাবর খাদ্যরসিক, ওই উরস্থনি ঝোল-ভাত বেশীদিন তিনি বরদাস্ত করিতে পরিলেন না। জ্বর একটু কমিল বটে, কিন্তু রোজই সন্ধ্যায় ৯৯ হইত। বাবা বলিলেন, এ-ভাবে অনাহারে থাকিলে আমি বাঁচব না। রাত্রে বাবা সুজির দু-খানা রুটি খাইতেন। একদিন তিনি জেদ ধরিলেন, 'আমি লুচি খাইব। মরি তো মরিব। কিন্তু এভাবে না খাইয়া মরিতে চাহি না।' আমি কলেজ হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় দেখিলাম বাবা রান্নাঘরে খাইতে বসিয়াছেন। সম্মুখে থালা পাতা, মা একটি লুচি ভাজিয়া থালার উপর দিয়াছেন। বাবা খাইতে যাইবেন, এমন সময় আমি বাধা দিলাম। থালাটি তাঁহার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলাম 'ডাক্তারে বারণ করেছে, তবু তুমি লুচি খাবে কেন?' বাবা উঠিয়া গেলেন; মা কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সহসা মনে হইল বাবা যদি না বাঁচেন আমি আর জীবনে লুচি খাওয়াইতে পারিব না। ভগবানের কৃপায় আমার জীবনে কিন্তু সে ট্রাজেডি ঘটে নাই। বাবা ক্রমশঃ ভালো হইয়া অবশেষে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। বাবার অসুখের এই পাঁচ-ছয় মাস সময়ের মধ্যে আমি অনেক কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। প্রথমতঃ বাড়িওয়ালার সহিত প্রায়ই তুচ্ছ বিষয় লইয়া মনোমালিন্য হইতে লাগিল। ও রকম নীচুমনা লোক আমি বড় একটা দেখি নাই। ভীষণ মশা চতুর্দিকে। আমরা মশারী টাঙাইবার আয়োজন করিলাম। এ-জন্য ঘরের দেয়ালে পেরেক পুঁতিতে হইল। বাড়িওয়ালা আপত্তি করিলেন। আমি সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলাম না। ঝগড়া বাধিল। তাহার পর তিনি বলিলেন 'আপনার বাবার যক্ষ্মা হইয়াছে, আমরা যক্ষ্মারোগী বাড়িতে রাখিব না। আপনারা আমার বাড়ি ছাড়িয়া দিন।' বলিলাম—'বাড়ি পাইলেই ছাড়িয়া দিব। যতদিন না পাই এখানেই থাকিতে হইবে।' মেডিকেল কলেজের ক্লাস করিয়া বিকালের দিকে যে অবসরটুকু পাইতাম বাড়ি খুঁজিতাম। বাড়ি পাওয়া তখনও সহজ ছিল না। রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টে অনেক সময় খালি বাড়ির খবর পাওয়া যাইত। অনেক সময় বাড়ির দেওয়ালেও খালি বাড়ির খবর ও ঠিকানা লেখা থাকিত। আমি কলেজের পর সেই সব ঠিকানায় খোঁজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনোমত বাড়ি জুটাইতে পারিলাম না। অবশেষে বাড়ি-ওলাটি একদিন বলিল গুণ্ডা লাগাইয়া আমাদের বিতাড়িত করিবে। মা-বাবা দু-জনেই ভয় পাইয়া গেলেন। একদিন ভাগ্যক্রমে বাবার পরিচিত একজন পুলিশের লোক বাবার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন—'এ অঞ্চলের থানার দারোগার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আছে। তাহাকে বলিয়া দিব, সে সব ব্যবস্থা করিবে। দারোগাবাবু হয়ত কিছু করিয়াছিলেন। কারণ তাহার পর হইতে বাড়িওয়ালা টুঁ-শব্দটি করিলেন না। এ সময় আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমাদের বাসায় বাবা-মা'র সঙ্গে ছিল আমার ছোট দুটি ভাই কালু আর ঢুলু এবং একটি বোন খুকী। আমার আরও দুটি ভাই ভোলা আর টুলু আমাদের সঙ্গে আসে নাই। তাহারা মণিহারীতে ছিল। আর এক ভাই নালু (লালমোহন) তখন স্কুলে পড়িত। সে ছুটির সময় আমাদের কাছে আসিয়াছিল। নালু কলিকাতার কোনও পথঘাট চিনিত না। একেবারে পাড়া-গেঁয়ে ছেলে। সে আসিবার পর বাবা বলিলেন —ভালোই হইল। নালুকে সঙ্গে লইয়া বিকালে হেদোতে বেড়াইতে যাইব।

ধীরেনবাবু ডাক্তার, বাবাকে বৈকালে রোজ বেড়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সঙ্গীর অভাবে বাবা যাইতে পারিতেছিলেন না। বাবা তখনও বেশ দুর্ব্বল। তবু বাবা নালুকে লইয়া একদিন বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য ট্রামে করিয়া হেদো পর্যন্ত যাইবেন। তাহার পর সেখানে একটু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিবেন। নালু ইতিপূর্বে ট্রামে চড়ে নাই। ট্রাম যখন আসিল নালু টপ করিয়া উঠিয়া পড়িল। বাবা উঠিতে পারিলেন না। হেদো কোথায় নালু তাহা জানিত না। তাহার কাছে পয়সাও ছিল না। সে যখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পৌছিয়াছে তখন কনডাকটর তাহার নিকট টিকিট চাহিল এবং টিকিট নাই দেখিয়া নাবাইয়া দিল। অকূল পাথারে পড়িল নালু। তখন সে বুদ্ধি করিয়া একটি রিক্সা ডাকিল। রিক্সাওয়ালাকে বলিল তুমি আমাকে সরকার বাই লেনে লইয়া চল। রিক্সাওয়ালা কিন্তু তাহাকে লইয়া গেল সরদার শঙ্কর রোড। নালু বলিল 'এ তো সরকার বাই লেন নয়। আমাকে সরকার বাই লেনে লইয়া চল। রিক্সাওয়ালা রাজি হইল না। বলিল 'আমার ভাড়া মিটাইয়া দিন।' নালুর কাছে একটিও পয়সা নাই। সে বারবার বলিতে লাগিল, আমাকে সরকার বাই লেনে লইয়া চল। সেখানেই তোমাকে পয়সা দিব।' বচসা বাধিয়া গেল।

এদিকে সন্ধ্যার সময় কলেজ হইতে ফিরিয়া শুনিলাম নালু হারাইয়া গিয়াছে। বাবা বলিলেন 'সে ট্রামে উঠেছে দেখেছি। কেন নাবল না, কেন ফিরল না, বুঝতে পারছি না। আমি আবার মেডিকেল কলেজে ফিরিয়া গেলাম। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে খোঁজ করিলাম। তাহার পর সেখান হইতে থানায় ফোন করিয়া তাহাদের ব্যাপারটা জানাইয়া দিলাম। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম নালু তখনও ফেরে নাই। মা-বাবা দু-জনেই কাঁদিতেছেন। ঢুলু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কালু ও খুকী হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছে। আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। ইহার পর কি করা উচিত ভাবিতেছি। এমন সময় আমাদের বাড়ির সামনে একটি মোটরের হর্ণ শোনা গেল। কপাট খুলিয়া দেখি প্রকাণ্ড একটি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটর হইতে নালুকে সঙ্গে লইয়া একটি অপরিচিত ভদ্রলোক নামিলেন। অপরিচিত ভদ্রলোক বলিলেন 'সত্যবাবু কি জেগে আছেন? যদি থাকেন তা হলে তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করব।' বাড়িশুদ্ধ সকলেই আমরা জাগিয়াছিলাম। তখনও খাওয়া হয় নাই।

ভদ্রলোককে বাবার ঘরে লইয়া গেলাম। তিনি নমস্কার করিয়া বলিলেন 'আমাকে চিনতে পারছেন না বোধ হয়'

বাবা উত্তর দিলেন—'না।'

'চিনতে পারবার কথা নয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমি একবার আপনার বাড়িতে আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলাম। আপনার আদর-যত্ন, আন্তরিকতার কথা আজও আ ম ভুলি নি।'

'মনে পড়ছে না-তো। কেন গিয়েছিলেন।' 'আমি গিয়েছিলাম মাছের ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে। আমাকে একজন বলেছিলেন মণিহারী অঞ্চলে অনেক বড় বড় বিল আছে। গঙ্গা থেকেও নাকি অনেক মাছ ধরে বাইরে চালান হয়। সেই সব মাছের কলকাতায় আড়তদার হওয়া সম্ভব কিনা এই উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলাম। মণিহারীতে কোনও হোটেল বা ডাক-বাংলো ছিল না। কারও সঙ্গে তেমন পরিচয়ও ছিল না। স্টেশনের কুলী বলল 'ডাক্তারবাবুর ওখানে চলুন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' সেখানে গিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। এই অজ্ঞাতকুলশীলকে যে সহৃদয়তার সঙ্গে আপনি অভ্যর্থনা করলেন তা আমার জীবনে কখনও পাই নি। আপনি শুধু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই করলেন না, আপনার জানা-শোনা মাছের মহলদারদেরও খবর পাঠিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেই ব্যবসা করে আমি অনেক টাকা উপার্জন করেছি। তখন আমি মেসে থাকতুম, এখন আমার প্রকাণ্ড বা ড় হয়েছে। ওই মাছের ব্যবসা থেকেই। অনেকবার মনে হয়েছে আপনাকে একবার প্রণাম করে আসি। কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি। আজ খেয়েদেয়ে শুতে যাব, এমন সময় দেখি আমার বাড়ির সামনে একটা রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কার যেন বচসা হচ্ছে। কবাট খুলে বেরিয়ে দেখলাম একটি বালকের সঙ্গে বচসা হচ্ছে। ছেলেটি বলল 'আমি মফঃস্বল থেকে এসেছি। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি কলকাতায়। এই রিকসাওয়ালা আমাকে বলেছিল সরকার বাই লেনে নিয়ে যাবে, কিন্তু এনেছে সরদার শঙ্কর রোডে। আর যেতে চাইছে না, বলছে আমার ভাড়া দিয়ে দাও। কিন্তু আমার কাছে পয়সা নেই। দেবো কি করে?' আমি তখন ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাড়ি কোথা?' সে বলল 'মণিহারী।' মণিহারী? কার ছেলে তুমি? বলল—সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় আমার বাবা। ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়? বলল-হ্যাঁ। তখন আমি তাকে বললাম—'তুমি ঘরের ভিতর এসে বোস। আমি রিকসার ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছি। রিকসার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আপনার ছেলেকে কিছু খাইয়ে আমার মোটর বের করলাম। তারপর অনেক খুঁজে খুঁজে বাড়ি বের করেছি।'

এই রকম আশ্চর্য অঘটন বাবার জীবনে অনেক ঘটিয়াছে। আমার জীবনেও। জীবনে অনেকবার অকূল পাথারে পড়িয়াছি এবং আশ্চর্যভাবে উদ্ধার পাইয়াছি।

অপ্রত্যাশিতভাবে কে যেন কোথা হইতে আসিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছে। ইহা কি আকস্মিক যোগাযোগ, না কি করুণাময় ভগবানের দয়া? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই।

আমরা সে সময় অর্থাভাবেও পড়িয়াছিলাম। বাবা প্রায় ছয় মাস অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহার উপার্জন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি পূর্ণিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে মণিহারী ডিস্‌পেন্‌সারিতে চাকুরি করিতেন। শেষের দিকে তাঁহাকে বিনা বেতনে ছুটি লইতে হইয়াছিল। তখন আমার তৃতীয় ভ্রাতা টুলু (গৌরমোহন) সবে ডাক্তারী পাশ করিয়া চাকুরি পাইযাছে। সে-ই কিছু কিছু টাকা পাঠাইত। আরও কিছু টাকার মনি-অর্ডার মাঝে মাঝে আসিত। কিন্তু কে পাঠাইত তাহা আমার সঠিক মনে নাই। সম্ভবত মণিহারীতে আমাদের যে বিষয়-সম্পত্তি ছিল তাহাই এই সব টাকার উৎস ছিল। টাকা অবশ্য সামান্যই আসিত, বড় কষ্টেই দিন চলিত আমাদের। কলেজে যাইবার সময় সবদিন ট্রামের পয়সাও জুটিত না, হাঁটিয়া যাইতাম। কষ্ট হইত না। এমন একটা স্ফূর্তি। এমন একটা আত্মবিশ্বাস ও আনন্দের আবেগ তখন আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত যে কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতাম না। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন একটি লোক আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল 'আমি অঘোরবাবু ডাক্তারের নিকট হইতে চিঠি ও টাকা আনিয়াছি।'

ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ কাটিহারে রেলওয়ে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। মায়ের একবার খুব অসুখের সময় প্রথম তিনি আমাদের বাড়িতে মণিহারীতে আসেন। সেই সময় হইতেই আমার মাকে তিনি মা বলিতেন। বাবা প্রয়োজন হইলেই দুরারোগ্য রোগীর জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। অনেকবার তিনি আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শুনিয়াছিলাম শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি দীক্ষা লইয়াছিলেন। মিশনের জ্ঞান মহারাজকে প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে দেখিতাম। এই অঘোরবাবুর চিঠি এবং প্রায় হাজারখানেক টাকা পাঠাইয়াছেন। চিঠিটি লিখিয়াছেন মাকে। লিখিয়াছেন—মা, শুনিলাম আপনি বিপদে পড়িয়াছেন। সামান্য কিছু পাঠাইলাম। আমিও আপনার ছেলে, গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না।

বাবা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র দিলেন। পরে টাকাটা তিনি শোধ করিয়া

দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দুর্দিনে অঘোরবাবুর মহত্ত্ব আমাদের অভিভূত করিয়াছিল। তাই তাঁহাকে আজও মনে আছে।

মায়ের অসুখের সময় বাবা যে বাল্যবন্ধুটির নাগাল পাইয়াছিলেন তাঁহাকেই আবার পত্র দিলেন। মায়ের অসুখের সময় বাবা কয়েকদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলেন।

কয়েকদিন পরে বাবার সেই বন্ধুটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, সত্যই তিনি বেশ কড়া লোক। নিজের মোটরে আসিয়াছেন। সঙ্গে দুই একটি পারিষদও আছে। বাবাকে তিনি প্রথমে খুব ভৎর্সনা করিলেন। বলিলেন 'কলকাতায় আমার অত বড় বাড়ি পড়ে আছে। আর তুই এই এঁদো গলিতে এসে আছিস। কালই চল আমার ওখানে। সেখান থেকেই চিকিৎসা হবে।'

মা প্রথমে সেখানে যাইতে রাজি হন নাই। বাবার আগ্রহ এবং বাবার বন্ধুর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেখানে যাইতে হইল। ভদ্রলোকের নাম-ধাম আমি ইচ্ছা করিয়াই গোপন রাখিতেছি, কারণ শেষ-পর্যন্ত সুর কাটিয়া গিয়াছিল। মানুষ অনেক সময় সাময়িক বাহাদুরি দেখাইবার জন্য মহত্ত্ব আস্ফালন করে, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তাল সামলাইতে পারে না। শেষে ছন্দ-পতন হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল।

আমরা তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ির দ্বিতলে আশ্রয় পাইলাম। মা বাবার জন্য আলাদা করিয়া পুরানো চালের ভাত এবং মাগুর মাছের ঝোল তোলা-উনানে রাঁধিয়া দিতেন। চাল এবং মাছ আমিই কিনিয়া আনিতাম। তোলা-উনুন, কাঠ, গুল, কয়লা, তেল, নুন, কিছু মশলাপাতিও সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বাবার বন্ধুর বাড়িতে একজন ঠাকুর ছিল। বাবার বন্ধু, বন্ধুর ছেলে, ব্যবসায় কর্মচারীরা এবং দুই-একজন পারিষদ দ্বিপ্রহরে এখানে খাইতেন। একটি ঝি ছিল। সেই সব তদারক করিত। ক্রমশঃ বোঝা গেল সেই ঝি-টির সহিত বাবার বন্ধুটির কিছু 'নটঘট' আছে। এ-সব ব্যাপার গোপন থাকে না। মা আমাকে বলিলেন 'তুমি বাড়ি খোঁজ, আমি এখানে থাকব না।' আমি আবার বাড়ি খোঁজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনোমত বাড়ি পাওয়া গেল না। বাবার অসুখ ক্রমশ ভালোর দিকে যাইতেছিল। মা আবার বলিলেন, 'ওঁর জ্বরটা যখন কমেছে তখন এ বাড়িটায় আনছ মনে হচ্ছে। এখন কোথাও নড়ানড়ি করব না। পরে ভালো বাড়ি দেখে উঠে গেলেই চলবে।' আমি বাড়ি খোঁজ বন্ধ করিয়া দিলাম। বাবার বন্ধু সন্ধ্যার সময় মোটরে করিয়া হাওড়ায় তাঁহার

বাড়িতে চলিয়া যাইতেন। সন্ধ্যার পর আমরা ছাড়া বাড়িতে আর কেহ থাকিত না। মাঝে মাঝে কিছু বকসিস দিয়া ঝি, চাকর ও ঠাকুরকে বশীভূত করিয়াছিলাম। তাহারা আমাদের যথেষ্ট সেবাযত্ন করিতে লাগিল। ধীরেনবাবু ডাক্তার প্রত্যহ আসিয়া বাবাকে দেখিয়া যাইতেন। প্রয়োজন হইলে মাঝে মাঝে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও আসিতেন। বাবার অসুখ তখন প্রায় সারিয়া আসিয়াছে তখন একদিন বিধানচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাবাকে আর কতদিন এখানে থাকিতে হইবে?' বিধান রায় বলিলেন 'আরও মাস-তিনেক।'

বাবা ইহার উত্তরে বলিলেন 'আমার ছুটি তো ফুরিয়ে যাবে কয়েকদিন পরে। তা হলে আবার দরখাস্ত করতে হবে। আপনি একটা সার্টিফিকেট দেবেন তো?'

'দেব। আপনার ছেলেকে আমার বাড়িতে পাঠিযে দেবেন। তখন লিখে দেব।'

আমি পরদিনই বিধানবাবুর বাড়িতে সার্টিফিকেট আনিতে গেলাম। বিধান রায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার বাবা কোথায় চাকরী করেন?

'পূর্ণিয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডে তিনি ডাক্তার।'

'তুমি কি করো?'

'আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি।'

বিধানবাবু তখন কিছু বলিলেন না। একটি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

দিন দুই পরে কলেজ হইতে ফিরিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। বিধানবাবু নাকি একটু আগে আসিয়াছিলেন এবং আমরা আগে তাঁহাকে যে 'ফি' দিয়াছিলাম তাহা জোর করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন। বাবাকে বলিয়াছেন—'আপনি ডাক্তার, আপনার ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়ে, আপনার কাছ থেকে আমি 'ফি' নিতে পারব না। আমাকে যখন খুশী ডাকবেন, আমি এসে দেখে যাব। 'ফি' দিতে হবে না।'

ইহার পর বিধানবাবুকে আরও কয়েকবার ডাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি 'ফি' লন নাই এবং বরাবর আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। বিধান-বাবুর সহিত ইহার পর হইতে আমাদের একটা সকৃতজ্ঞ হৃদ্যতার ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

বাবা ক্রমশ সুস্থ হইতেছিলেন, এমন সময় আমার ছোট বোন খুকী টাইফয়েড্ অসুখে আক্রান্ত হইল। সে যুগে টাইফয়েড্ রোগের ভালো চিকিৎসা ছিল না। 'সিম্‌টম্' অনুসারে চিকিৎসা হইত। জ্বর বাড়িলে স্নান করাইয়া জ্বর কমাইয়া দেওয়া হইত। পথ্যের সম্বন্ধেও নানারকম ধরাকাট ছিল। খুকীর অসুখ একটু বাড়াবাড়ি রকমের হইয়াছিল। ধীরেনবাবু প্রত্যহ আসিতেন। বিধানবাবুও মাঝে মাঝে আসিতেন। এই সময় বিধানবাবুর চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং বিদ্যাবত্তার একটা পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

খুকীর জ্বর ধীরে ধীরে ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ একদিন জ্বর খুব বাড়িল। বিধানবাবুকে খবর দিলাম। তিনি সন্ধ্যার সময় আসিলেন। আসিয়া ঘরে একটি চেয়ারে বসিলেন। খুকীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—'ধীরেন কি আজ এসেছিল?'

'একটু আগেই এসেছিলেন তিনি।'

'খুকী কতক্ষণ থেকে এরকমভাবে শুয়ে আছে?'

'সকাল থেকে।'

'আচ্ছা, একটা কাগজ দাও। আমি ধীরেনকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে দাও তাকে।'

চিঠিতে লিখিলেন—'আমার মনে হইতেছে মেয়েটির মেনিন্‌জাইটিস্ হইয়াছে। তাহাকে রোজ সোয়ামিন ইন্‌জেক্‌শন্ দাও।'

আমি চিঠিটা লইয়া ধীরেনবাবুর সহিত দেখা করিলাম। চিঠি পড়িয়া ধীরেনবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন।

বলিলেন, 'উনি বোধ হয় গোলমাল করে ফেলেছিলেন। আমি তোমার বাবাকে Soamin দেব ভাবছিলাম। উনিও বোধ হয় তাই ভেবেছেন। কিন্তু তোমার বাবার কথা না লিখে খুকীর কথা লিখেছেন। টাইফয়েডে সোয়ামিন্ দেব কি? ওটা আর্সেনিকের প্রিপারেশন্। আমি ওঁকে চিঠি দিচ্ছি একটা। সেটার উত্তর নিয়ে এসো তুমি।'

ধীরেনবাবুর চিঠি লইয়া আবার বিধানবাবুর বাড়ি গেলাম। দেখিলাম তখনও তিনি ফেরেন নাই। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ বসার পর তিনি ফিরিলেন। ধীরেনবাবুর চিঠিটা পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাহার পর ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। এবং শেল্‌ফ্ হইতে একটি বই বাহির করিয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর একটা জায়গায় একটা

চিহ্ন দিয়া বইটা আমাকে দিয়া বলিলেন 'এইটে ধীরেনকে দাও গিয়ে। আমি একটা article এ page mark করে দিলুম, এটা যেন ধীরেন পড়ে।' দেখিলাম সেটা একটি বিখ্যাত ডাক্তারী জার্নাল। ট্রামে উঠিয়া দেখিলাম যে প্রবন্ধটি ধীরেনবাবুকে পড়িতে দিয়াছেন সে প্রবন্ধটি টাইফয়েড্ মেনেন্জাইটিস্-এ সোয়ামিন ইনজেকশনের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক আলোচনা। গবেষক লিখিয়াছেন 'সোয়ামিন্' ইন্জেক্শন্ দিয়া খুব উপকার পাওয়া গিয়াছে। ধীরেনবাবু প্রবন্ধ পড়িলেন এবং খুকীকে 'সোয়ামিন্' ইন্জেক্শন্ দেওয়া শুরু করিলেন। দুই তিনটি ইন্জেকশন্ দেওয়ার পরই খুকীর খুব উপকার হইল। কিন্তু ঠিক এই সময় আমরা আর একটি বিপদে পড়িয়া গেলাম। বাবার বন্ধু বাবাকে জানাইলেন যে তাঁহার এক আত্মীয়ের মেয়ের বিবাহ এই বাড়িতে হইবে। সাতদিনের মধ্যে আমরা যেন আর একটা বাড়ি খুঁজিয়া লই। কারণ বিবাহের ব্যাপারে অনেক লোকজন বাড়িতে আসিবে। সাতদিনের মধ্যে ভালো বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। সৌভাগ্যক্রমে কাছেই একটি বাড়ির বাহিরের একটি ঘর পাওয়া গেল। সেই ঘরেই আমরা উঠিয়া আসিলাম। ভগবানের দয়ায় খুকী এবং বাবার অসুখ ক্রমশ ভালোর দিকে যাইতে লাগিল। একটা ঘরে রান্না, খাওয়া, শোওয়া, বড়ই অসুবিধে হইতেছিল। এমন সময় খবর পাইলাম বেলগাছিয়া অঞ্চলে একটি খালি দ্বিতল বাড়ি আছে। ভাড়া চল্লিশ টাকা। তখনই গিয়া বাড়িটি ভাড়া করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে বাড়িতেও থাকা গেল না। ভয়ানক মাছি। ভাত বাড়িতে না বাড়িতে মাছির ঝাঁক আসিয়া ভাত ঢাকিয়া ফেলে। ডালের বাটিতে ক্রমাগত মাছি পড়িতে থাকে। শুইয়া বসিয়া স্বস্তি নাই, চোখে মুখে দলে দলে মাছি আসিয়া বসে। মাছির জ্বালায় সে বাড়ি ত্যাগ করিয়া আবার আমরা বাবার মামার বাড়ি সেওড়াফুলিতে গেলাম। সেখানেও বিপদ ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। আমার ছোট ভাই টুলুর কলেরা হইল। পঞ্চম-ভ্রাতা কালু ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া মাথা ফাটাইল। কলিকাতায় ছুটিলাম ধীরেনবাবুর কাছে। তিনি ট্যাক্সি করিয়া স্যালাইন্ প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। টুলুকে স্যালাইন্ দিলেন। কালুর ফাটামাথা সেলাই করিলেন।

ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ভাল ডাক্তার ছিলেন না। মহৎহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান আমি দিতে পারি নাই। তাঁহার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। তিনি আজ পরলোকে তাঁহার উদ্দেশ্যে আজ প্রণাম নিবেদন করিলাম। তিনি ব্রজেন্দ্র সাহেবের প্রি

ছাত্র ছিলেন। আর, জি, কর মেডিকেল কলেজে প্যাথলজির অধ্যাপক ছিলেন তিনি। আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের উন্নতিকল্পে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করতেন। শুনিয়াছি আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের প্যাথলজিকাল মিউজিয়মে তাঁহার প্রচুর অবদান আছে। বাবা যখন ভালো হইয়া মণিহারী গেলেন তাহার কিছুদিন পর ধীরেনবাবুও একবার মণিহারী গিয়া কয়েকদিন ছিলেন আমাদের বাড়িতে। ধীরেনবাবুর মত সদা-হাস্যময় মহৎ লোক আজকাল কচিৎ চোখে পড়ে।

বাবার অসুখের জন্যে আমার পড়ার বেশ ক্ষতি হইল। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া গিয়াছিল। আমার পড়িবার কোন ঘরই ছিল না। কোন-রকমে ওয়ার্ডগুলিতে যাইতাম। একটু সময় পাইলেই লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িতাম। ইহার মধ্যেও ওই লাইব্রেরীতে বসিয়াই দু-একটি কবিতা বা ছোট গল্প লিখিতাম এবং ডাকযোগে কাগজে পাঠাইতাম। কখনও ছাপা হইত কখনও বা ছাপা হইত না। এই সময়ই বোধ হয় 'কল্লোল' পত্রিকায় কবিতা পাঠাইয়াছিলাম একটা। ঠিক কবে তাহা মনে নাই। কবিতাটার নাম দিলাম 'সই'। কলিকাতায় যখন ছিলাম তখন কোনও সাহিত্যিকদের আড্ডায় মিশিবার সুযোগ হয় নাই। সুযোগ পাইলেও সময় পাইতাম না বোধ হয়।

মেডিকেল কলেজের কয়েকটি স্মৃতি এখনও মনে আছে। সেগুলি কালানু-ক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করিলে ভালো হইত। কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডারে কালানুক্রমিক সঞ্চয়ের রেওয়াজ নাই। এলোমেলোভাবে রাখা আছে। যখন যেটা মনে পড়িতেছে সেটাই লিখিতেছি। প্রথম যে ঘটনাটি লিখিতেছি বোধ হয় আমার ফোর্থ ইয়ারে ঘটিয়াছিল। আমি তখন উইল্‌সন্‌ সাহেবের ওয়ার্ডে। উইল্‌সন্‌ সাহেব আমাদের সময় ফার্স্ট সার্জেন ছিলেন। প্রকাণ্ড পাকা গোঁফ ছিল উইলসন সাহেবের। কিন্তু বার্দ্ধক্যের আর কোন লক্ষণ ছিল না তাঁহার। লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়িতে উঠিতেন। আমাদের সার্জারি-ক্লাস হইত বৈকাল চারটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত। উইল্‌সন্‌ সাহেব প্রথমদিন আসিয়াই বলিলেন 'এখন তোমাদের খেলিবার সময়' আমি তোমাদের বেশী সময় নষ্ট করিব না। আমার প্রফেসর আমাকে যাহা পড়াইয়াছিলেন, তাহার নোট আমার লেখা আছে। সেই নোট তোমাদের টুকিয়া দিব। তাহা পড়িয়া তোমরা সার্জারি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া তোমাদের টেক্‌স্ট-বুক তো আছেই। আর একটা কথা তোমাদের বলিয়া দিই। আসল সার্জারি

বই পড়িয়া লেখা যায় না। ওটা হাতেকলমে শিখিতে হয়। ডাক্তারি পাশ করিয়া তোমরা যখন নিজের হাতে ছুরি ধরিবে, তখন হইতেই তোমাদের প্রকৃত সার্জারি-শিক্ষা শুরু হইবে।' প্রতিদিন পনেরো মিনিট তিনি আমাদের সার্জারির নোট লিখাইতেন। শ্রুতিলিখনের সময় সব কথা সবদিন বুঝিতে পারিতাম না। পরদিন তাঁহাকে সে কথা বলিলে তিনি সংশোধন করিয়া দিতেন। এই উইল্‌সন্‌ সাহেবের ওয়ার্ডে যখন ছিলাম তখন ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সার্জিকাল আউট্‌ডোরে। সার্জিকাল আউট্‌ডোর হইতে অনেক রোগীকে তিনি সার্জিকাল ইন্‌ডোরে ভর্তি করিতে পারিতেন। একদিন মেডিকেল কলেজের ঠিক সামনে আমার দুর্গা ওঝার সহিত দেখা হইয়া গেল। দুর্গা ওঝার মণিহারীতে বাড়ি, বাবার সঙ্গে খুব খাতির ছিল। দেখিলাম তাঁহার একটি হাতের দুইটি হাড়ই ভাঙা। বলিল 'একদল ডাকাত আমার বাড়ি আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের বাধা দিয়াছিলাম। তাহাদের লাঠির ঘায়ে হাড়-দুটি ভাঙিয়াছে, আর জোড়া লাগে নাই। তুমি ইহার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারো?' তাঁহাকে বনবিহারীবাবুর কাছে লইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন 'অপারেশন না করিলে এ-হাড় জোড়া লাগিবে না। দরকার হইলে মেটালের প্লেট্‌ দিয়া জুড়িয়া দিতে হইবে। উনি Prince of Wales হাসপাতালে যদি ভর্তি হইতে চান আমি ভর্তি করিয়া দিতে পারি।'

দুর্গা ওঝা বলিলেন 'ভর্তি হইতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু পনেরো দিনের বেশী থাকিতে পারিব না। কারণ ব্যবসায়ের জরুরী একটা কাজে পনেরো দিন পরে আমাকে বোম্বাই যাইতে হইবে।' বনবিহারীবাবু বলিলেন 'পনেরো দিনের মধ্যে তো অপারেশন হইয়া যাওয়া উচিত।'

আমাকে বলিলেন 'তুমি সিনিয়র হাউস সার্জেনকে একটু অনুরোধ করো তিনি যদি দুই-এক দিনের মধ্যে put-up করিয়া দেন হইয়া যাইবে। এখন put-up করা করা ব্যাপারটাকে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সার্জেন প্রতিদিন যে যে 'কেস্‌' অপারেশন করিবেন সে 'কেস্‌'গুলি তাহার পূর্বদিন সিনিয়র হাউস সার্জেন বাছিয়া সার্জেনকে জানাইবেন ইহাই তখন আইন ছিল। হাউস সার্জেন যতক্ষণ না কোন 'কেস্‌'-কে পুট্‌-আপ করিতেছেন ততক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে' তাহার অপারেশন হইবে না। দুর্গা ওঝাকে ভর্তি করাইয়া আমি সিনিয়র হাউস সার্জেনকে অনুরোধ করিলাম তাঁহাকে যেন শীঘ্র 'পুট্‌-আপ' করা হয়। তিনি বলিলেন কালই করিয়া দিব। কিন্তু অনেক 'কাল' আসিল এবং চলিয়া গেল

দুর্গা ওঝাকে তিনি পুট-আপ করিলেন না। দুর্গা ওঝা খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, আমিও হাউস সার্জনকে অনুরোধ করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গেলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার 'কেস' আর 'পুট-আপ' হয় না। একদিন সন্ধ্যায় মেসে বসিয়া পড়িতেছি এমন সময় দুর্গা ওঝার মুনিমজি ( অর্থাৎ,ম্যানেজার ) আমাকে আসিয়া বলিলেন—কাল অপারেশন হইবে। মানিকজির ( অর্থাৎ দুর্গা ওঝার ) প্রকাণ্ড অনুরোধ আমি যেন অপারেশনের সময় উপস্থিত থাকি। ইহার পর একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন 'ব্যাপারটা যদি আমাদের আগে জানা থাকিত অনেকদিন আগেই অপারেশন হইয়া যাইত। অনর্থক কয়েকটা দিন নষ্ট হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কোন্ ব্যাপারটা ?' মুনিমজি উত্তর দিলেন 'আজ সকালে আমি সিনিয়র হাউস সার্জেনের বাসায় একটি পাঁচসের ওজনের রুইমাছ এবং পঞ্চাশটি টাকা দিয়া আসিয়াছি। ডাক্তারবাবু কথা দিয়াছেন কালই তাহাকে 'পুট-আপ' করিবেন। ঘুস-ঘাস না দিলে প্রায় কোন জায়গাতেই কাজ হাসিল হয় না। এখানে ভাবিয়াছিলাম আপনি আছেন—বিনা ঘুসেই হইয়া যাইবে। কথাটা শুনিয়া আমি বড়ই অপমানিত বোধ করিলাম। মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মুনিমজিকে বলিলাম 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি সেই ডাক্তারের বিরুদ্ধে নালিশ করিব।' তাঁহাকে লইয়া গেলাম-আমাদের রেসিডেণ্ট সার্জন ক্যাপটেন এস. এন. মুখার্জির কাছে। তাঁহার পুরা নাম ছিল সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি। তিনি সেকালের আই. এম. এস. ছিলেন। শুনিয়াছিলাম তিনি দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা। ক্যাপটেন মুখার্জি আমার সব কথা মন দিয়া শুনিলেন, তাহার পর মুনিমজিকে বলিলেন 'আপনি যাহা মুখে বলিতেছেন তাহা যদি লিখিয়া দেন তাহা হইলে আমি কলেজের কমিটিতে সেটা লইয়া যাইব এবং ওই ডাক্তারের সাজা হইবে।'

মুনিমজি একটু ভাবিয়া বলিলেন 'লিখিয়া দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু ওই ডাক্তারের হাতেই তো আমার মালিককে থাকিতে হইবে। তাই আমার একটু দ্বিধা হইতেছে।' ক্যাপটেন মুখার্জি বলিলেন 'আপনার মালিক কাল হইতে আমার তত্ত্বাবধানে থাকিবেন। আমিই দরকার হইলে তাঁহার ঘা ড্রেস্ করিয়া দিব। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।' তখন মুনিমজি একটি কাগজে সব লিখিয়া দিলেন। পরদিন দুর্গা ওঝার হাত অপারেশন করা হইল। আমি অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত ছিলাম। দুর্গা ওঝা প্রায় পনেরো দিন পরে হাসপাতাল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার হাতের হাড় জোড়া লাগে নাই।

সেই সিনিয়র হাউস সার্জনটির নামে ক্যাপ্টেন মুখার্জি নালিশ করিয়াছিলেন, তাহারও ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। কমিটিতে যেদিন তাঁহার বিচার হয়—সেদিন আমি অসুস্থ। নিউমোনিয়া হইয়াছিল আমার। ইহার বিবরণ পূর্বেই দিয়াছি। মণিহারী হইতে সুস্থ হইয়া যখন ফিরিলাম, শুনিলাম উক্ত সিনিয়র হাউস সার্জনটির বিশেষ কোন সাজা হয় নাই। তিনি অন্য ওয়ার্ডে বদলি হইয়াছেন মাত্র। শুনিয়াছিলাম আমাদের প্রিন্সিপাল বার্নাডো সাহেব তাঁহাকে না কি কঠোর শাস্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উইলসন সাহেব বলিলেন 'ঘুস তো আমরা সকলেই লই। বাড়িতে রোগী দেখিয়া ফি লইয়া চিঠি লিখিয়া দিই-এ রোগীকে ভরতি করো, অমনি সে ভরতি হইয়া যায়। ইহা কি ঘুসের নামান্তর নহে? তবে এই হাউস সার্জনটি অতি লোভী। এ কেসটি স্টুডেন্টের কেস, তাহার নিকট হইতে ঘুস লওয়াটা এটিকেট-বহির্ভূত হইয়াছে। এজন্য তাহাকে অন্য ওয়ার্ডে বদলি করিয়া দেওয়া হোক। পরে সেই হাউস সার্জনটির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন 'তুমি আমার নামে নালিশ করিয়াছ এজন্য তোমার উপর আমার রাগ নাই। তুমি আদর্শবাদী লোক, তোমাকে আমি দূর হতে শ্রদ্ধা জানাইতেছি। কিন্তু কার্যকালে আমি সুবিধা পাইলেই আবার ঘুস লইব। কারণ সংসার আমার বিশাল, মাহিনা যথেষ্ট নয় এবং প্রাকৃটিসও কিছু নাই। সুতরাং যেখানে যাহা পাই কুড়াইয়া লই। এ পাপের জন্য পরলোকে হয়ত শাস্তি পাইব। তখন দেখা যাইবে, ইহলোকের ধাক্কাটা তো আগে সামলাই।

ইহার পূর্বে, আমার থার্ড ইয়ারে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল আমার জীবনে। আমি যখন মেডিকেল কলেজে ঢুকি তখনই লেখক বলিয়া ছাত্রমহলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল। শিক্ষক-মহল থেকে সে খ্যাতির স্বীকৃতি এই সময় প্রথম পাইলাম। আমাদের মেডিকেল কলেজে প্রতি বৎসর থিয়েটার হইত। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা খুব ভালো থিয়েটার করিতেন। বাংলা নাটক এবং ইংরেজী নাটক দুই-ই অভিনয় করিতেন তাঁহারা। পুরুষরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। এমন নিখুঁত অভিনয় করিতেন যে পুরুষ বলিয়া বোঝাই যাইত না। এই প্রসঙ্গে হিরেনদার কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার 'জনা' 'শ্যামলী'-র অপূর্ব অভিনয়ের কথা আজও মনে আছে। ইংরাজি অভিনয় শেখাইতেন। 'উণওয়ালা'। এই অভিনয়ের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন আমাদের অ্যানাটমির সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

ছাত্রমহলে তিনি নগেন চাটুজ্যে নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে আমরা খুব ভয় করিতাম। তাঁহার একটা বৈশিষ্ট ছিল খুব দ্রুতবেগে তিনি হাঁটিতেন। অ্যানাটমি হলের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত তিনি দ্রুতগতিতে চলিয়া বেড়াইতেন। হঠাৎ একদিন তিনি দ্রুতবেগে আসিয়া অ্যানাটমি হলে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কাঁধে দুই হাতে রাখিয়া বলিলেন 'বনফুল' আমাদের থিয়েটারের জন্য ভালো একটা 'ওয়েলকাম সং' লিখতে হবে তোমাকে। লেখা হলেই আমাকে দিও, ওটা ছাপাব আমরা।'

বলা বাহুল্য গর্বে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল।

যে গানটি লিখিয়া দিয়াছিলাম।

সেটি এই

মরণ লইয়া ঘর করি মোরা বেদনা মোদের
আর্ত আহত আতুর লইয়া কাটাই দিবসরাতি
তারি মাঝখানে অবসরমত আজিকার দিনটিরে
ছন্দমুখর আনন্দগানে হাসিতে ফেলেছি ফিরে
এসো গো তোমরা সবে
মুখরিত করি তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে।

আমরা সব দেখেছি শিখেছি জীবনটা কিছু নয়
মরণের সাথে আমাদেরই হয় নিতি নব পরিচয়
জীবনের কত বেদনা ও জ্বালা ভালো করে তাহা জানি
তবুও আমরা অমানুষ নই—হাসির দাবীটা মানি।
এসে গো তোমরা সবে
মুখরিত করি তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে।

আজিকার এই মধু উৎসবে অপূর্ণ যাহা আছে
তাহার লাগিয়া বিনীত মিনতি জানাই সবার কাছে
কালো যাহা আছে আলো হয়ে যাবে তোমরা চাহিলে পরে
হরষে ও গানে কানায় কানায় সকলি উঠিবে ভরে,
এসো গো তোমরা সবে
মুখরিত করি তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে।

থিয়েটার আরম্ভ হইবার পূর্বে গানটি পাওয়া হইয়াছিল। ইহার পর হইতে মেডিকেল কলেজে আমার সাহিত্যিক খ্যাতি আরও একটু বাড়িল। অর্থাৎ আমাদের কলেজের বাঙালী শিক্ষকরাও জানিতে পারিলেন তাঁহাদের ছাত্রদের মধ্যে একজন কবি দেখা দিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের মনোভাব ঠিক কি প্রকারের হইয়াছিল তাহা জানি না, এইটুকু শুধু জানি তাঁহারা সকলেই আমাকে সস্নেহে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দাক্ষিণ্য লাভ করিয়াছি। আমার অনেক অসঙ্গত আবদারও তাঁহারা রক্ষা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে ইহার প্রায় ষোল বছর পরে—যখন আমি ভাগলপুরে প্রাকটিস করি—তখনও ডাক্তাররা আমাকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন আমার 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি অভিনয় করিয়া। আমার শিক্ষক ও শিক্ষক স্থানীয় ডাক্তাররা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার দীনেশ চক্রবর্তী, ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষ ডাক্তারদের অভিনয় নিখুঁত হইয়াছিল। আমি ডাক্তারদের নিমন্ত্রণে ভাগলপুর হইতে সপরিবারে আসিয়াছিলাম। কি আনন্দ যে পাইয়াছিলাম তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা শক্ত।

ছাত্রজীবনে মেডিকেল কলেজে যখন পড়ি তখন আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত আর একটি ঘটনা ঘটিল। বাংলার বাঘ, তখনকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল একদিন।

আমার এক ঠাকুরদা, বাবার একজন কাকা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন। বাবা আমাকে চিঠি লিখিলেন আমি যেন তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিয়া আসি। আমি ভবানীপুর তাঁহার বাসায় (বোধ হয় গোবিন্দ বসু লেনে) গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, 'চল আশুতোষবাবুকেও প্রণাম করবি চল।'

আমাকে আশুতোষবাবুর কাছে লইয়া গেলেন। দেখিলাম আশুতোষবাবুর প্রকাণ্ড বৈঠকখানা বহু লোকের সমাগমে গমগম করিতেছে। তাহার মধ্যে দু-একজন সাহেবও রহিয়াছে দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে গিয়া আশুতোষকে প্রণাম করিলাম।

প্রশ্ন করিলেন 'কে তুমি?'

ঠাকুরদা আমার পিছোনেই ছিলেন। বলিলেন 'আমার নাতি।' মেডিকেল কলেজে পড়ে। আপনাকে প্রণাম করতে এসেছে। ওকে আশীর্বাদ করুন।'

আশুতোষ আমার মাথায় হাত দিয়ে বলিলেন —'বস বস, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। বস—' কাছেই একটা খালি চেয়ার ছিল, তাহার উপরই ব'সয়া পড়িলাম। ঠাকুরদা আমাব কানে কানে বলিয়া গেলেন—'বসে থাকো। চলে যেও না।'

বসিয়া রহিলাম।

তাঁহাদের নানাবিষয়ে নানারকম কথা হইতেছিল। আমি সব বুঝিতে পারিতেছিলাম না। একটু পরে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কানে গেল পাণিপথের যুদ্ধ লইয়া কি একটা কথা উঠিয়াছে।

অশুতোষ আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'এই তো কলেজের একটি ছেলে রয়েছে। এ বলতে পারবে। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হয়? স্কুলের থার্ড-ক্লাসেই আমি ইতিহাসবিদ্যায় পরিচ্ছেদ টানিয়াছিলাম। সংস্কৃত এবং অঙ্ক আমাব অতিরিক্ত বিষয় ছিল। আমাদের সময় এইরকমই নিয়ম ছিল। সুতরাং পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হইয়াছিল তাহা আমারও মনে ছিল না। একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম 'আমার তো মনে নেই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। স্কুলে থার্ড-ক্লাসের পর আর ইতিহাস পড়ি নি—'

আশুতোষ কিছু বলিলেন না। আলোচনা চলিতে লাগিল। আমি খুব অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আশুতোষ বলিলেন, 'তুমি যেও না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'না, আমি যাই নি। বাইরেই আছি—'

বাহিরের বারান্দায় চলিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরেই বৈঠকখানার লোকজন কমিয়া গেল। আমি আবার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আশুতোষ বলিলেন তুমি এ কি কথা বল্লে। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র বলে দেশের ইতিহাস জানবে না। আজ রবিবার, আজ তো তোমার ক্লাস নেই।

'না।'

'তা হলে তুমি আমার লাইব্রেরীতে বসে ঈশানচন্দ্র ঘোষের ভারতবর্ষের ইতিহাস বইখানা পড়ে ফেল। সবটা শেষ করে তারপর বাড়ি যেও।'

সেদিন তাঁহার লাইব্রেরীতে বসিয়া ঈশানচন্দ্র ঘোষের ইতিহাসটি পড়ে শেষ

করিয়াছিলাম। ইহার কিছুদিন পরে আর একবার আমরা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা—দল বাঁধিয়া গিয়াছিলাম তাঁহার বাড়ি। পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলাম। কারণ সেদিন ট্রাম স্ট্রাইক ছিল কলিকাতায় তখন বাস চলিত না। আমিই আমাদের দলের মুখপাত্র ছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ফার্ষ্ট' এম. বি. পরীক্ষার দিন পিছাইয়া দেওয়া। আশুতোষ আমাদের কথা শুনিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন 'আমার বাড়িতে এতগুল ডাক্তার কেন? বাড়িতে তো কারো অসুখ হয় নি।'

আমি আগাইয়া গিয়া সব কথা বলিলাম। 'আমাদের ডিসেকশন এখনও শেষ হয় নি। অথচ ইউনিভারসিটি থেকে নোটিশ এসেছে আর পনেরো দিন পরই ফার্ষ্ট এম. বি. পরীক্ষা শুরু হবে। আমাদের কোর্সই এখনও শেষ হয় নি। পরীক্ষা দেব কি করে?'

আশুতোষ বলিলেন 'কোর্স যদি শেষ না হয়ে থাকে পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দেব। তোমরা পরশু আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে দেখা কোর। তাহার পরদিনই আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল বার্নাডো সাহেব অ্যানাটমি হলে আসিয়া খবর লইলেন আমাদের ডিসেকৃশন শেষ হইয়াছে কি না। আমাদের প্রফেসর ননীলাল পাল বলিলেন—'না, হয় নাই। কারণ 'বডি' পাওয়া যাইতেছে না। অনেক ছাত্র ডিসেকৃশন শেষ করিতে পারে নাই।

তাহার পরদিন ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। আশুতোষ একটি ক্লার্ককে ডাকিয়া বলিলেন—'ফাস্ট এম. বি. পরীক্ষার দিন পিছাইয়া দিতে হইবে। ক্লার্কটি চলিয়া গেলেন এবং একটি লম্বা-চাওড়া কাগজ আনিয়া বলিলেন 'কি করে পেছিয়ে দেব। কোথাও তো ফাঁক দেখছি না। তিনমাসের মধ্যে কোন ফাঁক নেই।' আশুতোষ গম্ভীরভাবে বলিলেন 'তিনমাস পরে তো আছে? তা হলে ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষা তিনমাস পরেই হবে। নোটিশ দিয়ে দাও।' সে বছর ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষা তিনমাস পরেই হইয়াছিল।

আশুতোষের আর একটি উজ্জ্বল চিত্র মানসপটে আঁকা আছে। হাওড়া স্টেশন হইতে বিরাট একটি শোভাযাত্রা আসিতেছে। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এবং ছাত্ররা আছেন; আর সে শোভাযাত্রার পুরোভাগে আছেন নগ্নগাত্র, নগ্নপদে আশুতোষ। তাঁহার মাথার উপরে একটি পাত্র, পাত্রটির ভিতরে আছে ভগবান বুদ্ধের দেহের কোন অংশ। সেইটি লইয়া কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি সোসাইটিতে তিনি স্থাপন করেন। সেই মহান দৃশ্যটি আজও ভুলি

নাই। বুদ্ধদেবের দেহের একটি অংশ আমাদের ভাইস্‌চ্যান্সেলার মাথায় করিয়া বহিয়া আনিতেছেন—এই ঘটনাই আমাদের চিত্ত সেদিন উদ্বেলিত করিয়াছিল।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। এটি ঘটিয়াছিল যখন আমি বার্নাডো সাহেবের ওয়ার্ডে ছিলাম। তখন বোধ হয় আমার পঞ্চম বর্ষের শেষ বা ষষ্ঠ বর্ষ। কারণ এটা মনে আছে যোগেশদা ( ডাক্তার যোগেশ ব্যানার্জি ) তখন বার্নাডো সাহেবের জুনিয়র হাউস সার্জন। যোগেশদা আমার অপেক্ষা এক বছরের সিনিয়র ছিলেন।

সেই সময় নিয়ম ছিল ঠিক আটটার সময় ছাত্রদের ওয়ার্ডে গিয়া উপস্থিত হইতে হইত। যাহার ওয়ার্ড তিনিও ঠিক আটটার সময় আসিয়া ওয়ার্ডে 'রাউণ্ড' দিবেন এবং কোন রুগীকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রদের বক্তৃতা দিবেন। ইহাকে বলা হইত Clinics দেওয়া। বার্নাডো সাহেবের বেশ 'প্রাকটিস' ছিল। তিনি ওয়ার্ডে আসিতে বেশ বিলম্ব করিতেন। কোন কোনদিন একেবারেই আসিতেন না। যোগেশদা তখন রোলকল করিয়া আমাদের ছাড়িয়া দিতেন। হঠাৎ অমৃতবাজার পত্রিকায় কে একদিন সংবাদটি প্রচার করিয়া দিল। লিখিল বার্নাডো সাহেব আজকাল ওয়ার্ডের কাজে ফাঁকি দিতেছেন। ছাত্রদের আর তিনি 'Clinics' দেন না, প্রাকটিস করিয়া বেড়ান। পরদিনই বার্নাডো সাহেব কাগজটি হাতে করিয়া ওয়ার্ডে আসিলেন। বলিলেন 'আমাকে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে যিনি সচেতন করিয়া দিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় জরুরী রোগীর জন্য ডাক্তারের Consultation-এ ডাকেন, তাই আমাকে যাইতে হয়। ঠিক করিয়াছি কাল হইতে আর যাইব না। ঠিক আটটার সময় ওয়ার্ডে আসিব। ঠিক আটটার সময়ই রোলকল হইবে। তোমরাও আশা করি ঠিক আটটার সময় উপস্থিত থাকিবে।'

আমরা সাধারণতঃ ওয়ার্ডে যাইবার আগে নীলমণির চায়ের দোকানে সমবেত হইতাম। সেখানে চা জলখাবার খাইয়া একটু আড্ডা দিয়া তাহার পর ওয়ার্ডে যাইতাম। সুতরাং ঘড়ি ধরিয়া ঠিক আটটার সময় অনেকেই যাইতে পারিতাম না। পরদিন হইতেই কিন্তু বার্নাডো সাহেব ঠিক আটটার সময় ওয়ার্ডে আসিতে লাগিলেন এবং ঠিক আটটার সময়ই 'রোলকল' হইতে লাগিল। আমরা অনেকেই 'A' অর্থাৎ Absent চিহ্নিত হইয়া percentage হারাইতে লাগিলাম। এইরূপ কয়েকদিন চলিল। কিন্তু একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। বার্নাডো সাহেব ঠিক আটটার সময় আসিয়া যোগেশদাকে বলিলেন

'Joges, call the rolls'। যোগেশদা কিন্তু রোলকল করিতে গিয়া দেখেন রোলকলের রেজিস্টারটাই নাই। সেটি তিনি সামনের টেবিলে রাখিয়াছিলেন। সেখান হইতে খাতাটি উধাও হইয়া গিয়াছে। বার্নাডো সাহেব যোগেশদাকে খুবই বকিতে লাগিলেন। যোগেশদা বলিলেন 'রোজই তো এই টেবিলের উপর রাখি, কোন দিন তো এমন হয় নাই।' তখন বার্নাডো সাহেব এক নাটকীয় কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তিনি হাসপাতালের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেবকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—'হাসপাতালের সব গেট বন্ধ করিয়া দাও। সামনের গেটটি শুধু খোলা থাকিবে এবং সে গেট দিয়া কেহ যদি বাহিরে যাইতে চায় তাহাকে সার্চ না করিয়া যাইতে দিবে না। আমাদের একটি দরকারি খাতা চুরি গিয়াছে।' তাহার পর বার্নাডো সাহেব টেগার্ট সাহেবকে ফোন করিলেন। একটু পরেই দীর্ঘকায় টেগার্ট সাহেব আমাদের ওয়ার্ডে আসিয়া হাজির। তিনি বার্নাডোর মুখে সব শুনিলেন এবং যোগেশদাকে তিনি প্রশ্ন করিলেন। খাতাটি তিনি ঠিক কোনস্থানে রাখিয়াছিলেন? যোগেশদা দেখাইয়া দিলেন। টেগার্ট সাহেব লম্বা ওয়ার্ডের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত চাহিয়া দেখিলেন। ওয়ার্ডের শেষপ্রান্তে একটি বিছানা খালি ছিল। সেখানে কোন রোগী ছিল না। টেগার্ট সাহেব সেই বিছানাটির কাছে গেলেন এবং বিছানার গদিটি উল্টাইয়া দেখিলেন গদির নীচে খাতাটি রহিয়াছে। হাসিয়া তিনি খাতাটি আনিযা বার্নাডো সাহেবকে দিলেন এবং 'গুডবাই' জানাইযা চলিয়া গেলেন। বার্নাডো সাহেব এবং যোগেশদা অপ্রস্তুত হইয়া মূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা সকলে ওয়ার্ড পরিত্যাগ করিয়া 'কমন রুমে' চলিয়া গেলেন। 'কমন রুমে' আমাদের একটা সভা হইল। সভায় স্থির হইল আমরা বার্নাডো সাহেবের ওয়ার্ডে আর যাইব না। ইহাতে আমাদের ছয় মাস নষ্ট হইবে, তথাপি যাইব না। তিনি পুলিস ডাকিয়া আমাদের অপমান করিয়াছেন। কয়েকদিন আমরা ওয়ার্ডে গেলাম না। সাত আটদিন পর বার্নাডো সাহেবের দূত ডাক্তার অখিল মজুমদার মহাশয় একদিন আমাদের সহিত দেখা করিলেন। তিনি তখন মেডিকাল রেজিস্ট্রার ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন বার্নাডো সাহেবের। তিনি আসিয়া বলিলেন— 'সাহেবের সহিত চটাচটি করিয়া লাভ নাই। তা ছাড়া দোষটা তোমাদেরই। তোমাদেরই মধ্যে কেহ খাতাটি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। টেগার্ট সাহেবকে ডাকিয়া সাহেব নিজেও একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছেন। তাহার উপর তোমরা স্ট্রাইক করাতে সাহেবের মন আরো খারাপ হইয়া গিয়াছে। সাহেব

আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—ছেলেদের সহিত একটা মিটমাট করিয়া ফেল। আমার একটা মতলব মাথায় আসিয়াছে—তোমরা যদি মত কর সাহেবকে গিয়া বলি। আমি বলিব যে সব ছেলেরা এই কয়দিন ওয়ার্ডে সময়মত উপস্থিত হইতে পারে নাই; তাহাদের অনুপস্থিত বলিয়া চিহ্নিত করা হইবে না এবং ওয়ার্ড শেষ হইয়া গেলে সাহেব ছেলেদের একটি ভোজ দিবেন। ছেলেরা যে যাহা খাইতে চাইবে তাহাই খাওয়াইতে হইবে। আমরা রাজি হইলাম। বার্নাডো সাহেবও রাজি হইয়া গেলেন। ক্রমে আমাদের সঙ্গে খুব হৃদ্যতা হইয়া গেল। তাহার ওয়ার্ড যখন শেষ হইয়া গেল সত্যই তিনি তাহার বাড়িতে বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। সাহেবী, মুসলমানী এবং আমাদের স্বদেশী খাবারের প্রচুর সমারোহ হইল সেদিন। বার্নাডো সাহেবের বাড়িতে ভীম নাগের ভিয়ান বসাইয়াছিলাম আমরা। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা এক একটি টেবিল ছিল এবং প্রত্যেক টেবিলে প্রচুর খাবার। খাবার আরম্ভ করিবার পূর্বে বার্নাডো সাহেব হাসিয়া বলিলেন—Before we start let me remind you that the capacity of normal human stomach is four ounces only. Now let us begin.'

শুধু খাবার নয়। মদও ছিল। দুই একটি ছেলে মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িল। একজন তো বলিল—'Col-Barnado, please for a rick-saw. I always ride a rick-saw after drinking. বার্নাডো সাহেব তাহাকে রিক্সা আনাইয়া দিলেন। পরদিন নোটিশ বোর্ডে ছোট একটি নিবন্ধ দেখা গেল। নিবন্ধটির নাম--How to drink like a gentleman. যতদূর আছে সেটির সারমর্ম এই—পরের পয়সায় মদ খাইলেও কোন ভদ্রলোক কখনও ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেন না।

বার্নাডো সাহেবের ওয়ার্ডে যখন ছিলাম তখন ডাক্তার প্রফুল্লরঞ্জন দাশগুপ্ত সিনিয়র হাউস সার্জেন ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি অনেক ঋণী। তিনি হাতেকলমে আমাকে অনেক জিনিস শিখাইয়াছিলেন। Percussion করা (অর্থাৎ বুক পিঠ আঙুল দ্বারা ঠুকিয়া পরীক্ষা করা), Auscultate করা (স্টেথোস্কোপ দিয়া পরীক্ষা করা) তাঁহার নিকটই শিখিয়াছিলাম। তিনিই বলিয়াছিলেন 'দুপুরবেলা যখন ক্লাস থাকবে না, তখন একা একা ওয়ার্ডে এসে তোমার 'বেড'-এর রোগীদের পরীক্ষা কোর। হাসপাতালের টিকিটে কি লেখা

আছে তা দেখো না। রোগীকে জিজ্ঞাসা কোরো, তার কি কষ্ট, কেন সে হাসপাতালে এসেছে। তারপর তুমি তাকে নিজে পরীক্ষা করবে। সঙ্গে যেন Hutchinson-এর Clinical methods বইটা থাকে। গ্রীণের differential diagnosis বইটাও এনো। তুমি নিজে সেটা করবে, diagnosis যদি ভুল হয়, ক্ষতি নেই, তোমার কেন ভুল হচ্ছে সেটা আমি পরে দেখিয়ে দেব। কিন্তু তোমাকে আগে রোগীটি পরীক্ষা করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তারপব এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।'

তাঁহার এ আদেশ আমি পালন করিয়াছিলাম। তাঁহার অভিজ্ঞতা আমার ডাক্তারী জ্ঞানকে অনেক পরিপুষ্ট করিয়াছিল। তাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মণি দের কথাও মনে পড়িল। তিনি আমাদের সময় Pathologyর demonstrator ছিলেন। তাঁহার নিকটও আমি ঋণী। তিনি যত্ন করিয়া আমাকে Pathological Histology শিখাইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনিও মারা গিয়াছেন। প্রফুল্লবাবুর খবর জানি না।

এই সময় আমার বন্ধু শিবদাস বসুমল্লিক ও আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম। শিবদাসের জ্যোতিষ-চর্চা করা একটা নেশা ছিল। সে কোষ্ঠি এবং হস্ত-রেখা বিচার করিত। আমিও তাহার নিকট এ বিদ্যাটা কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম। মনে বাসনা জাগিল এ বিষয় একটু গবেষণা করিব। যে সব রোগী সাংঘাতিক রোগের কবলে পড়িয়া হাসপাতালে ভরতি হইত আমরা সম্ভব হইলে তাহাদের ঠিকুজি সংগ্রহ করিতাম এবং নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতাম যে ঠিকুজি হইতে ঠিক সেই সময় তাহার ফাঁড়ার কোন খবর পাওয়া যায় কি না। অনেক রোগী আমাদের ঠিকুজি সরবরাহ করিত। যেখানে ঠিকুজি মিলিত না সেখানে হস্ত-রেখা বিচার করিবার চেষ্টা করিতাম। সব সময় মিলিত না, অনেক সময় খুব মিলিয়া যাইত। আমি অনেক ভিখারীর হস্ত-রেখাও দেখিতাম তখন। তখনই দেখিয়াছি, অনেক ভিখারীর ভাগ্যরেখা খুব চমৎকার, কিন্তু সে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের প্রায়ই Sun-line থাকিত না। এসব খবর একটা খাতায় লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু সে খাতা কবে হারাইয়া গিয়াছে। জীবনে অনেক জিনিষ হারাইয়াছি। অনেক লেখাও হারাইয়া গিয়াছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব অনেকের বিবাহে প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি। কয়েকটি-মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং আমার 'স্বরসপ্তক' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

মেডিকেল কলেজের অনেক স্মৃতি।

আমাদের সময় মেডিকেল কলেজে প্রায়ই মেমসাহেব নার্স থাকিত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও থাকিত কিছু কিছু। নার্সদের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিতাম। প্রথম প্রথম যখন নাইট-ডিউটি পড়িত তখন ওই নার্সরা আমাদের দেখাইয়া দিত। সব শিখাইত। রাত্রে আমাদের সাধারণতঃ ইনজেক্‌শন দিতে হইত এবং সার্জিক্যাল কেসের ড্রেসিং মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিতে হইত। কি করিয়া কি করিতে হয় তাহা নার্সদের নিকটই শিখিয়াছি। নার্স গ্রীণের কথা এখনও মনে আছে। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শুধু যে যত্ন করিয়া শিখাইতেন তাহা নহে। মাঝে মাঝে চা, কফি, ওভালটিন প্রভৃতিও খাওয়াইতেন। তাঁহার সেই মাতৃমূর্তি এখনও আমার মনে আঁকা আছে। মেডিকেল কলেজে আমরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতাম এই নার্স এবং হাউস সার্জনদের নিকট হইতে। সাহেব প্রফেসরদের সঙ্গে সাধারণ ছেলেদের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাঁহারা সাহেব হওয়াতে তাঁহাদের খুব কাছ ঘেঁষিতে আমরা সাহস করিতাম না। তবে আমাদের মধ্যে কিছু 'খলিফা' ছেলে ছিল, যাহারা সাহেবদের 'কল' জোগাড় করিয়া দিত এবং সেইজন্যেই সাহেবদের অনুগ্রহভাজন হইত। পদলেহীর দল সেকালেও ছিল, একালেও আছে। এই পদলেহীদের মধ্যে অনেকে জীবনে উন্নতি করিয়াছিল কেবল সুপারিশের জোরে। যোগ্যতার জোরে নয়। সাহেবদের মনে হইত 'নেটিভদের' মনে মনে ঘৃণা করিতেন। একটা কথা মনে পড়িতেছে—আমরা যখন কলেজে পড়িতাম তখন ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বর বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন, যে গবেষণার ফলে **Urea Stibamine** নামক ওষুধটি আবিষ্কৃত হইয়া হাজার হাজার কলেজের রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। কিন্তু যখন তিনি গবেষণা করিতেছিলেন, তখন তিনি ওই সাহেবদের নিকট হইতে উৎসাহ পান নাই। তাঁহার গিনিপিগগুলি রাখিবার স্থানও তিনি পাইতেন না। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ হাসপাতালের ছাতে সেগুলি রাখিয়াছিলেন ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অপরাধ তিনি নেটিভ—কালা আদমি। তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতেছিল—বিশেষ করিয়া মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন। তাই সাহেবদের উপর আমরা খুব সন্তুষ্ট ছিলাম না। সাহেবরাও আমাদের সুচক্ষে দেখিতেন না। এ সব সত্ত্বেও দুই একজন প্রফেসর আমাদের প্রিয় ছিলেন। প্রথমেই নাম করতে হয় আর্মিটেজ সাহেবের। তিনি **Midwifery** এবং **Gynaecology** পড়াইতেন। যখন কোর্থ

ইয়ারে উঠিয়া প্রথম তাঁহার ক্লাসে গেলাম তখন প্রথমেই লক্ষ্য করিলাম তিনি রোল-কল করেন না। সমস্ত ছেলেকেই 'P' চিহ্নে চিহ্নিত করেন। ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন 'তোমরা ইচ্ছা করিলে এ বছরটা আমার ক্লাসে না আসিতে পারো।—এ সময়টা তোমরা মেডিসিন এবং সার্জারি পড়। Fifth year-এ যখন তোমরা আমার ওয়ার্ডে আসিবে তখন অন্য কোনও বিষয় পড়িবার সময় পাইবে না। সর্বক্ষণ Midwifery ও Gynaecolagy পড়িতে হইবে। তোমাদের পারসেন্টেজ হারাইবার ভয় নাই। আমি সে ব্যবস্থা করিব।' তবু আমরা তাঁহার ক্লাসে যাইতাম এবং সামনের দিকের বেঞ্চে বসিবার চেষ্টা করিতাম। উদ্দেশ্য মুখ চেনানো। প্রথম প্রথম তাঁহার বক্তৃতা বুঝিতে পরিতাম না। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা দিবার এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল, সকলেই আকৃষ্ট হইত। ফোর্থ ইয়ার, ফিফ্থ ইয়ার, সিক্সথ ইয়ারের ছেলেরা তো থাকিতই, অনেক হাউস সার্জন এবং বাহিরের ডাক্তাররাও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। আমাদের লেকচার থিয়েটার উপচাইয়া পড়িত।

আমরা যখন ফিফ্থ ইয়ারে উঠিলাম তখন সত্যই আমাদের অন্য বিষয় পড়িবার অবসর ছিল না। সব সময়ই মিডওয়াইফারি বা গাইনিকোলজির বই পড়িতে হইত। আমাদের কার্যক্রম নিম্নলিখিতপ্রকার ছিল। প্রথম দিনই গ্রীণ আর্মিটেজ আমাদের টেক্স্ট বুক দুইটি দেখাইয়া বলিলেন 'তোমরা ছয় মাস আমার ওয়ার্ডে থাকিবে। এই ছয় মাসের মধ্যে এই বই দুটি পড়িয়া শেষ করিবে। আমি প্রতিদিন পড়া ধরিব।' প্রতিদিন প্রায় কুড়ি-পাঁচিশ পাতা পড়িয়া আসিতে হইত। পড়া না পারিলে আমাদের তীব্র ভর্ৎসনার সম্মুখীন হইতে হইত। পড়া না পারার জন্য তিনি আমাদের একজন সহপাঠীর কান পর্যন্ত মলিয়া দিয়াছিলেন। সে মেডিকেল ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল। গ্রীণ আর্মিটেজ তাহাকে যাইতে দিলেন না। বলিলেন 'আমি যখন প্রথম পাশ করিয়া এখানে আসি তখন আমি মহামূর্খ ছিলাম। আমার মূর্খতার জন্য আমার গুরু গ্রীণ লাথি পর্যন্ত মারিয়াছিলেন। তাঁহার লাথি সহ্য করিয়াছিলাম বলিয়া কিছু শিখিতে পারিয়াছি।'

আমাদের প্রথমে ডিউটি ছিল ইডেন হাসপাতালের আউটডোরে। সেখানে অপেক্ষমান রোগিণীদের Case history আউটডোর টিকিটে লিখিতে হইত। কি কষ্টের জন্য হাসপাতালে আসিয়াছে, কষ্ট কবে শুরু হইয়াছে, বয়স কত, কি জাত, তাহার মাসিক ঋতু স্বাভাবিকভাবে হয় কি-না—এই সব। এই সব লিখিয়া টিকিটের উপর নিজের নাম লিখিতে হইত। এই সময় আউটডোরের কর্তা

ছিলেন ম্যাকসুইনি সাহেব। সব টিকিটগুলি গিয়া তাঁহার টেবিলে জমা হইত। তিনি একে একে রোগিণীদের ডাকিতেন এবং যে ছাত্রের নাম টিকিটের উপর লেখা থাকিত তাহাকেও ডাকিতেন। সেই ছাত্রটি রোগিণীর বিষয়ে ম্যাকসুইনি সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিবার এবং রোগিণীটিকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইত। সেই সময় আমরা P. V. (অর্থাৎ Pen Vaginum) পরীক্ষা করিবার প্রথম পাঠ পাইতাম। একটি ছবি মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল। একটি অসহায় কিশোরী মেয়ের মুখ। বয়স বোধ হয় ষোলর কাছাকাছি। চার মাস মাসিক ঋতু বন্ধ আছে। তাঁহার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন 'আমাদের গ্রামের ডাক্তারবাবুর সন্দেহ, পেটে টিউমার হয়েছে। তাই এখানে আনিয়াছি।' পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, মেয়েটি গর্ভবতী। আরও জানা গেল, মেয়েটি বাল-বিধবা। আমরা কাজকর্ম সারিয়া প্রায় বারোটা নাগাদ যখন বাহির হইলাম তখন চোখে পড়িল সেই মেয়েটি ইডেন হাসপাতালের গেটের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম তাহার দেবর তাহাকে গেটের ধারে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য বালিকা ভাবিয়া পাইতেছে না এখন কি করিবে। আমি বলিলাম 'আপনি এইখানে থাকুন, হয়ত একটু পরে তিনি ফিরিয়া আসিবেন।' মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল 'না সে আর ফিরিবে না।' তখন আমি বলিলাম 'তবু আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমার একটি জানা-শোনা অবলা-আশ্রম আছে। সেখানেই আপনাকে লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে পারি। তাহারা আপনার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। আপনি একটু বসুন, আমি মেস হইতে খাইয়া আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব।' মেয়েটি বসিয়া রহিল। আমি চলিয়া গেলাম। তখন ৩নং মির্জাপুর স্ট্রীটে থাকিতাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া দেখিলাম মেয়েটি নেই। কলিকাতার জনসমুদ্রে সে হারাইয়া গেল। তাহার আর সন্ধান পাই নাই। মনে হইতেছে এই ঘটনাটি আমার কোন গল্পগ্রন্থে গাঁথিয়া রাখিয়াছি।

আউট-ডোর শেষ করিয়া আমরা যখন ইন-ডোরে গেলাম, তখন আমাদের প্রত্যেককে চারটি করিয়া Bed দেওয়া হইল, অর্থাৎ চারজন রোগী আমাদের প্রত্যেকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। গ্রীণ আমিটেজ বলিলেন—'ইহাদের টিকিট তোমরা দেখিও না। তোমরা নিজেরা ইহাদের প্রশ্ন করিয়া, পরীক্ষা করিয়া, বই পড়িয়া ঠিক করো ইহাদের কি হইয়াছে এবং তাহা একটা খাতায় লিখিয়া ফেল। তোমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর তোমাদের সহিত আলোচনা করিব।'

দুই একজন ছেলে টিকিট দেখিয়া diagnosis লিখিয়াছিল কিন্তু জেরায় ধরা পড়িয়া গেল এবং খুব বকুনি খাইল। গ্রীণ আর্মিটেজ যখন বকুনি দিতেন মনে হইত একটা ঝড় বহিয়া যাইতেছে। আমাদের Case যখন অপারেশন টেবিলে উঠিত তখন একটি খাতা-পেন্সিল লইয়া আর্মিটেজ সাহেবের পাশে দাঁড়াইতে হইত। তিনি যেভাবে অপারেশন করিতেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতে হইত। অপারেশন শেষ করিয়া তিনি যখন হাত ধুইতেন তখন সে খাতা তাঁহার চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতাম; তিনি সাবধানে হাত ধুইতে ধুইতে সেটি পড়িতেন।

তাহার পর কলম বাহির করিয়া সেটি সংশোধন করিয়া দিতেন। মনে পড়িতেছে একবার লিখিয়াছিলাম—'An incisun about six inches long, was given on the abdomen'. আর্মিটেজ সাহেব given কাটিয়া made লিখিলেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'it is not a gift'.

এ সব ছাড়াও Museum-এ আমাদের লইয়া গিয়া আমাদের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত specimen দেখাইতেন তিনি। তাঁহার বাড়িতেও আমরা কেহ কেহ যাইতাম এবং তিনি অনেক বই আমাদের পড়িতে দিতেন। মনে পড়ে তাঁহাকে একদিন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'Semen' [শুক্র] আমাদের শরীরে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহার সার্থকতা আমাদের শরীরের বাহিরে স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তাহা হইলে শুক্রক্ষয় এত নিন্দনীয় কেন? আর্মিটেজ সাহেব আমাকে একটি বই দিয়া বলিলেন—'এই বইটা পড়িয়া দেখ তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে। বইটির নাম Excessive Venery, গ্রন্থকারের নাম নাই। বইটিতে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে আমাদের Brain ( মস্তিষ্ক ) এবং Nervous Tissue যে সব উপাদান দিয়া প্রস্তুত হয়, শুক্রও সেই সব উপাদনে প্রস্তুত। আমাদের শরীরে শুক্রের ভাণ্ডার খালি হইয়া গেলে শরীর আগে সেই ভাণ্ডার পূর্ণ করে। সুতরাং সে ভাণ্ডার যদি ঘন ঘন খালি হইয়া যায় মস্তিষ্কের অন্যান্য স্নায়ুগুলি উপাদানের অভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক আর্মিটেজ গ্রীণ ছেলেদের জ্ঞানদান করিবার জন্য মাঝে মাঝে দুঃসাহসিক কাজও করিতেন। মনে আছে একটি মহিলার জননেন্দ্রিয়ে একটু অস্বাভাবিকতা ছিল। মূত্রাশয়ের সহিত যুক্ত ছিল সেটি। আর্মিটেজ সাহেব সেই মেয়েটিকে ক্লাসে আনিয়াছিলেন সব ছাত্রদের দেখাইবার জন্য। ইহা লইয়া কাগজে লেখালিখি হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল যে মহিলাটি ভারতীয় বলিয়াই

গ্রীণ আর্মিটেজ সাহেব তাহাকে ক্লাসে আনিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যদি মেমসাহেব হইতেন তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর হইত না। তিনি কিন্তু মেয়েটির অভিভাবকদের অনুমতি লইয়াই এ কাজ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িতেছে, একটি মেমসাহেব রোগিণী আমাকে P. V. (pen vaginum) পরীক্ষা করিতে দিতে চাহে নাই। গ্রীণ আর্মিটেজ তাহাকে বললেন 'এটি প্রাইভেট ক্লিনিক নয়। এটি শিক্ষালযের হাসপাতাল। আপনি যদি ছাত্রকে পরীক্ষা কবিতে দিতে না চান, এ হাসপাতালে আপনার থাকা চলবে না। কোন প্রাইভেট ক্লিনিকে চলিয়া যান।' মেমসাহেব প্রাইভেট ক্লিনিকে চলিয়া গেলেন। খাঁটি মেমসাহেব রোগিণী আমাদের হাসপাতালে বড় একটা আসিত না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতীয় মহিলারাই সংখ্যায় বেশী ছিল। তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিতেন না। গ্রীণ আর্মিটেজ ত আপত্তি বরদাস্ত করিতেন না। তাঁহার কাছে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, ভালোবাসিত। তাঁহার চাপে পড়িয়া ধাত্রীবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলাম। গ্রীণ আর্মিটেজের আর একটি গুণ ছিল, তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্মান কবিতেন। চরম শক্রকে চিকিৎসক-জগতের অগ্রগামী পথিকৃৎ বলিয়া বারম্বার উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি তাঁহাকে। ডাঃ কেদার দাস মহাশয়কেও খুব শ্রদ্ধা করিতেন তিনি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে হইত তিনি যেন আমাদের আপনজন নন। তিনি বিদেশী শাসকের প্রতিনিধি। সে যুগে সব সাহেব সম্বন্ধেই আমাদের সকলের মনে এই ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিত। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। কোন সাহেবকেই আমরা প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিতাম না। তবে সাহেবদের কর্তব্যবোধ, তাহাদের সময়-নিষ্ঠা আমাদের মনে দাগ কাটিত। তাহাদের নিকট যে অনেক কিছু শিখিবার আছে এ কথা আমরা স্বীকার না করিয়া পারিতাম না।

প্রফেসার ষ্টীন সাহেবের কথা মনে পড়িতেছে। স্টীন সাহেব আমাদের সময়ে সেকেণ্ড সার্জন ছিলেন। বেশ বলিষ্ঠ, লম্বা-চওড়া পুরুষ ছিলেন তিনি। কথা বলিতেন কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। তিনি আর্মিটেজ সাহেবের মতো বক্তৃতা দিতে পারিতেন না। ওয়ার্ডে যে ক্লিনিকাল বক্তৃতা দিতেন তাহাও ভালো করিয়া শোনা যাইত না। কিন্তু সার্জন হিসাবে তাঁহার নাম ছিল। একটি ঘটনার জন্ত তাঁহাকে ভুলি নাই। তখন শীতকাল। একটা রোগীর একটি Kidney-তে Tumour হইয়াছে। Kidney টি অপারেশন করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

স্টীন সাহেব ওয়ার্ডে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অপারেশন করিবার পূর্বে প্রথমে আমাদের কি করিতে হইবে ? আমরা কেহ সদুত্তর দিতে পারিলাম না। স্টীন সাহেব বলিলেন—'প্রথমে দেখিতে হইবে যে Kidney-তে Tumour হয় নাই। সেই Kidney টি সম্পূর্ণ সুস্থ আছে কি না। Kidney হইতে Ureter ( উরিটার ) নামক নল দিয়া মূত্র মূত্রস্থলীতে ( যাহাকে ইংরেজি Bludder বলে ) সঞ্চিত হয়। স্টীন সাহেব ঠিক কবিলেন যে ভালো Kidney টিব Ureter হইতে মূত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা পরীক্ষা কবিবেন। তিনি ইহাও স্থির ক'রলেন যে ঐ সুস্থ Kidney-টি মিনিটে কয় ফোঁটা করিয়া মূত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। অসুস্থ Kidney অপসারিত হইলে এই Kidney টি তাহার ভার সামলাইতে পাবিবে কি-না সেটি সর্বাগ্রে জানা দরকার। সুতরাং প্রথমে তিনি সুস্থ Kidney টিব Ureter টি বাহিব কবিযা তাহা হইতে মূত্র সংগ্রহেব ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা এমন হইল যে একটি বড কাঁচেব শিশিব ভিতর একটি ক্যাথিটাব হইতে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পডিতেছে তাহা দেখা যাইবে। আমাদেব বলিলেন—'প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট অন্তব অন্তর গণিয়া দেখিতে হইবে, মিনিটে কয় ফোঁটা কবিযা ইউরিন পড়িতেছে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় বারে' বার গণিতে হইবে।' স্টীন সাহেব বলিলেন 'সুতরাং বারোজন ভলান্টিযাব চাই। প্রত্যেকে একঘণ্টা করিয়া কাজ করিবে। আমি একজন ভলান্টিযার হইলাম। সন্ধ্যা ৬টা হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত এই গণনা চলিবে। আমাকে তোমবা যে সময় আসিতে বলিবে সেই সময় আসিব। বাকি ১১ জন তোমরা কে কখন আসিবে নিজেদের মধ্যে ঠিক করিয়া লও।'

আমার পালা পড়িয়াছিল রাত্রি ১২ টা হইতে ১টা পর্যন্ত। তাহার পর স্টীন সাহেবের আসিবার পালা। রাত্রি ১টা হইতে ২টা পর্যন্ত তিনি গণিবেন। আমি একমনে গণিতেছিলাম। টং করিয়া ১টা বাজিল। কানের কাছে স্টীন সাহেব ফিসফিস করিয়া বলিলেন 'Have you finished ? I have come—'ঘাড ফিরাইয়া দেখিলাম কালো গরম সুট পরিয়া স্টীন সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। মুখে মৃদু হাসি। তাঁহার এ মূর্তিটি আজও আমার মনে আঁকা আছে। ঘটনাটি খুবই সাধারণ ঘটনা, তবু স্টীন সাহেবের এই মূর্তিটি আজও আমার মনে আঁকা আছে কারণ সেটি কর্তব্যপরায়ণ সময়-নিষ্ঠা সভ্য মানবের ছবি। যে গুণের জন্য পাশ্চাত্য জাতিরা আজও সকলের শ্রদ্ধাভাজন—এই ছবিটি যেন তাঁহারই প্রতীক।

আমাদের সেকালের মেডিকেল কলেজের যে ছবি আমার মনে দেদীপ্যমান

হইয়া আছে তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুশাসিত শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি চিকিৎসা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে ছাত্ররা এখানে ডাক্তারী পড়িবার জন্য আসিত, ওই সব প্রদেশ হইতে নানারকম রোগীও আসিত চিকিৎসার জন্য। আমাদের মেডিকেল কলেজ একটা নামজাদা কলেজ ছিল। সমস্ত প্রদেশের নির্বাচিত ভালো ছেলেরাই সে কলেজে পড়িত। আমি খুব একটা মিশুক প্রকৃতির ছিলাম না। তবু যে কয়জনের সঙ্গে মিশিয়াছিলাম তাহাদের প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ছাত্রদের মধ্যে ভালো গায়ক, ভালো অভিনেতা, ভালো বক্তা, ভালো চিত্রকর অনেক ছিল। আমি সে সময় অবসর পাইলেই রাস্তায় ঘুরিতাম। পরিমল গোস্বামী, শিবদাস বসুমল্লিক, সমর ভট্টাচায— ইহাদের মধ্যে কেহ না কেহ আমার সঙ্গে থাকিত।

কলিকাতার রাস্তার ফুটপাথে তখন হাঁটা অসম্ভব ছিল না। কলিকাতা শহরকে এবং কলিকাতার সদা-চঞ্চল জীবনধারাকে আমি যেন মনে মনে গ্রাস করিতাম।

'জঙ্গম' উপন্যাসের উপাদান এবং চরিত্রাবলী এই সময়ই আমার মনের প্রচ্ছন্ন-লোকে ধীরে ধীরে একত্রিত হইতেছিল। কিছুদিন পরে তাহাদের রূপায়িত করিয়াছিলাম। 'জঙ্গম' উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র ভল্টু। শিবদাসেরই প্রতিচ্ছবি সেটি। ঠিক ফটোগ্রাফ নয়, পোরট্রেট। আমার কলিকাতা জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা আমার পরবর্তী অনেক লেখায় ফুটিয়াছে। আমি সে সময় মাঝে মাঝে সাহিত্য-চর্চা করিতাম, কিন্তু কোন সাহিত্যিক-আড্ডায় জুটিতে পারি নাই। প্রথমতঃ অবসর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সুযোগ ছিল না এবং তৃতীয়তঃ খুব একটা প্রবৃত্তিও হইত না। আমি কাগজে লেখা পাঠাইয়া নেপথ্যে থাকাই বেশী পছন্দ করিতাম। 'কল্লোল' পত্রিকাতেও দুই একটা লেখা লিখিয়াছি। কিন্তু 'কল্লোল' দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার প্রয়াস নাই। 'শনিবারের চিঠি'র সজনীর সহিত 'প্রবাসী' অফিসে একদিনমাত্র দেখা হয়েছিল। তাঁহার কাগজ তাঁহার অনুরোধে সে সময় 'কাঁচি' বলিয়া একটি কবিতা এবং আর একটা কি গদ্য-রচনা লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার আড্ডায় তখনও আমি যাই নাই। 'শনিবারের চিঠি'র সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল পরিমল সম্পাদক হইবার পর। আমি যে সময় মেডিকেল কলেজে পড়িতাম সে সময় বিদেশী নোংরা সাহিত্যের নকলে এদেশেও একরকম নোংরা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সাহিত্যের লেখকরা নিজেদের বিদ্রোহী বলিয়া জাহির করিতেন। তাঁহারা নিজেরাই ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আত্মপ্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিতেন। তাঁহাদের এই ধরনের ক্লেদাক্ত সাহিত্য-চর্চা

আমার ভালো লাগিত না। সজনীকান্ত ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র পত্রিকায়। মাঝে মাঝে 'শনিবারের চিঠি' কিনিয়া পড়িতাম। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতাটা উপভোগ করিতাম, কিন্তু আর একটা কথাও মনে হইত; মনে হইত উহার ভিতরও যেন ক্লেদ আছে। প্রতি সপ্তাহে—'মণি-মুক্তা' নাম দিয়া যে সব রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হইত, সুরুচির পরিচয় নাই বলিয়া আমার মনে হইত। 'শনিবারের চিঠি'র দৌলতেই ওই সব লেখকরা তখন জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন লেখক বেশ প্রতিভাবান ছিলেন এবং সেই প্রতিভার জোরেই পরে তাঁহারা বাংলাসাহিত্যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেকালকার নোংরামির জন্য নয়। কিম্বা রবীন্দ্র-যুগ-অন্তকারী বিদ্রোহীরূপেও নয়। তাঁহাদের লেখাতেও রবীন্দ্র-প্রভাব যথেষ্ট। তাঁহারা রবীন্দ্র-অনুসারী সার্থক লেখক হিসাবেই এখন খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

তখন কিন্তু এসব লইয়া আমি বিশেষ মাথা ঘামাইতাম না। মেডিকেল কলেজের পড়া লইয়া ব্যস্ত থাকিতাম। বাংলাসাহিত্যের বই পড়িবার সময় ছিল না। বাংলা মাসিকপত্র কিঞ্চিৎ কখনও ষ্টলে দাঁড়াইয়া উল্টাইয়া দেখিতাম। কিনিতাম না। হাতে বাড়তি পয়সা থাকিত না। বস্তুত সে সময় থিয়েটার ও সিনেমা দেখিয়াই আমার মনের শিল্প পিপাসা মিটিত। তখন বিজু থিয়েটারের উপরতলার চার আনার টিকিট খরচ করিয়া আমরা ভালো ভালো বিদেশী সিনেমা দেখিতাম। চার্লি চ্যাপলিন, লরেল হার্ডি, হ্যারল্ড লয়েড, মেরি পিকফোর্ড, নার্জি মোভা ( রাশিয়ার অভিনেত্রী ) প্রভৃতি নটনটীরা তখন আমাদের হৃদয়হরণ করিতেন। তখন সিনেমা 'টকি' হয় নাই। নির্বাক সিনেমাতেই কিন্তু তখন যে আনন্দ পাইয়াছি পরে 'টকি'তে তত পাইয়াছি কিনা সন্দেহ। থিয়েটার দেখিতে হইলে বেশি পয়সা লাগিত। আমরা পীটেই বসিতাম। টিকিট যতদূর মনে পড়ে আট আনা কিংবা বারো আনা ছিল। ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। দানীবাবু, কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, তিনকড়িবাবু প্রভৃতি নামজাদা অভিনেতা ছিলেন সে যুগে। আরো অনেকে ছিলেন, সকলের নাম মনে পড়িতেছে না। অপরেশবাবু, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্রবাবুর নাম পরে শুনিয়াছিলাম। অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম মনে পড়িতেছে তারাসুন্দরীর, আঙুরবালার, কৃষ্ণ ভামিনীর, সুবাসিনীর, সুশীলাসুন্দরীর। নীহারবালা বলিয়া আর একজনের নামও মনে পড়িতেছে। কিন্তু শিশির ভাদুড়ী যখন তাঁহার 'সীতা' লইয়া নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন তখন চারিদিকে একটা

সাড়া পড়িয়া গেল। সিনেমা অপেক্ষা থিয়েটারই বেশী ভালো লাগিত আমার। এখনও তাহাই লাগে। কিন্তু তখন সবসময় থিয়েটার দেখিবার পয়সা জুটিত না। সাহেব-গঞ্জ হইতে মাঝে মাঝে প্রবোধদা আসিয়া থিয়েটার দেখাইতেন। আর অখিলদা মাঝে মাঝে টাকা দিতেন। অখিলদার কথা আগে একবার উল্লেখ করিয়াছি। অখিলদার কাছে নানাভাবে ঋণী আছি। অখিলদা তখন ডাক্তার হইয়া রোজগার করিতেছেন। যখন কলেজের ক্যান্টিনে নীলমণির দোকানে ধার স্তূপীকৃত হইয়া যাইত অখিলদা তাহা শোধ করিয়া দিতেন। যখন পকেট শূন্য অথচ থিয়েটার দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল, তখন অখিলদা থিয়েটার দেখাইতেন। অখিলদার কাছে অনেক ঋণ। অখিলদা কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমার কাছে আসিয়াছিলেন, জানি না এখন কোথায় আছেন।

যে কথা বলিতেছিলাম—থিয়েটার, সিনেমাই শিল্পপিপাসা মিটাইত। নাটক লিখিবার প্রেরণাও সে সময় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। একটা নাটক লিখিয়া শিশির-বাবুর কাছে লইয়া গিয়াছিলাম এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মেডিকেল কলেজের পড়ার চাপে আর বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার একটা ধারণা তখন হইতেই মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল_যে মহৎ স্বষ্টির সঙ্গে নাটকীয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমার কলিকাতায় এই জীবনে কিন্তু হঠাৎ একদিন যবনিকাপাত হইল। বিহারে নতুন মেডিকেল কলেজ খুলিল। বিহার গভর্ণমেণ্ট বাংলা গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন আমরা যে সব ছাত্র তোমাদের মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়াছি, তাহাদের ফেরত পাঠাও। তাহাদের আমরা পাটনা কলেজে পড়াইব এবং তাহাদের জন্য প্রতি বছর যে টাকা তোমাদের দিতাম তাহাও আর দিব না। একদিন নোটিশ-বোর্ডে এই বার্তা পড়িয়া বড়ই মুষড়াইয়া পড়িলাম। আমি তখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে। অসুখের জন্য পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই আমাদের দলের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারি নাই। এখন পাটনায় গিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি যদিও বরাবর পাটনা বিশ্ববিত্তালয়েরই ছাত্র ছিলাম, তবু ছয় বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতার উপর একটা মায়া বসিয়া গিয়াছিল। এম. বি. পরীক্ষার শেষ ডিগ্রীটাও কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয় হইতে লইব—মনে মনে এই আকাঙ্খা জাগিল। তখন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজে ডাঃ কেদার দাস প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিলাম এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম আমাকে আর. জি. কর কলেজে ভর্তি করিয়া

লউন। তিনি সম্মত হইলেন না। আমাকে উপদেশ দিলেন 'তুমি পাটনাতেই যাও। পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে যদি প্রথম ব্যাচে এম. বি. পাশ করিতে পারো তাহলে তোমার আলাদা কদর হবে। এখানে তা হবে না। পাটনাতেই চলে যাও।'

পাটনাই চলিয়া গেলাম শেষে।

## পাটনা এবং পুনশ্চ কলিকাতা

পাটনার স্মৃতি বিস্তৃত কবিযা লিখিব না। কারণ লিখিবাব মতো কিছুই নাই। কলিকাতা হইতে পাটনা গিযা মনে হইল যেন বনবাসে আসিলাম। নোংরা হাসপাতাল। নোংরা পরিবেশ, যে মেডিকেল কলেজে এতদিন কাটাইয়াছি সে মেডিকেল কলেজেব আভিজাত্য কোথাও নাই। পুরাতন টেম্পল মেডিকেল স্কুলকেই প্রিন্স অফ ওয়েলস্ মেডিকেল কলেজ করা হইয়াছে। মেডিকেল কলেজেব গৌববে সে তখনও ভূষিত হয নাই। আমি প্রথমে গিয়া হোস্টেলে সিট পাই নাই। ফণীদার বাড়িতে উঠিয়াছিলাম। ফণীদা (ক্যাপটেন পি. বি মুখার্জি, বেডিওলজিষ্ট) বাবার বন্ধু স্থানীয প্রমথনাথ মুখোপাধ্যাযের ভাইপো, অনুকূল জ্যাঠামশাইয়েব জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পাটনা মেডিকেলের রেডিওলজিষ্ট ছিলেন মেডিকেল কলেজের কাছেই তাঁহাব বাসা ছিল। নামজাদা রেডিও-লজিষ্ট ছিলেন ফণীদা। ফণীদার সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল পূর্ব হইতে। তাঁহাদের বাড়িব সহিত আমাদের আত্মীয়তা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমি যখন পাটনায় গেলাম তখন বৌদি ঠিক দেবরের মতোই সস্নেহে আমাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলেমেয়েরা আমার বন্ধু হইয়া উঠিল। বীণু, বুলু, বাপি, ক্ষেপি, কানু, লালটুর কথা মনে আছে। কানু, লালটু তখন খুব ছোট ছিল, আমার কোলে-পিঠে, বুকে চড়িত। এখন ভাবিতে কষ্ট হইতেছে বাপি, ক্ষেপি, কানু, লালটু সবাই অকালে মারা গিয়াছে। ফণীদাও কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছেন। বৌদি বাঁচিয়া আছেন এখনও। তাঁহার মেয়েরা এখনও বাঁচিয়া আছে। আমার পাটনার স্মৃতি ফণীদার পরিবারের সহিত জড়িত। লিখিতে বসিয়া বারবার তাহাদের কথা মনে পড়িতেছে। বৌদি এখন কলিকাতাতেই গড়িয়া অঞ্চলে আছেন। আমিও বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতায় আসিয়াছি। থাকি লেকটাউনে। গড়িয়া হইতে অনেক দূরে। বৌদির সহিত দেখা করিতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। কিন্তু দূরত্ব এত বেশী এবং যাওয়া-

আসা এত কষ্টকর যে যাওয়া আর হইয়া ওঠে না। বুড়া-বয়েসে ট্রামে, বাসে চড়িতে পারি না, মোটরে যাতায়াত খুবই ব্যয়সাধ্য। জীবনযাত্রাই দুঃসাধ্য আজকাল। চিঠিপত্র লিখিয়াও কাহারও খবর লওয়া যায় না, কারণ পোষ্টাফিসে না কি চিঠি বিলি হয় না। স্বাধীনতার পর সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। শাসন-কর্তারাই যেখানে অসাধু সেখানে এইরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

পাটনা মেডিকেল কলেজের দুইজন শিক্ষকের স্মৃতি আজও মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ঘোষ এবং সমর বরাট। শিক্ষক হিসাবে তো বটেই, মানুষ হিসাবেও তাঁহারা উচ্চকোটির লোক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন Eye, Ear, Nose এবং Throat-এর অধ্যাপক। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি. বি. এস. পরীক্ষার পাঠ্যক্রম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণে হইয়াছিল। সুতরাং Eye, Ear, Nose, Throat আলাদা একটি বিষয়রূপে গণ্য হইয়াছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা Surgery-র অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং পাটনায় গিয়া ওই বিষয়গুলি আমাদের আবার ভালো করিয়া পড়িতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে আমাদের সহায়ক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। আমার মনে চক্ষু-রোগবিশেষজ্ঞ হইবার বাসনাও জাগিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতো যত্ন করিয়া যে শিখাইয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষার সহিত কতো স্নেহ, কতো আন্তরিকতা যে ছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো যাইবে না। তাঁহার মতো অতো ভালো লোক, অতো ভালো শিক্ষক আমি খুব বেশী দেখি নাই। তাঁহার সহিত প্রায় প্রত্যহ রাত্রি আটটা নয়টা পর্যন্ত 'ডার্ক রুমে' কাটাইয়াছি। তাঁহারই সাহায্যে আমি প্রথমে 'রেটিনা' ( Retina ) দেখি। যেদিন প্রথমে দেখিলাম সেদিন আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমাদের চোখের ভিতর যে অমন একটা আশ্চর্যজনক দৃশ্য আছে, তাহার ছবি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আসলে যে অমন চমৎকার তাহা আমার ধারণা ছিল না। সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছি। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত জনৈক পরীক্ষক আমার প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা লইয়াছিলেন। বাহিরে যে সব রোগী ছিল তাহাদের পরীক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছিল, কিন্তু 'ডার্ক-রুমে' যে রোগীটি বসিয়াছিল তাহাকে পরীক্ষা করিয়া আমি কোনও রোগই ধরিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ রেটিনোস্কোপ দিয়া পরীক্ষা করিলাম কিন্তু কোন রোগের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না।

আমার সন্দেহ হইল নিশ্চয় কোনও রোগ আছে আমি ধরিতে পারিতেছি না। শেষ-পর্যন্ত উত্তর লিখিতে হইল চোখে কোনও দোষ নাই। লিখিলাম বটে কিন্তু মনে একটা দুর্ঘটনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল—ফেল হইয়া যাইব।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আমাদের হোস্টেলের বিছানায় বিনিদ্র-নয়নে শুইয়া আছি। একটি ছেলে আসিয়া বলিল—'সুরেনবাবু এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন। আমি দ্রুতপদে দ্বিতল হইতে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম সুরেন্দ্রনাথ মোটরে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তুমি 'ডার্করুমে' যাকে পরীক্ষা করেছিলে সে লোকটি ওঁর মোটরের ড্রাইভার। উনি লক্ষ্ণৌ থেকে মোটরে এসেছেন। চোখ খারাপ থাকলে তাকে উনি মোটরের ড্রাইভার রাখতেন না। আমার মনে হয় তুমি ঠিক উত্তরই লিখেছো। মনে হয় ওঁর কাছে তুমি ফুল-মার্কস পেয়েছো।'

অত রাত্রে আমার হোস্টেলে আসিয়া আমাকে ওই খবরটি দেওয়ার মধ্যে যে ভদ্রতার পরিচয় আছে তাহা আজকাল দুর্লভ। তখন তাঁহার সম্বন্ধে মনে যে শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল তাহা আজও আছে। শুধু একজন উৎকৃষ্ট শিক্ষক রূপেই নয়। প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক হিসাবেও তাঁহাকে এখনও মনে রাখিয়াছি।

ডাক্তার সমর বরাট ছিলেন একটু রুক্ষ, রগচটা প্রকৃতির মানুষ। চটিয়া গেলে মুখ খারাপ করিয়া গালাগালি দিতেন। তাঁহার রোগীরা, তাঁহার ছাত্রগণ সকলেই তাঁহার নিকট গালাগালি খাইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছে। তাঁহার কর্কশ বহিরাবরণের অন্তরালে একটি সুবর্ণখনি আছে। পর্বতের ভিতর স্নেহমমতার যে নির্ঝরিণী ছিল তাহার সন্ধান পাইলে সকলেই মুগ্ধ হইত। চটিয়া গেলে ছাত্র, রোগীদের তিনি 'শালা' পর্যন্ত বলিতেন। কিন্তু ছাত্ররা, রোগীরা তাঁহার উপর রাগ করিত না, তাঁহার এমনি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে আমরা ভয় করিতাম, ভালোও বাসিতাম। তাঁহার নিকট একদিন গিয়া আমরা বলিলাম—'সার, আমাদের Medicineটা আপনি revise করাইয়া দিন।' তিনি বলিলেন—'আমার আপত্তি নাই, আমি দুপুরবেলা আসিয়া তোমাদের পড়াইয়া দিব। কিন্তু তোমাদের পড়িয়া আসিতে হইবে।' বেলা দু-টা হইতে চারটা পর্যন্ত আমাদের ক্লাস লইতেন। সে সময়টা ছিল তাঁহার বিশ্রামের সময়। কিন্তু আমাদের আবদারে সে সময়টুকু তিনি আমাদের

জন্য ব্যয় করিতেন। ক্লাসে গিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাইতাম। দেখিলাম Medicine এর বিখ্যাত বই Osler তাঁহার মুখস্ত। কোন বই বা খাতা না খুলিয়াই তিনি বক্তৃতা দিতেন, মনে হইত একটা কল হইতে যেন ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। কখনও Osler, কখনও Price, কখনও বা অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আমরা বসিয়া শুনিতাম। মধ্যে মধ্যে তিনি এক আধটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। উত্তর দিতে না পারিলে গালাগালি দিতেন। এইভাবে তিনি সমস্ত Medicineটা আমাদের পড়াইয়া দিতেন। শুনিয়াছিলাম আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে আসিয়াছিল। প্রশ্ন-পত্রে কোন অল্টার্নেটিভ প্রশ্ন থাকিত না। প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হইবে। আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার একটি প্রশ্ন ছিল Epidemic Prophecy বিষয়। সনৎবাবু কিন্তু Epidemic Prophecy সম্বন্ধে আমাদের কিছু পড়ান নাই। কোনও Text বহিতে তখন Epidemic Prophecy প্রসঙ্গে ছাপাও হয় নাই। পরীক্ষার হলে বসিয়া আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। সনৎবাবু পরীক্ষার হলে গার্ড দিতেছিলেন। তিনিও চটিয়া লাল হইয়া গেলেন এবং প্রশ্নকর্তাকে 'শালা' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি যাহা করিলেন তাহা আরও বিস্ময়কর। তিনি পরীক্ষার হল হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে যখন ফিরিলেন তখন আমরা দেখিলাম দুইটি চাকর একটি ব্লাক-বোর্ড বহিয়া আনিতেছে। ব্লাক-বোর্ডে Epidemic Prophecy সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে। চাকরেরা ব্লাক-বোর্ডটি ডায়াসের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। সনৎবাবু আমাদের প্রত্যেকের কাছে আসিয়া কানে কানে বলিলেন 'লাইব্রেরীতে গিয়া তিনি ম্যাগাজিন হইতে Epidemic Prophecy সম্বন্ধে পয়েণ্টগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যেন ইহা দেখিয়া নিজেদের ভাষায় উত্তর লিখিয়া দিই।

এই অত্যাশ্চর্য বে-আইনী কাণ্ড ডাক্তার সনৎ বরাট ছাড়া আর কেহই করিতে পারিত না।

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্পও মনে পড়িতেছে।

সেদিন পৌষ-সংক্রান্তি। পিঠে-পার্ব্বণ। আমরা পরীক্ষার্থীরা কেহই বাড়ি যাই নাই। হোস্টেলে পরীক্ষার পড়া লইয়া হিমসিম খাইতেছি। হঠাৎ একদিন সনৎবাবুর সহিত দেখা হইল। বলিলাম 'শুনি, আপনার দিদি খুব ভালো পিঠে করেন। আমাদের অদৃষ্টে কি দুই-একটা পিঠে জুটিবে না?' সনৎবাবু বলিলেন

'দিদি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, তিনি আর পিঠে তৈরী করতে পারেন না। পিঠে গড়বার লোক আমাব বাড়িতে কেহ নাই। ওরা কেক, পুডিং, ওমলেট, চপ, কাটলেট বানাতে পারে। পিঠে বানাতে জানে না কেউ। পিঠে খাওয়াতে পারব না। তবে দুটো সেকেলে বুড়ি বাঁকিপুরে এখন আছে, তাদের যদি আনতে পারি, তা-হলে খবর দেব।' সন্ধ্যার একটু আগে খবর আসিল। তিনি নিজেই আসিযাছিলেন, বলিলেন 'পিঠে হবে, তোরা আসিস। রাতে খাবি।' গিয়া দেখি বিরাট খাওয়ার আয়োজন। শুধু আমাদের জন্য নয়, অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শুধু পিঠা নয়, মাংস, পোলাও, মাছ, মিষ্টান্ন, পায়েসও। এ বকম অপূর্ব্ব পিঠা অনেকদিন খাই নাই। সনৎবাবু আসিয়া বাববাব ধমকাইতে লাগিলেন—'তোমাদের হুজুকে পড়েই এই আযোজন, একটি জিনিস নষ্ট করতে পারবে না।'

সনৎবাবুর মতো লোক আজকাল বিরল। সনৎবাবু, সুরেনবাবু দু জনেই এখন পরলোকে। আমাদের মনে তাঁহাদের স্মৃতিটুকু বাঁচিযা আছে। এই সব স্মৃতির ঐশ্বর্যেই আমবা ঐশ্বযবান।

আজকাল 'আপনি-কোপনি'র যুগ। প্রত্যেকেরই নুন আনতে পান্তা ফুরায়, দীয়তাং ভুজ্যতাং আর হয় না। হইবেও না বোধ হয়। পাটনা কলেজের আর কোনও স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া মনে আঁকা নাই। কেবল কয়েক-জন ছাত্রের কথা মনে আছে। বিধুভূষণ বসু এবং বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অপেক্ষা কিছু জুনিয়র ছিল। তাহারা আমাকে দাদা বলিত। দু জনেই পড়াশুনায় 'গুড-বয়' ছিল। আমি যদিও গুড-বয ছিলাম না, কিন্তু তবু আমাকে তাহারা শ্রদ্ধা করিত, সম্ভবত আমার সাহিত্যের জন্যে। কারণ তখনও মাঝে মাঝে আমার কবিতা, গল্প ছাপা হইতেছিল। তাহাদের এই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা কলেজ-জীবনেই শেষ হয়ে যায় নাই। সাংসারিক জীবনেও তাহা বিস্তৃত হইয়াছিল। বিধুর মত অমন সরল সদা-হাস্যময় প্রাণখোলা ভদ্রলোক জীবনে বেশী দেখি নাই। কিছুদিন আগে সে মারা গিয়াছে। শেষজীবনে কলিকাতায় টালিগঞ্জের কাছাকাছি বাড়ি করিয়াছিল। মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা করিতে আসিত। তাহার প্রাণ-খোলা উচ্চ-হাস্য এখনও যেন শুনিতে পাইতেছি। বীরেন ছিল চালাকচতুর প্রকৃতির লোক, কিন্তু সাহিত্য-রসিক ছিল সে। সেইজন্যেই আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সে এখন মুঙ্গেরে আছে। আরও দুই-টি ছাত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। একজনের নাম

ধীরেন দত্ত, আর একজনের নাম বিজয় ( সম্ভবত বসু ) ইহারা দুইজনে, পরে মুঙ্গেরে ল্যাবরেটরি ছিল। ইহারা আমাকে অনেক কেস পাঠাইত। সেজন্য ইহাদের নিকট আজও কৃতজ্ঞ আছি। ধীরেনের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। রাত্রে নিজের ক্লিনিকে সে হার্ট-ফেল করিয়া মারা যায়। তখন সেখানে কেহ ছিল না। পরদিন তাহার মৃতদেহ আবিষ্কার হয়। পাটনা কলেজের জীবনের প্রধান ঘটনা আমাদের ব্যাঙ্গালোর যাত্রা। আমরা যখন পাটনায় যাই তখন আমাদের Maternity ward ( ছেলে প্রসব করানো ) করা হয় নাই। নিয়ম ছিল পরীক্ষা দিবার আগে প্রতিটি ছাত্রকে ত্রিশটি প্রসব করাইতে হইবে। পাটনা মেডিকেল কলেজে তখন Maternity ward ছিল না। সুতরাং বিহার গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্য ব্যাঙ্গালোরের Victoria হাসপাতালের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহারা প্রতিমাসে চারজন ছাত্রকে হাতে-কলমে প্রসব করানো শিখাইবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের জন্যে হাসপাতালের কাছে একটি ঘরভাড়া করিলেন বিহার গভর্ণমেণ্ট। একটি রাঁধুনী এবং চাকরও ছিল। সরকারের খরচেই আমরা সেখানে গিয়াছিলাম। আমার সহযাত্রী তিনজন আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি একা শেষ মুহূর্তে গিয়া পৌছিলাম। গিয়াই শুনিলাম আমার আগে যে তিনজন আসিয়াছিলেন সকলেই একটি করিয়া প্রসব করাইয়াছেন। ইহার পরই আমার পালা। ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নাকি প্রত্যহ চার পাঁচটা 'ডেলিভারি-কেস' হয়। খুব বড় হাসপাতাল। ঘণ্টাখানেক পরেই আমার ডাক আসিল। আমি তখন খদ্দরের জামা-কাপড় ছাড়া অন্য কিছু পরিতাম না। তাহা পরিয়াই ওয়ার্ডে গেলাম। দেখিলাম একটি মেয়ে টেবিলের উপর শুইয়া প্রসব-ব্যথায় কাঁদিতেছে। একটি তরুণী মেম নার্স তাহাকে সান্ত্বনা দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পারিতেছে না। দুই-জনের ভাষা আলাদা। একজনের তামিল, তেলেগু অথবা কানাড়ি ( ঠিক জানি না ) আর একজনের ইংরেজি। ওখানে কোন রোগিণীর ভাষা আমি বুঝিতে পারিতাম না। মনে হইত কড়মড় করিয়া কি যেন বলিতেছে। আমি লেবার-রুমে ঢুকিবামাত্র নার্সটি আমাকে একটি এপ্রণ ( Apron ) পরাইয়া দিলেন। নিকটেই একটি বর্ষীয়সী গম্ভীরপ্রকৃতির মেট্রন দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে আদেশ করিলেন 'Now, wash your hands properly. Liquid Antiseptic soap.' হাতে ঢালিয়া হাত ধুইলাম এবং কড়া বুরুষ দিয়া নখগুলিও পরিষ্কার করিলাম। মেট্রন বলিলেন 'অন্তত পাঁচ-মিনিট

করিয়া হাত ধুইতে হইবে।' তিনি নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন 'আমি যতক্ষণ না থামিতে বলি, ততক্ষণ হাত পরিষ্কার কর।' পাঁচ-মিনিট ধরিয়াই বুরুশসহযোগে হাত পরিষ্কার করিলাম। তাহার পর নার্সটি একজোড়া স্টেরিলাইজড (sterilised) রবারের দস্তানা আনিয়া দিল। তাহার পর টেবিলের দিকে আগাইয়া গেলাম। শিশুর মাথাটি অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। মেট্রনের নির্দেশমত কাজে লাগিয়া পড়িলাম। তিনি যেমন যেমন বলিতে লাগিলেন তেমনি করিতে লাগিলাম। তিনিই এ বিষয়ে আমার প্রথম শিক্ষয়িত্রী। অত্যন্ত গম্ভীর, একটিও বাজে কথা বলিলেন না। নির্দেশগুলি নির্ভুল। একটি কন্যা প্রসব করাইলাম। নার্স সেটিকে পরিষ্কার করিবার জন্যে পাশের ঘরে লইয়া গেল। সব শেষ হইয়া গেলে মেট্রন আমাকে বলিলেন—'তুমি কাপড় পরিয়া আসিয়াছ কেন? কাল হইতে ট্রাউজার পরিয়া আসিতে হইবে। বলিলাম 'আমার তো ট্রাউজার নেই।'

'তাহা হইলে এখানে কিনিয়া লও। এখানে তোমাদের ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়াছি এখানে ডাক্তারমাত্রই সাহেবী পোষাক পরে। তোমাকেও তাহা পরিতে হইবে।'

বলিলাম 'সাহেবী স্যুট করাইবার পয়সা আমার নেই। আমি গরীবের ছেলে। বেশী টাকাও সঙ্গে নাই।'

মেট্রন ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন 'একটা ট্রাউজার তোমাকে কিনিতেই হইবে। কাপড়পরা চলিবে না।' নার্সটি আমার দিকে তাকাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

আমি পরদিন সকালে উঠিয়াই বাজারে চলিয়া গেলাম এবং মোটা খদ্দর কিনিয়া দুইটা প্যাণ্টালুন করাইতে দিলাম। দরজিকে বলিলাম 'ডবল চার্জ দিব, কিন্তু আজ সন্ধ্যার মধ্যে চাই।' সন্ধ্যার মধ্যেই পাইয়া গেলাম। পরের চারদিন যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন আমি প্যাণ্ট ভূষিত। প্যাণ্টের ভিতর আমার খদ্দরের পাঞ্জাবীটা ঢুকাইয়া দিয়া, পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইয়া যখন আমি হাসপাতালে উপস্থিত হইলাম তখন সেই নার্সটির সহিত দেখা হইল। সে আমাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলল।

বলিল 'এ কি কাপড়ের প্যাণ্ট করাইয়াছ? কোথায় করাইলে? কাট-ছাঁটও তো ভালো নয়—,'

আমি বলিলাম—'কাপড় যদিও আমাদের দেশীয় জিনিস। কাট-ছাঁট যাই হোক আইন বাঁচিবে বলিয়া মনে হয়। **Matron wanted me to imprison my legs in a pair of tubs that I have done.'**

মেট্রন আসিয়া আমাকে দেখিলেন। কোনও মন্তব্য করিলেন না। মনে হইল ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

আমার তিনজন সঙ্গী রীতিমত সাহেবী স্যুট পরিয়া হাসপাতালে যাইত। তাহাদের চাল-চলনও সাহেবীগোছের ছিল। আমার ছিল ওই কিম্ভুত-কিমাকার পোষাক, আমি আদব-কায়দাও তেমন জানিতাম না। কথায় কথায় **Thank you** বলিতে পারিতাম না,—ইহার জন্তেই, এই বৈসাদৃশ্যের জন্যই বোধ হয় সেই নার্স টি আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হইল এবং আমার বন্ধুদের নিকট আমার সম্বন্ধে খবরাখবর লইতে লাগিল। বন্ধুরা আমাকে জানাইল যে, আমি কবিতা লিখিতে পারি। নার্স টি আমার সম্বন্ধে আরও উৎসুক হইল। ঔৎসুক্যের আর একটি কারণ বোধ হয় আমি আমাদের পরিমণ্ডলে একটু বেখাপ্পাগোছের ছিলাম। কাহারও সহিত বিশেষ মিশিতাম না। সিনেমা যাইতাম না। হাসপাতালে গিয়া নার্সদের সহিত আলাপ জমাইবার প্রবৃত্তিও আমার ছিল না। ইহার উপর আর একদিন আর একটি কাণ্ড ঘটিল। তখন ক্ষুর দিয়া দাড়ি কামাইতাম। খুব ভোরে সেদিন হাসপাতাল হইতে আমার ডাক আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি কামাইতে গিয়া আমার ডান-দিকের গোঁফের খানিকটা কাটিয়া গেল। বামদিকের গোঁফের খানিকটা কাটিয়া সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু পারিলাম না। পূর্বদিন রাত্রে হাসপাতালে স-গুম্ফ গিয়াছিলাম, সকালে যখন গেলাম তখন আমি গুম্ফহীন। কারণ সমস্ত গোঁফটাই কামাইয়া ফেলিতে হইয়াছিল। নার্স টি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

'হঠাৎ গোঁফ কামাইলে কেন?'

বলিলাম **'Accident'.**

আনুপূর্বিক সব শুনিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। একটি কথা আগে উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। নার্স টিও নবাগতা। স্কটল্যাণ্ড হইতে এখানে চাকরী করিতে আসিয়াছে। আমি যেদিন প্রথম হাসপাতালে, আমি, সে-ও সেইদিনেই প্রথম কাজে যোগদান করে। সে স্কটল্যাণ্ডবসিনী বলিয়া ইংরেজদের প্রতি মনে মনে একটু বিরূপ। আমার খদ্দর-প্রীতি দেখিয়া সে আমার সম্বন্ধে

মনে মনে সশ্রদ্ধ হইয়াছিল। পরে জানিয়াছিলাম সেও স্কটল্যাণ্ডের home-shine কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় ব্যবহার করে না। যদিও কাজের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে তাহার কাছে যাইতাম না, তবু তাহার সম্বন্ধে কেন জানি না একটা আত্মীয়তা-বোধ জাগিয়াছিল মনে। সে ভাবটা মনে মনেই ছিল, বাইরে কখনও প্রকাশ করি নাই।

সেদিন কাজের পরে সে হঠাৎ আমাকে বলিল 'ওভালটিন খাইবে? আমার ঘরে এসো। আমি এখনই ওভালটিন বানাইব।'

তাহার ঘরে গেলাম। চমৎকার এক কাপ ওভালটিন খাওয়াল সে।

তাহার পর হঠাৎ প্রশ্ন করিল—'তুমি সিনেমা দেখ না?'

'না। পয়সায় কুলোয় না।'

'আমি তোমাকে দেখাইব। চল না, আজ একটা ছবি আছে—'

'না, তোমার পয়সায় আমি যাইব না। আমি পুরুষ, আমারই উচিত তোমাকে দেখানো। কিন্তু আপাতত হাতে পয়সা নাই। দুই একদিনের মধ্যে বাড়ি হইতে টাকা আসিবে—তখন যাইব।'

বাড়ি হইতে টাকা আসিবার পর দুইখানি নিম্ন-শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া সিনেমায় গিয়ছলাম তাহাকে লইয়া।

সে নিম্নশ্রেণীতে বসিতে আপত্তি করিল। বলিল 'আমি টিকিট বদলাইয়া আনিতেছি—টিকিট দুইটি দাও আমাকে—'

আমি ইহাতে রাজি হইলাম না। সিনেমা দেখা হইল না।

ঘনিষ্ঠতা ইহাতে যেন আরও বাড়িল। একদিন হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল 'তোমার বন্ধুরা বলিতেছিল তুমি কবি। সত্যি?'

বলিলাম 'হ্যাঁ, আমি কবিতা লিখি।'

'আমাকে দেখাও না।'

'আমি বাংলায় কবিতা লিখি। তুমি তো তাহা বুঝিতে পারিবে না।'

'তুমি ইংরাজীতে কবিতা লিখতে পার না?'

'আগে কখনও লিখি নাই। তবে চেষ্টা করিলে পারি হয়ত—'

অনুনয় করিয়া বলিল 'তবে একটা লেখ না। প্লীজ—'

'বিষয়টা তুমি ঠিক করিয়া দাও—'

মুচকি হাসিয়া বলিল 'আমার সম্বন্ধে লেখ।'

'লিখিতে পারি। তবে সে কবিতা তোমাকে এখানে দেখাইতে পারিব না—'

'কেন ?'

'কারণ তোমার সম্বন্ধে আমার যাহা সত্য ধারণা, তাহা তোমার সামনে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি এখান হইতে যেদিন চলিয়া যাইব, সেদিন তোমার নামে কবিতাটি ডাকে পাঠাইয়া দিব। আমি চলিয়া গেলে পড়িয়া দেখিও।'

কয়েকদিন কাটিল।

সহসা একদিন সে প্রশ্ন করিল—'তুমি কি বিবাহিত ?'

'না। আমার বিবাহ হয় নাই।'

'কবে বিবাহ করিবে ?'

'আমার বাবা-মা তাহা ঠিক করিবেন।'

'তোমার বাবা-মা ? তোমার বউ তাঁহারা ঠিক করিবেন ? এ তো বড় অদ্ভুত।'

'ওই আমাদের সমাজের নিয়ম। ছেলেমেয়ের বিবাহ বাবা-মাই ঠিক করিবেন।'

'তুমি যাহাকে জীবনসঙ্গিনী করিবে তাহার সঙ্গে আগে মিশিবে না ?'

'না। আমাদের সমাজে সে রেওয়াজ নাই। তবে বাবা-মা ভালো বংশের ভালো মেয়েই পছন্দ করিবেন এ বিশ্বাস আছে।'

নার্স টি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল 'তুমি কবি, তুমি নিশ্চয় মনে মনে তোমার জীবনসঙ্গিনীর একটি কাল্পনিক ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছ। সে ছবি কিরূপ ?'

'অবর্ণনীয়।'

নার্স টি মুচকি হাসিয়া বলিল 'তাহার একটি নেগেটিভ বর্ণনা কিন্তু আমি দিতে পারি।'

'দাও—'

'তাহার সহিত আমার কিছুই মিল নাই।'

দুইজনেই হাসিয়া উঠিলাম।

বলিলাম 'তোমার মত রূপসী আমাদের সমাজে দুর্লভ। তুমি আমাদের সমাজে বেমানান।'

আমি ব্যাঙ্গালোর ত্যাগ করিবার দিন তাহাকে একটি কবিতা লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এই কবিতাটি আমার 'ডানা' পুস্তকে রূপচাঁদের জীবনীতে ছাপা আছে। কবিতাটি এই—

Evening speaks in golden clouds
Morning speaks in light
Flowers speak in scented petals
Lightning speaks in flight.
The manner in which they exprees
Is simple, plain and sweet.
But what we do, we human beings ?
We know not how to do it.
When the heart is full and feelings melting
We try to hide and alter.
When the eyes speak, the tongue denies
Words fail or falter
I know not how to word my feelings
How to coll my Muse
I wish I had the knack of Nature
To sing in light and Muse.

কবিতাটি 'ডানা' বই লিখিবার বহু আগে সেই নার্সের উদ্দেশেই লিখিয়াছিলাম। তাহার সহিত জীবনে আমার আর দেখা হয় নাই। আমি তাহার নাম জানিতাম, সে কিন্তু আমার পুরা নাম জানিত না। আমি তাহার কাছে—'স্টুডেন্ট মুখার্জি' নামেই পরিচিত ছিলাম। নার্সের নামটা ইচ্ছা করিয়াই উহ্য রাখিলাম।

ব্যাঙ্গালোর হইতে আমি সোজা মণিহারী চলিয়া গেলাম বাবা-মায়ের কাছে। কারণ কলেজে কোনো ক্লাস বা ওয়ার্ড বাকি ছিল না। ইহার পর গিয়াই ফাইনাল পরীক্ষায় বসিতে হইবে। তাহার পূর্বে, বাবা-মাকে প্রণাম করিবার জন্য মণিহারী চলিয়া গেলাম। পীরবাবার নিকটও মানত করিলাম। মনে মনে ভয় ছিল। কলিকাতা হইতে আসিয়াই মাইনর এম. বি. বি. এস. পরীক্ষাটা দিয়াছিলাম। কিন্তু জুরিসপ্রুডেন্সে প্র্যাকটিক্যালে পাশ করিতে পারি নাই। আমরা জুরিস প্র্যাকটিকালে মড়া চিরিয়াছি। এখানে পরীক্ষক আসিয়া কাঠের টুকরার মত একটা ধরাইয়া দিয়া বলিলেন 'পুলিস এই হাড়ের টুকরোটা পাঠাইয়া দিয়াছে। ইহার রিপোর্ট তুমি দিবে।' এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বলিলাম 'প্রথমে ঠিক করিতে হইবে এটা মানুষের হাড়

কিনা। আমি প্রথমে একজন Zoologist-এর সহিত পরামর্শ করিব।' এ উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। আমাকে ফেল করাইয়া দিলেন। পরীক্ষক ছিলেন প্রফেসর মোডি। শুনিলাম তাঁহার একটি বই আছে এবং তাহাতে ঐ প্রশ্নের উত্তর আছে। পরে তাহার বইটি কিনিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম।

ইহার অল্পদিন পরে বাবা আমার বিবাহ দিলেন। চীনের কাছাকাছি আপার বর্ডার মিচিনা শহরের অ্যাডভোকেট শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী তখন বেথুন কলেজে আই-এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়িতেছিল। বাবার বন্ধু আশুতোষ চক্রবর্তী ( আমাদের আশু জ্যাঠামশাই ) সম্বন্ধটি আনিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল। কিছুদিন পূর্বেই আমার জীবনে রোমান্সের একটা আভাস জাগিয়াছিল। বিবাহের পর সে রোমান্স অন্য রোমান্সে রূপান্তরিত হইয়া আমার জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। আমি বাবার বড় ছেলে। সুতরাং আমার বিবাহে প্রচুর ধুম হইয়াছিল। বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে প্রকৃতি এমন ধুমধাম করিয়া বর্ষা নামাইয়া দিলেন যে, আমরা মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। মণিহারী হইতে স্টীমার করিয়া গঙ্গা পার না হইলে কলিকাতায় পৌঁছোন যাইবে না। কিন্তু এমন বৃষ্টি ও সাইক্লোন শুরু হইল যে রেল-কোম্পানী আদেশ দিলেন সাইক্লোন না কমিলে স্টীমার ছাড়া যাইবে না। ওদিকে আমার ভাবী শ্বশুরমশাই কলিকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কথা ছিল আমরা বিবাহের একদিন আগেই পৌঁছিব। তাহা কিন্তু সম্ভব হইল না। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। বাবা অবশেষে স্টীমারের সারেংকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সারেং এবং স্টীমারের সব খালাসীর ডাক্তার বাবাই ছিলেন। সারেং বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওপর-ওলার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমরা আপনাদের পার করিয়া দিব। বাবুর বিয়ে পণ্ড হইতে দিব না।

তাহাই হইল। ৭০ জন বরযাত্রীসহ স্টীমারটি ছাড়িল এবং আমাদের সকরিগলিঘাটে পৌঁছাইয়া দিল। সেখান হইতে আমরা হাঁটিয়া সকরিগলি ষ্টেশনে গেলাম এবং সেখান হইতে কলিকাতার ট্রেন ধরিলাম। আমার বিবাহের তারিখ ছিল ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সাল। বাঙালী, বিহারী, হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি—সবরকম বরযাত্রীই আমাদের সঙ্গে ছিল। বন্দুকধারী ডাঃ গিরিজাবাবুও ছিলেন। তিনি এক কাণ্ড করিলেন। সকালে জলযোগ করিয়া মাড়োয়ারি, বিহারী বন্ধুদের লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—

চলুন আপনাদের কলিকাতা দেখাইয়া আনি। কাঁধে রাইফেল লইয়া প্যাণ্ট পরিয়া তিনি অগ্রবর্তী হইলেন। বাকি সকলে সার বাঁধিয়া তাঁহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিল। ফিরিলেন ঘণ্টাতিনেক পরে। ভবানীপুর হইতে তিনি তাহাদেব লইয়া আউটরামঘাটে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া সকলকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আসিযাছেন। ববযাত্রীহিসাবে আমার কলিকাতার বন্ধুরাও সকলে আসিয়াছিল। তাহারাও প্রায় সংখ্যায় একশত। আমাব শ্বশুরমশাই খুব ভালো খাওয়াইযাছিলেন। ইলিশমাছেব ডিমের অম্বলের কথা আজও মনে আছে।

মণিহারীতে জাহাজঘাটে বিরাট একটা জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করিল। বহু ঢাক-ঢোল এবং শিঙ্গা একযোগে বাজিয়া উঠিল। ও অঞ্চলে যতো ঢাকি ঢুলী সকলেই অনাহূত আসিযা হাজির হইযাছিল। জনতার মধ্যে সুসজ্জিত হাতী ও ঘোডা ছিল। আমাদের জন্য পালকি ছিল। লীলা এবং আমি দুইটি সুসজ্জিত পালকিতে চডিযা রওনা হইলাম। আমাদের আগে একটি ঘোডা নানারকম খেলা দেখাইতে দেখাইতে চলিল। ঢাক-ঢোলের বাদ্যে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল। গণ্যমান্য ভদ্রলোকেবা হাতীতে চডিযা মিছিলের পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন। বিরাট মিছিল।

বিরাট ভোজেরও আয়োজন হইযাছিল। বাবার জমিদারবন্ধুগণ প্রচুর মাছ, দই, আম, ক্ষীর উপহাব পাঠাইয়াছিলেন। তিনদিন ধরিয়া বহুলোককে খাওয়ানো হইয়াছিল। বাবা ও মা দুইজনেরই গলা ভাঙিযা গিযাছিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজনও প্রায় সকলেই আসিয়াছিলেন এবং বিবাহের পরেও অনেকদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন।

সব চুকিয়া যাইবার পর লীলা কলিকাতায় বেথুন কলেজের হোস্টেলে ফিরিয়া গেল। মা, বাবা স্থির করিলেন আই-এ পরীক্ষাটা দিয়া তবে সে বাড়িতে আসিবে। আমিও পাটনায় চলিয়া গেলাম। আমার তখন সম্মুখে পরীক্ষা, শিয়রে সংক্রান্তি।

পাটনা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডটন (Dutton) সাহেবের নিকট গিয়া বলিলাম যে আমি ব্যাঙ্গালোরে ৪৫টি কেস ডেলিভারি করাইয়াছি। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট আমাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। সেটি সাহেবকে দেখাইলাম।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন

**'I think you had a very good time there.'**

'Yes sir, I was quite happy'.

'I know. I have a proof of it also. Here you are.'

টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া সাহেব একটি মোটা খামের চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। দেখিলাম খামটি খোলা। খামের উপর ঠিকানা—**Student Mukherjee, C/o Principal P.W. Medical College, Patna, Bihar.**

সেই নার্সের চিঠি। বলা বাহুল্য, আমি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, **'That's alright.** কোনক্রমে তাহার অফিস হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

সুদীর্ঘ চিঠি। তাহাতে কি লেখা ছিল এখন ঠিক মনে নাই। এইটুকু মনে আছে তাহাতে উচ্ছ্বাসপূর্ণ আবোল-তাবোল ছিল না, ছিল পাশ্চাত্য রমণীদের অনিশ্চিত দাম্পত্যজীবনের ব্যথা-বেদনার কাহিনী। বারবার লিখিয়াছিল, তোমাদের সমাজ-ব্যবস্থা ঢের ভালো। আমরা ঘাটে ঘাটে ছিপ ফেলিয়া বেড়াই, তোমাদের তাহা করিতে হয় না। আমাদের বয়স যখন বাড়িয়া যায় তখন আমরা **old maid** হইয়া জীবনের আনন্দলোক হইতে নির্বাসিত হই। অনেকদিন পরে **'Anton Chekhov'**-এর লেখা **'A woman's Kingdom'** গল্পে এই বেদনার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছিলাম।

ডটন সাহেব আবার একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন অফিসে। ভয় হইল আবার বুঝি সেই নার্সের চিঠি আসিল। কিন্তু গিয়া দেখিলাম বিপদ অন্যরকম। ডটন সাহেব বলিলেন—কলিকাতা হইতে তোমাদের যে রিপোর্ট আসিয়াছে, তাহাতেও দেখিতেছি তুমি **Mental Disease**-এর **ward** কর নাই। তোমাকে রাঁচি যাইতে হইবে। আমি বলিলাম—ভুল রিপোর্ট আসিয়াছে। আমি **Mental Disease**-এর সব ক্লাসেই হাজির ছিলাম। ডটন সাহেব বলিলেন—তবে তুমি নিজে কলিকাতায় যাও এবং ভুল সংশোধন করিয়া আনো। আমি কলিকাতার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে একটি পত্র লিখিয়া দিতেছি। তুমি নিজেই চলিয়া যাও। যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রথমে মেডিকেল কলেজের অফিসে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ক্লার্ক একটু মৃদু হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, কি ব্যাপার? সব খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, দাঁড়ান, রেজিস্ট্রি-খাতাটা খুলিয়া দেখি। খাতা খুলিয়া দেখা গেল, খাতায় আমার

সমস্ত P-গুলি কাটিয়া কে 'A' লিখিয়া রাখিয়াছে। অবাক হইয়া গেলাম। খোঁজ করিলাম যে সাহেব প্রফেসর আমাদের Mental Disease পড়াইয়াছিলেন তিনি কোথায়। তিনি আমাকে ভালোভাবে চিনিতেন। শুনিলাম, তিনি পেশোয়ারে বদলি হইয়া গিয়াছেন। বলিলাম, তাহা হইলে এখন উপায় কি? অম্লানবদনে ক্লার্ক বলিলেন—আমাকে পঞ্চাশটা টাকা যদি দেন আমি এই রেজেষ্ট্রি-খাতার পাতা বদলাইয়া সব ঠিক করিয়া দিব। সম্মত হইলাম। বন্ধুদের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি খাতার পাতা বদল করিয়া সব ঠিক করিয়া দিলেন। আমাকে বলিলেন—এইবার আপনি গিয়া প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করুন। প্রিন্সিপাল ক্লার্ককে ডাকিলেন। তাহাকে আদেশ করিলেন—রেজেষ্ট্রি-খাতা লইয়া এস। ক্লার্ক রেজেষ্ট্রি-খাতা লইয়া আসিল এবং মাথা চুলকাইয়া বলিল—সত্যই এই ছেলেটির সম্বন্ধে ভুল রিপোর্ট পাঠানো হইয়াছে। ছেলেটি সেন্ট-পারসেন্ট ক্লাসে Attend করিয়াছিল। সাহেব তাহাকে খুব বকিলেন। সে মাথা হেঁট করিয়া বকুনিটি হজম করিল। বার্নাডো সাহেব বলিলেন—এখন আমাদের ত্রুটিস্বীকার করিয়া একটি চিঠি draft করিয়া আনো। আমি এখনই সই করিয়া দিব। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন 'Boy, I am very sorry'. ব্যাপারটা এখনও আমার নিকট রহস্যময় হইয়া আছে। মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্রদের নিকট 'ক্লার্করা' 'উপরি' কিছু পাইত। আমি কিন্তু কখনও কাহাকেও কিছু দিই নাই, তাহাদের নিকট কোন কৃপাপ্রার্থনাও করি নাই। মনে হয় তির্যকপথে ক্লার্কটি আমার নিকট হইতে কিছু 'উপরি' আদায় করিয়া লইল।

ডটন সাহেবের নিকট ফিরিয়া গেলাম। তিনি আমাকে ফাইনাল M. B. B. S.-এর পরীক্ষার্থীরূপে মনোনীত করিয়া যথাস্থানে নাম পাঠাইয়া দিলেন। আমি 'ফি' জমা দিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

পরীক্ষা মোটামুটি ভালই হইল। পরীক্ষার সময় Eye, Ear, Nose, Throat এবং প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় যে বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহার কথা আগেই বলিয়াছি। Medicine প্র্যাকটিকালের সময়ও একটু ভয় হইয়াছিল। আমার যে লং কেসটি পড়িয়াছিল সঠিকভাবে তাহার রোগনির্ণয় করিতে পারি নাই। যতদূর মনে হয় সেটি ডিসেমিনেটেড স্পাইনাল স্ক্লেরোসিস ছিল। আমাদের প্রশ্ন ছিল—Examine the case, give your Diagnosis and treatment. সময় তিন ঘণ্টা। আমি রোগীটিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা

করিলাম। যাহা যাহা পাইলাম লিখিলাম। Diagnosis-এর বেলায় লিখিলাম রক্তের W. R. পরীক্ষা না করিয়া ঠিক Diagnosis দেওয়া যায় না। মনে হইতেছে ব্যাপারটা ডিস্‌সেমিনেটেড স্ক্লেরোসিস। কি চিকিৎসা করিয়া তাহারও একটা প্রেসক্রিপ্‌সন লিখিয়া দিলাম। পরীক্ষক ছিলেন লক্ষ্ণৌ কলেজের Sprawson সাহেব। তিনি আসিয়া আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন এবং আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন। ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

আমাদের Midwifery এবং Gynaecology-র বাহিরের পরীক্ষক ছিলেন Green Armitage সাহেব। তিনি আমাকে যে সব প্রশ্ন করিলেন তাহার সহিত ধাত্রীবিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই।

'এখানে আসিয়া কেমন আছ ?'

'ভালই।'

'এখানকার খাওয়াদাওয়া কেমন ?'

'ভাল। হোস্টেলে থাকি।'

'খেলা-ধূলার ব্যবস্থা আছে ?'

'আছে।'

'এখানকার নার্সরা ভদ্র-ব্যবহার করে তো' ?

'হাঁ, তাহারা খুব ভালো।'

'আচ্ছা, তুমি যাইতে পার।'

তখন আর একজন পরীক্ষক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে উহাকে আপনি Midwifery বা Gynaecology সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নাই।

আর্মিটেজ সাহেব উত্তর দিলেন—'ও আমার ছাত্র ছিল। উহার বিদ্যার দৌড় কতদূর তাহা আমি জানি। প্রশ্ন করিবার দরকার নেই। আপনি যদি প্রশ্ন করিতে চান, করুন।' তিনি তখন দুই-একটি প্রশ্ন করিলেন, আমার উত্তর শুনিয়া খুশীও হইলেন।

অন্যান্য বিষয়েও পরীক্ষা ভালো হইল। পরীক্ষা দিয়া এবং কবে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে তাহার খবর লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। এবার মা-বাবা ছাড়া আর একটি আকর্ষণ ছিল—নব-বিবাহিতা বধূ—লীলা। সে আমার জন্য কলেজ কামাই করিয়া বসিয়াছিল। তাহার পর আমার জীবনে নতুন রং লাগিল। আমার সাহিত্যেও একটা নতুন মোড় ঘুরিল। লীলা হোস্টেলে চলিয়া গেল। প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লিখিতে শুরু করিলাম। পরিমল তাহার

স্মৃতিচারণে লিখিয়াছে যে এই সময়টা আমি সাহিত্য-চর্চা হইতে বিরত ছিলাম। মোটেই বিরত ছিলাম না। কিন্তু যে সাহিত্য আমি তখন রচনা করিয়াছিলাম তাহা মাসিকপত্রে প্রকাশযোগ্য ছিল না। তাহা লীলার নিকট প্রেরিত এবং সে তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত। এই চিঠিগুলির কয়েকটি পরে আমি কিছু পরিবর্তন করিয়া আমার 'কষ্টিপাথর' উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রেমের কবিতাগুলি অনেকদিন পর সুরেশ তাহার 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিল এবং আমি সেগুলি 'সুরসপ্তক' পুস্তকে সংকলন করিয়াছি। 'চতুর্দশী'-নামক সনেটগুলিও লীলাকে কেন্দ্র করিয়াই লেখা। কিন্তু এগুলি অনেক পরে লিখিয়াছিলাম। সজনীকান্ত এগুলি 'শনিবারের চিঠি'তে দুই সংখ্যায় প্রকাশ করে। এ কবিতাগুলি কবি মোহিতলালের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা। আমি পাটনা হইতে আসিবার সময় একটি ছেলেকে টাকা দিয়া আসিয়াছিলাম, সে যেন পরীক্ষার ফল বাহির হইবামাত্র আমাকে খবরটা জানাইয়া দেয়।

যে তারিখে পরীক্ষকদের মিটিং হইয়া পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হইবে সে তারিখটা আমার জানা ছিল।

মা আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। আমি তারিখটা বলিলাম। আরও বলিলাম সেই তারিখে বেলা এগারোটা নাগাদ পরীক্ষকদের মিটিং হইবে এবং তাহার পর পরীক্ষার ফল জানা যাইবে।

আমি প্রতিদিন সকালে চা খাইয়া আমাদের বাহিরতলার বাগানে চলিয়া যাইতাম। বাহিরতলায় আমাদের চল্লিশ বিঘার একটি আমবাগান আছে। সেখানে একটি ছোট্ট ঘরও করাইয়াছিলেন। আমি সেখানে বসিয়াই পড়াশুনা করিতাম। সেই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি আর একবার পড়িয়াছিলাম।

একদিন—তখন প্রায় বেলা বারোটা হইবে, দেখিলাম মা মাঠের উপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া আসিতেছেন। রোদে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। মা কাছাকাছি আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—'তুই পাশ করেছিস'। আনন্দে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত।

'টেলিগ্রাম এসেছে নাকি!'

'না। আমি ঠাকুরঘরে ছিলাম। ঠাকুর আমাকে বললেন—তোর ছেলে পাশ করেছে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'ও তোমার কল্পনা।'

'না দেখিস, একটু পরে ঠিক খবর আসবে। আমার ঠাকুর মিথ্যেকথা বলে না।'

মায়ের ঠাকুর ছিলেন জগদ্ধাত্রীর পট একটি। আমি আর মায়ের সহিত তর্ক করিলাম না। মা বলিলেন—'বেলা হয়ে গেছে। চল, খাবি চল। টেলিগ্রাম আসুক, তারপর পীরবাবাকে সিন্নি দেব।'

বিকেলবেলা টেলিগ্রাম পাইলাম, আমি পাশ করিয়াছি।

কয়েকদিন পরে পাটনা গভর্ণমেণ্ট হইতে পত্র পাইলাম আমাকে অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জনরূপে নিযুক্ত করিতে তাহারা ইচ্ছুক। আমি যেন দরখাস্তফর্মে যথারীতি দরখাস্ত করি। দরখাস্ত করিলাম এবং কিছুদিন পরেই খবর পাইলাম আমি পাটনা মেডিকেল কলেজে জুনিয়র হাউসসার্জনরূপে মনোনীত হইয়াছি। আমার পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞান দাস তখন মণিহারী আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে একটি গরম স্যুটের জন্য কাপড় উপহার দিলেন। সেই কাপড়ের স্যুট করাইয়া এবং তাহা পরিধান করিয়া আমি পাটনা যাত্রা করিলাম। সেখানে গিয়া হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখা হইতে বলিলাম Good morning। তিনিও গুডমর্ণিং করিয়া এবং আমার নিয়োগপত্র দেখিয়া বলিলেন --Dr. Mukherjee, I shall take you to your ward just now. Please take your seat and wait a few minutes.

বসিয়া রহিলাম। ডেপুটিসাহেব ফাইল সই করিতে লাগিলেন। আমার কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হইতে লাগিল। সই করিতে করিতে হঠাৎ ডেপুটিসাহেব বলিলেন 'By the bye, do you know the rules of the College ?'

'No. Sir.'

'Please have a look at them.'

একটি টাইপকরা কাগজ আমার হাতে দিলেন। তাহাতে প্রথম রুল দেখিলাম—Whenever a junior officer or a student meets his superiors he must show him respect by touching his forehead with his palm.

পড়িয়া আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলাম। ডেপুটিসাহেব বলিলেন—I have almost finished.

আমি বলিলাম 'না, আপনি কাজ করুন। আমি আপনাদের এই প্রথম রুল পড়িয়া ঠিক করিয়া ফেলিলাম এখানে আর কাজ করিব না।'

ডেপুটিসাহেব ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনিও দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন 'সে কি!'

আমাকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমি আর তাঁহার কথায় কান দিলাম না। 'গুডবাই' করিয়া চলিয়া আসিলাম। এবং সোজা পাটনা স্টেশনে চলিয়া গেলাম। পাটনা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম—অতঃ কিম্? অনেক ভাবিয়া ঠিক করিলাম Pathology-তে special training লইয়া কোনো বড় শহরে ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করিব। এই সিদ্ধান্ত লইবার প্রধান কারণ হাতে কিছু সময় পাইব, সেই সময়টুকু আমি সাহিত্য-সাধনায় দিতে পারিব। জেনারেল প্র্যাকটিশনার হইলে সাহিত্য-চর্চা করা যাইবে না।

আমাদের সময় Pathology তে Special ট্রেনিং লইবার কোন কোর্স ছিল না। কোন বিশেষজ্ঞের অধীনে থাকিয়া কাজ শিখিতে হইত। বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না।

আমাদের কলেজের ফিজিওলজির ডেমনস্ট্রেটার ডাক্তার চারুব্রত রায়ের এ বিষয়ে খুব নাম ছিল। ঠিক করিলাম তাঁহারই শরণাপন্ন হইব।

স্টেশন হইতেই বাবাকে একটি চিঠি লিখিলাম। বাবাকে জানাইলাম আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া আমি চাকুরি করিতে পারিব না। আমি কলিকাতায় চলিলাম। সেখানে আমি ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিতে স্পেশাল ট্রেনিং লইব। আপনি আমার পুরাতন মেসের ঠিকানায় আপনার মতামত জানাইবেন। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

কলিকাতায় ফিরিয়া পুরাতন মেস (৩নং মির্জাপুর স্ট্রীট) বাবার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বাবার চিঠি আসিতে দেরী হইল না। তিনি লিখিয়াছেন—তুমি চাকরী লইলে আমাদের আর্থিক কিছু সুবিধা হইত। কারণ তোমার সব ভাইরা এখনও মানুষ হয় নাই। কিন্তু তুমি এখন সাবালক হইয়াছ। লেখাপড়া শিখিয়াছ। তোমার বিবেকের বিরুদ্ধে আমি কিছু করিতে বলিব না। তুমি যদি ওখানে কাহারও অধীনে ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি সম্বন্ধে শিক্ষা লইতে চাও তাহাই লও। আমি মাসে মাসে তোমার খরচ পাঠাইয়া দিব।

বাবার অনুমতি পাইয়া আমি ডাক্তার চারুব্রত রায়ের সহিত দেখা করিলাম। সব কথা শুনিয়া তিনি আমাকে ধমক দিলেন। বলিলেন—তোমার মাথা

খারাপ হইয়াছে। তুমি পাটনায় ফিরিয়া গিয়া কাজে যোগদান করো। আমি তোমাকে ট্রেনিং দিতে পারিব না। কারণ দিনকয়েক ট্রেনিং লইয়া তুমি ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া যাইবে এবং কোথাও জেনারেল প্র্যাকৃটিশনার হইয়া বসিবে।

আমি বলিলাম—'আপনি যতদিন না যইতে বলিবেন, ততদিন যাইব না।' কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না।

খবর পাইলাম উনি ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র এবং তাঁহাকে খুব খাতির করেন। বনবিহারীবাবু যদি আমার জন্য অনুরোধ করেন চারুবাবু আপত্তি করিবেন না।

গেলাম বনবিহারীবাবুর কাছে। সব কথা বলিলাম তাঁকে। সব শুনিয়া ডান-পাটা নাচাইতে নাচাইতে তিনি বলিলেন, 'দেখ বনফুল, যে দেশে জন্মেছ সে দেশে বাঁচতে হলে সেলাম করতেই হবে। চাকরিতে একজন ভদ্র শিক্ষিত সাহেবকে সেলাম করে খুশী রাখতে পারলে আর কাউকে সেলাম করতে হবে না। আর চাকরি যদি না-ও করো তাহলে হাজার হাজার বাজে লোককে সেলাম করতে হবে। তা না হলে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ জমবে না। তুমি একটা ভালো চাকরী পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছ? আমি তখন বলিলাম 'আমি সাহিত্য-চর্চা করিতে চাই। ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করলে তার জন্য সময় পাবো। চাকরী করলে তা পাব না। জেনারেল প্র্যাকটিশ করলেও তা সম্ভব নয়।'

বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'অকূল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড় তা হলে—'তিনি আমার সামনেই ফোন তুলিয়া চারুবাবুর সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তাহার পর ফোন নামাইয়া বলিলেন—'চারুর কাছে যাও। দু-একটি শর্ত আছে, তা যদি তুমি মেনে নাও, ও তোমাকে নেবে। আর ও যদি তোমাকে ভালো করে শেখায় তাহলে ভালো প্যাথলজিস্ট হবে তুমি—'।

চারুবাবুর সহিত দেখা করিতেই তিনি বলিলেন—'তুমি মাস্টারমশাইকে গিয়ে ধরেছো? ওঁর অনুরোধ তো উপেক্ষা করা যায় না। তোমাকে শেখাবো। কিন্তু আমার কয়েকটি শর্ত আছে। প্রথম, তোমাকে একবছর অন্তত আমার কাছে কাজ শিখতে হবে। দ্বিতীয়—তোমার ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি আগেই সব কিনতে হবে। তৃতীয়তঃ, তোমাকে কথা দিতে হবে সব শেখার পর কলকাতায় তুমি প্র্যাকটিশ করবে না। কোনও মফঃস্বল শহরে গিয়ে করবে।'

আমি বলিলাম—'প্রথম ও তৃতীয় শর্ত আমি নিশ্চয় মানিব। কিন্তু তৃতীয় শর্তটির সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে পারিতেছি না। কারণ বাবাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি বলিতে পারিতেছি না যে সমস্ত যন্ত্রপাতি কেনার সামর্থ আমার আছে কি-না। বাবাই তো সব টাকা দিবেন।'

চারুবাবু বলিলেন—'যদি শিখিতে চাও, নিজের ল্যাবরেটরি কিনিতেই হইবে। কলেজের ল্যাবরেটরিতে তোমাকে শিখাইব কি করিয়া। তাহা বেআইনী। কলেজের যন্ত্রপাতি লইয়া স্বচ্ছন্দে কাজও করিতে পারিবে না। নানারকম অসুবিধা দেখা দিবে।'

বাবাকে চিঠি লিখিলাম। বাবা উত্তর দিলেন—'আজ মানি-অর্ডার করিয়া তোমাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইলাম। এখন ইহার বেশী টাকা আমার কাছে নেই।'

চারুবাবু বলিলেন—'পাঁচশত টাকা দিয়া Zeiss (জাইস্) মাইক্রোসকোপ কিনিয়া ফেল আর বাকি জিনিসগুলি ধারে কিনিয়া লও।'

বলিলাম, 'আমাকে ধার দেবে কে?'

'আমি জামিন হইলে দেবে।'

তখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দ্বিতলে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সায়েন্টিফিক সাপ্লাইজ নামে একটি দোকান ছিল। দোকানটি এখনও বোধ হয় আছে। চারুবাবু সেই দোকানের মালিককে একটি চিঠি দিলেন—'নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আমার ছাত্রকে ধার দিতে হইবে। ছেলেটি ভালো, তোমার টাকা মার যাইবে না। তোমার টাকার সুদও দিবে। জিনিসগুলি ইহাকে দিও।'

প্রবোধবাবু একটি দলিল করিয়া তাহাতে আমাকে সই করাইয়া লইলেন। প্রায় হাজার তিনেক টাকার জিনিস তিনি দিলেন। তাহার মূল্য সম্পূর্ণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত শতকরা সাড়ে বারো টাকা সুদে তাঁহাকে দিব লিখিতভাবে দলিলে এই প্রতিশ্রুতি আমি দিলাম।

চারুবাবু যদি তাঁহার পত্রে লিখিয়া দিতেন যে আমিই বনফুল, তাহা হইলে আমার হয়ত সুবিধা হইত। কারণ পরে জানিয়াছিলাম—তিনি বনফুলের লেখার অনুরাগী পাঠক একজন। ব্যাপারটা অনেকদিন পরে জানিয়াছিলাম। তখন আমি ধার শোধ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রবোধবাবু একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, আগে জানিলে সুদটা লইতাম না।

আমার জিনিসগুলি রাখিবার ব্যবস্থা মাস্টারমশাই (চারুবাবু) করিলেন। তখন মেডিকেল কলেজের ঠিক সামনে কলেজ স্ট্রীটের উপর লাহিড়ী কোম্পানীর একটি দোকান ছিল। তাঁহাদের সহিত মাস্টারমশায়ের আত্মীয়তা কিংবা বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের দোকানের পিছনের একটি ঘরে মাস্টারমশাই আমার জিনিসপত্রগুলি রাখিয়া দিলেন। দেখিলাম সেখানে তাঁহার ভেড়াটিও রহিয়াছে। W.R. পরীক্ষা করিবার জন্য ভেড়ার রক্তের প্রয়োজন হয়।

আমার মাইক্রোস্কোপটি মেডিকেল কলেজ pathological department-এর একটি লকারে রাখা হইল।

আমার মাইক্রোসকোপ অনেক ডেমনস্ট্রেটারই ব্যবহার করিতেন। তাঁহারাও আমার শিক্ষক হইয়া পড়িলেন ক্রমশঃ। মাস্টারমশাই যে যত্ন লইয়া আমাকে কাজ শিখাইয়াছিলেন তেমন যত্ন লইয়া নিজের ছেলেকেও বোধ হয় কেহ শেখায় না। তিনি রোগীদের নিকট হইতে যখন রক্ত আনিতে যাইতেন তখন আমার জন্যও কিছু বাড়তি রক্ত আনিতেন। সেগুলি আমি স্বাধীনভাবে নিজে পরীক্ষা করিতাম এবং সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত মিশাইয়া দেখিতাম ঠিক হইয়াছে কিনা। মল-মূত্র পরীক্ষাও প্রত্যহ করিতে হইত। সকাল দশটা হইতে রাত্রি আটটা, নটা পর্যন্ত তাঁহার কাছে থাকিতাম। তিনি স্বল্পভাষী রাশভারি লোক ছিলেন। কথা খুব কম বলিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর যে তাহার অনুরূপ ইহার প্রথম প্রমাণ পাইলাম প্রথমদিনই। বাড়ি হইতে টিফিন-কেরিয়ারে তিনি প্রত্যহ খাবার আনিতেন। বৈকালে সেগুলি খাইতেন। প্রথমদিনই আমাকে বলিলেন—টিফিন-কেরিয়ারটা খোল। কিছু খাও।' একটা আলাদা বাটিতে তিনি নিজেই প্রত্যহ আমাকে তাঁহার খাবারের অংশ তুলিয়া দিতেন। সিংহভাগটা আমিই পাইতাম। একদিন একটু আপত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিছু বলিবার পূর্বেই মাস্টারমশাই বলিলেন—'তুমি যা বলতে চাইছ, আমি বুঝেছি। আর বলতে হবে না, যা দিচ্ছি খাও।'

প্রতিদিনই খাইতাম।

লীলা তখন বেথুন কলেজের হোস্টেলে থাকিত। আমি থাকিতাম ৩নং মির্জাপুর স্ট্রীট মেসে। সেই মেসে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দেওয়ালে একটি বিস্কুটের টিন লাগানো ছিল। সেই টিনে পিওন চিঠি দিয়া যাইত। প্রতিবার সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ও উঠিবার সময় টিনের বাক্সটিতে একবার উঁকি দিয়া যাইতাম। সেইখানে লীলার মাঝে মাঝে চিঠি আসিত। আগেই লিখিয়াছি

যে আমিও আমার বাড়তি সময়টুকু তখন পত্ররচনাতেই খরচ করিতাম। একদিন লীলার চিঠিতে জানিলাম তাহার গোটা পনেরো টাকা দরকার। আমার কাছে টাকা ছিল। ঠিক করিলাম বৈকালে গিয়া টাকাটা দিয়া আসিব। সেদিন মাস্টারমশাইকে বলিলাম, 'আজ একটু সকাল সকাল ছুটি চাই। বেলা তিনটের সময়।'

'কেন?'

'আমার স্ত্রীকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আসতে হবে।'

'স্ত্রীকে? তোমার স্ত্রী আছে নাকি?'

'আছে। বেথুন কলেজে পড়ে, হোস্টেলে থাকে—'

মাস্টারমশাই অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। লীলাকে টাকা দিয়া আসিলাম। আমার তৃতীয় ভাই (গৌরমোহন) তখন সাব-এসিস্টেন্ট সার্জন হইয়া পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডে চাকরী করিতেছিল। সে লীলাকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাইত। আমাকেও পাঠাইত। আমার ল্যাবরেটরির জন্য অটোক্লেভ সেই পরে কিনিয়া দিয়াছিল। আমার ভাইরা সকলেই ভালো। তাহারা বারবার আমার সহায়, আমার ঐশ্বর্য। তাহারা আমার গর্ব।

সেইসময় আমার পুরাতন বন্ধু পরিমলের সহিত দেখা হইত। সে শুধু বড় সাহিত্যিক এবং রসিকই নয়, সে একজন উঁচুদরের ফটোগ্রাফারও। সে তখন ইলেক্‌ট্রোফোটো সার্ভিস নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিল। সে প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন মণিবাবু ও লাল মিঞাও। আমার একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। পরিমল বলিল 'রাত্রে আমার কাছে আসিয়া একদিন থাকো।' মণিবাবু সস্ত্রীক সেই বাড়ির এক অংশে থাকিতেন। তাঁহারা আমাকে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। গেলাম। পরিমলকে বলিলাম—আমার কিন্তু রাত্রে নির্জন জায়গা চাই। লীলাকে চিঠি লিখিতে হইবে।' খাওয়াদাওয়ার পর প্রায় রাত বারোটার সময় পরিমল আমাকে তাহাদের ফটো তুলিবার প্রকাণ্ড ঘরটিতে লইয়া গেল। দেখিলাম সেখানে খুব হাইপাওয়ারের আলো জ্বলিতেছে। পরিমল একটি টেবিল দেখাইয়া বলিল—এইখানে বোস। বসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই পত্ররচনায় মগ্ন হইয়া গেলাম। যতদূর মনে পড়ে সেদিন কবিতায় পত্র-রচনা করিতেছিলাম। এই অবস্থায় পরিমল কখন যে আমার ফটো তুলিয়া লইয়াছে জানিতে পারি নাই। পরদিন সেটি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। পরিমলের কাছে আমার অনেক ফটো এখনও আছে। আমার কাছে নাই।

পরিমল একটু সঞ্চয়ীপ্রকৃতির লোক। আমার ঠিক বিপরীত। আমি কোন কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখি নাই। অনেক বই কিনিয়াছি এবং হারাইয়াছি। অনেক ভালো ভালো চিঠি জীবনে পাইয়াছি, সেগুলিও রক্ষা করিতে পারি নাই। এমন কি রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলিও হারাইয়া গিয়াছে। 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' বইটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার কিছু পত্র ছাপা হইয়া গিয়াছে। আমার জীবনটা যেন ঢালু জায়গা। সব গড়াইয়া চলিয়া যায়।

হঠাৎ একদিন মাস্টারমশাই বলিলেন 'তুমি বউমাকে খবর দাও। তিনি যেন হোস্টেল থেকে কাল রাতে ছুটি নেন। কাল রাত্রে আমার বাড়িতে তোমরা দুজনে খাবে।'

ফোনে খবর দিলাম।

পরদিন মাস্টারমশাই বলিলেন—'তোমাকে ছুটি দিলাম। মোটরে তেল ভরিয়া দিয়াছি। তুমি বউমাকে হোস্টেল হইতে তুলিয়া লইয়া যেথানে খুসী ঘুরিয়া বেড়াও। রাত্রি সাড়ে ন-টা নাগাদ আমার বাড়িতে আসিলেই চলিবে। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার তোমাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিব।' আমি বলিলাম 'আপনি কি করিয়া ফিরিবেন?' তিনি উত্তর দিলেন 'সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।' মাস্টারমশায়ের গাড়ি লইয়া গড়ের মাঠেই সর্বক্ষণ বেড়াইয়াছিলাম। লক্ষ্য করিলাম লীলা খুব কাশিতেছে। বলিল—'এ কাশি কিছুতেই ভালো হইতেছে না।' অনেকরকম ওষুধ দিয়াছি। মাস্টারমশাই বলিলেন—ডাঃ সত্যবান রায়কে দেখাইতে। আমার যতদূর মনে আছে ডাঃ সত্যবান রায়ই বোধ হয় সেকালের প্রথম বাঙালী Ear, Nose, Throat Specialist. তিনি মেডিকেল কলেজের Dr. Juda সাহেবের কাছে কাজ শিখিয়াছিলেন। সেকালের M. Sc. M. B. ছিলেন তিনি। কলিকাতায় তখন তাঁহার খুব পশার। আমাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি যে সাহিত্যিক এ গর্বে তিনিও যেন গর্ব অনুভব করিতেন। তাঁহাকে বলিতেই তিনি একদিন লীলার গলাটা দেখিলেন। বলিলেন 'দুইটি টন্‌সিলই পচিয়া গিয়াছে। ও দুটিকে কাটিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে। ঠিক হইল লীলার পরীক্ষার পর অপারেশন হইবে। কিন্তু তখন বিছানা খালি পাওয়া গেল না। কেবিন পর্যন্ত ভরতি। সত্যবানবাবু বলিলেন 'তুমি কাছাকাছি একটা ঘর ঠিক করো। সেখানেই আমি অপারেশন করে দিয়ে আসব।'

ইলেক্‌ট্রোফোটো লাগোয়া মণিবাবুর বাসা। মণিবাবু বলিলেন, 'আমার

বাসাতেই আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি।' তাহাই হইল। মণিবাবুর বাসাতেই ডাক্তার সত্যবান রায় অপারেশন টেবিল, আলো, যন্ত্রপাতি লইয়া একজন নার্সসহ হাজির হইলেন এবং লীলার টন্‌সিল দুটিকে 'গিলোটিন' করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। তাহার পর লীলার কাশি কমিল। মণিবাবু ও তাহার স্ত্রী সেসময় যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা আজও ভুলি নাই। মণিবাবুর স্ত্রী ছিলেন মেমসাহেবের মত ফর্সা, মাথার চুল লাল, চোখের তারা নীল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত একজন মেমসাহেব যেন বাঙালী পোষাক পরিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। কয়েকদিন পরেই লীলা ভালো হইয়া হোস্টেলে গেল। আমিও আমার যথারীতি ল্যাবরেটরির কাজে লাগিয়া পড়িলাম। সেইসময় আমার জীবনে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে কথা কাহাকেও বলি নাই। ভদ্রলোকটির নিকট শপথ করিয়াছিলাম কাহাকেও বলিব না। তাঁহার হাঁপানি রোগ ছিল। তিনি মাঝে মাঝে রক্ত-পরীক্ষা করাইতে আসিতেন। ক্রমশ জানিতে পারিলাম ভদ্রলোক পুলিসে কাজ করেন। পুলিসে কাজ করেন, কিন্তু মনে মনে খুব স্বদেশী। আমরাও সকলে মনে-প্রাণে স্বদেশী ছিলাম। ক্রমশ ভদ্রলোকের সহিত ভাব হইয়া গেল। আমি তাঁহাকে 'সোয়ামিন' ইনজেকশন দিয়া দিতাম। এই ইনজেকশনটা তখন হাঁপানিতে খুব চমকপ্রদ ছিল। একদিন ভদ্রলোককে কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম 'ইংরেজদের যতোই দোষ থাকুক তাহারা দুষ্টের শাসন করে।' ভদ্রলোক বলিলেন 'ইংরেজ গরীব দুষ্টদের শাসন করে, বড়লোক দুষ্টদের পোষণ করে।'

প্রশ্ন করিলাম 'কি রকম?'

উত্তর দিলেন 'গভর্ণমেণ্ট কোন দুষ্ট বড়লোকের কেশাগ্র স্পর্শ করেন না, রাজামহারাজাদের দুষ্কৃতির সহায়তাই করিয়া থাকেন বরং। যদি দেখিতে চান আজই ইহার একটা প্রমাণ আপনাকে দেখাইতে পারি।'

'কি প্রমাণ?' প্রশ্ন করিলাম।

'সন্ধ্যার সময় আমি এসে আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। গাড়ি নিয়ে আসব। কিন্তু আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যাব। ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। যদি জানাজানি হয়ে যায় আমার চাকরী যাবে। আপনি রাত্রি নটার সময় প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আমি আসব।'

ঠিক রাত্রি নটার সময় তিনি একটি 'কার' ড্রাইভ করিয়া আসিলেন। গাড়িতে আর কেহ ছিল না। আমাকে তিনি পিছনের সিটে বসাইয়া রুমাল দিয়া চোখ বাঁধিয়া দিলেন। গাড়িটি ব্যাক করিয়া ঘুরাইয়া লইলেন, তাহার পর

মিনিটদশেক বোধ হয় সোজা চলিলেন। তাহার পর থামিলাম, আবার ব্যাক করিয়া গাড়ি একটি গলিতে ঢুকিল। ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে গাড়ি হইতে হাত ধরিয়া নামাইলেন। তাঁহার হাত ধরিয়াই একটি ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া আমার চোখ হইতে রুমাল খুলিয়া দিলেন। দেখুন—

দেখিলাম প্রকাণ্ড লম্বা একটা কাঠের প্যাকিং কেস। প্যাকিং কেসটি বাক্সের মত। ডালাটি বন্ধ। ডালার উপর একটি ছিদ্র এবং ছিদ্র দিয়া একটি রবারের নল বাক্সের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে। অদূরে দেখিলাম একটি অক্সিজেন সিলিণ্ডার।

বলিলাম—'কোন রোগী না কি।'

ভদ্রলোক বাক্সটির ডালা তুলিয়া দিলেন। ভিতরে দেখিলাম, একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছে। মনে হইল মেয়েটি কিশোরী। বয়স ষোল বছরের কমই। ভদ্রলোক বলিলেন—'স্বচক্ষে দেখলেন তো। এর ইতিহাস আপনাকে পরে বলব। এখন চলুন।'

আবার আমার চোখ বাঁধিয়া দিলেন এবং গাড়ি লইয়া সোজা গড়ের মাঠে চলিয়া গেলেন। সেখানে মনুমেন্টের কাছে গাড়ি থামাইয়া আমার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিলেন। বলিলেন—'যে মেয়েটিকে দেখলেন ওটি একজন মহারাজের মনে কামোদ্রেক করেছে। ভদ্রলোক যে মহারাজের নামটি বলিলেন তিনি দেশীয় রাজাগণের মধ্যে একজন নামজাদা রাজা। সে নামটি উহ্য রাখিতেছি। ভদ্রলোক বলিলেন সেই মহারাজার লোকজনরা ইহাকে বাড়ি হইতে হরণ করিয়াছে। মেয়েটি কিন্তু সতী এবং তেজস্বিনী। মহারাজের বাহুবন্ধনে ধরা দিতে বহু প্রলোভনসত্ত্বেও কিছুতেই রাজি হয় নাই। তাহার পর ইহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া ক্লোরোফর্ম করিয়া অজ্ঞান করা হইয়াছে এবং এই বাক্সে প্যাক করিয়া ইহাকে মহারাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইতেছে। সঙ্গে একজন ডাক্তার আছেন। তিনি মাঝে মাঝে মর্ফিন ইন্‌জেকশন দিতেছেন এবং অক্সিজেন শুঁকাইতেছেন। আমাদের উপর মালিকেরা অর্ডার দিয়াছেন আমরা পুলিসরা গোপনে যেন এই মালটিকে নিরাপদে এবং গোপনে পাচার করিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করি। ইহার পর কি বলা চলে যে ইংরেজরা দুষ্টের শাসক? যে সব দুষ্টেরা ইহাদের শোষণকার্যে সহায়তা করে তাহাদের ইহারাই লালন-পালন করে।

এ ঘটনা বহুদিন আগেকার। তাহার পর আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। স্বাধীনতার পর সাতাশ বছর কাটিয়া গেল। মনে এখন প্রশ্ন জাগিতেছে—ছবিটা

কি বদলাইয়াছে ? মনই উত্তর দিল—বদলায় নাই। এখনও আমাদের শাসনকর্তারা নিজেদের গদিরক্ষা করিবার জন্য নানাজাতের দুর্বৃত্ত পোষণ করিতেছেন। জীবনের প্রতিস্তরে দুর্নীতি, অবিচার, অত্যাচার, অপচয়, চুরি, স্বজন-পোষণ ও অযোগ্যতা। দেশ এখনও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এতদিন পরে, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণজীর কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ উচ্চারিত হইয়াছে। এ প্রতিবাদ অনেক আগেই উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বোদয়-নেতা এতদিন নীরব ছিলেন কেন এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিবে। Better late than never-এই প্রবচন অনুসারে আমরা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছি বটে, কিন্তু মনে আর একটা ভয়ও জাগিয়া উঠিতেছে। তাঁহার দলে যে সব লোক জুটিতেছে তাহারা খাঁটি মাল তো ? আজ যাহারা দেশের গদি অধিকার করিয়া দুই হাতে লুণ্ঠন করিতেছে, যাহাদের অবিচার ও অন্যায়ের তুলনা মেলা ভার, তাহারা একদিন মহাত্মা গান্ধীর দলে সেরা ভক্ত ছিল। জয়প্রকাশজী যদি ঠিক লোক নির্বাচন করিতে না পারেন তাহা হইলে আবার একদল সুবিধাবাদী জুয়াচোর আসিয়া গদি দখল করিবে এবং দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে থাকিয়া যাইবে।

আমি যে কাহিনীটি উপরে বিবৃত করিলাম তাহা আমার মনে গভীর দাগ কাটিয়াছিল। ইহার অনেক পরে আমি 'জঙ্গম' লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই কাহিনীটি ব্যবহার করিয়াছি। বস্তুত 'জঙ্গমে'র অনেক চরিত্রই কলিকাতার বহমান জনস্রোতের ভিতরই ভাসিতে ভাসিতে আমার মনে আটকাইয়া গিয়াছিল। অনেক পরে কল্পজগতের নূতন পরিবেশে তাহারা নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। আমি যখন মাস্টারমশাইয়ের নিকট ট্রেনিং লইতেছিলাম তখনও মাঝে মাঝে আমি দুই একটা কবিতা লিখিতাম। মাসিকপত্রে সেগুলি প্রকাশিত হইল। কিন্তু তখনও আমি উপন্যাসরচনায় মন দিই নাই। কখনও যে উপন্যাস লিখিব, কল্পনাও করি নাই। উপন্যাসলেখার নানা উপকরণ কিন্তু অজ্ঞাতসারেই আমার মনে জমা হইতেছিল। সে সময় লীলাকে চিঠি লেখাই আমার প্রধান সাহিত্য-কর্ম ছিল। কবিতায়, গদ্যে, নানাভাবে অলঙ্কৃত অনেক রঙিন-সচিত্র চিঠিতে অনেক চিঠি লিখিয়াছি তাহাকে। সেগুলি হারাইয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে এক বছর কাটিয়া গেল। লীলা পরীক্ষা দিয়া মণিহারী চলিয়া গেল একদিন। মাস্টারমশাই আমাকেও বলিলেন—তোমার আর কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমার যতটুকু বিদ্যা ছিল তাহা তোমাকে দিয়াছি। এবার এগুলি বারবার করিয়া করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহার

জন্য খরচ করিয়া কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি একবছরের জন্য কোন হাসপাতালে চাকরী লও। সেখানে যেন ইনডোর বেড থাকে। সেখানে গিয়া যাহা শিখিয়াছ তাহা বারবার প্র্যাকটিশ কর। তাহার পর কোনও একটা বড় শহর বাছিয়া প্রাইভেট প্র্যাকটিশ শুরু করিয়া দাও। তোমার আর পয়সা খরচ করিযা কলিকাতায় থাকিবার দরকার নাই।' সেটা ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ। মেসে ফিরিয়া সেইদিনের স্টেটসম্যানে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম আজিমগঞ্জ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসারের জন্য একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছে। হাসপাতালটি মিউনিসিপালিটির। বেতন মাসিক ৮০৲। ফ্রি কোয়ার্টার্স। প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করিতে দেওয়া হইবে। হাসপাতালে ষোলটি ইনডোর বেড আছে। মাস্টার-মশাইকে বিজ্ঞাপনটি দেখাইলাম তিনি বলিলেন—'এখুনি দরখাস্ত করে দাও।' চেয়ারম্যান টেলিগ্রামে আমাকে নিয়োগ করিলেন। কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে মাস্টারমশাইকে বলিলাম—'আপনার একটি ফটো চাই। আমার ল্যাবরেটরিতে রাখিব।' তিনি বলিলেন—আমার তো ফটো নাই। বিবাহের সময় একবার তোলা হইয়াছিল। সেটাও কোথায় আছে জানি না। আর একবার সম্ভবতঃ মৃত্যুর পর তোলা হইবে।' বলিলাম—'তাহা হইলে চলুন কোনো ফটো স্টুডিওতে একটা ফটো তোলাই। আপনার ফটো না লইয়া আমি কলিকাতা ত্যাগ করিব না। ইলেকট্রোফটো সার্ভিস বা সি. গুহ কোন স্টুডিওতে ফটো তোলা হইয়াছিল। সে ফটোটি আমার কাছে এখনও আছে। তাহা হইতে 'সোনা'-কে দিয়া সেদিন আবার একটি রিপ্রিণ্ট করাইয়াছি।

আজিমগঞ্জে গিয়া দেখিলাম মণিহারীর জমিদার সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (রায়বাহাদুর) সেখানকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। ভাগীরথী নদীর ওপারে জিয়াগঞ্জে তাঁহার বাড়ি। ভাগীরথীতে সর্বদা নৌকা পারাপার হয়। এপার-ওপার সর্বদাই যাতায়াত চলিতেছে।

আমার কোয়ার্টারটি আজিমগঞ্জে ভাগীরথীর ধারে। পাশ দিয়া রেললাইন চলিয়া গিয়াছে।

আমি আজিমগঞ্জে পৌছিলাম সন্ধ্যার পর। একাই গিয়াছিলাম। প্রবোধদা তখন আজিমগঞ্জে বুকিং ক্লার্ক। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্টেশনে দেখিলাম একটি বুড়ি পড়িয়া আছে। জ্বর হইয়াছে, উঠিতে পারিতেছে না। আমি যে হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হইয়া আসিয়াছি সেটি ছিল স্টেশনের পাশেই। আমি স্টেশনমাস্টারকে বলিয়া একটি স্ট্রেচার জোগাড়

করিলাম এবং সেই বুড়িকে হাসপাতালে ভরতি করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। তাহার পর প্রবোধদার বাসায় গিয়া খাওয়াদাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঠিক হইল—লীলা না আসা পর্যন্ত প্রবোধদার বাসাতেই আমি খাইব এবং আমার কোয়ার্টারে শুইব। প্রবোধদা কিছুতেই আলাদা ব্যবস্থা করিতে দিলেন না।

আজিমগঞ্জ হাসপাতাল দেখিয়া প্রথমে খুব আনন্দ হইয়াছিল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ি। ষোলটি রোগী থাকিবার মতো ইনডোর ওয়ার্ড। আলাদা অপারেশন থিয়েটার। আলাদা চাকর, আলাদা মেথর। একজন কম্পাউণ্ডার এবং একজন ড্রেসার। মেথর-দম্পতী হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডেই থাকে। ভোলা চাকরও সেখানে থাকে। কম্পাউণ্ডারবাবুর কোয়ার্টারস্‌ও হাসপাতালের মধ্যে। আমার পূর্বে যিনি ডাক্তার ছিলেন তাঁহাকে সকলে 'পাগলা ডাক্তার' বলিত। তিনি আমাকে চার্জ দিবার সময় বলিলেন 'কিছুদিন থাকুন, সব বুঝতে পারবেন। আমি কিছু বলিব না।'

অল্প কয়েকদিন কাজ করিবার পরই বুঝিতে পারিলাম। হাসপাতালে ঔষধ নাই, ঔষধ কিনিবার টাকাও নাই। ষোলটি ইনডোর রোগী রাখিবার ব্যয়বহন করিতে হাসপাতাল অক্ষম। হাসপাতালের আয়ের উৎস মিউনিসিপ্যালিটি, মিউনিসিপালিটির আয়ের উৎস ট্যাক্স। বহু লোকের বহু ট্যাক্স বাকি আছে। আদায় করিবার জন্য যে নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা দরকার তাহা নাই। গভর্ণমেণ্ট হইতে কিছু সাহায্য হাসপাতাল অবশ্য পায়, কেবল তাহা দিয়া হাসপাতাল চালানো সম্ভব হয় না। সুতরাং কাজ আরম্ভ করিয়াই বেশ দমিয়া গেলাম।

আমার উৎসাহ কিন্তু অদম্য ছিল। যে সব রোগী বাড়ি হইতে পথ্য আনিয়া খাইতে পারে এবং যে ঔষধ হাসপাতালে নাই তাহা কিনিয়া আনিতে পারে এমন সব রোগীকে আমি ইনডোরে ভরতি করিয়া তাহাদের মলমূত্র এবং রক্ত বিনা পয়সায় পরীক্ষা করিয়া তাহাদের চিকিৎসা শুরু করিয়া দিলাম। অনেক রোগী ইহাতে খুব উপকৃত হইল এবং হাসপাতালে ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল। আজিমগঞ্জে যে জীবন আমি যাপন করিয়াছিলাম তাহার প্রতিচ্ছবি আমার 'নির্মোক' নামক গ্রন্থে পরে আঁকিয়াছি। নির্মোকে অবশ্য অনেক কাল্পনিক

কাহিনী আছে, কিন্তু কাঠামোটা আজিমগঞ্জের পরিবেশ। আজিমগঞ্জে ডাক্তার হিসাবে আমার কিছু সুনাম হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক দূরের গ্রাম হইতেও রোগী আমার কাছে আসিতে লাগিল। এ সময়ও এক লীলাকে চিঠি-লেখা ছাড়া আর কোনও লেখালিখি নাই। সময় পাইতাম না। আমার কোয়ার্টারের একপাশে আমার ছোট ল্যাবরেটরিটি স্থাপন করিয়াছিলাম। সেখানকার ডাক্তাররা মাঝে মাঝে কেস পাঠাইতেন। আজিমগঞ্জে যোগেশবাবু এবং নিবারণবাবুর ভালো প্র্যাকটিশ ছিল। কোয়াক প্র্যাকটিশনারও ছিল কয়েকজন। নাম মনে নাই। তাহারা আমাকে অনেক কেস আনিয়া দিত। আজিমগঞ্জের কবিরাজ অনাথবন্ধু রায়ের সহিত শীঘ্রই বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তিনি শুধু বড় কবিরাজই ছিলেন না, অতিশয় সুরসিক, বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁহার দাদা অকালে দুইটি শিশু-পুত্রকে রাখিয়া মারা যান। অনাথবাবু সেজন্য আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটিকে সযত্নে তিনি মানুষ করিতেছিলেন। তাঁহার বিধবা বৌদিকে ঘরের সর্বময়ী কর্ত্রীপদে স্থাপন করিয়া আদর্শ হিন্দুজীবনযাপন করিতেছেন অনাথবাবু। তাঁহাকে খুবই শ্রদ্ধা করিতাম। আজিমগঞ্জের যে কয়েকজনের স্মৃতি মনে আঁকা আছে তাহার মধ্যে অনাথবাবুর স্মৃতিই উজ্জ্বলতম, পবিত্রতম। তিনি পান ও কিমাম খাইতেন। ক্রমশঃ আমারও এ অভ্যাসটি হইল। চমৎকার কিমাম—ঘরে প্রস্তুত করিতেন তিনি।

আজিমগঞ্জে কিছুদিন থাকিবার পর লীলাকে লইয়া আসিবার জন্য মনে মনে উৎসুক হইলাম। কিন্তু সেযুগে বাবা-মা যাহা ঠিক করিতেন তাহাই হইত। বিধাতা সদয় হইলেন—বাবা নিজেই একদিন আমাকে চিঠি লিখিলেন। বৌমাকে তুমি আসিয়া লইয়া যাও, আমি একটি শুভদিন দেখিয়া রাখিয়াছি। লীলা পরীক্ষা দিয়া মণিহারীতেই ছিল। মণিহারীতেই খবর আসিয়াছিল যে সে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করিয়াছে। লীলা সঙ্গীতেও পারদর্শিনী ছিল। রবীন্দ্র-সংগীতও খুব চমৎকার গাহিত। বিবাহের সময় সঙ্গে একটি সেতারও আনিয়াছিল সে। কিন্তু সংসারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সঙ্গীতসাধনা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমারও সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। অনাথবাবুর বাড়িতে মিশিরজী নামে একজন ভালো ওস্তাদ ছিলেন। তাহার নিকট আমিও কিছুদিন সেতার শিখিয়াছিলাম। কিন্তু সে শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

বাবার চিঠি পাইয়া লীলাকে আনিবার জন্য মণিহারী চলিয়া গেলাম। যাইবার পূর্বে লীলার জন্য একটি বড় হাত-আয়না, একটি চিরুণী কিনিয়াছিলাম

মনে পড়িতেছে। একটি টেবিল ক্লথ এবং স্বামী বিবেকানন্দের একটি ছবিও। আমার দাম্পত্য-জীবনে এইগুলি বোধ হয় লীলাকে আমার প্রথম উপহার। লীলা খুব খুশী হইল। তখন কত তুচ্ছ জিনিসে কত আনন্দ হইত। মা আসিবার সময় সঙ্গে কাঁসার বাসন দেন নাই। বলিয়াছিলেন, সেখানে বাসাবাড়িতে দামী কাঁসার বাসন চুরি হইয়া যাইবে। সেখান হইতে শস্তা বাসন কিনিয়া লইও। সুতরাং কিছু কলাইকরা বাসন এবং কিছু অ্যালুমিনিয়মের বাসনও কিনিলাম।

আজিমগঞ্জে আমার নতুন সংসার আরম্ভ হইয়া গেল। দেখিলাম লীলা রাঁধেও ভালো। আজিমগঞ্জে তরিতরকারি এবং মাছ ভালো পাওয়া যাইত। পুকুরের সুস্বাদু মাছ। রোজগারও কিছু কিছু হইতেছিল। বাড়িতে একটা ট্যারা ঝি রাখিয়াছিলাম। ঝুমু বলিয়া একটি কুকুরও জুটিয়াছিল। ধরাসন বলিয়া একটি চাকরও পাওয়া গেল। ঝুমুকে দুধ দিলে ধরাসন আপত্তি করিত। তাহার যুক্তি ছিল মানুষ দুধ পায় না, কুত্তারে দুধ দেওয়া কেন? হাসপাতালের চাকর ভোলা বাজারটা করিয়া দিত। হাসপাতালের মেথর ভূষণ এবং তাহার স্ত্রী আমাদের বাড়ির উঠান ও নালি পরিষ্কার করিত। একটা নতুন ধরণের জীবন শুরু হইয়া গেল।

কিছুদিন পরেই আজিমগঞ্জে কলেরা এপিডেমিক শুরু হইয়া গেল। হাসপাতালে দলে দলে রোগী আসিতে লাগিল। ইনডোর ভরিয়া গেল। আমি হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে খড়ের ও দরমার শেড তৈয়ারি করাইয়া রোগী ভর্তি করিতে লাগিলাম। সে সময় দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কম্পাউণ্ডার এবং ড্রেসারকে স্যালাইন কি করিয়া দিতে হয়—তাহা শিখাইয়া দিলাম। সে সময় একটি acute Arsenic poisoning এর কেসও কলেরা রোগীদের সহিত আসিয়াছিল। সেটি আমি ধরিয়া ফেলি। রোগীর বমিতে এবং পায়খানায় রক্তের আধিক্য দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়। কলিকাতায় কলেরার জীবন্ত জীবাণু দেখি নাই। এখানে প্রচুর দেখিলাম। অনেক রোগী প্রাণে রক্ষা পাইলেন। আমার খুব একটা নাম হইয়া গেল। নিয়মিতরূপে সব রোগীর মল-মূত্র পরীক্ষা করিতাম বলিয়া নাম বাহির হইয়া পড়িল। ও অঞ্চলে রোগীও অসংখ্য। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অ্যামিবিয়াসিক এবং গিয়ারডিয়াসিসও কম নয়। অনেক রোগী জুটিতে লাগিল। কিন্তু হাসপাতালে ঔষধের অভাব। আমাদের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ উপদেশ

দিলেন দেশী গাছ-গাছড়া দিয়ে চিকিৎসা করুন। চিরতা, কালমেঘ, গুলঞ্চ ত্রিফলা প্রভৃতির গুণগান করিয়া বলিলেন, আপাতত এই সব দিয়া চালান। আমি বহরমপুর গিয়া সিভিল সার্জনের সহিত দেখা করিলাম। সিভিল সার্জন ছিলেন—মেজর কাপুর। তিনি মেডিকেল কলেজে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। আমাকে দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে কিছু ওষুধ মঞ্জুর করিলেন। এইভাবে জোড়াতাপ্পি দিয়া আমার কাজ চলিতে লাগিল। ওখানকার কিছু সহৃদয় কৈইয়া ধনীও আমার খাতিরে হাস-পাতালে কিছু কিছু ঔষধ কিনিয়া দিয়াছিলেন। আজিমগঞ্জে নও-লক্ষা পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। খুবই ভদ্র পরিবার। আমার বাড়ির পাশেই ছিলেন রিটায়ার্ড ডাক্তার রাধিকাবাবু। তাঁহার দুই পুত্র তারাপদবাবু এবং রমাপদবাবু। তারাপদবাবু বেশ বিদ্বান লোক ছিলেন। জিয়াগঞ্জ স্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন তিনি। স্কুল-লাইব্রেরী হইতে অনেক ভালো-ভালো বই আনিয়া দিতেন আমাকে। রাত জাগিয়া সেগুলি পড়িতাম। ডিকেন্স, টলস্টয়, গর্কি, গল্‌সওয়ার্দির সহিত তখনই পরিচয় ঘটে। তখন বাংলা-সাহিত্যে যে সব আধুনিকমার্কা বাহির হইত তাহাও মাঝে মাঝে পড়িতাম। দেখিতাম বেলেল্লা-গিরি এবং অসভ্যতাকে ভাষা দিয়া কতগুলি অসভ্য লেখক নিজেদের স্থূলতা জাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন মনে মনে যে উত্তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাই পরে অনেক ব্যঙ্গকবিতায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তখন লিখিবার সময় ছিল না। শনিবারের চিঠির সঙ্গে তেমন পরিচয়ও হয় নাই। আমি যখন আজিমগঞ্জে ছিলাম তখন পরিমল গোস্বামী একবার সেখানে গিয়াছিল। তখন সে ফটো লইয়া মশগুল। পরিমল সঙ্গে ক্যামেরা আনিয়াছিল একটি। লীলা তখন অন্তঃসত্ত্বা। কেয়া তখন পেটে। পরিমল বলিল 'তোমাদের দুজনের একটি pair ফটো তুলিব। আমাদের বাড়ির সংলগ্ন একটি বাহিরের উঠান ছিল। সেখানে ছিল একটি কাপাসগাছ। সেই কাপাসগাছের সামনে লীলাকে লইয়া বসিলাম। পরিমল ফটো তুলিল। কিন্তু তাহার পত্র পাইলাম বাবা, মা সেইদিন রাত্রেই আমার কাছে আসিতেছেন। বাবা, মা কেহই তথাকথিত আধুনিক ছিলেন না। বাড়ির বউ পর-পুরুষের সহিত মেলামেশা করিতেছে ইহা তাঁহারা চাহিতেন না। পরিমলকে বলিলাম 'বাবা, মা যেন না জানিতে পারে তুমি আমাদের ফটো তুলিয়াছ। পরিমল বলিল আমি রাত্রে ছাদে শুইব। সেখানেই develop করিয়া print করিয়া শুকাইয়া লইব। তুমি কিছু চিন্তা করিও না।' পরিমল

তাঁহার কথা রাখিয়াছিল। কিন্তু বিধি বিরূপ ছিলেন। একটি ফটো যে ছাদ হইতে উড়িয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে আসিতে পারে ইহা পরিমল ভাবে নাই। বাবা সকালবেলা উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন সিঁড়ির কাছে একটি ফটো পড়িয়া আছে। তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ ফটো কোথা হইতে আসিল?' বলিলাম 'ওটা আমরা সম্প্রতি তুলিয়াছি। উড়িয়া আসিয়া এখানে পড়িয়াছে।' বাবা ইহা লইয়া আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলেন না। পরিমলও দুই-একদিন পরে চলিয়া গেল। পরিমলের তোলা সে ফটো-টি এখনও আমার কাছে আছে। আমার বিবাহের বৌভাতে পরিমল মণিহারী গিয়াছিল। বিবাহের পরদিনই সে আমাদের একটি ফটো তুলিয়াছিল। পরে সেটি রঙিন করিয়া পাঠাইয়া দেয়। সে ছবিটিও এখনও আছে।

আজিমগঞ্জে মাত্র একবছর ছিলাম। কিন্তু এই একবৎসরের মধ্যে আমার বাবা, মা, ভাইরা, বোনেরা, বড় বোন রাণীর স্বামী সুধাংশু ( ডাকনাম খোকা ), আমার কাকাবাবু সকলেই কিছুদিন গিয়া আমার কাছে ছিলেন। যদিও বাজারে ধার জমিয়া যাইতেছিল, তবু খুব আনন্দে ছিলাম। প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করিয়া আমি খুব বেশী রোজগার করিতে পারিতাম না। আমি হাসপাতালের গরীব রোগীদের লইয়াই বেশী সময়ক্ষেপ করিতাম। ল্যাবরেটরি হইতে মাঝে মাঝে কিছু আয় হইত। আয়ের আর একটা উৎস ছিল লাইফ ইনসিওরেন্সের কেসগুলি। আমি যাহা উপার্জন করিতাম তাহা হইতে কিছু টাকা আমাকে ঋণশোধবাবদ পাঠাইতে হইত প্রতিমাসে। ধারে ল্যাবরেটরি কিনিয়াছিলাম এবং সে ঋণ পরিশোধ না করিলে সুদে-আসলে তাহা তুমুল হইয়া উঠিবে এ ভয় ছিল। তাই যখনই যাহা পারিতাম শোধ করিয়া দিতাম। আমি নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার ছিলাম। তাহারা ভালো ফি দিত। কিন্তু নর্থ-ব্রিটিশের কাজটা শেষে ছাড়িয়া দিতে হইল। একজন ভদ্রলোককে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার মূল্য দিলাম। একজন এজেন্ট আমার জানা-শোনা ভদ্রলোকটিকে একদিন আমার কাছে লইয়া আসিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাঁহার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই। ইউরিণটা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে একটি পাত্র দিয়া বলিলাম—'বাথরুমে যান, গিয়া ইহার ভিতর প্রস্রাব করুন।' তিনি বাথরুমে গেলেন ও একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন 'একটু আগেই আমি প্রস্রাব করিয়াছি, এখন প্রস্রাব হইবে না। আমি যদি বাড়ি হইতে পাঠাইয়া দিই ক্ষতি আছে কি?' বলিলাম 'ক্ষতি নাই, তবে ইহাদের নিয়ম যে প্রস্রাবটা আমার

সামনে করিতে হইবে। বেশ, আপনাকে বিশ্বাস করিতেছি, আপনি বাড়ি হইতেই প্রস্রাবটা পাঠাইয়া দিন।' তিনি চলিয়া গেলেন। একটু পরে প্রস্রাব আসিল। দেখিলাম, প্রস্রাবে কোন দোষ নাই। ভালো রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। সেইদিন রাত্রেই অন্য কোম্পানীর একজন এজেন্ট আসিয়া আমার সহিত দেখা করিয়া প্রশ্ন করিলেন—'আপনি অমুকবাবুর রিপোর্টটি কি পাঠাইয়া দিয়াছেন?' বলিলাম 'দিয়াছি', কোনও দোষ নাই।' 'তাঁহার ইউরিণটা কি পরীক্ষা করিয়াছিলেন?' যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলাম। এজেন্ট বলিলেন 'উহার ইউরিণে দোষ আছে, সেইজন্তেই এই চাতুরী করিয়াছে।' পরদিনই ভদ্রলোককে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম 'আপনার ইউরিণ লইয়া নানারকম গুজব শুনিতেছি—ওটা আর একবার পরীক্ষা করিতে চাই। আমার সামনেই প্রস্রাবটা করুন।' করিলেন। দেখিলাম প্রস্রাবে অ্যালবুমেন এবং সুগার দুই আছে। তখনই নর্থ ব্রিটিশ কোম্পানীকে একটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করিলাম। **Don't accept the report I have sent. Letter forwarded.** চিঠিতে সব কথা খুলিয়া লিখিলাম এবং তাহার সঙ্গে আমার রেজিগ্‌নেশন-পত্রও পাঠাইয়া দিলাম। লিখিলাম, আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার, সাধারণ লোকের আশ্রয়ভাজন হইতে পারিব না। ঠিকমত পরীক্ষা করিলে অধিকাংশ লোকই **Unfit** হইয়া যাইবে। কারণ প্রকৃত সুস্থলোকের সংখ্যা এ দেশে কম। আপনাদের স্বার্থে যদি আমি সততা অবলম্বন করি তাহা হইলে আমি সকলের কোপদৃষ্টিতে পড়িব। তাহা আমি হইতে চাই না। তাই কাজে ইস্তফা দিলাম। নর্থ ব্রিটিশ কোম্পানী আমার সততার খুব প্রশংসা করিয়া আমাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং আমাকে উচ্চপদে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কিন্তু আর রাজি হই নাই। আমার ইন্‌সেওরেন্সের কাজ-কর্মও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল। প্রধানতঃ ধারের উপর নির্ভর করিতাম। অনেকদিন পরে সাহিত্য-সংসারের দাদামশায়ের মুখে একটি বড় খাঁটি কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—দেখ ভায়া, নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের ধারই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী আমার উপর কৃপা করিয়াছিলেন। লোকে আমাকে বিশ্বাস করিয়া ধার দিত এবং সেই ঋণের পাল তুলিয়া আমার জীবন-তরী ভালোভাবেই ভাসিয়া যাইত। জীবনের শেষ-প্রান্তে আসিয়া আজ সমস্ত জীবনটাই এইভাবে কাটিয়াছে।

আজিমগঞ্জের আর একটি প্রধান ঘটনা আমার প্রথম সন্তানের জন্ম। আমার মা ও বাবা পূর্বেই আসিয়াছিলেন। আজিমগঞ্জে তেমন যোগ্য নার্স বা দাই

ছিল না। গঙ্গার ওপারে জিয়াগঞ্জে মিস হকারের একটি নামকরা মেটারনিটি হাসপাতাল ছিল। একদিন লীলাকে সেখানে লইয়া গেলাম। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন সব ঠিক আছে। আর মাসখানেকের মধ্যেই হইবে। একটা তারিখও বলিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—'আপনি আমার বাসায় গিয়া প্রসব করাইবেন কি?' তিনি বলিলেন—'যাইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু অসুবিধা অনেক। প্রথম অসুবিধা নদী। তাহা ছাড়া কখন ব্যথা ধরিবে তাহা অনিশ্চিত। রাত-দুপুরে হইলে নদী পার হইয়া সেখানে পৌঁছাইতে আমার কষ্টও হইবে। সুতরাং এক সপ্তাহ আগে হাসপাতালে একটি ঘরে আপনার স্ত্রীকে রাখিয়া যান। এখানে কোনও কষ্ট হইবে না। আপনারা দুইবেলা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইবেন। সঙ্গে ঘরের খাবারও আনিতে পারিবেন।' মা-বাবাকে গিয়া সব বলিলাম। মা বলিলেন—'হাসপাতালে যদি দাও সঙ্গে আমিও থাকিব।' বাবা বলিলেন 'হাসপাতালেই দেওয়াই ভালো।' ডঃ মিস হকারকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মায়ের জন্যেও তিনি একটি ঘর দিতে পারবেন কিনা। সঙ্গে একটি ছোট বোনও থাকিবে।' তিনি বলিলেন—'একটি নতুন ঘর হইয়াছে। সেখানে কোনও রোগী এখনও রাখা হয় নাই। সেই ঘরে অনায়াসে আপনার মা থাকতে পারেন।' সেখানে আমরা মাকে লইয়া গেলাম। কিন্তু অচিরেই আর একটি সমস্যা দেখা দিল। বাথরুম। সেখানে কমোড। মা অপরের ব্যবহৃত কমোডে বসিতে রাজি হইলেন না। তিন থাক ইটের মাঝখানে একটি নতুন pot দিয়া মিস হকার এ সমস্যাটা সমাধান করিয়া দিলেন অবেশেষে।

বাবা ও আমি রোজ আজিমগঞ্জ হইতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। রোজ বিকেলে আমরা নদী পার হইয়া জিয়াগঞ্জের হাসপাতালে যাইতাম। মা একদিন বলিলেন—'আমাকে এক কলসী গঙ্গাজল দিয়া যাও। মেমসাহেব যখন তখন আসিয়া বিছানাপত্র, কাপড় চোপড় ছুঁড়িয়া দিতেছেন। তাঁহাকে বারণ করা যায় না। গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইব।' গঙ্গাজল জোগাড় করা শক্ত হইল না। কিন্তু যাহা ক্রমশঃ শক্ত হইয়া উঠিল তাহা প্রত্যহ গঙ্গা পার হইয়া হাসপাতালে যাতায়াত করা। গঙ্গা পার হইয়া হাঁটিয়াই সেখানে যাইতাম। আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম, বাবার উৎসাহ কিন্তু অদম্য। তখন বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। রাস্তায় জল-কাদা। রোজই গিয়া শুনি 'ব্যথা' ধরে নাই। মিস হকার যে তারিখ ঠিক করিয়াছিলেন তাহা উত্তীর্ণ হইয়া আরও চার-পাঁচদিন

কাটিয়া গেল। তখন মিস হকার বলিলেন আর বেশী দেরী করা ঠিক নয়। Labour induce করিতে হইবে। অর্থাৎ ঔষধ খাওয়াইয়া এবং ইনজেকশন দিয়া 'ব্যথা' জাগাইতে হইবে। তখন 'সিজরিয়ান' করিবার কথা সহজে কেহ ভাবিত না। মিস হকার আশঙ্কাপ্রকাশ করিলেন বেশী দেরী করিলে ছেলের মাথা শক্ত হইয়া যাইবে। প্রসব করিতে কষ্ট হইবে খুব। সুতরাং Labour induce করাই স্থির হইল। মিস হকার বলিলেন 'কাল সকালেই Castor Oil এবং কুইনিন খাওয়াইয়া দিব। তাহার পর প্রয়োজন হইলে Pituitrin ইনজেকশন দিব। আপনারা বিকালে আসিয়া দেখিবেন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।' সকালে আমার আসিবার উপায় ছিল না, কারণ সকালে আমারও হাসপাতালের ডিউটি। রোগীর ভীড়ও প্রচুর। বারোটার আগে হাসপাতাল ছাড়িয়া আসা সম্ভবই ছিল না। বাবা যাইবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন। হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া খাওয়াদাওয়া সারিতেই দুইটা বাজিয়া গেল। একটু বিশ্রাম করিয়া বেলা চারটা নাগাদ আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। অকালেও বেশ মেঘ ঘনাইয়া আসিল। আমরা যখন নৌকোয় তখনই টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে অবশ্য ছাতা ছিল, কিন্তু ওপারে গিয়া যখন পৌঁছিলাম বৃষ্টি বেশ জোরে নামিল। ছাতায় কুলাইল না। আমরা দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া অবশেষে হাসপাতালের পিছনে একটা গাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছিতে পরিলাম না। গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম। এক পশলা প্রবল বর্ষা হইয়া গেল। খানিকক্ষণ গাছতলায় দাঁড়াইয়া আপাদমস্তক ভিজিয়া ছপ-ছপ করিতে করিতে আমরা শেষে হাসপাতালের দিকেই অগ্রসর হইলাম। সেখানে গিয়া খবর পাইলাম, তখনও কিছু হয় নাই। শুনিলাম লীলাকে ডেলিভারি রুমে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। খুব ব্যথা শুরু হইয়াছে। ডক্টর নিউস, ডক্টর হকার এবং আর একজন বিলাতী সিস্টার সেখানে আছেন। ভিজা কাপড়ে আমরা দুইজন খানিকক্ষণ ভিজিটার রুমে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু আশঙ্কা হইল আমাদের হয়তো ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। তাই আর অপেক্ষা না করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে উঠিয়াই আবার আমরা হাসপাতালে গেলাম। শুনিলাম আমরা চলিয়া আসিবার পরই একটি মেয়ে হইয়াছে। ডক্টর হকার্স হাসিয়া আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন—'দেখবেন আসুন, কেমন গোলগাল মেয়ে হয়েছে।' শ্রাবণমাসে হইয়াছিল বলিয়া মেয়ের নাম রাখিলাম কেয়া। আঁতুরের সংস্কার ছিল

বলিয়া মা কেয়াকে ছুঁইতেন না। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেন। মিস হকার একদিন আমাকে বলিলেন—মেয়ে হইয়াছে বলিয়া কি আপনার মা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? তিনি তো নাতনীকে একদিনও কোলে করিতেছেন না। তখন তাঁহাকে আঁতুর-রহস্য বিস্তৃত করিয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন আপনাদের নিয়মটি খারাপ নয়—ভালো। মাসখানেক নবজাতককে বা প্রসূতিকে বাহিরের লোকের সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া রাখাই উচিত। কয়েকদিন পরে হাসপাতাল হইতে কেয়াকে বাড়িতে লইয়া আসিলাম। শাঁক বাজানো হইল। মেয়ে হইলে শাঁক বাজানো হইবে না এ নিয়ম আমি উঠাইয়া দিলাম।

প্রথম পিতৃত্বের একটা বিশেষ অনুভূতি আছে। সদ্যোজাত কন্যাটির কছেই মন সর্বদা পড়িয়া থাকিত। তাহার দেয়ালা করা, তাহার কান্না-হাসি, তাহার হাত-পা ছোড়া একটা অপরূপ সৌন্দর্য-লোকে লইয়া গেল আমাকে। একটা সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধও সঞ্চারিত হইল মনের ভিতব। যে প্রাণীটিকে সংসারে আনিয়াছি তাহার ভবিষ্যৎ যে আমার উপরই নির্ভর করিতেছে। এ বিষয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই যেন একটু সচেতন হইলাম। আমার ভাইরা একে একে খবর পাইয়া আজিমগঞ্জে আসিয়া হাজির হইল। আমার আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। রাঁধুনী রাখিতে পারি নাই। লীলাকে রাঁধিতে হইত। মা সাহায্য করিতেন। এতগুলি লোকের রান্নাবান্না করা এবং তাদের নানাবিধ দাবী মিটানো সহজসাধ্য নয়। তবু কি আনন্দে যে সে দিনগুলো কাটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। আনন্দের জন্যে বাহিরের উপকরণ বেশী প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন সকলের মনের সহৃদয়তার। সে সহৃদয়তা না থাকলে আনন্দের ঐকতান বাজে না। আমাদের পরিবারে সে সহৃদয়তা তখন ছিল। ভগবানের আশীর্বাদে এখনও আছে। আজিমগঞ্জের নিকটেই মুর্শিদাবাদ, সেই মুর্শিদাবাদ যেখানে মুর্শিদকুলী খাঁ হইতে মিরজাফর ও আরো অনেকের লীলাখেলা রঙ্গভূমি, যে মুর্শিদাবাদে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরেজদেব গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিয়া অসমর্থ বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল সিরাজকে চরম শাস্তি দিয়াছিলেন পলাশীর প্রাঙ্গণে এই মুর্শিদাবাদ দেখিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলেই দফায় দফায় সেখানে গেল এবং হাজারদুয়ারীর সঙ্গে অনেক কবরখানা দেখিয়া আসিল। দেখিয়া আসিল সিরাজের সমসাময়িক ইতিহাসে যে মহিলাটি সত্যিই মহীয়সী ছিলেন সেই লুৎফুন্নিসার কবরটি বড়ই অযত্নে, বড়ই অবহেলায় পড়িয়া আছে। কিছুদিন পর তাহা বিলুপ্ত হইবে।

আজিমগঞ্জে যখন ছিলাম তখন একটি অপরূপ উৎসবও দেখিয়াছিলাম। ইহা 'বেড়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিল তখন। জানিনা এ উৎসব এখন আর হয় কিনা। ভাদ্রমাসের শেষের দিকে—সম্ভবতঃ পূর্ণিমায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। সন্ধ্যার পর ভাদ্রমাসের ভরা-গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া আমোদ-আহ্লাদে মত্ত বহুলোক সেদিন গঙ্গাবক্ষে বিহার করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িত। কল্পনা করুন—কূলে কূলে ভরা গঙ্গা শারদ-জোৎস্নায় উদ্ভাসিত। তাহার উপর অনেক সুসজ্জিত আলোকিত নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। কোনটি হইতে হাসির হররা শোনা যাইতেছে, কোনটি হইতে বা গান। কোন বড় নৌকায় নাচও হইতেছে, নটীর নূপুরের শব্দও শোনা যাইতেছে মাঝে মাঝে। সারেঙ্গী এবং তবলচির বাজনাও। আধো-আলো অন্ধকারে সুরলোকের আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন। সব নৌকাই ভাসিয়া চলিয়াছে মুর্শিদাবাদের ঘাটের দিকে। সেখান হইতেই নবাবের নৌকা ভাসিত। সেই নৌকাটিকে সম্বর্ধনা করিবার জন্যেই এতগুলি নৌকার সানন্দ অভিযান।

কেয়ার বয়স তখন একমাস। মা এ ধরণের হুজুকে খুবই উৎসাহী ছিলেন। বলিলেন 'তুই একটা বড় নৌকা ঠিক কর। আমরা বেড়া দেখতে যাব। সব্বাই যাব। ছই-দেওয়া নৌকা ভাড়া করিস, তোর মেয়েকে ছইয়ের তলায় ঢাকাঢুকি দিয়ে রেখে দেব, ঠাণ্ডা লাগবে না।'

ঠিক করিলাম একটা নৌকা। গঙ্গাবক্ষে অনেক নৌকার সহিত আমাদের নৌকাও ভাসিল—ভাসিতে ভাসিতে আমরাও মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চারিদিকে গান-বাজনা, আনন্দ-কলরব শোনা যাইতেছে নানা নৌকা হইতে। কিন্তু নবাবের নৌকা কই? সকলেই উদগ্রীব হইয়া আছি। ক্রমে ক্রমে একটি বিরাট হর্ম্ম্য যেন নদীবক্ষে ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিল। তাহার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে আলো জ্বলিতে লাগিল একে একে। নানা রঙের আলো সমস্তটা যখন আলোকিত হইয়া উঠিল তখন মনে হইল ইহা যেন নৌকা নয়, একটা অপূর্ব আবির্ভাব। মুর্শিদাবাদের নবাবরা যখন প্রকৃত নবাব ছিলেন তখন এই উৎসব নাকি আরও জাঁকজমকের সহিত হইত। সে যুগের বড়লোকরা পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকা বাহির করিতেন। শারদ-পূর্ণিমায় ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় উপর স্বপ্নের রূপকথালোক মূর্ত হইয়া উঠিত। রাত বারোটা পর্যন্ত এই শোভা দেখিতাম আমরা।

ইহার কিছুদিন পরেই একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। রাধিকাবাবুর কথাই

আগেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি একজন রিটায়ার্ড ডাক্তার, আমাদের বাড়ীর কাছেই তিনি থাকিতেন। বাবার সহিত খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ বৈকালে আসিয়া বাবাকে লইয়া বাহির হইতেন। একদিন লক্ষ্য করিলাম আমার বাড়ির পাশ দিয়া যে রেললাইন চলিয়া গিয়াছে, সেই রেললাইনের পাশ দিয়া উভয়ে রোজ আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশনের দিকে যান। বাবাকে বলিলাম রেললাইনের কাছ দিয়া বেড়াইতে যাওয়াটা নিরাপদ নহে। রোজই সেইপথে বেড়াইতে যাইতেন। আমার পোষা কুকুর ঝুনুটাও তাঁহাদের পিছু পিছু যাইত। তাহার প্রবণতা ছিল দুইটি রেলের ঠিক মাঝখান দিয়া চলিবার। সেদিন বাবা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন একটি ট্রেণ আসিতেছে। ঝুনু লাইনের ভিতর রহিয়াছে। বাবা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য লাইনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। তাহার পরই দুর্ঘটনা।

আমি তখন গঙ্গার ওপারে জিয়াগঞ্জে একটি রোগীর বাড়ি বসিয়া রোগী দেখিতেছিলাম। একজন উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া খবর দিলেন, আপনি শীঘ্র চলুন, আপনার বাবা রেলে চাপা পড়িয়াছেন। বাঁচিয়া আছেন কিনা বলিতে পারি না। আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পৌঁছিলাম। দেখিলাম রেলের পাশে লোকে লোকারণ্য। ভীড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বাবা মাটিতেই রেলের পাশে চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার মাথায় রক্ত। আমি ঝুঁকিয়া যখন তাঁহার নাড়ী দেখিতে গেলাম বাবা চোখ খুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। বলিলেন 'আমার মাথায় কিছু আঘাত লেগেছে, আর বুকের পাঁজর ভেঙে গেছে। আর বিশেষ কিছু হয় নি। ওরা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিল হাসপাতালে, আমি যাই নি। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি একটা স্ট্রেচার আনাও।'

একটি স্ট্রেচার আনাইয়া অতি সাবধানে বাবাকে ধীরে ধীরে বাড়িতে লইয়া গেলাম। শহরের প্রবীণ ডাক্তারদের ডাকিলাম। তাঁহারা বলিলেন—মাথার একজায়গার খানিকটা চামড়া কাটিয়া গিয়াছে। সেটা stitch করিয়া দেওয়া হইল। দেখা গেল পাঁজরের তিনটি হাড় ভাঙিয়াছে। যথারীতি strat করিয়া দিলেন। তাঁহাকে Antifutanic injection এবং মর্ফিনও দেওয়া হইল। বাবা যে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়াছেন ইহাতেই আমরা সবাই আশ্বস্ত হইলাম। বাবা কিন্তু বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া ঘুমাইতে পারিতেছেন না। তখন তাঁহার জন্যে একটা ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করিলাম। ইজিচেয়ারের আশে-

পাশে বালিস গুঁজিয়া দিবার পর বাবা আরাম-বোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রে ঘুমও হইতে লাগিল। বাবার সঙ্গে গল্প করিবার জন্যে রাধিকাবাবু প্রায় প্রত্যহ আসিতেন। আরও আসিতেন অনেকে। চা-জলখাবার সরবরাহ করিতে লাগিল লীলা। তাহার খাটুনি খুব বাড়িয়া গেল কিন্তু কাঁচা পোয়াতির পক্ষে যেসব নিয়ম পালন করা উচিত তাহা পালিত হইতেছিল না। ফলে লীলা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। কেয়া প্রচুর মাই-দুধ খাইত, তাহার স্বাস্থ্যের কোন অসুবিধা হয় নাই। লীলার দুর্ব্বলতা তখন ধরা পড়ে নাই, বাবাকে লইয়া এবং আমার কাজকর্ম লইয়া এত ব্যস্ত থাকিত যে লীলার দিকে মন দিবার অবসর পাইতাম না। বেশী মনোযোগ দিবার উপায়ও ছিল না। মা ছিলেন সেখানে। আমি লীলার ঔষধপত্র, খাওয়াদাওয়া লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে মা যদি কিছু মনে করেন এ সঙ্কোচও ছিল। লীলাকে কেবল এক বোতল উইনকারনিস্ (win-carnis ) কিনিয়া দিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। বাবাকে লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন। কারণ বাবার ডায়াবিটিস ছিল। যাহা হোক, ভগবানেব কৃপায় বাবা ক্রমশঃ ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরা সে সময় খুব সাহায্য করিয়াছিল। বাবা তাহাদের ভদ্রতায় খুব মুগ্ধ হইলেন। আমাকে বারবার বলিতে লাগিলেন 'জায়গাটি খুব ভাল। তুমি এখানেই থাকিয়া যাও। এখানে তোমার সুনাম হইয়াছে, এখানেই ক্রমশঃ প্র্যাকটিশ জমিয়া যাইবে। প্র্যাকটিশ জমিয়া গেলে চাকরি ছাড়িয়া দিও। এ অঞ্চলে ল্যাবরেটারি নাই, তোমার ল্যাবরেটারি ভালোই চলিবে।' শুধু বাবা নয়, অনেকেই আমাকে এ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমনকি আমাদের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর সুরেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ এবং তাঁহার দাদা পান্নালাল সিংহও বলিতে লাগিলেন আমরা ভবিষ্যতে তোমার উন্নতি করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। তুমি থাকিয়া যাও। লীলার কিন্তু এই আজিমগঞ্জে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না, আমার তো ছিলই না। আজিমগঞ্জে দুচারিজন লোক খুবই ভদ্র ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই ছিল নিম্নস্তরের। নানারকম চক্রান্ত, দলাদলি লাগিয়াই থাকিত। সেখানে বড়লোক ছিলেন কেঁইয়েরা, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজাসাহেব। তিনি ছিলেন আমাদের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দুইজনকে কেন্দ্র করিয়া আজিমগঞ্জের রাজনীতির ঘোঁট চলিত। অনেকে আমাকেও একটা ঘোঁটের মধ্যে টানিবার চেষ্টা করিতেন। আমি কিন্তু কোন দলেই যাইতে চাহিতাম না, এ জন্যে উভয়দলেরই বিরাগভাজন

হইতেছিলাম ক্রমশঃ। মোট কথা আজিমগঞ্জের আবহাওয়াটা ভালো লাগিতেছিল না। ঠিক করিলাম বাবা একটু ভালো হইলে এক বছরের ছুটি লইয়া আজিমগঞ্জ হইতে সরিয়া পড়িব, আর ফিরিব না। বাবা যখন সুস্থ হইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাকে বলিয়া একদিন ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিলাম। আমার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া বাবা আমাকে আর আজিমগঞ্জে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না। বলিলেন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। ঠিক করিলাম, ভাগলপুরে গিয়া বসিব। মণিহারীর কাছে ভাগলপুরই সবচেয়ে বড় শহর। ডিভিশনাল হেড-কোয়ার্টার্সে অনেক ডাক্তার। ল্যাবরেটরি করিবার পক্ষে লোভনীয় শহর। ছেলেদের দুইতিনটি হাইস্কুল, মেয়েদের, ছেলেদের কলেজ—সব আছে। বাবা ইহাতে মত দিলেন। ঠিক হইল আমরা আজিমগঞ্জ হইতে প্রথমে মণিহারী যাইব। তাহার পর মণিহারী হইতে আমি ভাগলপুর গিয়া সেখানকার ডাক্তারদের সহিত আলাপ করিব। সেখানকার কোনও ডাক্তারকেই আমি চিনিতাম না। সেখানকার একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ। বাবার সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। ঠিক হইল বাবার নিকট হইতে চিঠি লইয়া তাঁহার সহিত প্রথম দেখা করিব।

আমি আজিমগঞ্জ হইতে যেদিন চলিয়া আসি সেদিন সত্যই বুঝিলাম কত লোক আমাকে ভালবাসিত। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিল আমি আবার যেন আজিমগঞ্জে ফিরিয়া আসি।

আজিমগঞ্জে আর ফিরিয়া যাই নাই।

আমার তৃতীয় ভাই টুলু (গৌরমোহন) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পাটনার টেম্পল্ মেডিকেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়াছিল। আমি যখন আজিমগঞ্জে ডাক্তার, সে তখন মণিহারীতে বাবার জায়গায় চাকরি করিতেছে। সে আমার চেয়ে চার বছরের সিনিয়র। আমি যখন আজিমগঞ্জে ছিলাম তখন সে আমার ল্যাবরেটরির জন্য একটি ছোট 'অটোক্লেভ' কিনিয়া দিয়াছিল। কলিকাতায় ছোট 'অটোক্লেভ' পাই নাই।

আমার পরের ভাই ভোলা নন-কো-অপারেশন করিয়া অনেকদিন বাড়িতে বসিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী ছিল সে। কিন্তু চার পাঁচ বৎসর বাড়িতে বসিয়া আমাদের জমির তদারক করিয়া কাটাইয়া দিল। অবশেষে মা-বাবার আগ্রহাতিশয্যে এবং বাবার এক প্রাক্তন সিভিলসার্জন জন সাহেবের আনুকূল্যে ভোলা কটক মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হইল। আমি যখন আজিমগঞ্জ ছাড়িয়া

চলিয়া যাইতেছি সেই সময় ভোলাও কটক হইতে পাশ করিয়া ফেলিল। শুধু পাশই নয়, সব বিষয়ে ভোলা ফার্স্ট হইয়া পাশ করিল। নন্ কো-অপারেশনের হুজুকে পড়িয়া জীবনের অমূল্য কয়েকটা বৎসর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে ডাক্তার হইয়া বাহির হইল এবং ভাগলপুর সদর হাসপাতালে সেকেণ্ড মেডিকেল অফিসারের চাকরি পাইল। টেম্পোরারি চাকরি। ভাগলপুর সদর হাসপাতালে মাত্র ছমাসের জন্য ঐ পোষ্টটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন ভাগলপুর মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষরা। ভোলা হাসপাতালে একটি কোয়ার্টার পাইয়াছিল। আমি যখন ভাগলপুরে গেলাম তখন ভোলার সেই কোয়ার্টারে গিয়া উঠিলাম। লীলা মণিহারীতে ছিল।

## ভাগলপুর

ভাগলপুরে গিয়া প্রথমে দেখা করিলাম ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষের সহিত।

দেখিলাম তাঁহার বিরাট প্র্যাকটিশ। তাঁহার বাড়ির সামনের সমস্ত রাস্তাটা গাড়িতে গাড়িতে ভর্তি। অধিকাংশই ঘোড়ারগাড়ি এবং টমটম। লোকের ভিড়ও প্রচুর। মোহিনীবাবু আমাকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন। বলিলেন—'এখানে ভালো ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি নেই, আপনি আসুন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সাহায্য আমি পাই নাই। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। ভাগলপুরের অন্যান্য বড় ডাক্তারদের সহিত দেখা করিলাম। ডাক্তার অমূল্যচরণ ঘোষ, ডাক্তার মহীউদ্দিন আমেদ, ডাক্তার ক্ষিতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, ভব ডাক্তার, (ভাল নাম মনে নেই।) ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ নিয়োগী (দাও ডাক্তার) এবং আরো অনেকের সহিত দেখা করিয়া আমার আগমনবার্তা জানাইলাম। সকলেই আমাকে আশ্বাস দিলেন সাহায্য করিব। সকলের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়া বাজারের ভিতর একটি ঘর খুঁজিতে লাগিলাম। অবশেষে একটি মনোমত ঘর পাওয়া গেল খলিফাবাগে। একপাশে সি. এল. বড়ুয়া ডেন্টিস্ট এবং আর একপাশে চনচনিয়াদের ইলেকট্রিক্যাল গুডস্-এর দোকান। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি হল। ল্যাবরেটরির নামকরণ হইল—The Sero Bactro Clinic। একটি প্রকাণ্ড কাঁচের উপর সাদা পশ্চাৎ-ভূমির উপর লাল অক্ষরে নামটি লিখাইলাম। তাহার পর সেই কাঁচটি লাগাইয়া দিলাম একটি বড় কাঠের বাক্সের উপর। বাক্সের ভিতর একটি বড় ইলেকট্রিক

বাল্‌বও দিলাম। একজন মিস্ত্রিকে দিয়া অনেকগুলি কাঠের র‍্যাক তৈয়ারী করাইয়া সেগুলি দেওয়ালে আটকাইয়া দিলাম। তাহার উপর রাখিলাম আমার ল্যাবরেটরির Reagentsগুলি। গোটা দুই টেবিল এবং গোটা চারেক চেয়ারও কিনিতে হইল। 'হল'-টি প্রকাণ্ড। ঘন সবুজ রঙের কাপড় দিয়া ঘিরিয়া সেই হলের ভিতর একটি ছোট আপিসঘরও বানানো হইল। সেটিও টেবিল, চেয়ার এবং শৌখীন একটি টেবিলল্যাম্পে ভূষিত হইল। চমৎকার লিখিবার ঘর হইল একটি। টেবিলটি বেশ বড়, সেকালের টেবিল, চারদিকে ড্রয়ার দেওয়া, উপরে রেকসিন আঁটা। টেবিলটি বাবার বন্ধু অনুকূল জ্যাঠামশাই আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। বেশ বড় প্রকাণ্ড টেবিল। সেটি আমার নিকট এখনও আছে। সেই টেবিলের একধারে একটি ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারও আমদানী করিলাম। টেবিলের উপর একধারে রহিল আমার Report-এর ছাপানো Formগুলি। আর একধারে ফুলদানী, কিছু বই এবং সাদা কাগজ। একটি ফাউণ্টেন পেন ছিল আমার তখন। পরে Swan এবং তাহার পর Waterman কিনিয়াছিলাম। ভালো কলম কেনার সখ আমার চিরকাল। কলমের পিছনে অনেক অর্থব্যয় করিয়াছি। অনেক ভালো ভালো পেনও উপহার পাইয়াছি। কিন্তু হারাইয়াছি এবং ভাঙিয়াছিও অনেক। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানটির অনুকরণে বলিতে ইচ্ছা করে—

পেনগুলি মোর হাতের মুঠোয় রইল না
সেই যে আমার নানারঙের পেনগুলি
মোর আঙুলের চাপ যে তারা সইল না
সেই যে আমার নানা রঙের পেনগুলি।

অবান্তর কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। এবার আসল কাহিনীতে ফিরিয়া আসা যাক্। আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র কেনাই ছিল। সেগুলি আনিয়া ল্যাবরেটরি সাজাইয়া ফেলিলাম। বহাল করিলাম মুন্নি মেথরকে। সেই আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করিল। তাহার একটি বৈশিষ্ট ছিল—যদিও গাঁজা খাইত কিন্তু বড় বাধ্য ছিল যে। চোখদুটি সর্বদাই লাল, কিন্তু সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ। ডাকিবামাত্র সাড়া দিত। সন্ধ্যার পর রোজ তাড়ি খাইত সে। তাহাকে একদিন উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম—কেন ওই সব ছাইপাঁশ খেয়ে পয়সা লোকসান করিস। সে বলিল—আমরা গরীব, আপনাদের মত দামী সিগারেট কিনিবার পয়সা নাই আমাদের। তাই সস্তা নেশা করি। আর নেশা না

করিলে কি লইয়া থাকিব। তাহার উত্তর আমাকে নীরব করিয়া দিল। আমি হাসিয়া তাহাকে একটা কাঁচি সিগারেট দিলাম।

সব গুছাইয়া গাছাইয়া সেদিন ল্যাবরেটরি খুলিব ঠিক করিলাম। দেখা গেল সেদিনটি কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। বাজার হইতে একটি লক্ষ্মীর পট কিনিয়া ল্যাবরেটরিতে টাঙাইয়া দিলাম; আর টাঙাইয়া দিলাম আমার মাস্টারমশাই চারুব্রত রায়ের ফটোখানি। সেইদিনই ক্ষিতীনবাবু আমাকে একটি 'কেস' ও পাঠাইলেন। একটি stool। সেই দিনই নগদ চারটাকা উপার্জন করিলাম। প্রতিবছর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন এই পটটিকে আমরা অর্চনা করিয়া আসিয়াছি। এখনও করি। ভাগলপুরে আমার ল্যাবরেটরিজীবন শুরু হইয়া গেল। তখনও আমি ভাগলপুর সদর হাসপাতালে ভোলার কোয়ার্টারে থাকি। একটি বুড়োগোছের চাকর আমাদের তত্ত্বাবধান করে। চাকরটার পাকা গোঁফ ছিল, সেটি সে পাকাইয়া শিঙের মত উদ্যত করিয়া রাখিত। ভোলার বাসায় থাকিবার সময় আমি দুইটি বড় বড় শাদা খরগোস কিনিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল একটি ভেড়া এবং কিছু গিনিপিগ কিনিয়া 'ভাসারম্যান' পরীক্ষার ব্যবস্থা করিব। একদিন ল্যাবরেটরি হইতে ফিরিতেই ভোলার সেই বৃদ্ধ চাকরটি অদ্ভুত ভাষায় বলিল, 'বাবু সোব সাফ হয়ে গেলো।' প্রথম বুঝিতে পারি নাই, পরে দেখিলাম খরগোস দুইটি কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তখনকার মত 'ভাসার-ম্যান' পরীক্ষা স্থগিত রাখিতে হইল। আরও দুর্ঘটনা ঘটিল। হাসপাতালে কুক্ (Cook) সাহেব নামে একজন সিভিলসার্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আগেও নাকি এখানে ছিলেন। গুজব শুনিলাম তাঁহারই খুঁটির জোরে মিসলাল নামক একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা ওখানকার মেয়ে হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া আছেন। সকলে বলিত মিসলালের ডাক্তারী কোন ডিগ্রী নাই। কুক্ সাহেবের জোরেই তিনি চাকরিটি পাইয়াছেন। ইহাও শুনিলাম মিসলালের নেক-নজরে পড়িলে কুক্ সাহেবের কৃপা পাওয়া যায়। মনে হয় ভোলা মিস্-লালের নেক-নজরে পড়িবার চেষ্টা করে নাই। সুতরাং কুক্ সাহেব ভোলার উপর খুব প্রসন্ন হইলেন না। একদিন শুনিলাম ভোলা হাসপাতালে যে সেকেণ্ড মেডিকাল অফিসাররূপে ছিল সেই সেকেণ্ড মেডিকেল অফিসারের পোষ্টটি নাকি কুক্ সাহেব বাতিল করিয়া দিবেন। আমি তখন উঠিয়া পড়িয়া একটি বাড়ি খুঁজিতে শুরু করিলাম।

লীলা মণিহারীতে গিয়া একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। আমার শ্বশুরমহাশয়

মণিহারীতে আসিয়াছিলেন কেয়াকে দেখিতে। তিনি লীলাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেলেন, চিকিৎসার জন্তে। সেখানে ডাক্তার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় লীলা অনেকটা ভালো হইল।

আমার তখনকার লেখা লীলাকেই নানাভাবে চিঠি লেখা। চিঠি কখনও গদ্যে, কখনও কবিতায়। কবিতার অনেক চিঠি আবার রঙীন করিয়াও দিতাম।

ভোলার চাকরিটা অবশেষে গেল। মণিহারী হইতে চিঠি পাইলাম আমি যেন লীলাকে কলিকাতা হইতে লইয়া আসি। ভোলা মণিহারী চলিয়া গেল। আমি কলিকাতায় গিয়া শুনিলাম পরিমল কেয়ার একটি ফটো তুলিয়াছে। কেয়ার বয়স তখন চার-পাঁচমাস। ছবিটি এখনও আমাদের কাছে আছে, নষ্ট হয় নাই।

লীলাকে মণিহারীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আমি আবার ভাগলপুরে ফিরিলাম। একটি বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আসিয়াই ভাগ্যক্রমে দুই-একদিনের মধ্যেই বাড়ি পাইয়া গেলাম একটা। ভিখনপুরের একটি গলিতে। বাড়িটির নানারকম অসুবিধা। বাড়িতে কল নাই, রাস্তা হইতে জল আনিতে হয়। একটা কুয়াও আছে, সেটাও বাহিরে। বাড়িটি পাকা। রান্নাঘর ছাড়া বোধ হয় গোটাতিনেক শোয়ার ঘর ছিল। বাহিরে বারান্দাও ছিল। আমার ল্যাবরেটরি হইতে হাঁটাপথে প্রায় পনেরো মিনিট। ইলেকট্রিক আলো নেই। এ সব সত্ত্বেও বাড়িটা ভাড়া করিয়া ফেলিলাম।

লীলার জন্য আটটাকা খরচ করিয়া একটি বড় আয়না কিনিলাম। ফুলদানী কিনিলাম। স্নো, পাউডার কিনিলাম। আর কিনিলাম কয়েকটি ছবি। একটি সরস্বতী, একটি বিবেকানন্দের। একটি টেবিল এবং দুইটি চেয়ারও কিনিতে হইল। ইজিচেয়ারে শোওয়া আমার বিলাস, সুতরাং একটি ক্যাম্পের ফোলডিং ইজিচেয়ারও কিনিলাম। শুইবার চৌকি, জল রাখিবার জন্তে বড় একটি টিনের পাত্র এবং আরও খুঁটিনাটি জিনিস কিনিয়া আমার ভাগলপুর-বাসের প্রথম ভাড়াটে বাসাটি যথাসম্ভব মনোরম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম। পরে অবশ্য প্রয়োজন-মতো আরও নানা আসবাব খরিদ করিতে হইয়াছিল। ভাগলপুরে যখন প্রথম বাসা করি তখন আমার বাসায় ভোলা তো ছিলই, কারণ চাকুরিটি যাইবার পর তাহাকে হাসপাতালের বাসাটি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ভোলা ছাড়া ছিল কালু আমার পঞ্চম ভ্রাতা। কালু ওখানে কলেজে ভরতি হইয়া আই. এস. সি. পড়িতেছিল। আর ছিল জয়া, আমার মামাতো ভাই। সেও কলেজে ভর্তি

হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ছিল টুলু আমার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা, সে ভরতি হইয়াছিল সি. এম. এস. স্কুলে। সুতরাং শুরু হইতেই আমাকে অনেকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব লইতে হইয়াছিল। লইবারই কথা, কারণ আমি বাবার বড় ছেলে। ভগবান সহায় ছিলেন। প্র্যাকটিশ করিয়া মাসে তিনচারশো টাকা রোজগার হইতে লাগিল।

ভাগলপুরে ভাগলপুর ইনস্‌টিটিউট নামে একটি পুরাতন ক্লাব ছিল। তাস, বিলিয়ার্ডস, টেনিস প্রভৃতি খেলা হইত। কিন্তু ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্লাবের লাইব্রেরীটি। অনেক ভালো ইংরাজী বই ছিল সেখানে। এইটিই আমার প্রধান আকর্ষণ হইল—আমি উক্ত ক্লাবের মেম্বার হইলাম। যতদূর মনে পড়িতেছে শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় মহাশয়ই আমাকে ক্লাবে লইয়া গিয়া মেম্বার করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় ছিলেন একজন কৃতবিদ্য সাহিত্যরসিক ব্যক্তি। আমার 'বনফুল' পরিচয় জানিবামাত্র তিনি আমার কাছে আসিয়া আলাপ করিলেন। যতদিন ভাগলপুরে ছিলাম ততদিন তাঁহার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এখনও আছে। তিনি এখনও ভাগলপুরে ওকালতি প্র্যাকটিশ করিতেছেন। আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং চাক্ষুষ মিলন আজকাল আর হয় না। মানসিক বন্ধুত্বটা কিন্তু এখনও অটুট আছে।

অমূল্যবাবুর সহিত প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ক্লাবে দেখা হইত। ক্লাবের ছাদটি খুব মনোরম ছিল। সেখানে চেয়ার বিছাইয়া অনেকের সহিত গল্পগুজব করিতাম। সেইখানেই 'নন্দ'-বাবু উকীল এবং আশু দের (বিখ্যাত Asude) সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত আশু দে-ও উকীল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি ছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে 'Patter' লেখার জন্য। আশুবাবুও কৃতবিদ্য (এম. এ. বি. এল.) এবং গুণী লোক ছিলেন। ভালো ম্যাজিক দেখাইতে পারিতেন, ভালো থিয়েটার করিতেন, বাংলায় 'ত্রয়ী' নামে একটা নাটকও লিখিয়াছিলেন। শনিবারের চিঠিতে দুই একটা ব্যঙ্গরচনাও লিখিয়াছিলেন বোধ হয়। মানুষ হিসাবেও তিনি অদ্ভুতচরিত্রের লোক ছিলেন। কথাবার্তা বলিবার ধরণ, চাল-চলন, এমন কি জামার 'কোট' পর্যন্ত অসাধারণ ছিল তাঁহার। অচিরেই আমার সহিত তাঁহার খুব ভাব হইয়া গেল। ভিখনপুরে আমার বাড়ির কাছেই তাঁহার বাড়ি ছিল। যেদিন ক্লাবে যাইতাম না সেদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়া আড্ডা জমাইতাম। খুব ভালো চা খাওয়াইতেন। বাড়ির সংলগ্ন ছোট একটি আলাদা বাড়ি ছিল তাঁহার। সেখানেই পড়াশুনা

করিতেন, সেখানেই মক্কেলদের সহিত আলাপ করিতেন। সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবদের সহিত আড্ডা দিতেন সেইখানে। তাঁহার এই বাড়িতে পারিবারিক ঝামেলা, গোলমাল, কচকচি কিছুই ছিল না। অথচ পারিবারিক সুখ-সুবিধা ভোগ করিবার ষোল আনা বন্দোবস্ত ছিল। আশুবাবু বাড়ির কাছে থাকিয়াই বাণপ্রস্থের আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমি মাঝে মাঝে গিয়া এই বাড়িতে তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতাম।

কিছুদিন পরে আর একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত অকস্মাৎ আলাপ হইয়া গেল আমার ল্যাবরেটারিতে। তিনি নিজের ইউরিণ পরীক্ষা করাইতে আসিয়াছিলেন। ডেন্টিস্ট চুনীলাল বড়ুয়া আমার পাশেই থাকিতেন। তিনিই আসিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন—ইনি বরাবির ডাক্তার ভুবনবাবু। তাঁহার ইউরিণ পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট লিখিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি আমাকে 'ফি' দিতে গেলেন। ফি লইলাম না। বলিলাম 'আপনি ডাক্তার, আপনার নিকট হইতে 'ফি' লইতে পারি না। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই আমি কৃতার্থ হইব। শুধু আপনার নয়, আপনার পরিবারের সমস্তরকম ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ভার আমি লইলাম। আপনি কি এখনও চাকুরি করিতেছেন?' ভুবনবাবু উত্তর দিলেন—করিতেছি। আমার যাঁহারা মালিক তাঁহারা বলিতেছেন আপনি অবসরগ্রহণের পূর্বে আপনার মনোমত একজন লোক আপনার জায়গায় বসাইয়া দিলেই আপনার ছুটি। কিন্তু মনোমত লোক এখনও পাই নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিরূপ লোক আপনি চান?' ভুবনবাবু বাঁধানো দাঁতে হাসিয়া উত্তর দিলেন 'প্রথমত চাই, লোকটি ভরদ্বাজগোত্রের হবে। অর্থাৎ মুখোপাধ্যায় তার উপাধি হবে। আমি নিজে মুখোপাধ্যায়, আমার জায়গায় একজন মুখোপাধ্যায়কেই বসাইব। দ্বিতীয়তঃ, সাব অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন হইলেই চলিবে। এম. বি. চাই না। কারণ জায়গাটা পাড়াগাঁয়ের মত। এম. বি. ওখানে টিকিবে না। আর তার পরীক্ষার ফল যতটা ভালো থাকে, ততই ভালো।'

আমি বলিলাম 'আমার একটি ভাই আছে। উপাধি মুখোপাধ্যায়। সে কটক মেডিকেল স্কুল হইতে প্রত্যেক সাবজেক্টে ফার্স্ট হইয়া পাশ করিয়াছে। সদর হাসপাতালে সেকেণ্ড মেডিকাল অফিসারের পোস্টে চাকরি করিতেছিল, কিন্তু সে পোস্ট কিছুদিন আগে উঠিয়া গিয়াছে।'

ভুবনবাবু সাগ্রহে রাজি হইলেন। বলিলেন—'আমি আপনার ভাইকে নিশ্চয় লইব। কিন্তু আপনার ভাই খুব ভালো ছেলে। কোথাও না কোথাও

ভালো গভর্ণমেণ্ট চাকুরি পাইয়া যাইবে। বরারি জায়গাটা খুব ভালো নয়, যদিও ভাগলপুর মিউনিসিপালিটির ভিতর; ওখানে হাই-স্কুলও আছে। কিন্তু ভদ্রসমাজ বলিয়া কিছুই নাই। তিনজন জমিদার আছেন, তাঁহাদেরই সাঙ্গোপাঙ্গরা সেখানে থাকে। ডাক্তারের কোয়ার্টার্স আছে, ইনডোর হাসপাতাল আছে, আউটডোর তো আছেই। রোগীও ভালো হয়। কিন্তু আমি সেখানে আমার পরিবার রাখি নাই। খঞ্জুরপুরে আলাদা বাড়ি করিয়া সেখানেই থাকি। সকালবেলা খাইয়া হাসপাতাল যাই, সমস্তদিন সেখানেই থাকি, রাত্রে চলিয়া আসি। বরারির সবাই ভালো, কিন্তু সমাজ বলিতে কিছুই নাই। দেখুন, আপনাদের যদি পছন্দ হয়, আমি আপনার ভাইকে চাকরিটি করিয়া দিব।'

বাবা তখন আমার কাছে আসিয়াছিলেন। বাবাকে গিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন 'চল, জায়গাটা দেখিয়া আসি।' ভাগলপুর হইতে বরারি চার মাইল দূরে। একদিন একটা ছ্যাকড়াগাড়ি ভাড়া করিয়া সকালে বরারি গেলাম। বরারি হাসপাতাল গঙ্গার ঠিক উপরে অবস্থিত। দৃশ্য অতিশয় রমণীয়। বাড়ির সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। বাবা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। আমরাও হইলাম। বরারির হাসপাতালেই ভোলা অবশেষে মেডিকেল অফিসার-রূপে বাহাল হইল। তাহার সমগ্র কর্মজীবন বরারিতেই কাটিয়াছিল।

ভোলা প্রথম প্রথম আমার বাসা হইতেই বরারিতে যাতায়াত করিত। কখনও একাগাড়িতে, কখনও ট্রেনে। ভাগলপুর হইতে বরারিঘাট পর্যন্ত একটি ট্রেন কয়েকবার যাতায়াত করিত।

বরারিতে ভোলা যাওয়ার পর আরও দুইটি লোকের সহিত হৃদ্যতা হইল। তাঁহারা সেইজাতের লোক যাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার পর মনে হয় তাঁহারা অতি নিকট আত্মীয়। যে ভদ্রতা, যে বিনয়, যে আভিজাত্য, যে সহৃদয়তা আগে অনেক শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে দেখিতাম (এবং যাহা আজকাল ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে) সেই পরম রমণীয় মনুষ্যগুণেই তাঁহারা মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। প্রথমজনের নাম বিজয় বসু। ওখানকার ওয়াটারওয়ার্কসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সকলেরই তিনি বিজয়দা। অবিলম্বে আমারও বিজয়দা হইয়া গেলেন। আমাকেও তিনি বলাইদা বলিয়া ডাকিতেন। সদা-হাস্যমুখ। সকলের উপকার করিবার জন্য সদা ব্যস্ত। বৌদিও ঠিক তেমনি। তাঁহার উপর কতো জুলুম যে করিয়াছি তাহার ঠিক নাই। বিজয়দা কিছুদিন আগে মারা গিয়াছেন। বৌদি তাঁহার একমাত্র কন্যা-

সন্তান পুষুর কাছে চলিয়া গিয়াছেন। কেমন আছেন জানি না। কাছের মানুষ অন্তরঙ্গ থাকে, দূরে চলিয়া গেলে সে অন্তরঙ্গতাও লোপ পায়। ইহা অমোঘ নিয়ম। স্মৃতি কিন্তু তাহাদের এখনও ধরিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় লোকটির নাম পাঁচুগোপাল সেন। তিনি তখন ভাগলপুর জেলে **Weaving department**-এর কর্তা ছিলেন। অতিশয় অমায়িক, কৃতবিদ্য ভদ্রলোক। বিলাতফেরৎ, কিন্তু গায়ে বিলাতী গন্ধ নাই। তাঁহার স্ত্রী—আমাদের উষাদি ছিলেন তাঁহার যোগ্যা সহধর্মিণী। অবসর পাইলেই আমরা জেলখানায় তাঁহার বাসায় গিয়া আড্ডা জমাইতাম। পাঁচুবাবু শান্তিনিকেতনে গোড়ার আমলের ছাত্র। তখন ইহার নাম ছিল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। পাঁচুবাবু সে সময়কার একটি গল্প বলিয়াছিলেন। সেটি এখনও মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি রূপার বুরুশ ছিল। সেটি দিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের মাথার চুল সুবিন্যস্ত করিতেন। বালক পাঁচুগোপালের ভারি লোভ ছিল ওই বুরুশটির প্রতি এবং সুবিধা পাইলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের অগোচরে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া ওই বুরুশটি নিজের মাথায় বুলাইয়া লইতেন। একদিন ধরা পড়িয়া গেলেন হাতে-নাতে। ধরিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বলিলেন—'তুই বুঝি আমার বুরুশে রোজ মাথা আঁচড়াস্? তাই ভাবছিলাম, আমার বুরুশে কাল চুল এলো কি করে? বুরুশটা তোর খুব পছন্দ? আচ্ছা, তুই নে ওটা। তোকে দিয়ে দিলুম।'

পাঁচুবাবু সেই অমূল্য উপহারটি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমরা সময় পাইলেই পাঁচুবাবুর বাড়িতে গিয়া আড্ডা জমাইতাম। একটা সুবিধা ছিল, ডাক্তার ক্ষিতীনবাবু তাঁহাদের চিকিৎসক ছিলেন। যখনই সেখানে যাইতেন, তাঁহার মোটরে আমাদেরও তুলিয়া লইতেন। ক্ষিতীনবাবু শুধু ভালো ডাক্তারই ছিলেন না, ভালো সাহিত্য-রসিকও ছিলেন। সুতরাং আমার সঙ্গে তাঁহার একটু বেশী হৃদ্যতা হইয়াছিল। ডাক্তার হিসাবে তিনি আমার ল্যাবরেটরির বড় পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। আমাকে অনেক 'কেস' পাঠাইতেন তিনি।

ভাগলপুরের বিদ্বৎসমাজের সহিত ক্রমশঃ পরিচয় হইল। তখন টি. এন. জুবিলি কলেজে খুব ভালো ভালো বাঙালী প্রফেসর ছিলেন। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বাঙালী। রামায়ণের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। নাম ছিল হরলাল দাশগুপ্ত। বিদগ্ধ লোক। ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন মোহিনী সংখো মহাশয় এবং নিশানাথ সরকার মহাশয়, কেমিস্ট্রির ডিমনস্ট্রেটার রাখাল ভট্টাচার্য, ফিজিক্সের প্রফেসর গিরিধর চক্রবর্তী, অঙ্কের প্রফেসর গিরিজাপ্রসন্ন, নারায়ণ

বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই শুধু বিদগ্ধ ব্যক্তিই ছিলেন না, প্রকৃত ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহারা। ক্রমশঃ সকলের সহিত আমার আলাপ হইল। এ আলাপ ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। নারায়ণবাবুকে আমি দাদা বলিতাম, কারণ তাঁহাদের পরিবারের সহিত সাহেবগঞ্জ হইতেই আমার এবং কাকার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। সকলেই পরস্পরের আত্মীয়ের মত হইয়া থাকিতেন। সকলের সুখদুঃখের অংশীদার হইতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পরলোকবাসী। কিন্তু তবু অনেকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এখনও আমার যোগাযোগ আছে। অনেকে এখনও আসে আমার কাছে।

ভাগলপুরে যে বাড়িটায় প্রথম বাসা বাঁধিয়াছিলাম সেটি ছিল ভিখনপুরে। আমার ল্যাবরেটরি হইতে বেশ কিছুটা দূরে। আমাকে রোজ চারবার যাতায়াত করিতে হইত। তাহা ছাড়া বাড়িটায় আরো নানারকম অসুবিধা ছিল, জল ছিল না, দুই একটি বিরক্তিকর প্রতিবেশীও জুটিয়াছিল। তাই বাড়ি বদল করিবার চেষ্টায় ছিলাম। হঠাৎ স্টেশন রোডের উপর একটা ছোট দ্বিতল বাড়ি পাইয়া গেলাম। ভাড়া একটু বেশী, কিন্তু ল্যাবরেটরির পাশে। খরচ একটু বাড়িল, তবু বাড়িটা ভাড়া করিলাম। সে বাড়ি লইবার পর আমার ভগ্নীপতি এবং বোন ছেলেমেয়েদের লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগ্নীপতির শরীর খারাপ হইয়াছিল। আমার কাছে আসিয়াছিল চিকিৎসার জন্য। তাহারা কিছুদিন রহিল। রাঁধুনী ছিল না। লীলাকেই সব সামলাইতে হইত। আমার ল্যাবরেটরির মেথর চাকরটা বাজার প্রভৃতি করিয়া দিত। আমি ল্যাবরেটরিতে মেথরের হাতেই চা, জল সব খাইতাম। হঠাৎ একদিন বাড়ির দাইটা অন্তর্ধান করিল। শুনিলাম, পাড়ার কোন ধর্ম-প্রাণা বৃদ্ধা তাহাকে বলিয়াছেন—ওই ডাক্তারবাবুর বাড়ির সবাই ম্লেচ্ছ। মেথরের হাতে খায়। তুমি উহাদের বাড়ি কাজ করিলে তোমাকে জাতে পতিত করিবে। তুমি ওখানে কাজ করিও না। অন্য দাই জুটানো শক্ত হইল। আমি তখন বাধ্য হইয়া মেথরের বউটিকে দিয়াই বাসন মাজাইতে লাগিলাম। ভাগলপুরে তখন খাটা-পায়খানা ছিল। মিউনিসিপালিটির মেথররা পায়খানা পরিষ্কার করিত। হঠাৎ একদিন উক্ত ধর্ম-প্রাণা বৃদ্ধার বাড়ির সকলে বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদের পায়খানা পরিষ্কার হইতেছে না। দুর্গন্ধে বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে। আমাকে আসিয়া বলিলেন—'আপনার তো মেথর চাকর, আপনি যদি কোন ব্যবস্থা করে দেন।' আমি তখন মুন্নিকে বলিলাম। মুন্নি বলিল "কোনও মেথর উহাদের পায়খানা পরিষ্কার করিবে না।

আমরা আপনার বাড়িতে কাজ করি বলিয়া উহাদের পরামর্শে ঝি পালাইয়াছে। আমরা উহাদের পায়খানা পরিষ্কার করিব না।" আমি একটু বিপন্নবোধ করিলাম। কারণ আমার মনে হইল ভদ্রলোক বোধ হয় ভাবিবেন আমিই মেথর-দের ক্ষ্যাপাইয়া এই কাণ্ড করিয়াছি। মুন্সিকে বুঝাইয়া বলিলাম। তখন ভদ্রলোকের বাড়িতে মেথর গেল—সমস্যার সমাধান হইল। এ বাড়িতে আমরা অবশ্য বেশী-দিন থাকি নাই। বড্ড বেশী খরচ হইতেছিল। বাবা বলিলেন 'বরারিতে ভোলার যখন কোয়ার্টার্স আছে, তখন তোমরা সেইখানেই গিয়া থাক। তুমি রোজ বরারি হইতে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করিবে।" সকলে বরারি চলিয়া গেলাম। কিন্তু সেখান হইতে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করা কষ্টকর হইয়া উঠিল আমার পক্ষে। এই সময় মাথায় আর একটি তুর্বুদ্ধি জুটিল। টাকা ধার করিয়া এই সময় একটি ফোর্থহ্যাণ্ড মোটর কিনিলাম। কয়েকদিন ব্যবহার করার পর বোঝা গেল মোটরটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যায় এবং লোক দিয়া না ঠেলাইলে স্টার্ট লয় না। কিছুদিন পর এমন অবস্থা দাঁড়াইল আমার মোটর দেখা গেলেই আশপাশের চেনা লোক সরিয়া পড়িত। পাছে ঠেলিতে হয়। মিস্ত্রির পিছনে খরচ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার তুরারোগ্য ব্যাধি সারিল না। তখন আমি মোটরটি বেচিয়া দিব ঠিক করিলাম। যে জমিদারদের হসপিটালে ভোলা ডাক্তার হইয়াছিল, তিনিই আমাকে মোটর কিনিবার টাকা দিয়াছিলেন। ৩০০৲ টাকা। এখনকার হিসাবে বেশী নয়, কিন্তু তখনকার হিসাবে অনেক। এই মোটরেরও একজন খরিদ্দার জুটিয়াছিল। ভোলা কিন্তু মোটরটা বিক্রি করিতে দিল না। বলিল 'ওটা আমাকেই দাও। আমি আমার মাহিনা হইতে কাটাইয়া ধার শোধ করিয়া দিব।' জলকলের বিজয়দা আশ্বাস দিলেন, তিনিই মোটর ঠিক করিয়া দিবেন। কিন্তু তিনিও জবাব দিলেন শেষে। আমি পুনরায় ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলাম। এবার বাড়ি পাইলাম মোশাকচকে কীর্তিচন্দ্র চ্যাটার্জি লেনে। একটি গলির মধ্যে বাড়ি। সে বাড়িটির পাশেই আর একটি বাড়ি। ঠিক যেন তাহার যমজ ভাই। সে বাড়িতে থাকতেন শ্রীযুক্ত ভূপেন চন্দ্রা। অতিশয় ভদ্র। প্রায় আমার বাবার বয়সী। বাবার সহিত তাঁহার অচিরেই বন্ধুত্ব হইয়া গেল এবং তিনি আমাদের হিতৈষী হইয়া উঠিলেন। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিলেন আর একটি grand old gentleman—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জানা গেল তাঁহার ভাই ফণীবাবু (S. D. O.) আমার কাকাবাবুর সহপাঠী ছিলেন। উপেনবাবুর বড়

ছেলেও ডাক্তার—হেলথ অফিসার—তাঁহার সহিত এবং ক্রমশঃ তাঁহাদের সমস্ত পরিবারের সহিতই আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। উপেনবাবুর ছোটো ছেলে অমল তখন মোটরমিস্ত্রি ধন্নুর নিকট কাজ শিখিতেছিল। পরে সে নিজেই একটি মোটর সারাইবার কারখানা করে এবং পরে আমি যে নতুন গাড়ি কিনি, সেই গাড়ির অভিভাবক হয়। এ বাসাটি হইতে আমার ল্যাবরেটরি খুব বেশী দূরে ছিল না, মাইলখানেকের মধ্যেই। কখনও হাঁটিয়া যাইতাম, কখনও বা রিক্সা, টমটম ব্যবহার করিতাম। এই বাসায় আসিবার কিছুদিন পরে আমার ছোটবোন খুকীর বিবাহ হয়। ঢনঢনিয়াদের বাগান-বাড়িতে বরযাত্রী রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লীলার খাটুনি বাড়িয়াছিল খুব। আত্মীয়স্বজন অনেকেই আসিয়াছিলেন। খুকীর যাবতীয় সায়া-সেমিজ লীলাই বাড়িতে কল চালাইয়া সেলাই করিয়াছিল। আমি কিছুদিন পূর্বে একটি Singer's sewing machine মাসিক কিস্তিতে খরিদ করিয়াছিলাম। সেই কলটি এখন বেশ কাজে লাগিয়া গেল। লীলার খাটুনি অবশ্য বাড়িল খুব। সে তখন চারমাস অন্তঃসত্ত্বা। আমার বড়ছেলে অসীম তখন পেটে। আশঙ্কা হইতে লাগিল ক্রমাগত প.-কল চালাইলে যদি কিছু হইয়া যায়। সাংঘাতিক কিছু হয় নাই, পেটে একটা ব্যথা হইয়াছিল। খুকীর বিবাহে কবিতায় একটি প্রীতি-উপহার লিখিয়াছিলাম। কবিতাটি ভুলিয়া গিয়াছি। একটি লাইন মনে আছে কেবল —'এসেছে ডাক—এসেছে ডাক'। আমার সব ভাইবোনের বিবাহের প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি। কিন্তু একটিও মনে নাই, সংগ্রহও করিয়া রাখি নাই। অনেক প্রীতি-উপহার লিখিয়াছি জীবনে। অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি পাইয়াছিলাম, আমার 'স্বরসপ্তক' পুস্তকে সেগুলি আছে। মোশাকচকের বাড়িটি ভালো ছিল, কিন্তু একটি কারণে বাড়িটি ছাড়িতে হইল। কীর্তি চাটুজ্যের গলির শেষপ্রান্তে আমার বাড়িটি এবং সে প্রান্তে পৌছিতে হইলে অনেকগুলি খোলা খাটা-পায়খানা পার হইয়া যাইতে হইত। আমার মা ঘোর আপত্তি তুলিলেন। বলিলেন—এ বাড়িতে থাকা যাইবে না। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনোমত বাড়ি পাওয়া গেল না। আর একটি অসুবিধা ছিল, লীলা তখন আসন্ন-প্রসবা। সুতরাং অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, ভাগলপুরে তখন লেডি ডাক্তার ছিলেন মিস লাল। সকলে তাঁহাকে হাতুড়ে বলিত। সে সময় হাসপাতালের অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন ছিলেন ডাঃ ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। মিস লাল তাঁহার স্ত্রীকে প্রসব করাইয়াছিলেন। সেপ্‌টিক হইয়া তিনি মারা যান। যেদিন মারা যান

সেদিন আমি ভূপতিবাবুর কোয়ার্টার্সে উপস্থিত ছিলাম। ভূপতিবাবুকে আমি মাষ্টারমশাই বলিয়া ডাকিতাম। কারণ আমি যখন মেডিকেল কলেজে ফিফ্‌থ ইয়ারে, তখন তিনি আমাদের ওয়ার্ডে জুনিয়র হাউস সার্জেন ছিলেন। মাস্টারমশায়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয় সন্ধ্যার সময়। ভাগলপুরের অনেক ডাক্তার সেদিন তাঁহার বাসায় উপস্থিত ছিলেন। আমিও ছিলাম। একটি আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়াছিলাম সেদিন। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে আমি রোগিণীর কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি হঠাৎ চোখ খুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ওঁকে একবার ডেকে দিন।' মাস্টারমশাই বাহিরে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া দিলাম। মাস্টারমশাই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। কি কথা হইল জানি না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন তিনি। মাস্টারমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বাহিরঘরে মেঝের ওপর লুটোপুটি করিয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া কাঁদিলেন তিনি। তাহার পর উঠিয়া চোখ মুছিলেন এবং উঠিয়া খাটে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার নাক ডাকিতেছে। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই শবদেহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মাস্টারমশাই ঘুমাইতে লাগিলেন।

ভূপতিবাবুর সহিত আমার খুব অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল। তিনি শুধু ভাল ডাক্তারই ছিলেন না, সুরসিক, বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ হইত।

একদিন তাঁহাকে বলিলাম 'লীলা তো আসন্নপ্রসবা। মাসখানেকের মধ্যেই তাহার ছেলে হইবে। আমি মিস লালকে দিয়া প্রসব করাইব না। আমার ইচ্ছা, আপনিই প্রসব করান। আপনি এ বিষয়ে পারঙ্গম। লীলা কিন্তু রাজি হইতেছে না। মায়েরও তেমন মত নাই। মহা মুশকিলে পড়িয়াছি। কি করি বলুন তো।'

মাস্টারমশাই বলিলেন 'তুমিই করাও। তুমি তো ব্যাংগালোর হইতে ভালো ট্রেনিং লইয়া আসিয়াছ। ভয় কি।'

বলিলাম 'করিতে পারি। কিন্তু আপনাকে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি প্রয়োজন বুঝি, আপনাকে ডাকিব।'

মাস্টারমশাই রাজি হইলেন।

আমি বাজার হইতে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও জিনিসপত্র কিনিয়া আনিলাম।

দুইটি খুব বড় বড় কলাই-করা গামলা কিনিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। অনেক সময় প্রসবের সময় ছেলের দম বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাকে একবার ঠাণ্ডা জলে এবং তাহার পর গরম জলে ডুবাইলে অনেক সময় শ্বাস-ক্রিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে।

সব প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একদিন রাত্রি দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পর ব্যথা ধরিল।

মাস্টারমশাইকে খবর দিলাম। তিনি আসিয়া বাহিরের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিলেন। তখন শ্রাবণ মাস। বর্ষণ শুরু হইয়া গেল। আমি হাতের আস্তিন গুটাইয়া আঁতুরঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। মা লীলার মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অসীমের জন্ম হইল ভোর চারটা নাগাদ। নির্বিঘ্নেই সব নিষ্পন্ন হইল। মাস্টারমশাইকে আর হাত লাগাইতে হইল না। তবে তিনি সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়াছিলেন। ভালোবাসার এই সব ছোটখাটো জিনিসগুলি আমার জীবনে অমূল্য সম্পদ।

অসীমের বয়স যখন দুই-সপ্তাহ, তখন একটি ভালো বাড়ির খবর পাইলাম। উকীল ধীরেন সেনের বাড়ি। তাঁহার বাড়ির প্রায় সামনাসামনি। আমাদের সকলেরই বাড়িটি খুব পছন্দ হইয়া গেল। মা বলিলেন 'আর দেরী নয়, এখনই বাড়ি বদল করিয়া ফেল।' কীর্তি চাটুজ্যের লেনে পায়খানা-কলুষিত গলি তিনি আর বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অবিলম্বে বাড়িটি ঠিক করিয়া ফেলিলাম। অসীমের বয়স যখন ২১ দিন, তখন আমরা নতুন বাড়িতে উঠিয়া গেলাম। বাড়িটি যে রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল, সেটির নাম লায়াল রোড। বাড়িটি দ্বিতল এবং উত্তরমুখী। পশ্চিমের রোদটাও সোজা আসিয়া দ্বিতলের ঘরটার উপর পড়িত। সেটি আমাদের শুইবার ঘর। বাড়িতে উঠিয়া গিয়া অনুভব করিলাম, তপ্ত কটাহের উপর পড়িলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই কলহগাঁয়ের এক জমিদার থাকিতেন। দেখিলাম, তিনি একটি বালক ভৃত্যকে দিয়া দিবারাত্র টানা-পাখা টানাইতেছেন। আমাদের সে উপায় ছিল না। গরমে ছটফট করিতে লাগিলাম। নবজাত অসীম দিনরাত চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু তখন উপায় কি। মা হাত-পাখা লইয়া দিনরাত নাতিকে বাতাস করিতে লাগিলেন। ভাদ্রমাসটা সে বাড়িতে অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদের থাকিতে হইল। আশ্বিনমাসে মা আমাদের লইয়া মণিহারী চলিয়া গেলেন। মণিহারীতে

পুজাটা কাটাইয়া আমরা লক্ষ্মীপুজার পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়া ল্যাবরেটরিতে লক্ষ্মী-পূজা করিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বাড়িরও সন্ধান পাইলাম। এ বাড়িটিরও মালিক ছিলেন উকীল ধীরেন সেন। বাড়ির নাম কিন্তু ছিল বরেন বাগচির বাড়ি। বাগচী মহাশয়ই বাড়িটির পূর্বতন মালিক। তিনি ভাগলপুরেরই প্রসিদ্ধ বাগচি পরিবারের সন্তান। কিন্তু তিনি মেম বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার মনোভাব সাহেবীভাবাপন্ন ছিল বলিয়া পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তিনি। আলাদা বাড়ি করিয়া থাকিতেন। বাড়িটিও করিয়াছিলেন সাহেবী কেতায়। বাড়িটির সামনেই বেশ একটি বড় বারান্দা ছিল। বারান্দার দুই-পাশে দুইটি ঘর। ভিতরের দিকেও শোবার ঘর দুইটি। তা ছাড়া রান্নাঘর এবং একটি ঢাকা বারান্দা। বাড়ির ভিতর একটি প্রশস্ত উঠানও ছিল। ডাক্তার অমূল্যচরণ ঘোষ এবং স্বর্গীয় ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষের বাড়িও ওই পাড়ায়। কাছেই দাওবাবুর (ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ নিয়োগী) বাড়ি। পাড়াটি খুব ভালো। বরেনবাবু বহুপূর্বে বাড়িটি ধীরেনবাবুকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। বাড়িটির একমাত্র দোষ ছিল, বাড়িটি অত্যন্ত পুরাতন।

এই বাড়িতে আসিয়া আমার মাথায় একটা নতুন মতলব জাগিল। খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইল, বাড়ির বাহিরের বারান্দাটি ঘিরিয়া আমার ল্যাবরেটরি যদি ওইখানে লইয়া যাই, তাহা হইলে খরচ অনেকটা কমিবে। তা ছাড়া যাওয়া-আসার হাত হইতেও পরিত্রাণ পাইব। বাবা ইহাতে অমত করিলেন না। মিস্ত্রি ডাকাইয়া কাঠের ফ্রেম ও কাঁচসহযোগে বারান্দাটি ঘিরিয়া ফেলিলাম। মুন্নির ছেলে সিতাবী আমার কাছে আসিয়া বাহাল হইল। মুন্নি অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পরেই সে মারা গেল। সিতাবী বরাবর আমার কাছে ছিল। সিতাবীর মত সুদক্ষ চাকর জীবনে আর পাই নাই। সে সবরকম কাজ করিতে পারিত। বাজার করিত। মুরগী ছাড়াইত। ছোট-খাটো মিস্ত্রির কাজ করিত। এমন কি অবসরসময়ে সে কাঁথা ও পরদা সেলাইও করিয়াছে। নির্ভরযোগ্য ভৃত্য ছিল সে। ল্যাবরেটরিতে আমার চা-ও সে বানাইয়া দিত। আমার দামাল-পুত্র অসীম তাহার কাছেই থাকিত। বাড়ির প্রশস্ত উঠানে আমার ল্যাবরেটরির গিনিপিগ এবং খরগোসের থাকিবার খুব সুবিধা হইয়াছিল। আমার ছোট ঝুমু কুকুরটিও থাকিত সেই ঘরে। তাহাদেরও তদারক করিত সিতাবী। সে সময় অর্থাভাবের জন্য আমি **Electric centrifugal Machine** কিনিতে পারি নাই। কিন্তু **Necessity is the mother of**

invention। মাথায় একটা বুদ্ধি গজাইল। একটা সিমেন্‌স্ টেবিল-ফ্যান কিনিয়া সেটাকে Centrifugal Machine-এ রূপান্তরিত করিয়া ফেলিলাম। প্রয়োজন-এর চাপে এবং অর্থের অভাবে স্থানীয় মিস্ত্রিদের সাহায্যে একটি Dry Heating chamberও করাইয়াছিলাম টিন দিয়া। এ সময় আমি বেশী লিখিতাম না। পড়িতাম খুব। ভাগলপুর ইন্‌স্টিটিউট হইতে অনেক ভালো ভালো বই আনিতাম। কলেজের অধ্যাপক বন্ধুরাও অনেক ভালো বই আনিয়া দিতেন। তখন ইন্‌স্টিটিউটেরই একটি ঘরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছিল অতি ম্রিয়মাণ অবস্থায়। বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায়ই সেটিকে কোনওরকমে জিয়াইয়া রাখিয়া-ছিলেন। অমূল্যবাবুই আমাকে তাহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন। সেখানেও বাংলা-সাহিত্যের অনেক পুস্তকের সহিত আমার পরিচয় ঘটে। মনে লিখিবার নানা উপাদান সংগৃহীত হইতেছিল, কিন্তু সেটি কাগজে লিপিবদ্ধ হইতেছিল না। তাহার কারণ বাহির হইতে কোনও তাগাদা ছিল না। ঠিক এই সময়েই একদিন পরিমল গোস্বামী আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিমল আমার অনেকদিনের বন্ধু। সুরসিক, বিদগ্ধ ব্যক্তি। বাংলায় প্রথম শ্রেণীর এম-এ তো বটেই, আরও নানা বিষয়ে সে সুপণ্ডিত। বিজ্ঞানের ছাত্র না হইয়াও বিজ্ঞানজগতের অনেক নির্ভুল খবর সে রাখে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সে কোনও নির্ভরযোগ্য চাকুরি জুটাইতে পারে নাই। নানা সংবাদপত্রের সহিত, নানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজেকে সাময়িকভাবে যুক্ত রাখিয়া সে একটা অনিশ্চিত জোড়া-তাড়া দেওয়া জীবনযাপন করিতেছিল। সে আমার কাছে আসিয়া বলিল—'শনিবারের চিঠি' কাগজের সম্পূর্ণ ভার সজনীবাবু আমার হাতে তুলিয়া দিতে চান। সজনী 'বঙ্গশ্রী' কাগজের সম্পাদক হইতেছেন। 'বঙ্গশ্রী' কাগজের মালিকের শর্ত এই যে তাহাকে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া 'বঙ্গশ্রী'-র উন্নতিকল্পেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। সজনী তাই পরিমলকে ডাকিয়া বলিয়াছে, আপনি 'শনিবারের চিঠি'-র ভার লউন এবং কাগজটিকে বাঁচাইয়া রাখুন। শনিবারের চিঠির জন্য লেখা আপনাকেই জোগাড় করিতে হইবে। লেখার কোন পারিশ্রমিক আমি দিতে পারিব না। বিজ্ঞাপনও আপনাকে যোগাড় করিতে হইবে। শনিবারের আয় যাহা হইবে তাহা আপনি লইবেন। আপনার থাকবার জন্য একটি ঘর আমি আপনাকে দিব। আমার বাড়ির নীচের তলার একটি ঘরে আপনি থাকিবেন। আপনাকে কোন ভাড়া দিতে হইবে না।

• পরিমল বলিল—তুমি যদি প্রতিমাসে লিখিতে রাজি হও আমি নিশ্চিন্তমনে এ ভার লইতে পারি। তোমাকে ব্যঙ্গরচনা লিখিতে হইবে। কাগজে মোহিত-লাল মজুমদার, নীরদ চৌধুরী নিয়মিত লিখিবেন বলিয়াছেন। আমি তো লিখিবই। তোমাকেও লিখিতে হইবে।

পরিমলকে প্রতিশ্রুতি দিলাম লিখিব। আমার মনে ব্যঙ্গ-রসাত্মক অনেক গল্পের প্লট তখন গিজগিজ করিতেছে। তাহাই কবিতায় লিখিতে শুরু করিলাম। প্রথম কবিতা বোধ হয় 'ভাদুড়ী'। তাহার পর প্রতিমাসেই শনিবারের চিঠিতে আমার ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। রসিকদের নিকট বাহবা পাইলাম। পরিমল ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগিল। সুতরাং আমার লেখার উৎসাহ স্তিমিত হইল না। পরিমল আমাকে থামিতে দিল না। পরিমলের নিরন্তর তাগাদা না থাকিলে আমি এতগুলি ব্যঙ্গকবিতা বোধ হয় লিখিতাম না। এই সময় আমার আর একটি মহাপ্রাণ ব্যক্তির সহিত আলাপ হইল এবং সে আলাপ ক্রমশঃ গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত আমার জীবনে একটি পরম প্রাপ্তি। দেখিলাম, তিনি শুধু সাহিত্যরসিকই নন, খাদ্যরসিকও। তিনি চাকুরিজীবী, কিন্তু স্বাধীনচেতা লোক। বড চাকুরি করিতেন—ইনকামট্যাক্স-অফিসার ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁহাব চাল-চলনে অফিসারসুলভ ঠাট-ঠমক বা চালিয়াতির লেশমাত্র ছিল না। বাল্যকালে শান্তি-নিকেতনে পড়িয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথেব বড় ভক্ত একজন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রসমিতির সদস্য এই লোকটির সহিত আলাপ করিয়া বড় ভালো লাগিয়াছিল। ইনি যখন টুরে ভাগলপুর আসিতেন, উঠিতেন 'সারকিট' হাউসে এবং সেখানে আমাদের নিমন্ত্রণ করিতেন। অমূল্য রায়, বসন্ত ডাক্তার, জলকলের বিজয়দা, সুকুমার ডাক্তার এবং আমি—এই পাঁচজনেই সেখানে গিয়া জুটিতাম। অমূল্য রায় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার বাড়িতেই প্রদ্যোতের সহিত প্রথম আলাপ হয়। প্রদ্যোৎবাবুর কাছেই আমি প্রথম **Mutton Roast** খাই। তাঁহার বুদ্ধ নামে একটি রন্ধনবিশারদ ওড়িশাবাসী সুপকার ছিল। **English Roast** সে চমৎকার বানাইত। তাহার নিকট আমি পরে রোস্ট-রন্ধনের পদ্ধতিটি শিখিয়া লইয়াছিলাম। প্রদ্যোৎবাবু আসিলে আমাদের পাঁচজনের বাড়িতে পালাক্রমে ভোজ হইত। প্রদ্যোৎবাবু যে কয়দিন থাকিতেন বড় আনন্দে দিন কাটিত। কিন্তু তিনি বেশীদিন থাকিতেন না। কয়েকদিন থাকিয়া পাটনা চলিয়া যাইতেন। মটন-রোস্ট আমার ভালো লাগিয়াছিল, কিন্তু ভাগলপুরে

তখন ভাল ভেড়ার মাংস পাওয়া যাইত না। পাটনা শহরে তখন Judges' Mutton নামে খ্যাত ভালো ভেড়ার মাংস পাওয়া যাইত। একদিন দেখি, প্রদ্যোৎবাবু প্লেনের এক যাত্রীর মারফৎ আমার জন্য সেই অপূর্ব্ব 'মাটন' পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন ভাগলপুর-পাটনা প্লেন-সার্ভিস ছিল। প্রদ্যোৎবাবুর ভদ্রতায় ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই পরিচয় পরে আরও অনেকবার পাইয়াছি। পরে যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

পরিমলের তাগাদায় প্রতিমাসে 'শনিবারের চিঠি'-তে ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়া চলিয়াছি। এমন সময় একটা মহাবিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বিহারের সেই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প কয়েকমিনিটের মধ্যে আমাকে একেবারে পথে দাঁড় করাইয়া দিল। তারিখটা ছিল ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৪, সময় বেলা দুইটা পনেরো মিনিট। ১৫ই জানুয়ারী ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে হইতে পারে ইহার ভবিষ্যদ্বাণী কয়েকদিন পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম। ভূমিকম্পের আগের দিন আকাশে ঘনঘটা করিয়া মেঘ জমিল, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, বজ্রগর্জনও শোনা গেল। আমাদের মনে হইল, প্রচুর ঝড়বৃষ্টি বোধ হয় হইবে। কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম—মেঘ নাই, আকাশ পরিষ্কার, চমৎকার রোদ উঠিয়াছে। সেদিন পৌষ-সংক্রান্তি ছিল। লীলা পিঠা প্রস্তুত করিতে লাগিল। আমি বাজারে গিয়া একটা ভালো খাসির রাং কিনিয়া আনিলাম। ঠিক হইল, রাত্রে ইংলিশ রোস্ট করিব। বুদ্ধর নিকট হইতে রোস্ট করিতে শিখিয়া ছিলাম।

সেদিন আমার মফঃস্বল হইতে একটি রোগী আসিয়াছিল। সে তিনটার ট্রেনে রিপোর্ট লইয়া চলিয়া যাইবে। আমি তাই খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম না করিয়া তাহার কাজ করিতেছিলাম। ঘরের ভিতর লীলা অসীমকে ঘুম পাড়াইতেছিল। ধোপানী আসিয়াছিল কাপড় লইবার জন্য। সে অপেক্ষা করিতেছিল, অসীম ঘুমাইলেই লীলা তাহাকে কাপড় দিবে। কেয়ার বয়স তখন বছর চারেক, সে পাশের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিল। ওই বয়সেই সে বেশ পাড়া-বেড়ানী হইয়া উঠিয়াছিল। অজস্র কথা বলিত, গানও গাহিত। আমি পরীক্ষা শেষ করিয়া রিপোর্ট লিখিতেছিলাম। যে টেবিলটার উপর লিখিতেছিলাম সেই টেবিলটার আর এক প্রান্তে আমার Centrifugal Machineটা ঘুরিতেছিল। হঠাৎ টেবিলটা খুব জোরে নড়িতে লাগিল। আমার মনে হইল Centrifugal যন্ত্রটাই বোধ হয় গোলমাল করিতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথার

উপর ছাদ হইতে চাপড়া ভাঙিয়া পড়িল, বুঝিলাম ভূমিকম্প হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলাম। রাস্তায় বাহির হইয়াই খেয়াল হইল, লীলা হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া খিড়কির দরজার দিকে গেলাম। দেখিলাম অসীমকে কোলে লইয়া লীলা বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই ধোপানিটা তাহাকে ঘুমাইতে দেয় নাই। কেয়াও পাশের বাড়ী হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসিল। আমরা সকলে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কম্পন এত প্রবল যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। সকলে বসিয়া মাটি ধরিয়া রহিলাম। চারদিকে একটা শব্দ উঠিল—যেন মোটরলরি আসিতেছে। ধুলায় চতুর্দিক ভরিয়া গেল। আমার বাড়িটাও আমার চোখের সামনে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। মিনিটখানেক পরেই আমরা দাঁড়াইয়াই রহিলাম কয়েকমুহূর্ত। চতুর্দিকেই একটা কোলাহল হইতেছিল। একটা জেলেনী বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম সে বলিতেছে— আশুবাবু বিতি গেল। অর্থাৎ আশুবাবু মারা গিয়াছেন। ডাক্তার আশুবাবুর বাড়ি আমার বাড়ির কাছেই। সংবাদটা পাইয়া বিচলিত হইলাম এবং লীলাদের রাস্তায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া ছুটিলাম দাও ডাক্তারের বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনেই তাঁহার দেখা পাইলাম। একটা চাঙড় পড়িয়া তাঁহার মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি জীবিত আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম লীলাদের কাছে। সেখানে একটা ছ্যাকড়াগাড়িও পাইয়া গেলাম। সাধারণতঃ ভাগলপুর হইতে বরারির গাড়ি-ভাড়া একটাকা ছিল। লোকটা চারটাকা চাহিল। ঠিক করিলাম, বরারি গিয়া ভোলার খবর লইব। আরও দুই একটি কুলিও সংগ্রহ করিতে হইল। ভগ্নস্তূপের মধ্যে আমার ল্যাবরেটরি পড়িয়া রহিল। আমি কেবল মাইক্রোশকোপটা বাহির করিয়া আনিলাম। লীলা গহনাপত্র, কাপড়ের ট্রাঙ্কটা এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে লইল। খাসির রাংটাকেও সঙ্গে লইয়াছিলাম। কেয়া, অসীমকে লইয়া আমরা বরারির দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া ভোলার সহিত দেখা হইল। সেও আমাদের খোঁজে আসিতেছিল। শুনিলাম, তাহার বাড়ির তেমন কিছু ক্ষতি হয় নাই। বরারি পৌঁছিয়াই আর ঘরে ঢুকিতে সাহস হইল না। কারণ সেখানে গিয়া গুজব শুনিলাম মুঙ্গের শহর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আরও শুনিলাম, যে ভূমিকম্পটা হইয়া গেল তাহা ভূমিকা-মাত্র। প্রচণ্ডতর ভূমিকম্প শীঘ্রই আবার আসিবে। সেদিন প্রখর শীতের

হাওয়া। তবু সেই গঙ্গার তীরের খোলা মাঠে হাসপাতালের পাশে বিছানা বিছাইয়া শুইব ইহাই ঠিক হইল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া শুইতে সাহসে কুলাইল না। মাঠে শুইয়াও শান্তি নাই। কোথাও মোটরের বা লরির শব্দ হইলেই চমকাইয়া উঠিতাম—ওই বুঝি আবার শুরু হইল। হাসপাতালের একটা জায়গায় একটা টিন লাগানো ছিল। জোরে বাতাস বহিলে সেটি খড়খড় শব্দ করিত। শব্দ শুনিলেই আমরা সচকিত হইয়া উঠিতাম। তাহার পর মুঙ্গের, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে যে সব খবর আসিতে লাগিল তাহাতে আমাদের আরও কাবু করিয়া ফেলিল। দুই-একদিন বড়ই অশান্তিতে কাটিয়াছিল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও গাড়ি-ভাড়া করিয়া আবার ভাগলপুরে গেলাম। ভাঙা বাড়িটার ভিতর হইতে আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্রগুলি তো উদ্ধার করিতে হইবে। গিয়া দেখিলাম, আমার গিনিপিগ, খরগোস সব মরিয়া গিয়াছে। ঝুনু কুকুরটাও। পোষ্টাপিস বন্ধ। ব্যাংকও বন্ধ। স্টেশনে অনেক ট্রেন আটকাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শহরে চরম বিশৃঙ্খলা। আমার কাছে মাত্র আড়াইটি টাকা সম্বল। প্রায় সামনা-সামনিই ছিল অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি। তাহাকে গিয়া বলিলাম—আপনার বাড়িতে আপাততঃ আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র রাখিয়া দিতে চাই। জায়গা আছে কি? অমূল্যবাবুর বাড়ির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। তাহা ছাড়া তাঁহার বাড়ির সম্মুখে তিনি খাপড়ার একটি ঘর বানাইয়াছিলেন রোগী দেখিবার জন্য। অতিশয় দয়াশয় লোক ছিলেন অমূল্য ডাক্তার। তিনি বলিলেন—আপনি জিনিসপত্র আমার বাড়িতেই রাখুন এবং যতদিন অন্য কোথাও ঘর না পাইতেছেন আমার ওই ঘরেই আপনি ল্যাবরেটরি করুন। আগেই বলিয়াছি তখন আমার কাছে মাত্র আড়াই টাকা সম্বল। আমি ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করিতাম বটে কিন্তু অনেক গরীব রোগীর বিনা পয়সায় চিকিৎসাও করিতাম। অনেক মেথর, অনেক রিকসাওয়ালা, মুটে, অনেক মেছো, অনেক গরীব দাই, চাকর আমার রোগী ছিল। সেদিন হঠাৎ আমার একটা পুরাতন রোগী রিক্সা-ওয়ালাকে রাস্তায় দেখিতে পাইলাম। বলিলাম—আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্রগুলি ওই ভগ্নস্তূপ হইতে বাহির করিয়া অমূল্যবাবুর বাড়িতে পৌঁছাইয়া দাও, তোমাকে আমি দুইটি টাকা দিব। সে রাজি হইল। সে জিনিসপত্র বাহির করিতেছে, আমি রাস্তার উপর একটা কাল্‌ভার্টের উপর বসিয়া আছি। এমন সময় একটা প্রায়-উলঙ্গ মাতাল টলিতে টলিতে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আমাকে আদেশের ভঙ্গীতে বলিল—হামকো দো রুপিয়া

দে। লোকটির চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন—ঠিক মাতালের মত নয়। আমি বলিলাম—আমার কাছে এখন বাড়তি দুই টাকা নাই। মাত্র আড়াই টাকা আছে। দুই টাকা এই কুলিটিকে দিতে হইবে এবং আট আনা লাগিবে একার ভাড়া। একা চড়িয়া আমি বরারি যাইব।

লোকটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, যদি তোমার কাছে বেশী টাকা থাকিত, তুমি আমাকে দিতে কি? বলিলাম—নিশ্চয় দিতাম।

তখন সে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করিল।

বলিল—তুমি একটু পরে বত্রিশ টাকা পাইবে। বলিয়া সে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

একটু পরেই কিন্তু তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গেল। সত্যিই দুইজন রোগী আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—আমাদের ট্রেণ এখানে আটকাইয়া পড়িয়াছে, কখন ছাড়িবে ঠিক নাই। আমার এবং আমার স্ত্রীর রক্ত পরীক্ষা করিতে হইবে। আমাদের ডাক্তারবাবু আপনাকে দিয়াই পরীক্ষা করাইতে বলিয়াছেন। একটি চিঠিও দিয়াছেন তিনি। আমরা ভাবিলাম, যখন এখানে আসিয়াই পড়িয়াছি আপনাকে রক্তটা দিয়া যাই। আপনি পরে রিপোর্ট পাঠাইয়া দিবেন।

আমি বলিলাম—আমার ল্যাবরেটরি তো এখন ধ্বংসস্তূপের ভিতর। এখন রক্ত লইয়া কি করিব। তোমরা দিনসাতেক পরে আসিও। সে কিন্তু বলিল—রক্ত লইয়া বরফে রাখিয়া দিব। যদি করা সম্ভব হয় করিবেন, আর যদি না করিতে পারেন তখন আমরা আবার আসিব। এখন আমরা রক্তটা দিয়া যাই।

লোকটি জোর করিয়া আমাকে রক্ত দিয়া গেল। নগদ বত্রিশটি টাকা পাইয়া গেলাম। সেই উলঙ্গ মাতাল লোকটা কোথা গেল? উঠিয়া গিয়া রাস্তায় একটু ঘোরাঘুরি করিলাম কিন্তু তাহার দেখা পাইলাম না। পাইলে তাহাকে দুইটি টাকা দিতাম। কিন্তু লোকটি কোথায় যেন উবিয়া গেল। খুঁজিয়া পাইলাম না।

ইহার পরও ভূমিকম্পের কম্পন মাঝে মাঝে হইতেছিল। কিন্তু খুব বেশী নয়। তবু আমরা স্বস্তি পাইতেছিলাম না। রোগীপত্রও তেমন আসিতেছিল না। সমস্ত মুঙ্গের শহরটাই ভূমিকম্পের কবলে পড়িয়াছিল। মুঙ্গেরের শোচনীয় দুর্দশার কাহিনী রোজই শুনিতে পাইতেছিলাম। খবর পাইলাম, আমাদের মণিহারীর বাড়ির কিছুই হয় নাই। আমাদের মণিহারীর বাড়ির মাটির

দেওয়াল, খড়ের চাল। বাবা লিখিলেন, তোমরা সকলে মণিহারীতে এস। সকলকে লইয়া মণিহারীতে চলিয়া গেলাম। কয়েকদিন পরেই কিন্তু আমাকে একাই ফিরিতে হইল। মা বলিলেন—আগে সেখানে ভালো ঘর ঠিক হোক, তারপর সকলকে লইয়া যাইও।

ভাগলপুরে ফিরিয়া অমূল্য ডাক্তারের খাপরার ঘরেই আবার আমি ল্যাবরেটরির কাজ আরম্ভ করিলাম। কিছু কিছু রোজগারও হইতে লাগিল। যতদূর মনে পড়িতেছে, ইহার মধ্যেও আমি শনিবারের চিঠির জন্য কিছু লেখা পাঠাইতে পারিয়াছিলাম।

কিন্তু, মুশকিলে পড়িলাম, কোথাও বাড়ির সন্ধান না পাওয়ায়। আমি একটা বড় রাস্তার ওপর এমন একটা বাড়ি খুঁজিতেছিলাম যেখানে আমার ল্যাবরেটরি ও বাড়ি একসঙ্গে হয়। কিন্তু তাহা পাওয়া যাইতেছিল না। হঠাৎ একদিন পটলবাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি ছিলেন ভাগলপুরের একজন নামজাদা উকিল এবং একজন প্রভাবশালী কংগ্রেসকর্মী। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও খাতির করিত। ভয়ও করিত অনেকে। কারণ, তিনি খুব একরোখা, জেদি মানুষ ছিলেন। আমাকে স্নেহ করিতেন তিনি। সম্ভবতঃ, আমার সাহিত্যিক খ্যাতির জন্য। তখন তিনি মুঙ্গেরে ত্রাণকার্য করিতেছিলেন। আমার সহিত দেখা হইতেই বলিলেন—আমি মুঙ্গেরে ছিলাম অনেকদিন, আপনার সহিত দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, আপনার বাড়িটাও পড়িয়া গিয়াছে।

আমি উত্তর দিলাম—ঠিকই শুনিয়াছেন। বড় অসুবিধার মধ্যে আছি। কোথাও বাড়ি পাইতেছি না। ভাবিতেছি, ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব।

'কেন?'

'বাড়ি না পাইলে থাকিব কোথায়?'

'আমি আপনার বাড়ির ভার লইতেছি। আমার বাড়ির পাশে মীরহুল্লা লেনে ছোট একটা বাড়ি আছে, আপনি আজই সেটা গিয়ে দখল করুন। প্রয়োজন হইলে, ওই বাড়িতেই আরও দু-একখানা ঘর বাড়াইয়া দিব।'

'আমার ল্যাবরেটরি?'

'আচ্ছা, ভাবিয়া দেখিতেছি। কাল বলিব।' পরদিন তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি রাস্তার উপর এক টুকরা জমি দেখাইয়া বলিলেন—এইখানে যদি আপনার ল্যাবরেটরি করিয়া দিই, তাহা হইলে চলিবে কি? জায়গাটা

ভালো। বলিলাম—ল্যাবরেটরি তৈয়ারি করিতে তো অনেকদিন লাগিবে। তিনি বলিলেন—আমি একমাসের মধ্যে করিয়া দিব। একটা 'হল' করাইতে আর কতদিন লাগিবে? আপনি হলের মধ্যে যদি সিমেন্টের টেবিল বা তাক করাইতে চান, তাহাও করাইয়া দিব। তখনও মাঝে মাঝে কম্পন হইতেছিল। পটলবাবু বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি খুব মজবুত কংক্রিটের বাড়ি করাইয়া দিব। দুইটা বড় বড় বীম (Beam) দিলে আর পড়িয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। আপনি থাকিবেন বলিয়াই এই ল্যাবরেটরি করিয়া দিতেছি। জায়গাটা আমার বাড়ির সংলগ্ন উঠান।' পাশেই তাহার দ্বিতল বাড়িটা দেখিলাম। পটলবাবু বলিলেন—'আমার মীরজুম্লা লেনের বাড়িতে যদি থাকেন, আপনার ল্যাবরেটরির খুব কাছে হইবে।' মীরজুম্লা লেনের বাসাটি খুব ছোট। দুইটিমাত্র ঘর এবং একটি বারান্দা। ঠিক করিলাম, ইহাতেই উঠিয়া আসিব। **Any port in the storm.** পটলবাবু বলিলেন—পরে আপনার প্রয়োজনমত আরও ঘর বাড়াইয়া দিব। এখন উঠানের একধারে যে টিনের চালাঘরটা আছে, সেটাকেই রান্নাঘর করুন।

পটলবাবুর প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেলাম। মণিহারী গিয়া লীলাকে লইয়া আসিলাম। সঙ্গে টুলুও আসিল। তাহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম।

সে সময় আমাদের একটি বড় ইক্‌মিক্ কুকার ছিল। কুকারে ভাত, ডাল-ভাতে এবং মাংস হইত। মাংস এবং ভাতই তখন প্রধান খাদ্য ছিল আমাদের।

দিবারাত্র মিস্ত্রি লাগাইয়া পেট্রোমাক্সের আলোয় কাজ করাইয়া ঠিক এক-মাসের মধ্যেই পটলবাবু আমার নতুন ল্যাবরেটরিটি প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। ল্যাবরেটরিটি সত্যই আমার মনোমত হইল। ল্যাবরেটরিটি আমার বাড়ির খুব কাছে হওয়াতে আমি দ্বিপ্রহরে সেখানে আসিয়া থাকিতাম। সন্ধ্যার পরও রাত্রি নটা-দশটা পর্যন্ত অতিবাহিত করিতাম। সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়া লিখিতাম। বন্ধুবান্ধব কেহ আসিলে, সেইখানেই গিয়া বসিতেন। নিজস্ব একটা লেখার ঘর পাইয়া আমার লেখার বেগ বাড়িতে লাগিল। হাস্যরসের এবং ব্যঙ্গরসের কবিতা তো লিখিতে লাগিলামই, দুই-একটা গম্ভীর লেখাও লিখিলাম। সেই সময়, বন্ধুবর অমূল্য রায় প্রায়ই আমার ল্যাবরেটরিতে আসিতেন এবং আমার লেখা শুনিতেন। বেশ রসিক ব্যক্তি তিনি। তাঁহার উপদেশ অনেক সময় আমার বড় কাজে লাগিয়াছে। নেপথ্যে আর একটি পাঠিকা ছিল—তাহাকে না পড়াইয়া আমি কোন লেখাই ছাপিতে দিতাম না—সে ব্যক্তি লীলাবতী, আমার

সহধর্মিণী। কোথায় রস জমিল না, কিংবা সুরটা কাটিয়া গেল, লীলা তাহা ধরিতে পারিত। সুতরাং লীলার বিচারের উপরও আমার অনেকটা আস্থা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ—'লেখা লিখিবার পর কিছুদিন ফেলিয়া রাখিবে' তাহার পর আবার সংশোধন করিয়া ছাপিতে দিবে। কিন্তু, আজকাল তাহা আর হইবার জো নাই। বাজারে একটু নাম হইয়া গেলে, প্রকাশক বা সম্পাদকরা লেখার কালী শুকাইতে দেন না। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি নিরপেক্ষ, রসিক ব্যক্তি লেখাটি শুনিয়া বা পড়িয়া বলেন, ভালো হইয়াছে, তাহা হইলে, লেখা ছাপিতে দিতে পার। প্রকৃত রসিকরা ক্বচিৎ ভুল করেন। আমি তখন অমূল্য রায় ও লীলার উপর নির্ভর করিতাম। পরে সজনীও আসিয়াছিল।

আমার একটা স্বভাব, আমি একঘেয়ে ব্যাপার বেশীদিন বরদাস্ত করিতে পারি না। উপর্যুপরি একইরকম তরকারি খাইতে পারি না। আমার আহারের বৈচিত্র্যের জন্যও লীলাবতীকেও নানারূপ নতুন রান্না শিখিতে হইয়াছে। আমি নিজেও মাঝে মাঝে রান্নাঘরে ঢুকিয়া নতুন ধরনের কিছু রাঁধিবার চেষ্টা করিতাম। ডিম-বেগুন, ব্রেণ-বর্বটি, লাউয়ের স্ট্যু প্রভৃতি নানারকম Experiment করিয়াছি। মাংসেরও রোস্ট, স্ট্যু, শিককাবাব প্রভৃতি করিয়াছি।

লিখিবার বেলাতেও আমার এই স্বভাব ক্রমশঃ নিজেকে জাহির করিতে লাগিল। কিছুদিন ব্যঙ্গকবিতা লিখিবার পরই ব্যঙ্গকবিতা লেখায় আর রুচি রহিল না। আমি তখন একদিন 'তৃণখণ্ড' নাম দিয়া একটি গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত গল্প লিখিয়া ফেলিলাম। পরে শুনিয়াছি, ইহাকেই সংস্কৃতে নাকি 'চম্পূকাব্য' বলে। এতদিন, প্রত্যেক মাসে পরিমলকে 'শনিবারের চিঠি'-র জন্য ব্যঙ্গরচনা পাঠাইতেছিলাম। 'তৃণখণ্ড' সম্পূর্ণ হইবার পর ব্যঙ্গকবিতা না পাঠাইয়া সেইটাই পাঠাইয়া দিলাম। পরিমল কিন্তু ওটা না ছাপিয়া ফেরৎ দিল। লিখিল, তুমি ব্যঙ্গকবিতাই পাঠাও। 'তৃণখণ্ড'-কে বাক্সবন্দী করিয়া ব্যঙ্গরচনাই পাঠাইলাম তাহাকে। আমার মনে হইল, রচনাটি হয়তো ঠিক রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

ঠিক মনে পড়িতেছে না, তবে মনে হয়, এই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারা গেলেন। তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত আলাপ ছিল না। তাঁহার কয়েকটি লেখা আমার বড় ভালো লাগিয়াছিল। 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'নিষ্কৃতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ'। 'দেবদাস', 'পথের দাবী', 'দেনা-পাওনা' তত ভালো লাগে নাই। তাঁহার

শেষের দিকের অনেক রচনাই আমার তত ভালো লাগিত না। তাঁহার মৃত্যুতে তবু আঘাত পাইলাম। মনে হইল, একজন বড় শিল্পী চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে আমি কলিকাতায় গেলাম একবার। আমার ল্যাবরেটরির **Reajent** প্রভৃতি আনা। সে সময় 'শনিবারের চিঠি'র অফিসেও গেলাম। তখন ২৫।২ মোহনবাগান রো—এই ঠিকানায় অফিস ছিল। সজনীর সহিত আলাপ হইল। যতদূর মনে পড়ে, সেদিন তারাশঙ্কর, বিভূতি বাঁড়ুয্যে, বীরেন ভদ্র, নীরদ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার সকলের সহিত পরিচিত হইলাম। শনিবারের চিঠির অফিসে তখন বেশ জমজমাট একটা আড্ডা বসিত। পরে, আমি আরও অনেকবার ওই আড্ডায় গিয়াছি এবং ওই আড্ডাতেই প্রমথনাথ বিশী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুশীলকুমার দে, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। অনেকের সহিত 'আপনি' সম্বোধন 'আপনি' থাকিয়া গিয়াছে, আবার অনেকের বেলায় তাহা তুমিতে পরিণত হইয়াছে। দুই এক ক্ষেত্রে 'তুই' তুঙ্গেও আরোহণ করিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সজনীর সহিত অন্তরঙ্গতা জমিয়া গেল। তাহাকে আমি ভালোবাসিয়া ফেলিলাম। সেও আমাকে ভালো-বাসিল। তাহার পর আর একটা কাণ্ড ঘটিল এক দিন। কপিল ভট্টাচার্য এক-দিন প্যারিস হইতে ভাগলপুরে আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইল। কপিল আমার কাকাবাবুর ছাত্র, আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে। পড়াশোনায় ভালো ছেলে। ইনজিনিয়ারিং পাশ করিয়াছে শিবপুর কলেজ হইতে। সাহিত্য-চর্চাও করিত এককালে। তাহার 'রেলইয়ার্ডের বক্ষপঞ্জরে' গল্প বোধ হয় প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। গল্পটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কপিল কিন্তু সাহিত্য-পথে বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সে ভালো ইনজিনিয়ার হইয়াছিল। সিভিল ইনজিনিয়ার। কংক্রিটের কাজ শিখিবার জন্য সে প্যারিসে গিয়াছিল। সেই প্যারিস হইতে সে হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। দেখিলাম, সঙ্গে করিয়া অনেকগুলি 'শনিবারের চিঠি' এবং অন্য কয়েকখানা মাসিকপত্রও আনিয়াছে। সবগুলিতেই আমার লেখা ছিল। সেইগুলি দেখাইয়া কপিল আমাকে বলিল—আপনার এত ভালো লেখা, কিন্তু ছাপা কি বিশ্রী। আমার ইচ্ছা, এগুলি ভালোভাবে ছাপা হোক এবং আপনার লেখাগুলি পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হোক। আমি কলিকাতায় সজনীবাবুর সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমার সহিত পার্টনারশিপে ব্যবসা করিতে রাজি হইয়াছেন।

ভালো একটা সাপ্তাহিক পত্রিকাও বাহির করিব। আপনাকে লিখিতে হইবে। আপনার কাছে নতুন কোন অপ্রকাশিত লেখা আছে ?

আমি বলিলাম 'আছে। কিন্তু এ লেখাটি পরিমলের পছন্দ হয় নাই। সে 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপে নাই।'

'কোথায় সেটা ?'

'তৃণখণ্ডের' পাণ্ডুলিপিটি তাহাকে দিলাম। সে সেটি লইয়া চলিয়া গেল। ভাগলপুরে তখন তাহার একটা বাসা ছিল।

পরদিন আসিল আবার।

বলিল 'তৃণখণ্ড' অপূর্ব সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা আমরা পুস্তক-আকারে ছাপিব। আপনাকে সামান্য কিছু অগ্রিম দক্ষিণা দিতেছি।' একশো টাকার নোট আমার হাতে দিল। আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। কপিল বলিল —আপনার কবিতাগুলিও সংগ্রহ করিয়া 'বনফুল-কবিতা' নাম দিয়া আমরা ছাপিব।' আমার লেখা যে পুস্তক-আকারে ছাপা হইবে, তাহা আমি কখনও কল্পনাও করি নাই। কোথা হইতে কপিল আসিয়া জুটিয়া গেল। আর একটা যোগাযোগও এই সময় ঘটিল। বাবার পত্র পাইলাম—বাংলাসাহিত্যজগতের দাদামশাই শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মণিহারীতে আমাদের বাড়িতে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছেন। সঙ্গে দিদিমা আছেন। তাঁহারা আমার ভাই টুলুর কোয়ার্টার্সে উঠিয়াছেন। টুলু তখন মণিহারী হাসপাতালের ডাক্তার। বাবা লিখিয়াছেন—দাদামশাই আমার সহিত দেখা করিতে চান। আমি যেন দুই-একদিনের জন্য মণিহারীতে যাই।

মণিহারী গেলাম একদিন। গিয়াই প্রথমে দাদামশায়ের সহিত দেখা করিবার জন্য টুলুর কোয়ার্টার্সে গেলাম। দেখিলাম, ঘরের কপাট বন্ধ। বাহিরে একটি চাকর বসিয়া আছে। চাকরটি আমাকে বলিল—'বাবু এখন পূজা করিতেছেন, কাহারও সহিত এখন দেখা করিবেন না।' আমি তাহাকে বলিলাম—বাবু পূজা হইতে উঠিলে বলিও যে, বলাইবাবু ভাগলপুর হইতে আসিয়াছেন। একঘণ্টা পরে দেখা করিতে আসিবেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের জানালাটা খুলিয়া গেল।—'আরে কে, বলাই নাকি—এসো এসো।'

ভিতরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম 'আপনি পূজা করিতেছিলেন নাকি—'

'আরে না, না, বাজে লোক তাড়াইবার জন্যে এই ফন্দী করেছি।

দাদামশাই বলিলেন—'ভায়া, মাসিকপত্রে তোমার অনেক গল্প, অনেক কবিতা পড়েছি। কিন্তু এখনও বই একটাও বেরুল না কেন?'

বলিলাম 'আমি তো কোনও প্রকাশককে চিনি না। কে আমার বই প্রকাশ করবে, বলুন। সজনীরা হয়ত প্রকাশ করতে পারে।'

দাদামশাই আর কিছু বলিলেন না। দাদামশায়ের সহিত দিনদুই আড্ডা দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। দিন পনেরো পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পত্র পাইলাম একটি। তিনি লিখিয়াছেন, কেদারবাবু জানাইয়াছেন, প্রকাশকের অভাবে আপনি আপনার গল্পগুলি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। আমি আপনার প্রকাশক হইতে ইচ্ছুক। আপনার ছোটগল্পগুলি পাঠাইয়া দিবেন। একটু মুশকিলে পড়িলাম। নানা পত্রিকায় আমার গল্পগুলি প্রকাশিত হইতেছিল। সবগুলির ফাইল-কপি আমার কাছে ছিল না। অনেকগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। সজনীকে পত্র দিলাম, আমার গল্পগুলি সংগ্রহ করিয়া দাও। সজনী সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল—দিব। কিন্তু কিছু সময় লাগিবে। তোমার 'তৃণখণ্ড' পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তোমাকে এবার বড় গল্প লিখিতে হইবে। কয়েকদিন পরে, হরিদাসবাবুর নিকট হইতে আর একটি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—আমি যেন তাঁহার 'ভারতবর্ষ' কাগজেও লিখি।

হঠাৎ, এই সময় পাটনা কলেজ হইতে একটা সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণ আসিল। সে সভায় অনেক সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস তো ছিলেনই, আরও বোধ হয় দু-একজন ছিলেন, এখন ঠিক নাম মনে পড়িতেছে না। আমাদের থাকিবার স্থান হইয়াছিল ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দারের বাড়িতে। তাঁহাদের লাইব্রেরীর বিস্তৃত ঘরে, মেঝেতে সারি সারি আমাদের বিছানা পাতা হইল। ঘরের চারদিকে আলমারিতে বই ঠাসা। সজনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। একটু পরে সে হঠাৎ আমাকে বলিল—তোমার সব গল্পগুলি এইখানেই আছে। আমার কাছে যে গল্পগুলি নাই, সেগুলি আমি টুকিয়া লইব। যোগেন্দ্রনাথের ছোট ছেলে মণি সমাদ্দার সর্বদা আমাদের সেবায় নিযুক্ত ছিল। সজনী তাহাকে বলিল—'মণি, এখনই আমাকে একটা খাতা এনে দাও।'

সজনী সেদিন না ঘুমাইয়া আমার গল্পগুলি খাতায় টুকিয়া ফেলিল। সজনীর মত বন্ধু ছাড়া আর কেহ এ-কাজ করিত না।

এইখানেই মণি সমাদ্দারের কথা বলিয়া লই। সে অকালে পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। তাহার মত আদর্শবাদী, শিক্ষিত, বিনয়ী ছেলে খুব বেশী চোখে পড়ে না। তাহার 'প্রভাতী' বলিয়া একটি কাগজ ছিল এবং এই কাগজটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রভাতী সংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিল। সত্যই সাহিত্য-প্রাণ ছেলে ছিল সে। বাঁচিয়া থাকিলে সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক কিছু করিতে পারিত। কিন্তু অকালমৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিল। তাহার বেশ কিছুদিন পরে, তাহারই অনুরোধে, তাহার 'প্রভাতী' পত্রিকায় আমি বিনা পারিশ্রমিকে 'রাত্রি' উপন্যাসটি লিখিতে আরম্ভ করি। 'রাত্রি' উপন্যাসটি দু-এক সংখ্যা বাহির করিবার পর সজনী 'শনিবারের চিঠি'তে লিখিল 'রাত্রি' প্রভাতীতে বেমানান। সুতরাং সেও 'শনিবারের চিঠি'তে 'রাত্রি' পুনর্মুদ্রণ করিতে লাগিল। এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা। 'রাত্রি' লিখিবার পূর্বে আমি আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখিয়াছিলাম। মণির প্রসঙ্গে 'রাত্রি'-র কথা মনে পড়িল।

সজনীর নিকট হইতে আমার গল্পের ফাইল সংগ্রহ করিয়া আমি তাহা হরিদাস-বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। সজনীর 'শনি-রঞ্জন প্রেসে' 'বনফুলের কবিতা' ও 'তৃণখণ্ড' ছাপা হইতে লাগিল। যতদূর মনে পড়িতেছে 'বনফুলের গল্প' বইটাই সর্বাগ্রে বাজারে বাহির হইয়াছিল। তাহার পর 'বনফুলের কবিতা' এবং তাহার পর 'তৃণখণ্ড'।

এতদিন লেখক ছিলাম, এইবার গ্রন্থকার হইলাম। সজনী পত্রযোগে আমাকে ক্রমাগত তাগাদা দিতেছিল, আমি যেন আর একটা উপন্যাস আরম্ভ করি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ও ভারতবর্ষের জন্য লেখা চাহিতে লাগিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহাদের দোলসংখ্যা ও পূজোসংখ্যার জন্য লেখা দাবী করিলেন। সজনীর বাড়িতেই সুরেশবাবুর সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, যাহা স্নেহে কোমল, উদারতায় মুক্তহস্ত, কিন্তু কর্তব্যে কঠোর। তাঁহাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাঁহার অনুরোধ দাবীরই নামান্তর ছিল। তাঁহার দাবীতে অনেক গল্প লিখিয়াছি। ঠিক সাল মনে নাই—তবে এই সময়ের কাছাকাছি উপেনদার সম্পাদনায় 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়। তাঁহার কাগজে একটি ছোটগল্প লিখিয়াছিলাম, মনে আছে।

সজনীর তাগাদার চোটে অস্থির হইয়া একদিন একটি বড় গল্প ফাঁদিয়া বসিলাম। গল্পটি যখন শেষ হইল, ঠিক সেই সময় পটলবাবু আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। পটলবাবু সাহিত্যরসিক ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের গান খুব ভালোবাসিতেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন—'আপনি লিখছেন নাকি? তা হলে আমি যাই।' বলিলাম—লেখা শেষ হয়ে গেছে। শুনবেন?

'নিশ্চয়।'

পটলবাবু বসিয়া পড়িলেন সামনের চেয়ারটায়। তাঁহাকে গল্পটি পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন—প্লটটি সুন্দর। এটিকে আরও বড করুন। ইহাতে উপন্যাসের মালমশলা আছে।

এই বড় গল্পটি পরে 'দ্বৈরথ' উপন্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছিল। লেখা শেষ হইবার পরই সজনীকে খবর দিলাম। শরদিন্দুকেও খবর দিলাম। শরদিন্দু মুঙ্গেরে থাকিত। সে-ও একজন উঁচুদরের রসিক ও লেখক ছিল। সেও 'শনিবারের চিঠি'-তে 'চন্দ্রহাস' ছদ্মনামে লিখিত। সে নিজেই একদিন ভাগলপুরে আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়াছিল। আমি মুঙ্গেরে তাহার বাড়ি গিয়া তাহার লেখা শুনিতাম। তাহার বাবা, মা, ভাই, তাহার বউ, ভ্রাতৃবধু, তাহাদের ছেলেমেয়ে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল আমার। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারটির প্রতি সত্যই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাদের আত্মীয়বৎ মনে করিতাম। তাই শরদিন্দুকে লিখিতে দ্বিধা হইল না—আমি একটা উপন্যাস লিখিয়াছি, তুমি আসিয়া শুনিয়া যাও। সজনীকেও আসিতে লিখিলাম। সজনীর চিঠি পাইলাম,'আমি অমুক তারিখে যাইতেছি। তারিখটি শরদিন্দুকেও জানাইয়া দিলাম। তাহারা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। লীলা তাহাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে লাগিল। আমি তাহাদের সম্মুখে বসিয়া উপন্যাসটি পড়িয়া ফেলিলাম। তাহারা মাঝে মাঝে এখানে, ওখানে কিছু রদবদলের পরামর্শ দিল, কিন্তু উভয়েই এক মত দিল যে, গল্পটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বইটির নাম কি হইবে, ঠিক করি নাই। আমি বলিলাম 'অহিনকুল' দিলে কেমন হয়। শরদিন্দু মাথা নাড়িল, না, অন্য নাম দিতে হইবে। আমার উপর ও ভারটা ছাড়িয়া দাও। আমি ভাবিয়া পরে তোমাকে জানাইব। শরদিন্দু চলিয়া গেল। সজনী যাইবার সময় বলিয়া গেল হরিদাসবাবু যদি উপন্যাসটি তাঁহার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চান, সেইখানেই দিও। কয়েকদিন পরেই শরদিন্দুর চিঠি পাইলাম—সে লিখিয়াছে, তোমার বই-এর নামকরণ করিলাম

'দ্বৈরথ'। অটলবাবুকে বইটি শুনাইবার বাসনা ছিল, কিন্তু তিনি ওকালতি, পলিটিকস্ এবং নিজের বিষয়সম্পত্তি লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাঁহার নাগাল পাইলাম না। কিছুদিন পরেই হরিদাসবাবুর নিকট হইতে পত্র পাইয়া 'দ্বৈরথ' উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষে' পাঠাইয়া দিলাম।

আগে কবিতা এবং ছোট গল্প লইয়া মত্ত থাকিতাম। এবার উপন্যাস লিখিবার নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। কিছুদিন পরেই আর একটি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলাম—'বৈতরণীতীরে'। সেটিও হরিদাসবাবুকে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি এটি ভারতবর্ষে না ছাপিয়া কিছুদিন পরে পুস্তক-আকারেই প্রকাশ করিলেন। এই উপন্যাসটিতে আমি বীভৎস রস ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল, বীভৎস রসের উপন্যাস বড় একটা নাই—চেষ্টা করিয়া দেখি, পারি কিনা। রবীন্দ্রনাথ বইটির প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই উঠিয়া পড়িয়া, সাহিত্য সাধনায় লাগিয়া পড়িলাম। লিখিবার জন্য তাগাদাও নানা-স্থান হইতে আসিতে লাগিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর পত্রিকা আমার নিকট গল্প চাহিতে লাগিল। ল্যাবরেটরির কাজের জন্য দিনেরবেলা লিখিতে পারিতাম না। কিছুদিন সন্ধ্যার পর ল্যাবরেটরিতে বসিয়াই লিখিয়াছি। কিন্তু দেখিলাম, আমাকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিলেই লোকসমাগম হয়। অনেক ভদ্রলোক সময় কাটাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের গল্প (যাহার সহিত আমার কিছুমাত্র সংস্রব নাই) অনবরত শুনাইতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিয়াছি, সাধারণ লোকে আত্ম-আস্ফালন করিতে বড় ভালোবাসে। নিজের ছেলেমেয়ের গল্প, জামাইয়ের গল্প, তাহার মনিব তাহাকে কত ভালোবাসেন, তাহার গল্প - এই সব গল্প কয়েকদিন শুনিবার পর স্থির করিলাম, সন্ধ্যার পর আর ল্যাবরেটরিতে বসিব না। ইহার পর লিখিবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলাম, তাহা সাধারণতঃ কেহ করে না। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় খাইয়া ৭টা নাগাদ শুইয়া পড়িতাম। ঘড়িতে এলার্ম দিয়া উঠিতাম রাত্রি ১টার সময়। একটা হইতে রাত্রি ৪টা পর্যন্ত। (কোন কোন দিন পাঁচটা পর্যন্ত) লিখিতাম। তাহার পর আবার শুইয়া পড়িতাম। উঠিতাম বেলা আটটার সময়। তখন প্রাতরাশ করিয়া ল্যাবরেটরিতে চলিয়া যাইতাম। সঙ্গে লেখার খাতা থাকিত। সময় পাইলে সেখানেও লিখিতাম। আমার ল্যাবরেটরির মেথর সীতাবি বাজার করিয়া আনিত। আমি যাহা রোজগার করিতাম, সব লীলাকে দিয়া দিতাম।

সংসারের সব ঝড়-ঝাপটা লীলাই সামলাইত। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমাকে সে বিরক্ত করিত না। আমার সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না কেয়া, অসীম তো ছিলই, কিছুদিন পরে রঞ্জুরও জন্ম হইল ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে। তা ছাড়া আমার ভাইরা ছিল। তাহারা আমার বাসায় থাকিয়া স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করিত। বাবা, মা মাঝে মাঝে আসিয়া আমার কাছে থাকিতেন বাড়িতে অতিথিবর্গের ভিড়ও ছিল। আমি মাঝে মাঝে আমার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতাম। সব ঝঞ্ঝাট লীলাই পোহাইত। এই সময়ই সাহিত্য-চর্চা করিয়া কিছু কিছু উপার্জনও হইতে লাগিল। হরিদাসবাবু বেশ কিছু টাকা দিলেন। কয়েকটি মাসিকপত্রও আমার গল্পের জন্য টাকা পাঠাইতে লাগিল। সাহিত্য-চর্চা করিয়া যে অর্থাগম হইবে, এ কথা কখনও ভাবি নাই কিন্তু, সেই অর্থ যখন আপনি আসিতে লাগিল, তখন পুলকিত হইলাম। লেখার বেগ বাড়াইয়া দিলাম। এই সময় সজনী প্রায়ই ভাগলপুর যাইত। উদ্দেশ্য আমার সাহিত্য-প্রেরণার বহ্নিকে উৎসাহের হাওয়া দিয়া আরও প্রজ্জলিত করা। ও যখন আসিত, তখন আমি উহাকে আনিতে স্টেশনে যাইতাম। কলিকাতা হইতে ট্রেণটা তখন খুব ভোরে পৌঁছাইত। যতদূর মনে পড়িতেছে, ভোর সাড়ে চারটায়। একবার খবর পাইয়া সজনীকে আনিতে স্টেশনে গিয়াছি, শুনিলাম ট্রেণ লেট আছে। আমি সাড়ে তিনটা নাগাদ স্টেশনে পৌঁছিয়াছিলাম। ট্রেণ লেট শুনিয়া ওভারব্রিজের উপর উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। দেখিলাম দুইটি প্ল্যাটফর্মে নানাজাতের প্যাসেঞ্জাররা ট্রেণের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। অনেকে অনেকের ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, অনেকে আবার ঝগড়াও করিতেছে। হঠাৎ 'কিছুক্ষণ' গল্পের আভাসটি আমার মনে যেন বিদ্যুৎ-চমকের মত খেলিয়া গেল। আমি ওভার-ব্রিজের উপর পায়চারি করিতে করিতেই এই কল্পনাটির উপর তা দিতে লাগিলাম। অনেকদিন তা দিতে হইয়াছিল। তাহার পর গল্পের শাবকটি অণ্ড হইতে বাহির হইয়া পড়িল একদিন। কিছু সময় লাগিয়াছিল।

এই সময় ভাগলপুরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। আদমপুরের রাজবাড়ি ভাগলপুরের বাঙালী-সমাজ একটি বিখ্যাত স্থান। রাজবাড়ি রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তিনি ছিলেন উকিল; কিন্তু, নিজ প্রতিভাবলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। সে অর্থ শুধু তিনি নিজে ভোগ করেন নাই ভাগলপুরের জনসাধারণের হিতার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্তি দুর্গাচরণ হাইস্কুল, মোক্ষদা গার্লসস্কুল, হাসপাতালে শিবতারিণী ওয়ার্ড

টি. এন. জুবিলি কলেজেও তাঁহার অনেক দান। তাঁহার এই সব কৃতিত্বের জন্য সেকালে তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। আমি যখন ভাগলপুরে যাই, তখন তাঁহার পৌত্রেরা সেখানে ছিলেন। পৌত্রেরা অবশ্য পিতামহের মতো কৃতী ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন বড়লোকের আদুরে নাতি। তাঁহারাই তাঁহাদের বাড়ির সামনের এক টুকরো জমি সস্তায় বিক্রয় করিয়া দেন এবং সেই জমির উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ভবন নির্মিত হয়। বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায় এবং ভাগলপুরের বিখ্যাত উকিল শ্রীরঞ্জিতকুমার সিংহের উদ্যোগে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পর হইতে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে সংযুক্ত হইলাম। ক্রমশঃ সেখানে কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য হইলাম। তাহার পর—অনেকদিন পর সভাপতি হইলাম। যতদিন ভাগলপুরে ছিলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলাম। ভাগলপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে গিয়া প্রথমেই দুইখানি অমূল্য পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইলাম। (একটি শিবনাথ শাস্ত্রীর (?) লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ' আর একটি দীনেশ সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ'। কিছুদিন পরে, ভাগলপুরে আর একটি ব্যাপার প্রায়ই করিতে হইত। সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তো বটেই, ওখানকার টি. এন. জুবিলি কলেজে, মাড়োয়াড়ি কলেজ (এবং পরে মেয়েদের কলেজ) প্রতি বৎসর যে সব সাহিত্য-সভা হইত, তাহাতেও আমাকে কর্ণধার হইতে হইত। আমিই শেষে তাহাদের বলি—বাহির হইতে সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনুন, আমি একা কতবার সভাপতিত্ব করিব। তাঁহারা আমার উপরই সভাপতি নির্বাচন করিবার ভার দিতেন। যে সব সাহিত্যিকেরা আমার নিমন্ত্রণে আসিতেন, সাধারণতঃ আমারই বাড়িতে তাঁহারা আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের সহিত একটা অন্তরঙ্গতা হইয়া যাইত। এইরূপে তদনীন্তন বঙ্গসাহিত্যের নামজাদা সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার ভাব হইয়া গেল। আমি নিজের ঘরে বসিয়াই তাহাদের আপনজন হইয়া গেলাম। তাহাদের আড্ডায় যাইবার কোন প্রয়োজন হইল না। কলিকাতায় যখন আসিতাম, তখন সজনীর বাড়িতে কিম্বা হোটেলে উঠিতাম। সেজন্য সাহিত্যের বিশেষ কোনও গোষ্ঠীর সহিত যুক্ত হইবার প্রয়োজন হয় নাই। 'শনিবারের চিঠি'তে অনেকদিন লিখিয়াছি, কিন্তু শনিবারের চিঠির দলভুক্ত ঠিক ছিলাম না। আমি সেখানে লেখকমাত্র ছিলাম। সে-কাগজের নীতি-নিয়ন্ত্রণে আমি কোনদিন অংশগ্রহণ করি নাই। তবে সজনীকান্তের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সজনীর ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল

আমাকে। সে আমার প্রকৃত হিতৈষী ছিল। ক্রমশঃ সে আমার ঘরের লোক হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু বে-পরোয়া ছিল বলিয়া তাহাকে আরও ভালো লাগিত। একটা উদাহরণ মনে পড়িতেছে। সেটা বোধ হয়, এই সময়েই ঘটিয়াছিল। আগেই বলিয়াছি, সজনী সময় পাইলেই ভাগলপুরে আমার কাছে চলিয়া যাইত। সেবার ব্রজেন দত্ত ভাগলপুরে গিয়া আলাদা একটি বাড়িভাড়া করিয়া সস্ত্রীক সেখানে ছিলেন। সজনীকে লইয়া আমি সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে ভাগলপুরের গড়ের মাঠ স্যানডিস কম্পাউণ্ডে গিয়া হাজির হইলাম। সুন্দর হাওয়া দিতেছিল, আমরা দুইজনে মাঠে ঘাসের উপর গিয়া বসিলাম। দেখিলাম, পূর্বাকাশে চাঁদ উঠিতেছে। সেদিন বোধ হয়, শুক্লা-ত্রয়োদশী কিম্বা চতুর্দশী ছিল। কয়েকমুহূর্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। ইহার পরই মনে হইল, এবং সেটি তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলাম—'ভাই, শুনেছি নাকি চন্দ্রালোকে তাজমহল অতি সুন্দর দেখতে। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা আর দেখা হবে না।'

সজনী সঙ্গে সঙ্গে বলিল—'চল, কালই চল।'

'টাকা কোথায়? আমার তো ব্যাংক-ব্যালান্স নেই।'

'আমার টাকা আছে। আমি 'মুক্তি' নামে একটা-সিনেমা-গল্পের Script লিখে ৫০০ টাকা পেয়েছি। সেটা আছে আমার কাছে। কালই বেরিয়ে পড়ি চল—'

আমি বলিলাম, 'না ভাই, তোমার টাকা খরচ করে আমি যাব না। তা ছাড়া আমি একা যেতে চাই না। লীলা আছে, লীলার বোন ছায়াও রয়েছে। তাদের কার কাছে রেখে যাব?'

'চল, বাড়ি গিয়ে পরামর্শ করা যাক। টাকা আমি দেব। তুমি পরে শোধ কোর। টাকার জন্যে ভেবো না।

সজনীর এই 'কুছ পরোয়া নেই' ভাবটাই আমার বড় ভাল লাগিত। বাড়ি আসিয়া লীলাকে বলিলাম। লীলা বলিল, 'আমাকে যদি লইয়া যাইতে চাও, মা-বাবাকেও সঙ্গে লইতে হইবে। মা-বাবাকে ফেলিয়া আমি যাইতে পারিব না। ছায়াও সঙ্গে যাইবে।' মা-বাবা তখন বরারিতে ভোলার বাসায় ছিলেন। মায়ের তখন কোমরে খুব ব্যথা, 'শায়াটিকা' হইয়াছে। মা সোৎসাহে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—'আমি যাইব'। সজনী বলিল—আমি তাহা হইলে কলিকাতায় গিয়া সুধা, খোকন এবং উমাকে লইয়া আসি। আরও কিছু টাকাও

আনিতে হইবে। কারণ, দল বেশ ভারি হইয়া গেল। পাঁচ শ' টাকায় কুলাইবে না। ব্রজেন দত্ত সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গী হইলেন।

ঠিক হইল, আমি সকলকে লইয়া গয়া চলিয়া যাইব। সজনী সপরিবারে আগ্রাগামী ট্রেনে চড়িয়া গয়া আসিবে, আমরা সেই গাড়িতে উঠিব। তাহাই হইল।

এই ভ্রমণকাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দিব না। একটি ঘটনা কেবল উল্লেখ করিতেছি। আগ্রা গিয়া পৌঁছাইলাম সন্ধ্যার একটু আগে। ব্রজেনদা ইতিপূর্বে আগ্রা আসিয়াছিলেন, তিনি আমাদের তাঁহার পূর্বপরিচিত একটি হোটেলে লইয়া গেলেন। সেখানে চার্জ শুনিলাম, জনপ্রতি তেরো টাকা করিয়া। সেকালের পক্ষে চার্জটা একটু বেশি মনে হইল। কিন্তু ব্রজেনদার পরিচিত হোটেল, আমরা আপত্তি করিলাম না। আমি কেবল হোটেলের মালিককে প্রশ্ন করিলাম, পেট ভরিয়া খাইতে দিবেন তো? তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' সেদিন রাতেই কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিলেন না। সজনী এবং আমি যখন তৃতীয়বার ভাত লইয়া তৃতীয়বার মাংস চাহিলাম, তখন পাচক আসিয়া বলিল, সব ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, ম্যানেজারকে ডাক, এ রকম কথা তো ছিল না। ম্যানেজার আসিলেন। আমার এবং সজনীর উচ্চকণ্ঠে হোটেলের অন্যান্য বোর্ডাররাও আসিয়া দরজায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজারকে আমরা বলিলাম, আমরা আধপেটা খাইয়া শুইতে চলিলাম। কালই আপনার বোর্ডিং ত্যাগ করিব।

ঐতিহাসিক ব্রজেনদা বলিলেন—বহুপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রও এই হোটেলে আসিয়াছিলেন এবং অনুরূপ কারণে হোটেলের ম্যানেজারের সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছিল। এ ঘটনা আমি পূর্ববর্তী ম্যানেজারের মুখে শুনিয়াছি। তোমরাও সেই সাহিত্যিক ঐতিহ্য রক্ষা করিলে। কাল, অন্য হোটেলে উঠিয়া যাইও। আমি কিন্তু তোমাদের সহিত থাকিব না। আমি এখান হইতে মথুরা, বৃন্দাবন হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।

আগ্রা হোটেলে নাবিয়াই অবশ্য আমরা তাজমহল দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সে বর্ণনাটা আর দিলাম না। সংক্ষেপে বলিতেছি—স্বপ্নের সমুদ্রে যেন অবগাহন করিলাম। তাহার পরদিন উঠিতে একটু বেলা হইল। উঠিয়া দেখিলাম, হোটেলের সম্মুখে কয়েকজন বাঙালী যুবক দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আসিয়া বলিল—শুনিলাম, এই হোটেলে বনফুল, সজনীকান্ত দাস এবং ব্রজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়াছেন। তাঁহারা আগ্রায় আসিয়া হোটেলে থাকিবেন, এটা আগ্রাবাসী বাঙালীদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর।

তখন আত্মপরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনারা কি করিতে চান ?

—আমরা একটি বাড়ি ঠিক করিয়াছি, সেইখানে আপনাদের লইয়া যাইতে চাই। আপনাদের সমস্ত খাওয়ার ভারও আমরা লইব।

দেখিলাম, ভদ্রলোকেরা নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাঁহাদের প্রস্তাবে আমরা রাজি হইলাম। তাঁহাদের মধ্যে তারাশঙ্করের একজন আত্মীয়ও ছিলেন। যতদূর মনে পড়িতেছে, তারাশঙ্করের ভাগিনেয়। তিনিই একটা ঘর আমাদের জন্যে ঠিক করিয়া দিলেন। দ্বিতলের উপর গিয়া আমরা আস্তানা গাড়িলাম। সেদিন বৈকালে একটা সাহিত্যসভারও আয়োজন করিলেন তাঁহারা। ব্রজেনদা সন্ধ্যার ট্রেনে চলিয়া গেলেন। আমরা সেই বাসায় আসর জমাইলাম। অনেক বাঙালী-বাড়ি হইতে আমাদের জন্য রান্না খাবার আসিতে লাগিল। আগ্রাবাসী বাঙালীদের সেই আতিথেয়তার কথা আজও মনে আছে। সেখানে দুই-তিনদিন থাকিবার পর যখন আমরা ফিরিবার উপক্রম করিলাম, তখন একজন ভদ্রলোক বলিলেন—এতদূর আসিয়াছেন, হরিদ্বারটা অন্ততঃ দেখিয়া যান। অকপটে সত্যিকথাই বলিলাম—আমাদের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন—টাকার জন্যে ভাবনা কি ? যত টাকা লাগে, আমরা দিচ্ছি, আপনারা গিয়া পাঠাইয়া দিবেন। তখন আমরা স্থির করিলাম, তাহা হইলে যাওয়াই যাক। তাঁহার নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ করিয়া আমরা হরিদ্বার রওনা হইলাম। আমার ভাইকে চিঠি লিখিয়া দিলাম, ভদ্রলোককে টাকাটা যেন T. M. O. করে দেয়। সে যাত্রায় আমরা হরিদ্বার, হৃষীকেশ এবং লছমনঝোলা দেখিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলাম। নতুনরকম একটা অভিজ্ঞতা হইল। নতুন উৎসাহে আবার লেখা শুরু করিলাম। সজনীর নিকট কিছু ধার হইয়া গিয়াছিল, ঠিক করিলাম, লেখা দিয়াই সেগুলি শোধ করিয়া ফেলিব। সজনী বলিল, তুমি লেখা হইলেই আমাকে পাঠাইয়া দিবে, আমি কোথাও না কোথাও সেগুলি বিক্রয় করিয়া দিব। অনেক ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম সেই সময়। আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অলকা, সচিত্র ভারত প্রভৃতি কাগজে গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির নাম আমার মনে নই। এই সময়ই আমি ভারতবর্ষেও নিয়মিত লেখক হইয়াছিলাম। 'দ্বৈরথ' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে সেখানে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে আমার মনে যেন প্রেরণার একটা জোয়ার আসিয়াছিল। প্রতিদিনই রাত্রে

লেখার টেবিলে বসিতাম। ইহার পরই বোধ হয় 'নির্মোক' বইটা লিখিতে শুরু করি। আমার আজিমগঞ্জ-জীবনের কিছু ছাপ 'নির্মোক' বইটাতে আছে। 'নির্মোক' পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে আর একটি ঘটনাও ঘটিল। মোক্ষদা গার্লস স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা স্থির করিলেন যে, তাঁহারা মেয়েদের জন্তে কলেজও খুলিবেন। সন্ধ্যার পর সেখানে কলেজ বসিবে। তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যাপকরা বিনা-বেতনে পড়াইতে সম্মত হইলেন। প্রথমে 'আর্টস' বিভাগ আরম্ভ হইবে। আই. এ. ক্লাসে অনেকগুলি মেয়ে ভরতি হইল। কর্তৃপক্ষ আমাকেও অনুরোধ করিলেন, আমি যেন তাঁহাদের বাংলাটা পড়াইয়া দিই। আমি সম্মত হইলাম। সে বৎসর যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী নাট্যতালিকার মধ্যে ছিল। ছাত্রীদের সে বইটি আমাকে পড়াইতে হইয়াছিল। পড়াইতে গিয়া দেখিলাম, জীবনচরিতে কবি মধুসূদনের জীবন্ত মূর্তি ঠিক যেন ফোটে নাই। আমার ইচ্ছা হইল, আমি সেটি ফুটাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু, সে কি উপায়ে? উপন্যাস লিখিব, না নাটক? বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায় উপদেশ দিলেন, যদি পারেন, নাটক লিখুন। আমি লাগিয়া পড়িলাম। সজনীকে পত্র লিখিলাম, কবি মধুসূদনকে জীবন্ত করিতে হইলে কি কি বই পড়া দরকার? সজনী আমাকে কিছু বই পাঠাইয়া দিল। ভাগলপুরেও আমি কিছু বই জোগাড় করিয়া ফেলিলাম। অনেক পড়াশুনা করিয়া 'শ্রীমধুসূদন' নাটক শুরু করিয়া দিলাম। অমূল্যবাবু প্রায়ই সন্ধ্যায় পর আসিতেন এবং আমি যেটুকু লিখিয়াছি, শুনিয়া যাইতেন। খুব উৎসাহ দিতেন তিনি। যেখানটা খটকা লাগিত, অকপটে বলিতেন এবং আমি তাহা সংশোধন করিয়া লইতাম। লেখা শেষ হইলে, কলিকাতায় চলিয়া গেলাম, সজনীকে লেখাটা শুনাইবার জন্তে। সজনী মহা খুশী। সে একটা কথা বলিয়াছিল। এখনও মনে আছে—I envy you. ফিরিবার সময় লেখাটা 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক ফণীর হাতে দিয়া আসিলাম। 'শ্রীমধুসূদন' ভারতবর্ষে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'নির্মোক' বইটি আগেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক ব্রজেনদা 'প্রবাসী'-তে ছাপিবেন বলিয়া তাহার পাণ্ডুলিপিটি আমার নিকট হইতে লইয়া গেলেন। বলিলেন, পরের মাস হইতেই ছাপিব। কিন্তু তাহা হইল না। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের কোনও কন্যার (শান্তা দেবী বা সীতা দেবী, ঠিক মনে নাই) একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'নির্মোক' প্রবাসী আপিসে পড়িয়া রহিল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আমার 'দ্বৈরথ' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল। সেটি পুস্তকাকারে

প্রকাশিত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের প্রকাশভবন হইতে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িতেছে। 'দ্বৈরথ' পুস্তকটি আমার মায়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। হরিদাসবাবু আমাকে রয়ালটি বাবদ একশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। আমি ঠিক করিলাম, টাকাটাও মাকে দিব। মা কিন্তু টাকা লইতে চাহিলেন না। বলিলেন, 'আমি টাকা নিয়ে কি করব বাবা? আমার যা অভাব, তোমরাই তো মিটিয়ে দিচ্ছ। টাকা নিয়ে আমি করব কি?' মায়ের অর্থলোভ একেবারেই ছিল না, তিনি জীবনে কখনও সঞ্চয় করেন নাই। আমার বাবা আমাদের বড় আমবাগানটা তাঁহার নামে লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, মা তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—তুমি আমার ছেলেদের উপর অবিশ্বাস করিতেছ কেন? তোমার অবর্তমানে তাহারা আমাকে অযত্ন করিবে, এ চিন্তা তোমার মনে আসিতেছে কেন? নির্লোভ, নিঃস্বার্থপর, তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন তিনি। আমি মাকে বলিলাম, 'তোমার দরকার নাই জানি, কিন্তু তোমার নামে উৎসর্গ করা বইতেই তো এই আমার প্রথম উপার্জন। তুমি যদি টাকাটা লও, আমার বড় আনন্দ হইবে।'

মা বলিলেন,—'টাকা লইয়া আমি করিব কি?'

'কোনও তীর্থ ঘুরিয়া এস।'

অনেক জেদাজেদির পর মা টাকাটা লইলেন এবং বাবাকে লইয়া পুরী চলিয়া গেলেন।

ইহার পর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স হইতে 'বনফুলের আরও গল্প' এবং 'কিছুক্ষণ' প্রকাশিত হইল।

এই সময় বন্ধু, পরিষদ, শনিবারের চিঠির ও শনিরঞ্জন প্রেসের কর্মকর্তা সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, শনিবারের চিঠির জন্য একটি প্রহসন লিখুন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে এই সময় 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটিও লিখিতে শুরু করিলাম। সে বারবার তাগাদা না দিলে এ নাটক লিখিতাম না বোধ হয়। কিছুদিন আগে সুবল মারা গিয়াছে। তাহার মত চালাক, চতুর, বশম্বদ এবং কর্মক্ষম বন্ধু আমি বড় একটা দেখি নাই। আমরা যখন আগ্রা গিয়াছিলাম, সে সঙ্গে ছিল। সে না থাকিলে, আমার কনিষ্ঠ পুত্র চিরন্তনকে ( রন্তু ) লইয়া বিপদে পড়িতাম। চিরন্তন তখন খুব শিশু, হাঁটিতে পারে না। সুবলই তাহাকে সর্বদা কোলে বহন করিয়াছে। সুবল আজ নাই, তাহার স্মৃতি মনকে ভারাক্রান্ত করিতেছে। সে উপীনদার ( সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ) বৈবাহিক ছিল। উপেনদার ছেলের সহিত তাহার একমাত্র মেয়ের বিবাহ হয়।

এই সময় আমি একটি বড় উপন্যাসও আরম্ভ করি। তখনকার জীবনস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে অসংখ্য চরিত্র আমি দেখিয়াছি বা কল্পনা করিয়াছি, তাহাদের লইয়া আমি 'জঙ্গম' শুরু করিয়া দিলাম। 'জঙ্গম' লিখিয়া শেষ করিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। সজনী মাঝে মাঝে আসিয়া শুনিয়া যাইত এবং আমাকে খুব উৎসাহ দিত। 'জঙ্গম' উপন্যাসে একটি কোন সুগঠিত প্লট নাই। ইহা একটি লোকের জীবনপ্রবাহের চতুর্দিকে নানাবিধ চরিত্রের আবর্তন ও বিবর্তন। বস্তুতঃ, জঙ্গমে আমি তদানীন্তন সমাজের বহুমুখী চিত্তবৃত্তিকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। 'জঙ্গম' উপন্যাস শেষ পর্যন্ত একটা বড় আর্ট গ্যালারি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সমালোচক বইটিকে বহু চরিত্রের মিছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'জঙ্গম' বইটিও ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সময়টা আমি যেন একটা উন্মাদনার মধ্যে থাকিতাম। সমস্ত দিন ল্যাবরেটরির কাজ এবং রাতে সাহিত্যসাধনা। সংসারের সমস্ত ঝক্কি লীলার উপর। আমি যেন স্বপ্নজগতে বাস করিতাম তখন।

সংসার ক্রমশঃ বড় হইতেছিল, খরচও বাড়িতেছিল। বর্তমানের তুলনায় খরচ তখন অবশ্য খুব কম ছিল। ভালো প্রথম শ্রেণীর কাতার্নি (কাটারিভোগ) চাল ছিল আট টাকা মণ, পাকা রুইমাছ ছিল আট আনা সের, খাঁটি ঘি ছিল টাকায় চৌদ্দ ছটাক, দুধ টাকায় পাঁচ সের। তরি-তরকারি কোনটাই চার-আনা সেরের বেশি নয়। কিন্তু, আয়ও অবশ্য কম ছিল। আমি ল্যাবরেটরি হইতে মাসে তিন শত বা খুব বেশি হইলে চারি শত টাকা রোজগার করিতাম। লেখা হইতেও কিছু কিছু টাকা পাইতেছিলাম। ইহাও আমাকে সাহিত্যকর্মে আরও বেশি উৎসাহিত করিতেছিল। কিন্তু, উৎসাহের আসল উৎস ছিল, সজনীকান্ত এবং পরিমল। শনিবারের চিঠির নিরন্তর চাহিদার জন্য আমাকে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। নানাধরণের লেখা লিখিয়াছি শনিবারের চিঠিতে। অনেক লেখার নাম থাকিত না, অনেক লেখায় 'বনফুল' ছাড়াও অন্য ছদ্মনাম ব্যবহার করিতাম। তবে, অধিকাংশ লেখাই 'বনফুল' নামে লিখিয়াছি।

আমি ভাগলপুরে ডাক্তারি করিতে করিতে সাহিত্য-সেবা করিতাম। সজনীকান্ত এবং তাহার দলের লোক ছাড়া অন্য কাহারও সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। শরদিন্দুর সহিত আমার পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। সজনী আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের,

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সহিত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সহিত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, কবি শান্তি পালের সহিত, নিখিল দাসের সহিত, প্রমথনাথ বিশীর সহিত, নীরদ চৌধুরীর সহিত, শিল্পী হরিপদ রায়ের সহিত, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ ( ভাস্কর ) মহাশয়ের সহিত, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এবং আরও অনেক বিদগ্ধ গুণীর সহিত, যাঁহাদের নাম এখন মনে পড়িতেছে না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভাগলপুরে আমার বাড়িতে গিয়াছিলেন পরে। অনেকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতাও হইয়াছিল। সজনীর মাধ্যমেই অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল দে এবং কবি মোহিতলালের স হিত আমার পরিচয় ঘটিযাছিল। ইহারাও পরে আমার বাড়িতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন একদল 'বোহিমিয়ান' সাহিত্যিক ছিলেন। ইহাদের অনেকেরই কোনও সুনির্দিষ্ট পেশা বা চাকুরি ছিল না। কোনও সাময়িকপত্রের অফিসে, বা গ্রামোফোনের দোকানে বা অন্য কোথাও ইহারা অনিশ্চিত চাকুরি করিতেন। ইহাদের সঙ্গে অ'মার আলাপ করিবার তেমন সুযোগ হয় নাই। তবে সজনীর আফিসে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যাযের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সে আলাপ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সে 'গল্পভারতী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিল। তাহার অনুরোধে 'গল্পভারতী'তেও অনেক লেখা দিতাম। নৃপেনও ভাগলপুরে গিযাছিল। তাহাব লেখার হাতটি বড় মিষ্টি ছিল। পণ্ডিত লোকও ছিল সে। অনেক পড়াশোনা ছিল। সেই সময় আরও তিনজন লেখকের গল্প আমার ভালো লাগিত। রমেশচন্দ্র সেন, জগদীশ গুপ্ত এবং মণীন্দ্রনাথ বসু। তাঁহার 'রমলা' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। জগদীশ গুপ্তেব গল্পে একটা অসামান্য অনন্যতা আছে। তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। 'প্রবাসী'-তে মাঝে মাঝে তাঁহার লেখা পড়িতাম। খুব ভালো লাগিত। রমেশচন্দ্র সেনের সহিত শেষ বয়সে যখন দেখা হয, তখন তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্পগুলি চমৎকার। আমার আর একজন প্রিয় লেখক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বড় উ'কলও ছিলেন। একবার ভাগলপুর আদালতের কাজে তিনি গিয়াছিলেন। সেই সময় আমার বাড়িতে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। সে যুগের 'বিদ্রোহী' লেখকদের মধ্যে তাঁহার নাম ছিল। তাঁহার 'মেঘনাদ' বইটি নাম করিয় ছিল সেকালে। এখন সে 'মেঘনাদ'কে লোকে ভুলিয়াছে। মাইকেলের মেঘনাদকে কিন্তু ভুলিতে পারি নাই।

এই সময় আমার জীবনে একটি পরম সৌভাগ্য উদিত হইয়াছিল। এই

সময় আমি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। কি করিয়া আসিলাম, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমি আমার 'রবীন্দ্রস্মৃতি' বইটিতে দিয়াছি। এখানে সে সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু শুধু বলিতে পারি, আমি অনাহূত যাই নাই, রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে সপরিবারে গিয়াছিলাম। একবার নয়, বার বার। কবি রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিলাম তাঁহার বিপুল সৃষ্টির মধ্যে, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিলাম তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া। বুঝিতে পারিলাম, প্রকৃত আভিজাত্যের স্বরূপ কি। তাহা অর্থের ঝঙ্কার নহে, তাহা মহত্ত্বের প্রকাশ। সেই মহত্ত্বে অবগাহন করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত তাঁহার শেষ জীবনে আমার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাহাই আমার জীবনের একটি পরম সম্পদ হইয়া আছে।

এই সময় পৃথিবীর রাজনৈতিক জগতের খুব ডামাডোল কাণ্ড ঘটিতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তর্জন-গর্জন কাগজের মারফৎ শুনিতে পাইতেছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসও তখন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। এই সময়ই বোধ হয়, আমার নাটক শ্রীমধুসূদন পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হয় ডি. এম. লাইব্রেরী হইতে। আমার বাবার মামাতো ভাইয়ের জামাতার ( অমর ভট্টাচার্য ) সহিত ডি. এম. লাইব্রেরীর মালিক শ্রীগোপালদাস মজুমদারের ( প্রকাশকজগতে গোপালদা নামে সুপরিচিত) বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা আমার ভাগলপুরের বাড়িতে আসিয়াছিলেন বইটি লইবার জন্য। মনে পড়িতেছে, প্রথম সংস্করণের জন্য আমাকে আড়াইশো টাকা দিয়াছিলেন। বইটি প্রকাশিত হইবার পর আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী হঠাৎ একদিন ভোরবেলার ট্রেনে আমার কাছে আসিয়া হাজির। তাঁহার পকেটে আমার নাটক শ্রীমধুসূদন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—'এসেছি কবির দ্বারে—'। তাহার পর বলিলেন, 'অনেকদিন আগে 'রূপকথা' নাটক শুনে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, আপনি ভালো নাটক লিখতে পারবেন। আমার সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। আমি আপনার 'শ্রীমধুসূদন' অভিনয় করব।' এ কথা শুনিয়া আমি একটু অসুবিধায় পড়িলাম। কারণ, কয়েকদিন পূর্বে সতু সেন নামক এক ভদ্রলোককে নাটকটি অভিনয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলাম। শিশিরবাবুকে সে কথা বলিলাম এবং তাহার হাতে সতু সেনের নামে একটি পত্র দিলাম যে, তিনি যেন আমার নাটক অভিনয় না করেন। শিশিরবাবুই আমার নাটকের অভিনয় করিবেন। শিশিরবাবু চিঠি লইয়া পরের ট্রেনেই ফিরিয়া গেলেন এবং পরে আমাকে জানাইলেন যে,

তিনি সতু সেনের নাগাল পাইতেছেন না। তিনি অবশেষে নিজেই একটি 'মাইকেল' লিখিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। আমার শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগরের নকলে অনেকগুলি নাটক লেখা হইয়াছিল। কিন্তু, সে সব নাটকে নকল-নবিশী প্রতিভা ছাড়া অন্য প্রতিভা দেখা যায় নাই। অনেকে নির্লজ্জের মত আমার সৃষ্টি-চরিত্র এবং আমার লেখা-সংলাপগুলিও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আরও অনেকের জীবনী লইয়া আমার নাটক লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, চোরদের ভয়ে আর লিখি নাই। বর্তমান যুগেও থিয়েটার ও সিনেমার জগতে অনেক চোরের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। স্বদেশী, বিদেশী নানা নাটক মারিয়া নাট্যকার হইয়াছেন তাঁহারা। হায়, হায়।

আমার শ্রীমধুসূদন নাটক প্রথম অভিনয় করেন, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররা। তাহার পর, ডাক্তাররা। ডাক্তারদের অভিনয় অতি চমৎকার হইয়াছিল। আমি ভাগলপুর হইতে আসিয়া দুইটি অভিনয়ই দেখিয়াছিলাম। আমার শ্রীমধুসূদন রেডিওতেও অনেকবার অভিনীত হইয়াছে। অ্যামেচার থিয়েটারের দলও মাঝে মাঝে অভিনয় করিয়াছেন। এখনও করেন। চোরদের নাম ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। সাহিত্যজগতে সর্বত্রই চোরেরা বর্তমান। এ দেশে একটু যেন বেশি।

যদিও আমি প্রকাশ্যভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত ছিলাম না, কিন্তু, রাজনীতির প্রভাব আমার মনে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। মনে মনে আমি কংগ্রেসী ছিলাম, মহাত্মা গান্ধীর উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল, তবু, সে সময় খুব বড় আঘাত পাইয়াছিলাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইলেন। তখন, কেমন যেন আবছাভাবে মনে হইল, মহাত্মাজী একটি অবাঙালী দলের নেতা এবং সে দলে বাঙালীদের প্রভুত্ব চলিবে না। গান্ধীজির এই দলটিই পরে ভারতকে দুই ভাগ করিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা লইয়াছিলেন। এই দলই পরে গদিতে বসিয়া সীতারাম পট্টভিকে দিয়া যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙালী শহীদদের সম্মানের স্থান নাই। স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে যে সরকারী ইতিহাস লেখা হইয়াছে, তাহাতেও অগ্নিযুগের সম্মানজনক বিবরণ নাই—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই কারণে ওই ইতিহাসের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে থাকিতে চাহেন নাই। তিনি নিজে আলাদা একটি তথ্যপূর্ণ সত্য ইতিহাস লিখিয়াছেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় তখন মনটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নেতাজীর প্রতি কংগ্রেসের এই দুর্ব্যবহারে

মনটা প্রসন্নও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বারবার মানা করিয়াছিলেন—পলিটিকসে ঢুকো না। ওর ভিতর সাহিত্যিক টিকতে পারে না। আমি কিছুদিন ছিলাম। তখনই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।

না, পলিটিকসে আমি ঢুকি নাই। কিন্তু, তবু পলিটিকাল খবর মনকে বিচলিত করিত। কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইবার পরই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখিলেন। ইহারই কাছাকাছি সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, সুভাষচন্দ্র পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া অন্তর্ধান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক আগে সজনীর একটি চিঠি পাইয়াছিলাম। সজনী লিখিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ। আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। তুমি শীঘ্র কলিকাতায় চলিয়া এস। চিঠি পাইবার পরদিনই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম। সমস্ত দিন কোনও কাজ করিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। কি যে করিব, কি যে করা উচিত, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। ভোরের দিকে একটি কবিতা লিখিয়া 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়া দিলাম, তাহার পর আর একটি লিখিয়া পাঠাইলাম 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। তাহার পর মনে পড়িল, রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া যেন আমি একটা নাটক লিখি। কি লিখি? আমার মনের মধ্যে যে নাটকটা রূপ-পরিগ্রহ করিল, তাহা লিখিতে হইলে পড়াশোনা করিতে হইবে। ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের লাইব্রেরি বেশ বড়। কলেজের প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করিয়া লাইব্রেরিটি ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি তো দিলেনই, একটি ভালো চেয়ার এবং টেবিলেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হরলালবাবু তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইংরাজির অধ্যাপক নিশানাথবাবুও আমাকে সাহায্য করিলেন অনেক। ল্যাবরেটরির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া আমি লাইব্রেরিতে বসিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। উপকরণ সংগ্রহ করিতে তিন চার দিন লাগিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই 'শনিবারের চিঠি'-র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যায় 'অন্তরীক্ষে' নাম দিয়া এই একাঙ্ক নাটকটি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নাটকে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলাম।

ইহার ঠিক পরেই যে বৃহৎ ঘটনাটি আমার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছিল—'সেটি বিয়াল্লিশের আন্দোলন; যাহার ইংরাজি নাম **August Disturbance**। **Quit India** প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পরই বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির

সকলকে জেলে পুরিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হইল, তাহা বিস্ময়কর। লোকেরা বহু জায়গায় রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলিল। টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার কাটিয়া দিল। অনেক জায়গায় থানা আক্রমণ করিয়া তাহার উপর জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিল। অনেক রেলওয়ে গুদামে লুটপাট শুরু হইল। গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া গভর্ণমেণ্টকে অচল করিয়া দেওয়াই লক্ষ্য হইল এই আন্দোলনকারীদের। সাধারণ লোকদের উপর কেহ কিন্তু কোনরকম অত্যাচার করে নাই। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য বেশিদিন নিষ্ক্রিয় রহিল না। রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ মিলিটারি অবতরণ করিল। সে সময় গ্রামে গ্রামে যে অত্যাচার শুরু হইল, তাহা অকথ্য। আমার 'অগ্নি' বইটিতে সে অত্যাচারের কিছু বর্ণনা আছে। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু, অনেক স্বদেশী বিহারী যুবক আমাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের মুখেই সব খবর পাইতাম। তাহারা রোজ রাত্রে আমার নিকট আসিয়া সব খবর দিয়া যাইত। সে সময় বাহিরের পৃথিবী হইতে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। চিঠি নাই, কাগজ নাই। একমাত্র যোগাযোগ ছিল রেডিওর মাধ্যমে। তখন ব্রিটিশরা যুদ্ধে হারিতেছিল। সেই খবর রেডিওতে প্রচারিত হইত। সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনিব বলিয়া কিছুদিন আগে আমি একটি রেডিও কিনিয়াছিলাম। আমার রেডিও কেনার ইতিহাসটিও আশ্চর্য। বাজারে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের শিশির মিউজিক হল ছিল। সেখানে তিনি রেডিও বিক্রি করিতেন। সন্ধ্যা হইতেই সেখানে রেডিও বাজিত। আমি প্রতিদিন রাত্রি নয়টার সময় তাঁহার দোকানে রেডিও শুনিতে যাইতাম। একদিন শিশিরবাবু বলিলেন—আপনি একটি রেডিও বাড়িতে লইয়া যান। আমি বলিলাম—এখন রেডিও কিনিবার পয়সা আমার নাই। একদিন আমি রেডিও শুনিয়া বাড়ি ফিরিতেছি, দেখিলাম, একটি লোক একটি রেডিও লইয়া আমার পিছু পিছু আসিতেছে। আমি বাড়ি পৌঁছাইতেই সেই লোকটি থামিল এবং বলিল—বাবু আপনার এখানে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে বলিলেন—আপনার কাছেই ওটা থাক। যখন খুশী, দাম দেবেন। প্রায় বছরখানেক পরে রেডিওর দাম দিয়াছিলাম। গভর্ণমেণ্ট সকলের রেডিও বাজেয়াপ্ত করিলেন। আমাদের সকলের রেডিও গভর্ণমেণ্ট আফিসে জমা দিয়া আসিতে হইল। বাহিরের কোনও খবর পাইবার উপায় আর রহিল না। তখন, আমি কতকগুলি কল্পিত খবর সৃষ্টি করিয়া সেগুলি বিহারী কংগ্রেসকর্মীদের দিতাম।

তাহারা সেগুলি সাইক্লোস্টাইল করিয়া চতুর্দিকে বিতরণ করিত এবং ল্যাম্প-পোস্টে, পোস্টে সাঁটিয়া দিত। একটা খবর ছিল—Churchill has been shot dead. কিছুদিন এইরূপ করার পর, গভর্ণমেণ্ট আমাদের রেডিওগুলি ফেরৎ দিলেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, সত্য খবরের পথ বন্ধ করিলে নানারকম মিথ্যা গুজব শহরে ছড়াইয়া পড়িবে এবং তাহাতে ভালো ফল হইবে না।

আমরা তখন পটলবাবুর ছোট বাড়িটি ছাড়িয়া পটলবাবুর বাড়িতেই ভাড়াটে হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছি। কিছুদিন আগে পটলবাবু মারা গিয়াছিলেন। আমার ছোট কন্যা করবীর ছোট বাড়িতেই জন্ম হইয়াছিল। বাড়িটি বড়ই ছোট ছিল, আমার সংসার বড় হইতেছিল। চারিটি সন্তান, ভাইরা থাকিত, তা ছাড়া বাবা, মা আসিতেন, অতিথি-অভ্যাগতরাও আসিতেন। আমার ওই ছোট বাড়িতেই অনেক সাহিত্যিকের পদধূলি পড়িয়াছে। মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বাসায় গিয়াছিলেন। সজনী তো প্রায়ই যাইত, অনেক সময় সপরিবারে। ব্রজেনদাও সপরিবারে একবার আসিয়াছিলেন। বিভূতিবাবুও (শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)—এই ছোট বাড়িতেই আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওই ছোট বাড়িতেও লীলা একা হাতে অনেক ঝঞ্ঝাট সামলাইয়াছে। এমন সময় খবর পাইলাম—নিরুপমবাবুর একটি বড় বাড়ি খালি আছে। বাড়িটির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। দেখিয়া পছন্দ হইল, চলিয়া গেলাম। সেখানেই কয়েকমাস ছিলাম। কিন্তু, বাড়িওয়ালার সহিত বনিল না। শুনিলাম, পটলবাবুর বড় বাড়ির নীচের তলাটা নাকি ভাড়া দেওয়া হইবে। তখন, সেই বাড়িতেই চলিয়া গেলাম। আগস্ট-আন্দোলনের সময়ে আমরা পটলবাবুর বড় বাড়িতেই ছিলাম। আমার সুবিধাই হইয়াছিল, কারণ, পটলবাবু আমাকে ল্যাবরেটরি করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক তাঁহার বাড়ির পাশেই। ল্যাবরেটরি-টিকে আমি বৈঠকখানার মত ব্যবহার করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পর সেইখানেই বসিয়া লিখিতাম। এই সময় আমি 'রাত্রি' লিখিয়াছি, 'বিদ্যাসাগর' লিখিয়াছি, 'আহবনীয়' বলিয়া কয়েকটিও এই সময় লিখিয়াছিলাম দেশের যুবকদের উদ্দেশ্যে। শনিবারের চিঠিতে এই সময় 'ভূয়োদর্শন' ও লিখিতেছিলাম প্রতিমাসে। এই সময় আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। যখন 'বিদ্যাসাগর' লিখিতেছি, তখন হঠাৎ একদিন বন্ধু প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত আসিয়া হাজির। সে তখন একজন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার। অথচ সাহিত্য-রসিক। সে আসিয়া বলিল 'বলাইদা, আপনি শ্রীমধুসূদন 'ভারতবর্ষে' লিখেছেন, এটা কিন্তু প্রবাসীতে দিতে

হবে।' বলিলাম,—'আমার আপত্তি নাই। কিন্তু 'প্রবাসী' কি নেবেন এ লেখা? তাঁরা না চাইলে আমি দেব না। চাইলে নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু পারিশ্রমিকও চাই।' প্রদ্যোৎ বলিল, 'আমি রামানন্দবাবুকে চিঠি লিখছি। তিনি তোমাকে পত্র দিবেন।'

প্রদ্যোৎ চলিয়া গেল। আমি বিদ্যাসাগর লিখিতে লাগিলাম এবং প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কবে রামানন্দবাবুর চিঠি আসিবে। আমার লেখা শেষ হইয়া গেল, তবু রামানন্দবাবুর চিঠি আসিল না। বিদ্যাসাগর লিখিবার পূর্বে সজনীকান্তের কাছে বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত কিছু বই লইয়াছিলাম। সজনী একটি পত্রে জানিতে চাহিল—বই কতদূর লেখা হইল? উত্তর দিলাম, বই শেষ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সজনীর উত্তর পাইলাম—সাতদিনের মধ্যেই আমি ভাগলপুর যাইব। বইটি শুনিয়া আসিব। তাহার পর চিঠি পাইলাম—আমি ভোর চারটের ট্রেনে ভাগলপুর পৌছিব। সাড়ে চারটে হইতে বইটি শুনিব। সেইদিনই সকালের ট্রেনে ফিরিব। তুমি প্রস্তুত থাকিও। নির্দিষ্ট দিনে ভোরে স্টেশনে গিয়া সজনীকে লইয়া আসিলাম। এক কাপ চা খাইয়া ল্যাবরেটরিতে গিয়া 'বিদ্যাসাগর' পড়া শুরু হইল। শেষ হইল সাড়ে আটটা নাগাদ। সজনী সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া বলিল—চমৎকার হয়েছ। এটা আমি শনিবারের চিঠিতে ছাপব। এই নাও সামান্য প্রণামী।

পাণ্ডুলিপি লইয়া সজনী চলিয়া গেল। ঠিক তাহার দুইদিন পরেই রামানন্দবাবুর চিঠি পাইলাম। তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাই সময়মত পত্র দিতে পারেন নাই। লিখিয়াছেন, আমি যেন বিদ্যাসাগর নাটকটি অবিলম্বে পাঠাইয়া দিই। মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। পাখি তো উড়িয়া গিয়াছে। তখন আমি ক্লিফোর্ড ব্যাক্সের পোয়েটেস্‌টার্স অব ইস্পাহান বইটি পড়িতেছিলাম। ওটি একটি চমৎকার একাঙ্ক নাটক। এটির ভাবানুবাদ করিবার ইচ্ছা হইতেছিল। অবিলম্বে শুরু করিয়া দিলাম। রামানন্দবাবুকে জানাইলাম, আপনার চিঠি না পাইয়া 'বিদ্যাসাগর' অন্যত্র দিয়াছি। তবে, অন্য একটি বিদেশী একাঙ্ক নাটকের ভাবানুবাদ করিতেছি, সেটি যদি আপনি ছাপেন, পাঠাইয়া দিব। তিনি উত্তর দিলেন—ছাপিব, পাঠাইয়া দাও। 'কবয়' বইটি কিছুদিন পরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে 'শনিবারের চিঠি'র জন্য আমি মাঝে মাঝে 'একাঙ্ক' নাটক লিখিতেছিলাম। একঘেয়ে ব্যঙ্গকবিতা লিখিতে লিখিতে আর ভালো লাগিতেছিল না। এই নাটকগুলি পরে 'দশভান' নামে প্রকাশিত হয়। বইটির

নামকরণ করেন পরশুরাম রাজশেখর বসু মহাশয়। পরশুরামের প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার কল্পনা, তাঁহার অঙ্কিত সমসাময়িক সমাজের নিখুঁত চিত্র, তাঁহার গল্পের গঠন-পারিপাট্য, তাঁহার হিউমার, তাঁহার ব্যঙ্গ, তাঁহার লেখায় বিজ্ঞানী, বিদগ্ধ শিল্পীমনের সমন্বয় বাঙালী রসিকমহলে সাড়া তুলিয়াছিল। আমি যখনই কলিকাতায় আসিতাম, তাঁহার বকুলবাগানের বাড়িতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম। তাঁহার সহিত খুব একটা হৃদ্যতা হইয়াছিল। তিনি আমাকে অনেক চিঠি লিখিয়াছিলেন; চিঠিগুলির অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি চিঠি বোধ হয়, কুমারেশ তাহার 'ষষ্টিমধু' কাগজে প্রকাশ করিয়াছিল। আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া একটি কবিতাও লিখিয়াছিলেন তিনি। সে কবিতাটিও হারাইয়াছি। কবিতাটির প্রথম লাইন ছিল—'হে ডাক্তার, চিরিয়াছ বহু কলেবর' এবং শেষের খানিকটা

বঙ্কিম ডেপুটি যথা রবি জমিদার
তেমনি ভিষক্ তুমি বিধির বিধানে
নেশা তব মানিল না পেশার বাঁধন
বনফুল দিল চাপা বলাই ডাক্তারে।

রাজশেখর বসুর বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও আমার 'আকাশবাণী' নামক ব্যঙ্গ-কবিতাটি পড়িয়া দুইটি নর্তকীর ছবি আঁকিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ছবি দুটির নাম আমারই রচনার একটি ছত্র 'এ ছাড়া বাজারে মাল নাই—' ছবি দুটি বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলাম, এখনও আমার কাছে আছে। নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আর বেশিদিন থাকিবে না।

এই সময়ে ভাগলপুরে ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি আমার 'মাস্টারমশাই'। তিনি বগুড়ায় সিভিল সার্জন ছিলেন। এখান হইতে রিটায়ার করিয়া ভাগলপুরে আসিয়া থাকিবেন ঠিক করিয়াছেন। আমি যেন তাঁহার জন্য একটি বাসা ভাড়া করিয়া রাখি। আমি ভাগলপুরে আছি—এইটাই তাঁহার ভাগলপুরে আসিবার প্রধান কারণ। আমি তাঁহার জন্য ভাগলপুরের আদমপুর মহল্লায় গোলকুঠি নামক বাড়িটি ভাড়া করিলাম। বাড়ির মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর ভাইপো। তিনি দিল্লীতে থাকিতেন। প্রেমসুন্দরবাবু থাকিতেন ভাগলপুরে। তিনি আমার কাকাবাবুর সহপাঠী ছিলেন। আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার নিকট হইতেই আমি বনবিহারীবাবুর জন্য বাড়িটি ভাড়া করিলাম।

ইহার পরই গভর্ণমেণ্ট একটি 'ইমারজেন্সি' চালু করিলেন। কোনও বাড়ি ভাড়া লইতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুম লইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা হুকুমে কোনও বাড়ি ভাড়া লওয়া যাইবে না। কাপড়ের বেলাতেও এই ইমারজেন্সি বিপন্ন বিস্তার করিয়া ক্রেতাদের সম্মুখীন হইল। নিয়ম হইল—গভর্ণমেণ্ট যে দোকান নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সেই দোকান হইতেই কাপড কিনিতে হইবে। এই দুর্গতি আমাদের বেশ কিছুদিন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই সময় আমার মা অসুখে পড়িলেন। পেটের অসুখ। সে অসুখ আমরা কিছুতেই সারাইতে পারি নাই। অনেক বড় বড ডাক্তার, কবিরাজ তাঁহাব চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য ভাগলপুর আনিয়াছিলাম। মা যখন খুব অসুস্থ, তখন আমার জীবনেও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল।

ঘটনাটি শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, একটু বিস্ময়করও। গোডা হইতে বলিতেছি। একদিন প্রেমবাবু আমার ল্যাবরেটরিতে আসিয়া বলিলেন—আমার ভাইপো গোলকুঠি বাড়িটি বিক্রি করে দিতে চায়। সে দিল্লীতে বাডি করেছে। এখানে সে বাড়ি রাখবে না, তার টাকারও দরকার। তুমি একজন খরিদ্দার দেখ। আমরা একজন ভদ্রলোক খরিদ্দার চাই। আমার বাবা, মা ওই বাড়িতে বাস করেছিলেন। সুতরাং, যাকে-তাকে আমরা বাডি বিক্রি করব না। লোকটি ভদ্রলোক হওয়া চাই। তোমার কাছে তো অনেক লোক আসেন, তুমি একটু চেষ্টা কর।' আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, করিব। করিলামও। কিন্তু, তাঁহাদের মনোমত খরিদ্দার পাওয়া গেল না। প্রেমবাবু তখন বাললেন, তুমিই বাড়িটা কিনে ফেল।

আমি বলিলাম—আমার ব্যাংক-ব্যালান্স তো প্রায় নিল (Nil), যা রোজগার করি, সব খরচ হয়ে যায়। কিছু জমাতে পারি নি। তা ছাড়া আপনাদের হাতা-ওলী বাড়ি। সেখানে আর একটি বাড়িও আছে। জমি প্রায় দেড়-বিঘা। ও বাড়ি কেনবার সামর্থ আমার নেই। ও বাড়ির দাম কত?

প্রেমবাবু বলিলেন—'আমি তোমার ভাইপোকে চিঠি লিখছি। তারপর তোমাকে জানাব—।'

দিনদশেক পরে তিনি আবার আসিলেন এবং আমাকে তাঁহার ভাইপোর চিঠি দেখাইলেন। তাঁহার ভাইপো-ও ডাক্তার। তিনি লিখিয়াছেন—'বনফুল যদি এ বাড়ি কেনেন, তা হলে আমি পনেরো হাজার টাকা পেলেই তাঁকে দিয়ে দেব। ওই টাকাই আমার দরকার। তবে, দাম কেবল বনফুলের জন্য। তিনি যদি না কেনেন, তবে যে ক্রেতা সর্বোচ্চ মূল্য দেবে, তাকেই বিক্রি করবেন।'

প্রেমবাবু বলিলেন—'একজন মাড়োয়ারি পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাইছে। কিন্তু, তুমি যদি কেন, আমি তোমাকেই পনেরো হাজার টাকায় দেব। তুমি কিনে ফেল—'

'ধার করেও কেন। দেড় বিঘে জমিশুদ্ধ দুখানা বাড়ি এত সস্তায় আর কখনও পাবে না। তোমাকে যখন এখানে থাকতেই হবে, তখন নিজের বাড়ি থাকা ভালো। তুমি ধার কর।'

আমি বলিলাম, আপনি তা হলে দিন পনেরো অপেক্ষা করুন। আমি কলকাতায় গিয়ে আমার প্রকাশকদের জিজ্ঞাসা করি, তারা টাকা দিবে কিনা। পরদিন কলিকাতায় চলিয়া গেলাম এবং সজনীর বাড়িতে উঠিলাম। সজনী মাঝে একবার ভাগলপুরে গিয়াছিল এবং গোলকুঠিতে গিয়া বনবিহারীবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য গোলকুঠিতে গিয়াছিল।

সজনী বলিল—'ও বাড়ি তোমাকে কিনতেই হবে। চমৎকার বাড়ি। তুমি তোমার প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বল—'

প্রকাশকদের কাছে গিয়া খোঁজ করিয়া জানিলাম, তাহাদের নিকট ছয় হাজার টাকা আমার পাওনা আছে। আরও নয় হাজার টাকা ধার করিতে হইবে। একজন ধনী প্রকাশক ('নামটা আর করিব না।') বলিলেন—শুধু নয় হাজার কেন, পুরা নয় হাজার টাকাই তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু, একটি শর্তে। ভবিষ্যতে তাঁহাকে ছাড়া আমি আর কোনও প্রকাশককে বই দিতে পারিব না। তিনিই আমার গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ সব ছাপিবেন। রয়ালটি দিবেন ৩৩⅓%। তিনি তাঁহার শর্তটি **Stamped Paper**-এ টাইপ করিয়া লিখিয়া দিলেন এবং আমাকে বলিলেন, ইহাতে সই করিয়া দিলে আমি সব টাকা দিয়া দিব। সজনীকে দলিলটি দেখাইলাম। সজনী বলিল—এ শর্তে তুমি রাজি হইও না। নয় হাজার টাকা যতদিন না শোধ হয়, ততদিন তুমি ওই শর্তে আবদ্ধ থাকিতে পার, কিন্তু, টাকা শোধ হইয়া যাইবার পর আর বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। প্রকাশক ভদ্রলোক কিন্তু এ শর্তে রাজি হইলেন না। সজনী বলিল, তুমি ভেব না, টাকা আমি জোগাড় করে দেব। শেষ পর্যন্ত সজনীই টাকাটা দিয়াছিল, একটি ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া। সজনীর সে ধার আমি বই দিয়া শোধ করিয়াছিলাম।

এই বাড়িকেনা আমার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার জন্য আমি কয়েকটি সমস্যারও সম্মুখীন হইলাম।

প্রথম, আমার মাস্টারমশাই বনবিহারীবাবুর সহিত আমার একটু মনোমালিন্য হইয়া গেল। আমি অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার বাড়িওয়ালা হইয়া গেলাম, ইহাতে তিনি খুশীই হইয়াছিলেন প্রথমে। কিন্তু, আমার মা জেদ ধরিয়া বসিলেন—আমি তোর বাড়িতে যাব। বাড়ি যখন কিনেছিস, তখন সেইখানেই আমাকে নিয়ে চল। খুব জেদ করিতে লাগিলেন তিনি। তখন আমি বনবিহারীবাবুকে গিয়া সব খুলিয়া বলিলাম। বনবিহারীবাবু একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—তা হলে কোথায় যাব? হঠাৎ বাড়ি কোথায় পাই। আমি বলিলাম—আমি আপনাকে বাড়ি খুঁজিয়া দিতেছি। আগেই বলিয়াছি, তখন বাড়ি পাওয়া শক্ত ছিল। সব বাড়ি গভর্ণমেণ্টের দখলে। তাহারা ছাড়-পত্র না দিলে বাড়ি পাইবার উপায় নাই। আমি একদিন গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া সব খুলিয়া বলিলাম। আমি যে বাড়িটি কিনিয়াছিলাম, তাহার নিকটেই একটি খালি পাকা বাড়ি ছিল। আর, তাহার পাশেই ছিল কয়েকটি খোলার ঘর। আমি মাস্টারমশায়ের জন্য পাকাবাড়িটি চাহিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আমার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। মাস্টারমশাইকে আসিয়া খবর দিলাম, আমার বাড়ির কাছেই গঙ্গার ঠিক উপরে আপনার জন্য একটি বাড়ি ঠিক করিয়াছি। মাস্টারমশাই বলিলেন—ধীরেনবাবুকে লইয়া আজ বাড়িটি দেখিয়া আসিব।' ধীরেনবাবু মাস্টারমশাইকে লইয়া গিয়া সেই খোলার ঘরগুলি দেখাইয়া বলিলেন—বলাইবাবু আপনার জন্যে এই ঘরগুলি ঠিক করেছেন। মাস্টারমশাই ক্রোধান্ধ হইলেন। আমাকে হঠাৎ জানাইলেন—'আমি এখানে থাকব না। বৌশিতে (মন্দার হিল) বাড়ি পেয়েছি। সেখানেই চলে যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি গেলাম তাহার কাছে।

'আপনি বাড়িটা দেখে এসেছেন?'

'এসেছি। ও বাড়িতে আমি থাকতে পারব না—।'

তিনি যে খোলার ঘরগুলি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমার কল্পনাতীত ছিল।

বলিলাম—'ওর চেয়ে ভালো বাড়ি তো এখন খালি নেই—।'

'আমি থাকব না এখানে। যেদিন তুমি এ বাড়ি কিনেছো, সেই দিনই বুঝেছি, আমার এখানকার চাকরি গেল।'

সহসা তাঁহার দুইচক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। কয়েকদিন পরেই মাস্টারমশাই চলিয়া গেলেন।

মাকে লইয়া সদ্য-ক্রীত বাড়িতে আসিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা ছিল। মা এত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে আনা সম্ভবপর হইল না। মা তখন আমার ভাই ভোলার কাছে বরারিতে ছিলেন। তাঁহার কবিরাজি চিকিৎসা হইতেছিল। চিকিৎসা করিতেছিলেন আজিমগঞ্জের কবিরাজ অনাথনাথ রায়। তাঁহার চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। মা বরারিতেই মারা গেলেন। মা যখন মারা গেলেন, তখন আমি তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়াছিলাম। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে যে অদ্ভুত অনুভূতিটা হইয়াছিল, তাহা এখনও আমার মনে আছে। মনে হইয়াছিল, আমার বুকের ভিতর হইতে কে যেন কি একটা উপড়াইয়া লইয়া গেল। মা আমার ভাগ্যবতী ছিলেন, পুণ্যবতীও ছিলেন। অমন পবিত্র, উজ্জ্বল, শাণিত চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। তিনি স্কুলে বা কলেজে কখনও পড়েন নাই। সামান্য বাংলা জানিতেন। তাঁহার বয়স যখন এগারো বছর, তখনই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তখনই তিনি মণিহারী গ্রামে আসিয়া সংসারে হাল ধরিয়াছিলেন। সারাজীবন সুনিপুণ ধৈর্যের সহিত তিনি আমাদের সংসার তরণীকে পরিচালনা করিয়াছেন। নিষ্ঠাবতী ধর্ম-প্রাণা হিন্দু রমণী ছিলেন। জগদ্ধাত্রী দেবী তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন। মনে হয়, কিছু অসাধারণ শক্তিলাভ করিয়াছিলেন তিনি। দুই একটি ঘটনা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। কেয়ার বয়স তখন পনেরো বছর। তখন তাহার টাইফয়েড হইয়াছিল। ভাগলপুরের সিভিল সার্জন বিমলবাবু তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। ভাগলপুরের অন্যান্য বড় ডাক্তাররাও প্রত্যহ আসিয়া তাহার খবর লইত। কিন্তু, কেয়ার অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে কনভালশান শুরু হইল। খবর পাইয়া মা কেয়াকে দেখিতে আসিলেন। আসিয়া কেয়ার বিছানায় বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহার পর যাওয়ার সময় আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—তুই ভাবিস না বাবা। কেয়া ভালো হয়ে যাবে। আমি বলিলাম—এত বড় বড় ডাক্তাররা হতাশ হয়ে পড়েছেন, তুমি আশা দিচ্ছ কেমন করে? মা উত্তর দিলেন—'আমি তো জীবনে কোনও পাপ করিনি, আমি বেঁচে থাকব আর তোর মেয়ে মরে যাবে? এত বড় শাস্তি ভগবান আমাকে কেন দেবেন? দেখিস, ঠিক 'ও সেরে উঠবে।

তার পর দিনই কেয়ার জ্বর কমিয়া গেল, কনভালশান বন্ধ হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে গেল সে।

মা ভাদ্রমাসে মারা গিয়াছিলেন। ভাদ্রের ভরা গঙ্গার জলে মাকে বিসর্জন দিয়া আসিলাম। শ্রাদ্ধের দিন আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। মা গরীব দুঃখীকে খাওয়াইতে ভালোবাসিতেন। সে জন্য আমি কাঙালী-ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলাম। আমার বাড়ির পাশেই যে রাস্তাটি ছিল সেই রাস্তাটি মিউনিসি-প্যালিটিকে বলিয়া দুদিক বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, সেখানেই কাঙালী-দের বসাইয়া খাওয়াইব। দুই মণ চাল-ডালের খিচুড়ি, তদপযুক্ত তরকারি, ভাজা, মিষ্টান্ন, দই-এর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু, তখন বর্ষাকাল। দুপুরের পর হইতেই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। যদি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া যায়, কাঙালীরা খাইবে কি করিয়া? অন্য পাড়া হইতে কয়েকজন আসিবে বলিয়াছিলেন পরিবেশন করিবার জন্য। তাঁহারাও কেহ আসিলেন না। আমি ঠিক করিলাম—কাঙালীদের বসাইয়া আমরাই পরিবেশন আরম্ভ করিয়া দিই। তাহার পর যাহা হইবার তাহা তো হইবেই। খাওয়ানো শুরু হইল। একটু পরে অন্য পাড়া হইতে যাহাদের আসিবার কথা ছিল, তাঁহারা আসিলেন। দেখিলাম তাঁহারা আপাদমস্তক ভিজিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন —চারদিকে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। এখানে বৃষ্টি নাই ইহা তো বড় আশ্চর্য। যতক্ষণ কাঙালীভোজন হইল ততক্ষণ একফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নাই। আকাশ থমথমে হইয়া রহিল, বৃষ্টি নাবিল না। তুমুল বৃষ্টি নামিল কাঙালী ভোজন শেষ হইবার পর। ঘটনাটা হয়ত কাকতালীয়বৎ কিন্তু ইহা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

মাকে লইয়া নতুন বাড়িতে আসিতে পারিলাম না। বাড়িতে রান্নাঘরটি ভালো ছিল না। ঠিক করিলাম এই দুইটি করিয়া তবে গৃহে প্রবেশ করিব। তখন সিমেণ্ট, ইঁট সবই দুর্লভ। গভর্ণমেণ্টের পারমিট ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় যিনি পি. ডব্লিউ-ডির কর্তা ছিলেন, তিনি ছিলেন আমার লেখার খুব ভক্ত। তিনিই আমার পারমিট জোগাড় করিয়া দিলেন। আমি আরও কিছু টাকা কর্জ করিয়া গৃহসংস্কারে লাগিয়া পড়িলাম।

এই বাড়ি প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ঘটনাটি আশ্চর্যজনক। যখন আমার মনে বাড়ি কিনিবার কোনও কল্পনাও ছিল না, যখন প্রেমসুন্দর-বাবু আমার নিকট আসিয়া বাড়ি বিক্রয় করিবার প্রস্তাবও করেন নাই তখন আমার ল্যাবরেটরিতে একজন পাঞ্জাবী সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন একদিন। গেরুয়া আলখাল্লাপরা পাগড়িধারী বিশালকায় পুরুষ একজন। বলিলেন—আপনার ভাগ্যগণনা করিতে চাই?

বলিলাম—আপনার দক্ষিণা কত ?

'এক টাকা।'

এ বিষয়ে আমার কৌতূহল ছিল। রাজি হইলাম।

তিনি বলিলেন—একটি ফুলের নাম করুন।

করিলাম।

আপনার হাতটা দেখান এবার।

দেখাইলাম।

তাহার পর আমার নাকের কাছে নিজের হাতটা রাখিয়া পরীক্ষা করিলেন, কোন্ নাসারন্ধ্র দিয়া বায়ু বেশী বাহির হইতেছে। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাগজে কি অঙ্ক কষিলেন। তাহার পর বলিলেন—ঠিক এক বৎসরের মধ্যে আপনার একটি বাড়ি হইবে। বাড়ির সহিত কিছু জমিও থাকিবে। তাঁহার এই অসম্ভব ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম এবং তাঁহাকে একটি টাকা দিয়া বলিলাম—আপনি যাহা বলিলেন তাহা অসম্ভব। কারণ বাড়ি কিনিবার মতো টাকা আমার নাই। এক বৎসরের মধ্যে হইবে এ আশাও নাই। তিনি টাকাটা লইলেন না। বলিলেন, আপনি যেদিন গৃহ-প্রবেশ করিবেন সেইদিন আসিব এবং সেইদিন টাকা লইব। তাহার পর নানারকম আশ্চর্য যোগাযোগে সত্যই আমি বাড়ি কিনিলাম এবং যেদিন গৃহ-প্রবেশ করিব ঠিক করিয়াছি, ঠিক তাহার আগের দিন জ্যোতিষী আবার আসিয়া আমার ল্যাবরেটরিতে আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম—আপনার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছে। কি প্রণামী দিব, বলুন ?'

তিনি বলিলেন—আপনার বাড়িটি দেখিব। তাঁহাকে লইয়া গিয়া বাড়িটি দেখাইলাম। বাড়ির গেট ছিল দক্ষিণ দিকে। তিনি বলিলেন—দক্ষিণ দুয়ার যমের, সুতরাং এ গেট বন্ধ করিয়া বাড়ির পশ্চিম দিকে গেট করিতে হইবে। তাহার পর বাড়ির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। এ বাড়িতে একটি 'জিন' অর্থাৎ ভূত আছে। দুষ্ট ভূত নয়, ভদ্র ভূত। তাহাকে বিদায় না করিলে এ বাড়িতে টিকিতে পারিবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করিব। আপনি কাল সকালে আমার জন্যে এক বাটি দুধ ও একটি আ-ছোলা নারিকেল কিনিয়া রাখিবেন। আমি খুব ভোরে আসিয়া পূজা-পাঠ করিব। পরদিন খুব ভোরে আসিয়া তিনি ছাদের চিলেকোঠায় গিয়া বসিলেন। এক জামবাটি দুধের ভিতর সেইগোটা নারিকেলটি বসানো হইল। তিনি চক্ষু বুঁজিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

তাহার পর আমাকে ও আমার স্ত্রীকে বলিলেন, আপনারাও আমার পাশে বসিয়া মনে মনে সেই 'জিন'কে অনুরোধ করুন, তিনি যেন এ বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এবং তিনি যখন চলিয়া যাইবেন, তখন যেন এমন কিছু করিয়া যান যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি চলিয়া গেলেন। আমরা তিনজনই পাশাপাশি চোখ বুঁজিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। একটু পরেই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটিল। জামবাটির দুধটা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। নারিকেলটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সত্যই ব্যাপারটি বিস্ময়কর। ঠাণ্ডা দুধ যে অমন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহা সত্যই কল্পনাতীত ছিল। জ্যোতিষী বলিলেন, 'জিন' চলিয়া গেলেন। এবার আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে বসবাস করুন। জ্যোতিষীকে আমি পঁচিশটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলাম।

নতুন বাড়িতে আসিয়া কিন্তু কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইলাম। ল্যাবরেটরি হইতে বাড়ির দূরত্ব প্রায় এক মাইলের কাছাকাছি। চারবার যাতায়াত করিতে হইত। কখনও হাঁটিয়া যাইতাম, কখনও রিক্সায়, কখনও ঘোড়ার গাড়িতে। ঘোড়ার গাড়ি সব সময় পাওয়া যাইত না। বাজারও কাছেপিঠে তেমন ছিল না। সুজাগঞ্জ বাজারে রোজ যাইতে হইত। খরচ এবং অসুবিধা দুইই বাড়িল।

দ্বিতীয়, আমি বাড়ি কিনিয়াছি বলিয়া অনেকের চক্ষু টাটাইল। বিহারীদের নয়, বাঙালীদের। অনেক তথাকথিত বন্ধুদের আচার-আচরণে, কথা-বার্তায় তাহা প্রকাশ হইতে লাগিল। একটা ঈর্ষার আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। অনেক দেঁতোহাসি এবং মেকি অভিনন্দনের সম্মুখীন হইতে হইল।

আগেই বলিয়াছি, আমার বড় বাড়ির পাশে আর একটি ছোট বাড়ি ছিল। সে বাড়িতে ভাড়াটে ছিল একজন। বাড়ি কিনিবার সময় তাঁহাকে আমি আশ্বাস দিয়াছিলাম, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তাঁহাকে আমি উঠাইব না। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বর্ষাকালে অনেক সময় ল্যাবরেটরিতে যাইতে পারিতাম না। তখন ঠিক করিলাম, ওই পাশের বাড়িতেই আমার ল্যাবরেটরি করিব। ভদ্রলোককে নোটিশ দিলাম। তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে যখন উঠিয়া গেলেন, তখন বাড়ির উঠানে যে ফলন্ত লেবু-গাছটি ছিল, তাহার শিকড় কাটিয়া গাছটিকে নিধন করিয়া গেলেন। এবং আরও এমন সব কাণ্ড করিলেন, যাহার জন্য তাঁহার সহিত কলহ হইয়া গেল। মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল।

অবশেষে ল্যাবরেটরি বাড়িতে তুলিয়া আনিলাম। বাবা মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার মানা আমি শুনি নাই। প্রত্যহ চারবার যাতায়াত করিয়া আমার মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হইতেছিল, আমি লিখিতে পারিতেছিলাম না। তবু, রোজ রাত্রে যতটা পারিতাম, লিখিতাম। বাধ্য হইয়া লিখিতে হইত, কারণ ঋণ করিয়াছিলাম, তাহা যত শীঘ্র সম্ভব, শোধ করিতে হইবে। খুব ভোরে উঠিয়াও লিখিতাম। 'অগ্নি' বইটা ভোরে উঠিয়াই লিখিয়াছিলাম। এই বইটি লিখিতে কিছু পড়াশোনাও করিতে হইয়াছিল। এইসব কারণে ল্যাবরেটরি বাড়িতেই তুলিয়া আনিলাম। তাহাতে কিন্তু আর একটি অসুবিধে ক্রমশঃ দেখা দিতে লাগিল। আমার এই ল্যাবরেটরিতেও রোগী ভালই আসিত। ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ-নির্ভর, প্র্যাকটিশিং ডাক্তারদের উপর। তাঁহারা 'কেস' পাঠাইলে তবেই আমি 'কেস' পাই। কিন্তু, যেদিন আমার 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটি নিউ থিয়েটার্স লইবে বলিয়া স্থির করিল এবং আমাকে নগদ ছয় হাজার টাকা দিয়া গেল, সেইদিনই আমার সতীর্থ বাঙালী ডাক্তারদের সহানুভূতি আমি হারাইলাম। আমার রোগীর সংখ্যা কমিতে শুরু করিল। কিছু দরিদ্র রোগীকে আমি বিনা পয়সায় দেখিতাম। অনেকের ঔষধও বিনামূল্যে দিতাম। তাহারা অবশ্য আমাকে ছাড়িল না। আমি লিখিবার বেশি সময় পাইলাম এবং এই সময়ে লেখাপড়া লইয়াই থাকিতাম। লেখার চাহিদাও ক্রমশঃ বেশ বাড়িতে লাগিল। তাগাদার তাড়াতেই আমি এত লেখা লিখিয়াছি। তাগাদা না থাকিলে লিখিতাম না। আমার মনে হয়, সব লেখকের পক্ষেই বোধ হয় এ কথা সত্য।

কিছুদিন পরে শুনিলাম, আমার ল্যাবরেটরির কাছেই আর একজন ডাক্তার ল্যাবরেটরি খুলিয়া বসিয়াছেন। তিনি যথারীতি ব্যবসায়িক রীতি অনুসারে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সুতরাং, আমার রোগীর সংখ্যা আরও কিছু কমিল। আমার নকল বন্ধুদের মেকিত্ব ক্রমশঃ বেশী প্রকট হইয়া পড়িল। ডাক্তারদের মধ্যে আমার প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন ক্ষিতিশবাবু। কিন্তু, তিনি কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছিলেন। আমার আর একটি বন্ধু, ডাক্তার মহীউদ্দিন আহমেদ। সে মুসলমান এবং বিহারী। আমার সহপাঠী ছিল। সে আমাকে বরাবর 'কেস' পাঠাইত। তাহার মত বন্ধু ভাগলপুরে আমার বেশি ছিল না। একটা সত্য কথা না বলিয়া পারিতেছি না, ভাগলপুরে বিহারীদের এবং অন্য অবাঙালীদের নিকট আমি যে আন্তরিক ভালোবাসা পাইয়াছিলাম, বাঙালীদের নিকট হইতে তাহা পাই নাই। বাঙালীরা আমার খ্যাতির জন্য আমাকে কিছু খাতির করিত,

কিন্তু, আমাকে বেশি ভালোবাসিত বিহারীরা। ভাগলপুরের ফটোগ্রাফার হরি কুণ্ডু এবং আনন্দ প্রেসের মালিক রাম অওতার আজও আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে। আরও আছে অনেক কুলি, মুটে, মজুর, রিকসাওলা, মেছো, মেছুনি দোকানদাররা। ইহারা আমার সাহিত্যের আস্বাদ পায় নাই, তবু কেন যে ভালোবাসিত আমাকে, তাহা জানি না। ইহাদের অনেকের কথা পরে আমি আমার 'হাটে বাজারে' গ্রন্থে লিখিয়াছি। আর একটি কথা মনে পড়িল। মনে হইতেছে, আমি 'মানদণ্ড' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই লেখার একটু ইতিহাস আছে। কলিকাতায় গিয়াছিলাম। সজনীর বাসায় আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন,—বনফুল, এবার পূজায় তোমার উপন্যাস চাই। আমি বলিলাম, লিখিব, কিন্তু পারিশ্রমিক এক-হাজার দিবেন তো? মজুমদার মহাশয় বলিলেন— দিব। তুমি লিখিতে শুরু করিয়া দাও। ভাগলপুরে ফিরিয়া গিয়া 'মানদণ্ড' আরম্ভ করিয়া দিলাম। বইটি লেখা সম্পূর্ণ করিয়া বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায়কে এবং অধ্যাপক গিরিধারী চক্রবর্তীকে পড়িয়া শুনাইলাম। লীলা আগেই পাণ্ডুলিপিটি পড়িয়াছিল। তিনজনেই রায় দিলেন—বইটি ছাপিতে দিতে পার। আনন্দবাজারে পাঠাইয়া দিলাম। 'পূজা' সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইল। কিন্তু, সুরেশের এক হাজার টাকার বদলে সাত শত টাকার (৭০০৲) চেক পাঠাইলেন। সুরেশবাবুকে যখন প্রশ্ন করিলাম, কথার খেলাপ কেন? তিনি উত্তর দিলেন—আমরা সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক রবীন্দ্রনাথকে দিয়াছি —তাহা ৭০০৲। সুতরাং, তোমাকে আমাদের অফিস হইতে সাতশত টাকার বেশি দেওয়াটা অশোভন। বাকি ৩০০৲ আমি নিজের পকেট হইতে তোমাকে দিব। তুমি নগদ চাও, নগদ দিব, কিংবা ঐ মূল্যের কোনও জিনিস যদি চাও, তাহা কিনিয়া দিব! আমার তখন একটা পাখার দরকার ছিল। সুরেশবাবু আমাকে একখানি Tropical পাখা কিনিয়া দিয়াছিলেন। সে পাখাটি এখনও আমার কাছে আছে, এবং ভালোই চলিতেছে। এই সময়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিকমহলে খুব একটা ডামাডোল চলিতেছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবেন। কাহাকে দিবেন, কংগ্রেসকে, না মুসলিম লীগকে, ইহা লইয়া নানারূপ কল্পনা-জল্পনা, আলাপ-আলোচনা, সভা-মিছিল প্রভৃতি হইতেছিল। জিন্না দাবী করিতেছিলেন যে, তাঁহারা একটা আলাদা 'নেশন', সুতরাং, তাঁহারা, আলাদা রাজত্ব চান। হিন্দু নেতারা বই লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া প্রতিবাদ করিতেছিল তাহার।

জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজী বলিলেন—হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া নাই, ইংরেজ আছে বলিয়াই এ ঝগড়া। ইহার পরই নোয়াখালিতে ভীষণ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিল, তাহার পর বিহারে, তাহার পর অন্যান্য নানা জায়গায়। কলিকাতায় তখন মুসলিম লীগ গভর্ণমেণ্ট। সেখানে নিদারুণ ক্যালকাটা কিলিং হইয়া গেল। সুরাবর্দি তখন মুখ্যমন্ত্রী এবং মুজিবর রহমান তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। সারা দেশ ব্যাপিয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার একটা ঝগড়া বহিতে লাগিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধা দিবার ভাণ করিলেন, কিন্তু প্রকৃত বাধা দিলেন না। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন 'স্বপ্নসম্ভব' নামে একটি বই লিখিয়াছিলাম আমি। পরে সেটি পুস্তকাকারেই রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশ করিয়াছিল। ইহার অনেক পরে আমি বইটির ইংরাজি অনুবাদ করি। সে অনুবাদ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজে প্রকাশিত হয়—**Betwixt Dream and Reality** এই নামে এবং পরে রূপা এণ্ড সন্স তাহা বই হিসাবে প্রকাশ করেন। শুনিয়াছি, বইটি অস্ট্রেলিয়ার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল। বি. এ. ইংরজী অনার্স ক্লাসে।

এই সময়ে আমার লেখার উৎসাহ তুঙ্গে উঠিয়াছিল। নানারকম লেখা লিখিতাম। শনিবারের চিঠির তাগাদায় লিখিতে হইত। ঋণশোধ করিবার তাগাদাও ছিল। এই সময়ের মধ্যেই আমার কয়েকটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। বনফুলের গল্প—আমার প্রথম গল্পসংগ্রহের বই। তাহার পর বাহির হয় বনফুলের আরও গল্প। তাহার পর 'ভুয়োদর্শন' 'বিন্দু বিসর্গ' 'দশভান' নামে একাঙ্ক নাটক, সিনেমার গল্প ( ব্যঙ্গনাটক ) 'শ্রীমধুসূদন' এবং 'বিদ্যাসাগর' কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়েই আমি 'শনিবারের চিঠি'-তে 'সপ্তর্ষি' উপন্যাস আরম্ভ করি। এই সময় 'অঙ্গারপর্ণী' নামক একটি ব্যঙ্গকবিতার বইও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশ করেন। ইহার কিছুপূর্বে আমার 'রাত্রি' উপন্যাসটি তাঁহারা প্রকাশ করেন। পরে ইহা রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত হয়। নির্ভুল তারিখ অবশ্য মনে নাই, তবে সময়টা মোটামুটি এই—আমাদের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্বে। তখন, দিবারাত্র যখনই সময় পাইতাম, লিখিতাম। এই সময়ই বাজারের নিকট আর একটি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি স্থাপিত হইল। আমার রোগীর সংখ্যা আরও কিছু কমিয়া গেল। লেখার অনেক সময় পাইলাম। লেখার চাহিদাও প্রচুর ছিল, লেখা লইয়াই মাতিয়া রহিলাম। ল্যাবটি হইতে যাহা পাইতাম, তাহাও তখনকার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

তাহার পরই ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পাইলাম। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সর্বত্র বাঙালীর সর্বনাশের বীজ বপন করিয়া ইংরেজরা চলিয়া গেল। ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়ন করিবার আন্দোলন বাঙালীরাই প্রথমে করিয়াছিল। ইংরেজ তাহার শোধ লইয়া গেল। স্বাধীন ভারতে বাঙালীর গৌরবের স্থান কোথাও রহিল না। স্বাধীনতার পরই দেশে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গেল। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ হিন্দুমুসলমানের রক্তে ভিজিয়া গেল। পাঞ্জাব হইতে দলে দলে লোক এ দেশে আসিতে লাগিল। এ দেশ হইতে অনেক মুসলমান পাঞ্জাবী পশ্চিম পাঞ্জাবে চলিয়া গেল। ভারত গভর্ণমেণ্ট অর্থ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিলেন। উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীরা এখানে ভালোভাবেই নিজেদের স্থান করিয়া লইল। তাহারা দেশে যে সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহার মূল্য পাইল, কিন্তু, হিন্দু বাঙালীদের বেলা গভর্ণমেণ্ট কিছু করিলেন না। করিলেন কেবল উদ্বাস্তু ক্যাম্প। সেখানে বাঙালী হিন্দুরা ভিখারীর মত বাস করিতে লাগিলেন। স্বাধীন ভারতেও বাঙালীদের প্রতি এই বিমাতৃসুলভ আচরণ দেখিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল। মনে হইল, এখনও আমরা, হিন্দু-বাঙালীরা, পরাধীন আছি। তফাৎ কেবল, আমাদের আগেকার প্রভুরা ইংরেজ-ভাষাভাষী ছিলেন, এখনকার প্রভুরা হিন্দি-ভাষাভাষী। হিন্দু-বাঙালীরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, তাই শাসনব্যাপারে তাহাদের কোন হাত রহিল না।

কিছুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী নিহত হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে বড়ই মর্মাহত হইলাম। মনে হইল, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষটি চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর বসিয়া লিখিতেছিলাম, এমন সময় আমার বড় ছেলে অসীম ছুটিয়া আসিয়া খবরটা দিল। গুজব রটিয়া গেল, একজন মুসলমান তাঁহাকে মারিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। কিছুদিন পূর্বে ভাগলপুর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মুসলমান হত্যা হইয়াছিল নোয়াখালির প্রতিশোধস্বরূপ। সকলের ভয় হইল, আবার একটা নিদারুণ খুনোখুনি শুরু হইয়া যাইবে। আমাদের বাড়ির পাশেই সি. এম. এস. (C. M. S.) স্কুলে একজন সাহেব পাদরি প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক-সভা আহ্বান করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আত্মার মঙ্গলকামনা করিয়া একজন সাহেব পাদরি সর্বপ্রথম তাঁহাকে যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। একটু পরেই রেডিওতে পণ্ডিত জওহরলাল ঘোষণা করিলেন, ঘাতক মুসলমান নয়, একজন হিন্দু, নাম নাথুরাম গড্‌সে। পরদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটি শোকসভা

হইল। সেই সভায় আমি স্বরচিত—হে মহাপথিক, হে মহা পথ—'কবিতাটি পাঠ করি।

সে সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া বড় গোলমেলে। তাহার বিশদ বিবরণ এ গ্রন্থের পক্ষে অবান্তর। তবে, আমার মনে হয়, আমার 'ত্রিবর্ণ' নামক গ্রন্থের মাল-মশলা তখনই আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল।

আমার ছেলেমেয়েরা তখন বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান কেয়ার বয়স তখন ১৮।১৯ বছর। আই. এ পরীক্ষা দিয়াছে। তাহার জন্য নানাস্থানে পাত্র সন্ধান করিতেছি। বড় ছেলে অসীম ম্যাট্রিক ক্লাসে, ছোট ছেলে চিরন্তন সেকেণ্ড ক্লাসে এবং ছোট মেয়ে করবী মোক্ষদা গার্লস স্কুলে পড়িতেছে। তাহাদের পড়াশোনার ভার আমার গৃহিণীর উপর ছিল। সমস্ত সংসারের ভারই তিনি বহন করিতেন। আমি যাহা রোজগার করিতাম, তাহা তাহার হাতেই দিয়া দিতাম। সংসার তিনিই চালাইতেন, আমি যেন paying guest-এর মতন সারাজীবন কাটাইয়াছি। একটু অবশ্য তফাৎ ছিল। আমি আগে খুব জেদি এবং রাগী ছিলাম। এই দুইটার ধাক্কা অবশ্য আমার গৃহিণীকে সামলাইতে হইত। তিনি অবশ্য কম জেদি বা রাগী ছিলেন না। তাই, সংঘর্ষটা মাঝে মাঝে খুব জমিয়া উঠিত। আমার ছোট ছেলে রনতু (চিরন্তন) হইবার পর গৃহিণী ঘরে পড়িয়া প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তিনি বেথুন কলেজে আই. এ. পড়িতেন। ভালো রাঁধিতে জানিতেন না। কিন্তু, আমি খাদ্যরসিক জানিতে পারিবার পর, নিজের চেষ্টায় রন্ধন-ব্যাপারে ক্রমশঃ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। ছেলেমেয়েদের বাড়িতে তিনিই পড়াইতেন এবং আমার লেখার সময় মাঝে মাঝে আমাকে চা করিয়া দিতেন। আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। তাহারা আসিলে, তাহাদের আপ্যায়নের ভার তাঁহার উপরই ছিল। আমার ভাইয়েদের অনেকেরই স্ত্রী ছেলে হইবার সময় আমার কাছে চলিয়া আসিতেন। তাঁহাদের আঁতুরের ভারও লীলাকে লইতে হইত। আমি টাকা রোজগার করিতাম এবং নিজের নানারকম খেয়াল লইয়া থাকিতাম। লেখা ছাড়া, ছবি আঁকা, মাঝে মাঝে নূতন স্বাদের রান্না করা, গোলাপফুলের বাগান করা, বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো, দিনে পাখি দেখা, রাত্রে আকাশচর্চা করা। অর্থাৎ, আমি আমাকে লইয়া এবং আমার খেয়াল লইয়া দিনরাত ব্যস্ত থাকিতাম। লীলাবতী সংসারের দৈনন্দিন ঝড়-

ঝাপটা আমার গায়ে লাগিতে দিতেন না। টাকার দরকার হইলে, টাকা চাহিতেন এবং আমি সেটা জোগাড় করিয়া দিতাম। যখন প্র্যাকটিশের টাকায় কুলাইত না, তখন প্রকাশকদের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা চাহিতাম, এবং পরে বই লিখিয়া তাহা শোধ করিয়া দিতাম। যদি আমি বা লীলা মিতব্যয়ী হইতাম, তাহা হইলে প্রকাশকদের নিকট আমাকে টাকা ধার করিতে হইত না। ডাক্তারি হইতে যাহা রোজগার করিতাম, তাহাতেই আমাদের সংসার কষ্টে-সৃস্টে চলিয়া যাইত—কিন্তু, আমাদের উভয়েরই প্রবণতা ছিল অমিতব্যয়িতার দিকে। অমিতব্যয়িতার একটা দরাজ আনন্দ আছে, সে আনন্দ আমরা প্রচুর ভোগ করিতাম। সেজন্যে ধার করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু, সে ধার শোধ করিবার জন্যই আমি রাত জাগিয়া বই লিখিয়াছি এবং ভালো করিয়া লিখিবার জন্য অনেক পড়িয়াছি। পূর্বেই বোধ হয়, উল্লেখ করিয়াছি, একঘেয়ে, এক ছাঁচের-লেখা আমি লিখিতে পারি না। প্রতিটি লেখায় আমি নূতন স্বাদ পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতটা সফল হইয়াছি, জানি না। সুতরাং, পরোক্ষভাবে আমাদের অমিতব্যয়িতাই আমাকে বই লিখিতে প্ররোচিত করিয়াছে। নক্ষত্র দেখার কৌতূহল আমার প্রথম জাগে, যখন আমি মেডিকেল কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম বছর মেসে স্থান পাই নাই, তাই সেওড়াফুলি হইতে ডেলি প্যাসেনজারি করিতে হইত। একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় ফিরিতেছি, রেলের ওভারব্রিজে উঠিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি চোখে বাইনাকুলার লাগাইয়া দক্ষিণ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। আমিও দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং প্রশ্ন করিলাম, কি দেখিতেছেন? তিনি উত্তর দিলেন—অগস্ত্য নক্ষত্র। অবাক হইয়া গেলাম।

'আপনি নক্ষত্র চেনেন?'

'যেগুলো খালি চোখে দেখা যায়, চিনি।'

'আমাকে চিনিয়ে দেবেন?'

'দেব না কেন? কিন্তু, রাত জাগতে হবে।'

ভদ্রলোক দীর্ঘাকৃতি। পরিচয় লইয়া জানিলাম, তিনি সেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশনের অ্যাসিস্‌টেণ্ট স্টেশন-মাস্টার। পরদিন রবিবার ছিল। তাঁহার বাড়ি গেলাম। দেখিলাম, তাঁহার একটি ছোট টেলিস্কোপও আছে। আমাকে তিনি একটি ছোট বাংলা বইও দিলেন। এ বিষয়ে তিনিই আমার প্রথম গুরু। কিছুদিন পরে তিনি বদলি হইয়া গেলেন। আমার কিন্তু, আকাশচর্চার নেশা জমিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও নানারকম বই কিনিতে লাগিলাম।

মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় যখনই সময় এবং সুযোগ পাইয়াছি, নক্ষত্রগুলি চিনিবার চেষ্টা করিয়াছি। আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া আমাদের পুরাণে এবং গ্রীকদেশের পুরাণেও নানাবিধ উপাখ্যান আছে। তা ছাড়া নক্ষত্রগুলিকে ঠিক মতো চিনিতে পারিলেও ভারি আনন্দ হয়। এজন্য অবশ্য অনেক রাত জাগিতে হয়। বই পড়িয়া এবং আকাশের ছবি দেখিয়া নক্ষত্রদের সহিত মোটামুটি একটা পরিচয় করা খুবই সহজ। ভাগলপুরে আমার সাহিত্যচর্চার সহিত আকাশ-চর্চাও পুরাদমে চালাইয়াছি। আমার পুত্র-কন্যারা এবং মাঝে মাঝে লীলাও আকাশ-চর্চায় যোগ দিয়াছে। আকাশ-চর্চার একটি প্রধান উপকরণ, ভালো একটি বড় টর্চ। সেই টর্চ দিয়া নক্ষত্রটিকে চিনাইয়া দেওয়া সহজ। শক্তি-সম্পন্ন ( পাঁচ সেলের বা আট সেলের ) টর্চের আলো যেন আঙুলের মতো গিয়া নক্ষত্রটিকে স্পর্শ করে। ভারি আনন্দজনক ব্যাপার এটা। এই সব লইয়া একটি বই লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু, সেটি হইয়া ওঠে নাই। পক্ষী-পর্যবেক্ষণও আমার একটা নেশা ছিল। তাহা লইয়া 'ডানা' লিখিয়াছি। পক্ষী-পর্যবেক্ষণের জন্য প্রদ্যোতের কাছে আমি ঋণী। তাহার সহায়তা না পাইলে, আমি পক্ষী বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান আহরণ করিয়াছি, ততটুকুও পারিতাম না। নানারকম পাখী মাঝে মাঝে দেখিতাম, কিন্তু, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না। মনে কিন্তু কৌতূহল ছিল। এমন সময় একদিন প্রদ্যোৎ আসিয়া হাজির। দেখিলাম, তাহার গলায় একটি বাইনাকুলার ঝুলিতেছে। শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত একজন ইনকাম-ট্যাক্সের বড় অফিসার তখন। সাধারণের চক্ষে ভয়াবহ ব্যক্তি, কিন্তু, আমার খুব প্রিয়, আমার লেখার খুব ভক্ত।

প্রশ্ন করিলাম—'তোমার গলায় বাইনাকুলার কেন ?'

'আজকাল হার্ডওয়াচিং করছি।'

'আমাকে চিনিয়ে দেবে ?'

'নিশ্চয়, এখনই চলো—'

তাহার মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া গেলাম। এবং, সেইদিনই অনেক পাখী চিনিলাম। আমার উৎসাহ দেখিয়া প্রদ্যোতের উৎসাহ বাড়িল। সে আমাকে সালিম আলির একখানা বই উপহার দিল। তাহার পর, ক্রমাগত বই পাঠাইতে লাগিল। তাহার নিকট হইতে বোধ হয়, পক্ষীসংক্রান্ত সবরকম বইহ পাইলাম। আমার বাবার একজন বন্ধু ( আমাদের জ্ঞানবাবু কাকা ) তাঁহার দূরবীণটি আমাকে উপহার দিলেন। কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য, সে দূরবীণটি চুরি

হইয়া গেল। আমার উৎসাহ-কবিতায় শোচনীয় ছন্দ-পতন হইল। প্রদ্যোৎকে জানাইলাম—ভাই প্রদ্যোৎ, বাইনাকুলারটি চুরি গিয়াছে। একটি বাইনাকুলারের দাম কত এবং কলিকাতায় পাওয়া যাইবে কিনা, অবিলম্বে জানাও। প্রদ্যোৎ একটি বিলাতী বাইনাকুলার কিনিয়া উপহারস্বরূপ সেটি আমাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিল। আবার আমার পাখী দেখা শুরু হইয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরেই আমার বড় মেয়ে কেয়ার বিবাহ হয়। বরপক্ষ ভাগলপুর যাইতে রাজি হইলেন না। আমাকেই সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে হইল। আমাদের বড় পরিবার। আমরা ছয় ভাই, দুই বোন। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তা ছাড়া, আমার বন্ধুবান্ধব এবং বাবার বন্ধুবান্ধবও আছেন। বাবা তখনও জীবিত। সুতরাং, বড় একটি বাড়ির প্রয়োজন। সজনী আমার সহায় হইল। তখনই আর একবার অনুভব করিলাম, সজনী আমার কত বড় বন্ধু। ভাগলপুর হইতে আসিয়া আমরা প্রথমে সজনীর বাড়িতে উঠিয়াছিলাম। সজনীর বাড়িতেই কেয়াকে দেখানো হইয়াছিল। একটা বড়ো বাড়ির সন্ধানে সজনীই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সে সময় গ্রীষ্মকাল ( বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ ঠিক মনে নাই )—সেই দারুণ গ্রীষ্মে সজনী বাড়ি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথাও মনোমত বাড়ির সন্ধান পাওয়া যায় না, অবশেষে শোনা গেল, রাজা মণীন্দ্র নন্দী কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি আছে। কলেজ-বাড়িটি খালি আছে। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন পঞ্চাননবাবু। সজনী আমাকে সঙ্গে লইয়া তাহার কাছে গেল। তিনি বলিলেন—'আমাদের কলেজের শাসন-পরিষদ ঠিক করিয়াছেন যে, বিবাহে ব্যবহার করিবার জন্য কলেজ ভাড়া দেওয়া যাইবে না। কিন্তু, আপনি দেখিতেছি, বিপদে পড়িয়াছেন। আপনাকে সাহায্য করিব। কাগজে-কলমে আপনাকে ভাড়া দিব না; আপনি বাড়িটি ব্যবহার করুন। ইহার ইলেকট্রিক বিল এ কয়দিনে যাহা হইবে তাহা দিবেন, এবং বিবাহ হইয়া গেলে. কলেজে আপনার সাধ্যমত কিছু ডোনেশন দিয়া যাইবেন.' নিশ্চিন্ত হইলাম।

বিবাহের টাকা আমি প্রকাশকদের নিকট হইতে অগ্রিম ঋণ লইয়াছিলাম। ডি. এম. লাইব্রেরীর মালিক গোপালদা আমাকে কিছু টাকা দিয়াছিলেন। আর একটি সিনেমা কোম্পানী আমাকে কিছু টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সব টাকাটা দেন নাই। তাঁহার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া গহনার অর্ডার দিয়াছিলাম, তিনি প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করাতে বড়ই

বিপন্নবোধ করিতে লাগিলাম। দুই হাজার টাকা কম পড়িয়াছিল। সজনীর পরামর্শে আমি আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশ মজুমদারের সহিত দেখা করিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, দুই হাজার টাকার জন্যে তোমার মেয়ের বিয়ে আটকাইয়া যাইবে না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়া আমাকে নগদ দুই হাজার টাকা বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে একটি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে গেলাম। তিনি বাধা দিলেন। বলিলেন, কিছু করিতে হইবে না। তুমি শুধু তোমার হ্যাণ্ডটি আমার কাগজের উপর নাড়িও। তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। সেকালে প্রকাশকদের সহিত এবং কাগজের মালিকদের সহিত আমাদের যে হৃদ্যতা ছিল, তাহা এখন আছে কিনা জানি না। শুনিয়াছি, আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীমান অশোক সরকার তাঁহাদের এই গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

বাড়ি তো ঠিক হইল, কিন্তু, একটা বিবাহের যে অনেক ঝঞ্ঝাট। কলিকাতা শহরে পয়সা ফেলিলে সবই পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, তাহা আমার মত আনাড়ির পক্ষে জানাও শক্ত। সজনীই সব ভার লইল। আমি সমস্ত টাকা সজনীর হাতে দিয়া দিলাম। সজনীই সব ব্যবস্থা করিল। বিবাহ শেষ হইয়া যাইবার পর, সমস্ত খরচের হিসাব সে একটি খাতায় লিখিয়া আমার হাতে দিল। রসিদও ছিল এক গোছা। কোন্ কোন্ দোকান হইতে কি কি কেনা হইয়াছে, তাহার ক্যাশমেমো। সেই খাতাখানি আর ক্যাশমেমোগুলি আমি কিছুদিন রক্ষা করিয়াছিলাম। এখন হারাইয়া গিয়াছে।

আমার মেয়ের বিবাহের বছরেই আমার বড় ছেলে অসীম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। পরীক্ষায় ভালো ফল হইয়াছিল। স্কলারসিপ পাইয়াছিল। কিন্তু, বাঙালীর ছেলে বলিয়া তাহাকে স্কলারসিপ দেওয়া হইল না। আমি ঠিক করিলাম, ছেলেদের আর বিহারে পড়াইব না। তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকাইয়া দিলাম। তাহার নম্বর ভালো ছিল, বিশেষ অসুবিধা হইল না। একটু কিন্তু চাতুরী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন—আপনি যে ভাগলপুরে থাকেন, ইহা সুবিদিত। বিহারের ছেলেকে বাংলাদেশের কলেজে ভরতি করার অসুবিধা আছে। আপনি আপনার ছেলের গার্জেন হিসাবে নিজের নাম দিবেন না। বাংলাদেশে বাস করেন, এমন কোন আত্মীয়ের নাম দিন। তাহাই হইল। সেওড়াফুলী-নিবাসী আমার জেঠতুতো দাদা শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় অসীমের গার্জেন হইলেন। বাঙালীদের উপর

প্রতিশোধ লইবার জন্য ইংরেজ বহু পূর্ব হইতেই প্রাদেশিকতার বিষ প্রতি প্রদেশে বপন করিয়াছিলেন। কারণ, হিন্দু বাঙালীরাই স্বদেশী আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। হিন্দু বাঙালীদের ধ্বংস করিবার জন্য ইংরেজ নানারকম আইন করিয়াছিল। বিহার ফর বিহারীজ, আসাম ফর আসামীজ—এই সব আইন আমাদের সর্ব-ভারতীয় বোধকে বিনষ্ট করিয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার পরও এ সব আইনের প্রখরতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

অসীম প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হইল। মানে, আমার খরচ বাড়িল। মেয়ের বিয়ের ঋণ তখনও শোধ হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, আরও দুইটি ল্যাবরেটরি বাজারে হইয়াছিল, সুতরাং আমার রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছিল। যে রোগীদের আমি বিনা পয়সায় দেখিতাম, তাহাদের সংখ্যা অবশ্য কমে নাই। কিন্তু, দূরে চলিয়া আসার জন্য আমার অর্থদায়ী রোগীর দল কমিতে লাগিল। সকলের পরামর্শে আমি আমার ল্যাবরেটরি আবার পূর্বস্থানে লইয়া গেলাম। অর্থাৎ, পটলবাবু আমার জন্য যে ল্যাবরেটরিটি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সেইখানেই ফিরিয়া গেলাম। পটলবাবুর পুত্র সেখানে মোটরের যন্ত্রপাতির একটি দোকান করিয়াছিল। আমার অনুরোধে সে দোকান সরাইয়া লইল। কিন্তু, ভাড়াটি বাড়াইয়া দিল। পটলবাবুকে আগে ১৬ টাকা ভাড়া দিতাম—অরুণকে ৪০ টাকা দিতে হইল।

আমি কিন্তু দমিলাম না, সম্মুখসমরে অগ্রসর হইয়া গেলাম।

আদমপুর মহল্লায় বাঙালীটোলায় আমার 'গোলকুঠি' বাড়িটি ছিল গঙ্গার ধারে। সেখান হইতে আমার ল্যাবরেটরি প্রায় এক মাইল দূর। চারবার যাওয়া-আসা করিতে হইবে। প্রথম প্রথম হাঁটিয়াই যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু, দুই-একদিন হাঁটিয়াই বুঝিতে পারিলাম, পারিব না। ঘোড়ার গাড়ি কিংবা রিক্সার শরণাপন্ন হইতে হইল। খরচ আরো বাড়িল। আমার দ্বিতীয় বাড়িটি ভাড়া দিলে কিছু আর্থিক সাশ্রয় হইত। কিন্তু, আমি ওই বাড়িটিতে একা বসিয়া লিখিতাম, একা বসিয়া লেখার আনন্দ হইতে আমি নিজেকে বঞ্চিত করিলাম না। লেখা একটা তপস্যা, হট্টগোলের মাঝখানে তাহা বারবার বিঘ্নিত হয়। গোলকুঠির ওই খোলার বাড়িতে বসিয়া আমি আমার অনেক বই লিখিয়াছি। ওই ছোট্ট বাড়ির ঘরটিতে ঢুকিয়া খিল দিয়া টেবিলের সামনে বসিলেই অদ্ভুত একটা স্বপ্নলোক মূর্ত হইয়া উঠিত আমার মনে। আমি সমস্তদিন ল্যাবরেটরির কাজ করিতাম। রাত্রে ওই স্বপ্নলোকে গিয়া বিচরণ করিতাম।

ঋণশোধ করিবার তাড়ায় আমাকে অনেক বই লিখিতে হইয়াছিল। এ তাড়া না থাকিলে, আমি হয়ত এতো বই লিখিতাম না। শুনিয়াছি, স্কট এবং আলেকজানডার ডুমাও ধার শোধ করিবার জন্য অনেক বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রকাশকদের সঙ্গে কি শর্তে আবদ্ধ ছিলেন, জানি না। কিন্তু, আমার প্রকাশকদের সঙ্গে শর্ত ছিল, বই লেখা হইলে তাঁহাদের দিব। কিন্তু, কবে লিখিব, কি আকারে লিখিব, তাহা আমিই ঠিক করিব। প্রকাশক আমাকে তাড়া দিতে পারিবেন না। তাঁহারা রাজি হইয়াছিলেন এবং আমি আমার খেয়াল-খুশী-মত যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিয়াছি। আমি চেষ্টা করিতাম, যাহাতে আমার দুইটি বই যেন এক স্বাদের না হয়। নাম করিব না, তবে, অনেক বড বড় নামজাদা লেখকের একঘেয়ে লেখা পড়িয়া মনে হইত, এরূপ চবিত-চর্বণ করিয়া লাভ কি। ইহাতে লেখকের হয়ত কিছু আয়বৃদ্ধি হয়, কিন্তু, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। লেখকের একটু খ্যাতি হইয়া গেলে প্রকাশকরা তাঁহার বই লইতে আগ্রহী হন, বই ছাপা হইলেই কিছু অর্থাগম হয়—এই লোভ অনেক লেখক সংবরণ করিতে পারে না। একই বিষয়ের একইরকম চরিত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়া পুনঃপুনঃ বই লিখিতে থাকেন।

আম সে লোভ সংবরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। লেখার বিভিন্ন বিষয়-বস্তু আহরণ করিবার জন্য আমি নানা বিষয়ের পুস্তক পড়িয়াছি। আমার অধ্যাপক বন্ধুবর্গ আমাকে নানা বইয়ের সন্ধান দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া তিনজনের নাম মনে পড়িতেছে। একজন, ডক্টর সুশীল দে, আর একজন, নির্মল বসু। ইঁহারা আর ইহলোকে নাই। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও জীবিত নাই। এ প্রসঙ্গে সজনীর নামও বারবার মনে পড়িতেছে। কারণ, আমার কোনও বই-এর প্রয়োজন হইলে, তাহাকে চিঠি লিখিতাম, এবং, সেই আমাকে খবর দিত, কোথায়, কাহার কাছে সে বই পাওয়া সম্ভব। অনেক সময় সে নিজেও জোগাড় করিয়া বা কিনিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিত। কবি মোহিতলাল মজুমদারের নিকটও আমি অনেক প্রেরণা পাইয়াছি। তাঁহার সহিত আমার যে পত্রালাপ হইত, সে পত্রগুলিতে আমাকে তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, তাহা আমাকে উদ্বুদ্ধ করিত।

আর একজনের কথা আমি একটু বিশদভাবে লিখিব। তিনি ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। আমার মাস্টারমহাশয়। মেডিকেল কলেজে তাঁহার নিকট আমি পড়িয়াছি। কিন্তু, তিনি আমার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন

সাহিত্যের ক্ষেত্রে। লেখার জন্যই আমাকে স্নেহ করিতেন তিনি। কিছু প্রশ্রয়ও দিতেন। সেই সাহসে আমি ভাগলপুরে থাকিতে আমার অনেক লেখা তাঁহাকে ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতাম পড়িবার জন্য। স্কুলে মাস্টারমহাশয়েরা পূর্বে যেমন ছেলেদের Exercise-book সংশোধন করিয়া দিতেন, তেমনি তিনি আমারও অনেক লেখা সংশোধন করিয়া পাঠাইতেন। সঙ্গে দীর্ঘ চিঠিও থাকিত। চিঠি নয়, যেন বেত। সাহিত্যের প্রকৃত সমজদার ছিলেন তিনি। অত্যন্ত কড়া সমালোচক, কোনওরকম শৈথিল্য সহ্য করিতেন না। আমার সাহিত্য-সাধনার পথে তিনি প্রথম শ্রেণীর 'গাইড' ছিলেন একজন। তাঁহার পরামর্শেই আমি অনেক ভালো ভালো বিদেশী লেখকদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ভাগলপুরে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। তখন তাহাকে আমার লেখা পড়িয়া শুনাইতাম। ভালো লাগিলে বলিতেন—নটমল্লার জমেছে। না জমিলে, মৃদু হাসিয়া বলিতেন—সুর ঠিক বাঁধতে পার নি, বেসুরো ঠেকছে মাঝে মাঝে। আগাগোড়া ঢেলে লেখ। তিনি নিজেও একজন উঁচুদরের লেখক ছিলেন। কার্টুনও আঁকিতেন চমৎকার। সে যুগের 'শনিবারের চিঠি'-তে ও 'ভারতবর্ষে' তাঁহার কার্টুন ও লেখা বাহির হইত। তাঁহার লেখা ছোটগল্প, 'নরকের কীট' এবং 'সিরাজীর পেয়ালা' বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহার 'দশচক্র' উপন্যাসটিও সেকালে রসিকসমাজে নাম করিয়াছিল। ব্যঙ্গরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আদর্শেই আমি 'অগ্নীশ্বর' লিখিয়াছিলাম। তাঁহার মধ্যে প্রখরতা ও কোমলতার যে অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়াছিল, তাহা বড় একটা দেখা যায় না। বাহিরে শাণিত তরবারি, অন্তরে কোমল পণির। বনবিহারীবাবুর কাছে আমার ঋণ অনেক।

এই সময় আমি আমার সমস্ত বই বেঙ্গল পাবলিশার্সদের দিতাম। আমার ছোট ছেলে রনতুও (চিরন্তন) ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সীতে ভরতি হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী হইতে অসীম কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এবং রন্তু শিবপুরে ইনজিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হইল। তাহাদের খরচ মাসে মাসে বেঙ্গল পাবলিশার্স দিত। তখন, মনোজ ও শচীন একসঙ্গে ছিল। বেঙ্গল পাবলিশার্সকেই তখন সব বই দিতাম। এই সময়, আমার বই সিনেমা-ওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রথমে আসিয়াছিলেন বোম্বাই হইতে 'বম্বে টকিজ' কোম্পানী। তাহারা আমার 'দ্বৈরথ' বইটি কনট্রাক্ট করিয়া আমাকে ৫০০ টাকা দিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা কিন্তু বইটি করিতে পারে নাই। তাহার পর

কলিকাতার নিউ থিয়েটার্স আমার 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকটি সিনেমায় রূপায়িত করেন। উপলক্ষে প্রখ্যাত ডিরেকটর শ্রীবিমল রায় (এখন স্বর্গীয়) সপরিবারে ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মেয়েদুইটি রেংকি এবং তাতন তখন খুব ছোট। রেংকি এখন বড় হইয়াছে এবং আমার গল্প ইংরজীতে অনুবাদ করিতেছে। সময় কত দ্রুত চলিয়া যায়।

'মন্ত্রমুগ্ধ' সম্বন্ধে আর একটি কথাও মনে আঁকা আছে। সেটিও এখানে লিখিয়া রাখি। 'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবি যখন প্রস্তুত হইয়া কলিকাতার প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হইতে লাগিল, তখন আমি একদিন কলিকাতায় গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিলাম। বইটি হাসির বই, দেখিলাম দর্শকরা সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে। আমার বাবা তখন মণিহারীতে ছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে আমার কাছে আসিয়াছিলেন। কাগজে তিনি 'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবির প্রশংসা পাড়য়াছিলেন। আমাকে একদিন প্রশ্ন করিলেন—এখানে ও ছবি আসিবে কি না। বলিলাম, এখানে বাংলা ছবি কম আসে। ঠিক বলিতে পারি না। বুঝিলাম, বাবার ছবিটি দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু, বাবার তখন শরীর খুব সমর্থ নয়। তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া ছবি দেখানো সম্ভব নয়। আমি সেই থিয়েটার্সের মালিক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে একটি পত্র লিখিয়া জানাইলাম, আমার বৃদ্ধ পিতা ভাগলপুরে আছেন, তিনি 'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবিটি দেখতে চান। তাঁহার পক্ষে কলিকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়। আপনারা কি ছবিটি একদিনের জন্য এখানে পাঠাইতে পারেন? আমি এখানে একটা প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থা করিতে পারি, যদি আপনারা ছবিটি পাঠান। ভাগলপুরের স্টেশন রোডের উপর যে বড় প্রেক্ষাগৃহটি ছিল, তাহার মালিক একজন বিহারী ভদ্রলোক আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিলেন— সকালবেলা যে কোনও দিন আপনি আমার 'হল'-টি ব্যবহার করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ও ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমার পত্র পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'আমি লোক দিয়া ছবিটি ভাগলপুরে পাঠাইয়া দিব। সে গিয়া আপনার বাবাকে ছবিটি দেখাইয়া আসিবে। আপনি একটি সিনেমা-হল জোগাড় করুন।'

যথাকালে 'মন্ত্রমুগ্ধ' ভাগলপুরে আসিল এবং ভাগলপুরবাসী অনেক বাঙালী আমার বাবার সহিত বসিয়া বইটি উপভোগ করিলেন। আমার কম খরচ হইল না।

এইসময়ই আমার জীবনে আর একটা ঢেউ আসিয়া লাগিল। ভাগলপুরের বাহিরে নানাস্থান হইতে সাহিত্য-সভায় নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলাম। অনেক

জায়গায় সম্বর্ধনা এবং মানপত্রও জুটিল। মুঙ্গের, জামালপুর, পাটনা, মজঃফরপুর, কানপুর, কাশী, নৈনিতাল, এমন কি বর্মাদেশে রেঙ্গুন পর্যন্ত গিয়াছি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় কন্যাকুমারিকাতেও গিয়াছিলাম এবং সেই সময় দক্ষিণভারতের বড় বড় তীর্থগুলি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। লীলা সর্বত্র আমার সহগামিনী হইয়াছিল। দিল্লীতে যখন গভর্ণমেণ্টের সাহিত্য-আকাদমী ছিল, তখন তাহাতে আমিও একজন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। একটি সভাতে যোগদানও করিয়াছিলাম। তখন জওহরলাল নেহরু বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু, আমি দেখিলাম, আকাদমী যে পদ্ধতিতে প্রতি বছর বিভিন্ন লেখকদের পুরস্কার বিতরণ করেন, সে পদ্ধতিটি সাহিত্য-অনুমোদিত পদ্ধতি নহে। গভর্ণমেণ্ট নিজেদের খুশীমতো নিজেদের নিয়োজিত কয়েকজন লোকের ভোট লইয়া ঠিক করেন, কে পুরস্কার পাইবার যোগ্য। আমি বলিলাম, গভর্ণমেণ্ট যাঁহাদের নিকট ভোট লইতেছেন, তাঁহারা যে সাহিত্যরসিক হইবেনই, তাহার স্থিরতা নাই। আর, দ্বিতীয় কথা—যেখানে ভোটের ব্যাপার, সেখানে গোপনে ধরাধরি, ক্যানভ্যাসিং প্রভৃতি চলিবেই। ভোটের জগতে লাল নীল হয়, ইন্দ্র হনুমান হোল—এ সব তো সুবিদিত। আমার মনে হইল, এই সব পুরস্কার-বিতরণ দ্বারা গভর্ণমেণ্ট একদল প্রসাদ-লোলুপ, ধরাধরি-পটু-সাহিত্য-পেশাদার সৃষ্টি করিবেন। স্বাধীনচেতা, আত্মসম্মানশীল সাহিত্যিকেরা হয়তো এ পদ্ধতিতে ক্বচিৎ পুরস্কৃত হইতে পারেন, কিন্তু,না হইবার সম্ভাবনাও বেশি। আমি আমার এ কথাগুলি আকাদমীর সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলাম। তাহার পর হইতে আর আকাদমীর সংস্পর্শে যাই নাই। আমার মতে, ওটা এখন একটা প্রহসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি যতদিন ভাগলপুরে ছিলাম, ততদিন কলিকাতার কোন সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য কেহ আমাকে আমন্ত্রণ জানান নাই। কলিকাতার অলিতে-গলিতে সাহিত্যিক, এখানে বাহির হইতে লোক ডাকিবার দরকার হয় না। এখন, এখানে আসিয়া কিন্তু, সভার ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এখানে সাহিত্যিকরা সকলেই সভা করিতে ব্যস্ত। সে সব সভায় কিন্তু সাহিত্য-চর্চা করিবার সুযোগ নাই। মন্ত্রী আসেন, গায়ক-গায়িকারা আসেন, বক্তারা আসেন, সভার উদ্যোক্তারা সভার বিবরণী পাঠ করেন এবং ইহার সহিত অনেক সময় থিয়েটার এবং নৃত্য থাকে। খবর-কাগজের রিপোর্টারদের খুব খাতির এ সব সভায়। অনেক সময় তাঁহারা সভাপতি বা প্রধান অতিথি হন। কারণ, তাহা করিলে সভার খবরটা ফলাও করিয়া (অনেক সময় সচিত্র) বাহির করিবার সুযোগ হয়।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আবার ভাগলপুরে ফিরিয়া যাই। ভাগলপুরে আমার জীবন সুখের জীবন ছিল। ডাক্তারি করিতাম, রাত জাগিয়া লিখিতাম, মাঝে মাঝে আকাশ-চর্চা করিতাম, দিনের বেলা সময় পাইলেই পাখীদের খবর লইতাম। পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গার চরে চরে ঘুরিতাম, কিম্বা আমার বাড়ির সামনে শৈলেনবাবুদের যে প্রকাণ্ড বাগানটা ছিল, তাহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িতাম। ওইখানেই একদিন কুলোপাখির দেখা পাইয়াছিলাম। অনেক ছোট ছোট পাখি দেখিতে পাইতাম, কিন্তু, সবাইকে চিনিতে পারিতাম না। বই দেখিয়া অচেনা পাখিদের স্বরূপনির্ণয় করা শক্ত। অপেক্ষা করিতাম, প্রদ্যোৎ কবে আসিবে, তাহাব সাহায্যে চিনিয়া ফেলিব। আমার ছেলেমেয়েরাই আমার তারা-দেখা এবং পাখি-দেখার সঙ্গী ছিল।

পটলবাবুর বাড়িতে যখন ছিলাম, তখনই একটি গাভি কিনিয়াছিলাম। এ খবর বোধ হয় পূর্বেই লিখিয়াছি। গাভীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। দুই একটি কুকুরও পুষিতাম। আমার ল্যাবরেটরির জন্য ভেড়া, খরগোস, গিনিপিগ তো ছিলই। সমস্ত ভার লীলাই সামলাইত। গোয়ালা ঠিক সময়ে দুধ দুহিতে আসিত না বলিয়া লীলা নিজে দুধও দুহিতে শিখিয়াছিল। দুধ, ক্ষীর, ছানা, পায়েস, সন্দেশ, পিঠার তাল সামলাইবার জন্য আমাকে ইন্‌সিউলিন-এর ডোজ বাড়াইয়া দিতে হইল। আমার বাড়ির পাশেই অনেকটা জমি ছিল। সেখানে গোলাপগাছ লাগাইতাম। গোলাপ আমার ছেলেবেলার সঙ্গী, মণিহারীতে আমাদের বড় গোলাপবাগান ছিল। নিজের বাড়ি করিয়া এখানেও গোলাপবাগান করিলাম। করিয়া কিন্তু ফ্যাসাদে পড়িয়া গেলাম। ভাগলপুরে প্রচুর হনুমান। দেখিলাম, তাহারাও গোলাপরসিক। গোলাপের কচি পাতা বা কুঁড়ি হইলেই খাইয়া যাইত। একটা অশান্তির সৃষ্টি হইত বাড়িতে। এ জন্য আমার চাকর দুর্গা অনেক বকুনি খাইয়াছে আমার নিকট। একদিন দুর্গাকে খুব বকিতেছি, এমন সময় আমার একজন লোহার দোকানদার রোগী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রশ্ন করিল, আমি এত চটিতেছি কেন? তাহাক সব বলিলাম। সে বলিল—এক কাজ করুন। লোহার জাল বাগানের চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলুন। অর্থাৎ, জালের একটা ঘর বানাইয়া ফেলুন। সেই ঘরের মধ্যে আলো, বাতাস সব ঢুকিবে, অথচ গাছগুলি নিরাপদ থাকবে।

প্রশ্ন করিলাম—'এত জাল কোথায় পাইব?'

'আমি দিব। আমার দোকানে প্রচুর জাল আছে। বলেন তো, কালই পাঠাইয়া দিই।'

কত দাম লাগিবে—

'ঠিক বলিতে পারি না। তবে মনে হয়, শ'দুই টাকার মধ্যে হইয়া যাইবে—।'

'অত টাকা তো আমার এখন নাই।'

'আপনি যখন খুশী টাকা দিবেন। এখন আপনার বাগান তো বাঁচুক।'

আমার বাগান জাল দিয়ে ঘিরিয়া দিলাম। হনুমানের হাত হইতে ফুলগুলি রক্ষা পাইল। কিন্তু, আর এক প্রকার উৎপাত শুরু হইল। দেখিলাম, মাকড়সারাও গোলাপ-ফুল-বিলাসী। লোহার জালে তাহারাও জাল পাতিতে লাগিল এবং গাছের কুঁড়ি ও কচি পাতাগুলিকে জখম করিবার ব্যাপক আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। আমি দমিলাম না। ঝাড়ু এবং **Insecticide** লইয়া তাহাদের তাড়া করিলাম। ফল ভালোই হইল। আমি দেওঘর হইতে গোলাপফুলের চারা আনাইতাম। **Glory Garden**-এর স্বর্গীয় বিজয়বাবু ধর্মপ্রাণ, পুষ্পরসিক ছিলেন। তিনিই আমাকে গোলাপফুল নির্বাচন করিয়া দিতেন। একবার কয়েকটা ফুল উপহারও পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আজ ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। হনুমান ও মাকড়সার হাত হইতে গোলাপ-ফুলগুলিকে রক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু, মানুষের হাত হইতে পারি নাই। একবার, সরস্বতীপূজার সময় খুব ভোরে বাঙালীটোলায় ছেলেরা কাঁচি দিয়া জাল কাটিয়া আমার বাগানে প্রবেশ করিয়া ভালো ভালো গোলাপফুলগুলি চুরি করিল। কয়েকটি দামী গাছ উপড়াইয়া দিয়া গেল। সরস্বতীপূজার দিন সকালে উঠিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। আমার ছোট মেয়ে করবী তখন পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িল এবং খবর আনিল যে, একজনের বাড়িতে মা সরস্বতীর সামনে আমাদের বাগানের গোলাপফুলগুলি রহিয়াছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল। তখন ভাগলপুরে পুলিশের বড় কর্তা একজন বাঙালী ছিলেন। আমার লেখার ভক্ত ছিলেন তিনি। আমি তাঁহার নিকট চলিয়া গেলাম। সব শুনিয়া বলিলেন, এখনই ব্যবস্থা করিতেছি। তিনি একজন পুলিশ ইনস্পেকটার পাঠাইয়া দিলেন। যে বাড়িতে আমার গোলাপগুলি পাওয়া গিয়াছিল, সে বাড়ি তিনি খানাতল্লাসী করিলেন এবং পুরোহিতটিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিলেন। তাহাকে বলিলেন চোরাই মাল আপনার নিকট পাওয়া গিয়াছে, তাই আপনাকে ধরিয়াছি। ফুলগুলি কাহারা আনিয়াছে এবং কোথা হইতে আনিয়াছে, তাহা নির্ণয় না করা পর্যন্ত আপনাকে থানায় আটক থাকিতে হইবে। তবে, বলাইবাবু যদি আপনাকে

ক্ষমা করেন আপনাকে ছাড়িয়া দিব। পুরোহিত আসিয়া আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষমা করিতে হইল। গোলাপের সখের জন্য অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইয়াছি। এখন কলিকাতায় ছাদের উপর গোলাপের গাছ করিয়াছি—টাব। ভালোই ফুল হইতেছে। ইংরেজরা গোলাপকে Queen of Flowers বলে। সত্যই, গোলাপ ফুলের রাণী। আমার মনে হয় উহারা যেন অপরূপা অপ্সরী। এইসব লইয়াই আমার ভাগলপুরের জীবন সুখময় ছিল। পারিবারিক সুখেও আমি সুখী ছিলাম। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় ভালো ছিল, আমার ভাইরা যদিও নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকিত, তবু ছুটি পাইলেই মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত। এবং যখন আসিত বাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইত। আমার চতুর্থ ভ্রাতা লালমোহন আসিলে গানের আবহাওয়া ফুটিয়া উঠিত বাড়িতে। সে সুগায়ক ছিল, ডাক্তার ছিল সে। মফঃস্বলে থাকিত এবং অনেক সময় অনেক গল্পের প্লট আনিয়া দিত আমাকে। মণিহারী হইতে বাবা আসিয়া মাঝে মাঝে আমার নিকট থাকিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি বড় একা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার কাছে যখন থাকিতেন তখনও কেমন যেন স্বস্তি পাইতেন না। সঙ্গীর অভাব অনুভব করিতেন। গল্প করিবার মত মনের মানুষ পাইতেন না। বই পড়িতেন, রেডিও শুনিতেন কিন্তু কতক্ষণ আর বই পড়া যায় বা রেডিও শোনা যায়। তিনি এককালে কর্ম-ব্যস্ত ডাক্তার ছিলেন, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই আমিই তাঁহাকে জোর করিয়া প্র্যাকটিশ হইতে সরাইয়া আনিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম কর্মহীন হইয়া তিনি স্বস্তি পাইতেছেন না, তখন তাঁহাকে একটি কাজ দিলাম। বলিলাম—আমি আপনাকে খাতা কলম আনিয়া দিতেছি। আপনি আপনার জীবন-চরিত লিখুন। আপনার শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত সবটা লিখিয়া ফেলুন। বাবা হাসিয়া বলিলেন—আমার মত সামান্য লোকের জীবনী কি লিখিবার যোগ্য? আমি বলিলাম—আমি আপনার চরিত্র লইয়া একটি বই লিখিব। আপনার শৈশব ও যৌবনের কথা আমার ভালো জানা নাই। সেটা আপনি লিখিয়া ফেলুন। ইহাতে আপনার সময়ও কাটিবে।

বাবা আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা সে খাতাটি এখনও আমার নিকট আছে। বাবার চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া পরে আমি 'উদয়-অস্ত' বইটি লিখিয়াছি। ওই বইটিতে অধিকাংশ চরিত্রই কাল্পনিক। কিন্তু সূর্যসুন্দরের চরিত্রটি আমার বাবারই চরিত্র। দুঃখের বিষয় বাবা আমার এ

বইটি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাবার মৃত্যুর পরই আমি এ বইটি লেখা শুরু করিয়াছিলাম।

আমার ভাগলপুরের বাড়িতে লোকজন, অতিথি, অভ্যাগত, গরু বাছুর, ভেড়া, কুকুর, গিনিপিগ্, খরগোস, মুরগী ছিল, সংসার-সমুদ্রে যে সব ঢেউ অনিবার্যভাবে গায়ে আসিয়া লাগে সে-সবও আমি এড়াইতে পারি নাই। এইসব জটিলতার ভিতর আর একটি উপসর্গ জুটিল। আমি ধার করিয়া একজনের নিকট হইতে একটি থার্ডহ্যাণ্ড মোটর কিনিয়া বসিলাম। মনে হইল ইহাতে সময়ের সাশ্রয় হইবে এবং প্রত্যহ চারবার ল্যাবরেটরি হইতে আসা যাওয়া করিতে গাড়িভাড়া বাবদ যে অর্থব্যয় হয় সেই টাকাতেই মোটর চালাইতে পারিব। তখন পেট্রোলের দাম ছিল প্রতি গ্যালন চৌদ্দ আনা এবং ড্রাইভারের মাহিনা ছিল মাসে ত্রিশ বা চল্লিশ টাকা। মোটরটি যখন কিনিলাম তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কিনিবার পর দুই একদিন ব্যবহার করিয়াই মোটরটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম। চালাতে চলিতে সে রাস্তার মাঝে হঠাৎ থামিয়া যায় এবং লোক দিয়া না ঠেলাইলে আর চলিতে চায় না। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল আমার মোটরটি যে রাস্তায় প্রবেশ করিত সে রাস্তা হইতে আমার পরিচিত লোকজনেরা গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করত। তাহাদের ভয় হইত মোটর থামিলেই এবং থামিলেই ডাক্তারবাবু আমাদের ঠেলিতে অনুরোধ করিবেন আর সে অনুরোধ উপেক্ষা করা যাইবে না। মোটরটি শেষে জলের দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

মোটর প্রসঙ্গে আর একজন লোকের কথা মনে পড়ে। ডাক্তার সুরপতি ঘোষ। তাঁহারই ভাগিনেয়ের নিকট হইতে মোটরটি কিনিয়াছিলাম।

ডাক্তার সুরপতি ঘোষ একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কর্ম হইতে অবসর লইয়া তিনি ভাগলপুরে নিজেদের বাড়িতে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। আমার লেখা পড়িতে খুব ভালোবাসিতেন। চার পাঁচটি ভাষা জানিতেন তিনি। সর্বদা বই পড়িতেন। ডাক্তার হিসাবে তিনি আমার অনেক সিনিয়র ছিলেন, বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় পাহাড় হইতে তাঁহার মোটর উল্টাইয়া যায়। কয়েকটি হাড় ভাঙিয়া যায়। অসহ্য বেদনার জন্য তাঁহাকে 'মরফিন' ইন্‌জেকশন দেওয়া হইত। শেষে 'মরফিন' তাঁহার চিরসঙ্গী হইয়া পড়িল। ভাগলপুরে আমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তিনি দুইবেলা 'মরফিন' ইন্‌জেকশন লইতেন।

তাহার সহিত বড় একটা মিশিতেন না। প্র্যাকটিশও করিতেন না। দিনরাত বই লইয়া থাকিতেন। একদিন নিজেই তিনি আমার 'নির্মোক' বইটি পড়িয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ শুরু। আমি আমার সমস্ত বই তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলাম, তিনিও অনেক ভালো ভালো ইংরেজি বই আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহার নিকট হইতেই আমি প্রথমে কোনান ডয়ালের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি পড়িয়াছিলাম। শার্লক হোমসের স্রষ্টা তাঁহার ডিটেকটিভ গ্রন্থগুলির জন্য বিখ্যাত, তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও যে এত ভালো তাহা আমাদের জানা ছিল না। সুবপতিবাবুর সংগ্রহে অনেক ভালো ভালো বই আমি পড়িয়াছিলাম। পালিভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রগাঢ় ভক্তও ছিলেন একজন। পালিভাষায় লিখিত বুদ্ধদেব বিষয়ে অনেক গ্রন্থ তাঁহাকে পাঠ করিতে দেখিয়াছি। আমার মনে শ্রদ্ধার পবিত্র পটভূমিতে তাহার ছবি আঁকা রহিয়াছে।

মাঝে মাঝে আমার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র কিনিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইত। সেই সময় আমি আমার প্রকাশকদের সহিতও দেখা করিতাম। সেবার ডি. এম. লাইব্রেরীতে গেলাম। গোপালদাকে অনেকদিন বই দিই নাই। তখন বেঙ্গল পাবলিশার্সকেই সব বই দিতেছিলাম। গোপালদা অনুযোগ করিলেন আমি কেন তাঁহাকে বই দেওয়া বন্ধ করিয়াছি। বলিলাম বেঙ্গল পাবলিশার্স আমার ছেলে দুইটির পড়ার খরচ জোগায়, তাই যাহা লিখি সেখানেই দিতে হয়। আর আজকাল ল্যাবরেটরি বাড়ি হইতে দূরে হওয়ায় সময়ও বেশী পাই না। একটি পুরাতন মোটর কিনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম সে মোটর চলিতে চায় না, থামিয়া থাকিতে চায়। তাই সেটিকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছি।

গোপালদা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তোমাকে কালই একটি নতুন মোটর কিনিয়া দিব। তুমি মাঝে মাঝে বই লিখিয়া টাকাটা শোধ করিয়া দিও।

ইহা আমি প্রত্যাশা করি নাই। এখন তো বই লিখিয়া বেঙ্গল পাবলিশার্সকেই দিতে হইবে। তবে বেশী যদি লিখিতে পারি আপনাকে দিব।

গোপালদা সেই শর্তেই রাজি হইলেন। গোপালদা বলিলেন—কোন্ মোটর তুমি কিনিতে চাও।

বলিলাম, কোন্ মোটর কেমন আমার কোন ধারণা নাই। এ বিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ। গোপালদা বলিলেন, জনৈক মোটর ইনজিনিয়ারের সঙ্গে তাঁহার আলাপ আছে। তিনি তাহার নিকট খোঁজ করিবেন।

পরদিন আমাকে বলিলেন, তাঁহার মতে অস্টিন ( Austin ) ভালো। চলে অস্টিনের দোকানে যাওয়া যাক। দোকানে গেলাম। সেখানকার ম্যানেজার বলিলেন—অস্টিনের লেটেষ্ট মডেল Somerset A খুব ভালো গাড়ি। অস্টিনের আর একটা বড় গাড়িও আছে, কিন্তু আমার মতে Somerset গাড়িটাই আপনার পক্ষে ভালো হইবে। গাড়িটি দেখিয়া আমার খুব পছন্দ হইল গোপালদা গাড়িটি আমাকে কিনিয়া দিলেন। দাম লাগিল সাড়ে চোদ্দ হাজার টাকা। কথা হইল তাহাদের ড্রাইভার আমার গাড়িটি ভাগলপুরে পৌঁছাইয়া দিবে। গাড়িটি লইয়া আমার বড় মেয়ে কেয়ার বাড়ি গেলাম। কেয়ার মেয়ে, —আমার জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী উর্মিকে লইয়া এক চক্কর বেড়াইয়া আসিলাম। তাহার পর গাড়িটি দোকানের জিম্মায় রাখিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া গেলাম। পরে আমার বড় ছেলে অসীম এবং রজনীর ছেলে খোকন আমার গাড়িটি লইয়া ভাগলপুরে আসিল

নূতন ঋণভার মাথায় চাপিল। সুতরাং লেখার বেগও বাড়াইতে হইল। মোটর কিনিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে আরও কয়েকটি জিনিস লাভ করিলাম। প্রথম লাভ, অনেকের ঈর্ষা। অনেক তথাকথিত বন্ধুর মুখে বক্র হাসি, কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গি দেখিলাম। দ্বিতীয় লাভ হইল—আমি অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটা জগতে প্রবেশ করিলাম যাহাদের সম্বন্ধে আগে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। সে জগৎটি মোটরের জগৎ। যে জগতে মোটরের মিস্ত্রিরা এবং ড্রাইভাররা রাজত্ব করে, যাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে মোটর চালানো সম্ভব নয়। এ জগতে আমার প্রথম এবং প্রধান গাইড হইল শ্রীমান অমল মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর মোটর ওয়ার্কসের মালিক। সে ভাগলপুরের ওস্তাদ মোটর-মিস্ত্রি ধনঞ্জ মিস্ত্রির নিকট হইতে হাত কলমে কাজ শিখিয়া স্টেশন রোডের উপর নিজে একটি কারখানা খুলিয়াছিল। তাহার দাদা দিব্যেন্দু আমার বন্ধু ছিল। তাহার বাবাকেও আমি পিতৃব্য শ্রদ্ধা করিতাম। এই অমলই আমার মোটরমিস্ত্রি হইল। তাহার পরামর্শেই চলিতাম। মোটর সারাইবার জন্য কখনও সে আমার কাছে কোন পারিশ্রমিক লয়। বরাবর অনুজের মতো ব্যবহার করিত আমার সঙ্গে ভালো বংশের ছেলে। তাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি। মোটর ড্রাইভার নামক সম্প্রদায়টি আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি। রেলের বাবু, বা থানার দারোগার মতো ইহাদেরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কথাবার্তা, চাল-চলন, চরিত্রও একটু বিশেষ ধরণের। ইহাদের একটি বৈশিষ্ট্য, সাধারণতঃ ইহারা একজায়গায় বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। আমাকেও অনেক ড্রাইভার বদল করিতে হইয়াছে। মনে

মাঝে দুই একটি এমন চরিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি যাহারা আমার শিল্পবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। আমার 'হাটে বাজারে' বইটির ড্রাইভার আলী একটি সত্য চরিত্র, কাল্পনিক নহে। মোটরমিস্ত্রিদের মধ্যে অনেক চরিত্র আমার মনে দাগ কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদের চরিত্র আমার গল্পে, উপন্যাসে আসিয়া পড়িয়াছে।

মোটর কিনিয়া আমার তৃতীয় লাভ হইল পাখী দেখা। শহরের বাহিরে দূরে দূরে পাখী দেখিতে যাইবার সুযোগ পাইলাম। ভাগলপুর শহরের বাহিরে 'সুন্দরবন' নামে মাড়োয়ারিদের খুব বড় একটা বাগান ছিল। সেখানে অনেক গাছ, অনেক ঝোপ, অনেক পাখী। সেখানে গিয়া প্রায়ই ফটিকজল পাখীর সাক্ষাৎ মিলিত। সেখানে নানারকম পাখীর ভীড়। টুনটুনি, ভগীরথ, বসন্ত-বৌরি, বেনে বউ, দোয়েল, বুলবুলি, নীলকণ্ঠ, খঞ্জন, বাঁশপাতি—পরি, নানারকম পাখীর দেখা পাইয়াছি সুন্দরবনে। ওই সুন্দরবনেই প্রথমে চোর-পাখী দেখি। তাহারা গাছের ডালে ডালে হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়। ডাহুকপাখীর কথা পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পাখীটিকে কখনও দেখি নাই। একজনের মুখে শুনিলাম, শহর হইতে একটু দূরে মীরজান নামক একটি পল্লী আছে, সেখানে একটি পুকুরে না কি ডাহুক আছে অনেক। মোটরযোগে আমি এবং আমার ছোট ছেলে বস্তু (চিরন্তন) একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুদূর গিয়া মোটর আর চলিল না। পদব্রজেই আমরা বাপ-বেটায় রওনা হইয়া পড়িলাম এবং অনেক খোঁজা-খুঁজির পর পুকুরটি আবিষ্কার করিলাম। পুকুরের ধারে ধারে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ডাহুকপাখীর ডাক শুনিতে পাইলাম। একটু পরে পাখীটিকে দেখা গেল। অনেক সময় আমি ও লীলা ভোরে বাহির হইয়া মাঠে মাঠে, বাগানে বাগানে ঘুরিতাম। মনে পড়িতেছে একটা বাগানে অপ্রত্যাশিতভাবে হুতুমপ্যাচার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। প্রদ্যোৎ যখন আসিত তখন তাহার সহিতও মোটরে বাহির হইতাম। শহর ছাড়িয়া গ্রাম্য অঞ্চলে চলিয়া যাইতাম। মনে আছে, একদিন ভোরে এক গমের ক্ষেতে সে আমাকে ভরদ্বাজ পাখী চিনাইয়া দিয়াছিল। ইহার ইংরেজী নাম Skylark সংস্কৃত নাম ব্যাঘ্রাট, হিন্দী নাম ভরথা। মোটর কিনিয়া পাখীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনেক বাড়িয়া গেল। 'ডানা' পুস্তকের অনেক উপকরণ সংগ্রহ হইল। 'ডানা' পুস্তক গোপালদাকে (ডি. এম. লাইব্রেরী) দিয়া-ছিলাম। 'ডানা' দিয়া মোটরের কিছু ধার শোধ হইয়াছিল। মোটর কিনিয়া আমার চতুর্থ লাভ হইয়াছিল। বাজারের লোকদের সহিত পরিচয় এবং হৃদ্যতা। আমি প্রত্যহ মোটর করিয়া বাজারে যাইতাম। মাছ, মাংস, তরিতরকারি কিনিতাম।

ক্রমশঃ মেছোদের সহিত, মাংস-বিক্রেতাদের সহিত, এবং তরকারীওয়ালা ও তরকারী-উলীদের সহিত একটা ভালোবাসার বন্ধনেও আবদ্ধ হইলাম। এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করিলাম তাহাদের মধ্যে। ইহাদের লইয়াই আমি 'হাটে বাজারে' বইটি লিখিয়াছি। ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম যে যদিও ইহারা অশিক্ষিত, কিন্তু অমানুষ নয়। বরং তথাকথিত শিক্ষিতদের অপেক্ষা কম ভণ্ড, মনে মুখে এক, মুখোশের বা পালিশের ধার ধারে না। ইহারা মনে হয় বেশী স্নেহ-প্রবণ। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করিতে ইহারা কখনও দ্বিধা করে না। ভারতের সংস্কৃতি ইহাদের মধ্যেই যেন এখনও বাঁচিয়া আছে। যাহারা শিক্ষিত তাহারা নানাদেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া একটা খিচুড়ি-সংস্কৃতির দাস হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা অশিক্ষিত ভারতীয় সংস্কৃতিই তাহাদের আশ্রয়। তাহারা পা ফাঁক করিয়া সিগারেটও খায় না, দিদিমাকে কাঁটা চামচে খাওয়াইবার চেষ্টা করে না। ইহাদের দোষও অনেক আছে, কিন্তু সেসব দোষ শিক্ষিতদের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণ বর্তমান। দুশ্চরিত্র, মাতাল, চোর, মিথ্যাবাদী, ঘোর স্বার্থপর লোক শিক্ষিতদের মধ্যেই বেশী দেখিয়াছি।

মোটর কিনিয়া আমার পঞ্চম লাভ হইয়াছিল লম্বা লম্বা ভ্রমণ। যখনই জীবন একঘেয়েমি মনে হইত তখনই বাহির হইয়া পড়িতাম। মন্দার হিল (বৌসি) দেওঘর, দুমকা অনেকবার গিয়াছি। ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় কয়েকবার আসিয়াছি। মোটরে আসিবার বিশেষ আনন্দ যেখানে খুশি যাও যেখানে খুশি, যতক্ষণ খুশি বিশ্রাম কর। মোটরে যান্ত্রিক কোনও গোলযোগ হইলে সে আর একরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ভয়, অনিশ্চয়তা, ক্রোধ, হতাশা, উৎকণ্ঠার সহিত রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিকতার ( Adventure ) রসও মিশ্রিত আছে তাহাতে।

পূর্বেই বলিয়াছি এ সময় আমার সাহিত্যসাধনার বেগ বাড়াইয়াছিলাম দিনে সময় পাইলেই লিখিতাম। রাতে তো লিখিতামই। সেকালের অনেক শারদীয়া সংখ্যায় লিখিতে হইত। সেইজন্য অনেক ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছিলাম সেই সময়। অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন আমি এতো গল্প ও উপন্যাসের প্লট কি করিয়া পাই? লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীও আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলাম—নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লওয়ার মত লেখাটাও আমার পক্ষে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত লিখিতেছি তো। প্লট কি করিয়া মাথায় আসে তাহা জানি না।

ওটা বোধ হয় ভগবানের লীলা বা অনুগ্রহ। সত্যই, আশ্চর্যভাবে নানারকম প্লট মাথায় আসিত। কি করিয়া আসিত জানি না। আর আসিলেই আমি কালবিলম্ব না করিয়া সেটি লিখিয়া ফেলিতাম। লিখিয়া দুই একদিন ফেলিয়া রাখিতাম। তাহার পর নিজেই সেটি পুনরায় দেখিয়া কাটাকুটি করিতাম। তাহার পর পরিষ্কার করিয়া আবার লিখিতাম। আমার মাষ্টার মশাই ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় আমাকে মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা করিয়া চিঠি লিখিতেন—তুমি এত বেশী লিখিতেছ কেন? ধীরেসুস্থে লেখ। তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইও না। কিন্তু আমি থামিতে পারিতাম না। আমি কেবল চেষ্টা করিতাম গতানুগতিক একঘেয়ে প্রেমের গল্প বা পল্লীজীবনের দুঃখময় নাকে-কান্না আমার লেখায় যেন না ফুটিয়া ওঠে। পল্লীসমাজের গল্প শুনিয়া শুনিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি লোকের কথা মনে পড়িল। স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন আর্ট প্রেসের মালিক ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে 'সচিত্র ভারত' নামে একটি চমৎকার সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। আর্ট পেপারে ছাপা সুদৃশ্য পত্রিকাটি। অনেক ছবি এবং কার্টুন। আমাকে বলিয়াছিলেন—তোমার গল্প চাই। দক্ষিণা পাঁচ টাকার বেশী দিতে পারিব না। কাগজটি ছাপিতেই অনেক ব্যয় হয়, তোমাদের দক্ষিণা তাই বেশী দিতে পারিব না। লেখা কিন্তু চাই। ও রকম একটা পরিচ্ছন্ন সুমুদ্রিত কাগজে লিখিতে পারাটাই একটা সৌভাগ্য, ইহাই আমার মনে হইয়াছিল। টাকাটা উপরি পাওনা। তাঁহার কাগজে অনেক গল্প লিখিয়াছি। পরিমল, সজনী, তারাশঙ্কর কাগজটির সংস্রবে আসিয়াছিল। নরেনবাবুর মতো অমন অভিজাত ভদ্রলোক বেশী দেখি নাই। তিনি স্যার আর. এন. মুখোপাধ্যায়ের ভাই ছিলেন। বিলাসীও ছিলেন খুব। শুনিয়াছি দাঁত তুলাইবার জন্য প্লেনে করিয়া তিনি জার্মানী গিয়াছিলেন, যাহাতে দাঁত তুলিতে একটুও কষ্ট না হয়। সর্বদাই সাহেবী পোষাকে থাকিতেন। কানে কিছুই শুনিতে পাইতেন না। সঙ্গে একটি নল থাকিত; তাহার এক প্রান্ত কানে লাগাইয়া দিয়া অন্য প্রান্তটি বাড়াইয়া দিতেন। সেখানে একটি ধাতুনির্মিত ফানেলের মত ছিল। সেই ফানেলের ভিতর কথা বলিলে তিনি শুনিতে পাইতেন। আমাকে বারবার বলিতেন তোমার লেখার সম্মান-মূল্য দিতে পারি না বলিয়া আমি লজ্জিত। যখনই আমি কলিকাতা আসিতাম তখনই আমার সহিত আসিয়া দেখা করিতেন এবং কখনই শুধু হাতে আসিতেন না। কখনও সন্দেশ, কখনও কেক বা কোনও বই আনিতেন। মনে আছে একবার

একটা ভেড়ার রাং আনিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়িতে অনেকবার নিমন্ত্রণ খাইয়াছি। তাহার স্ত্রীকে আমার খুব ভালো লাগিত। তিনি যেন সেকালের মা ছিলেন একজন। অত্যন্ত সুমিষ্ট আলাপ। রান্নাও জানিতেন অনেক রকম। দেশী রান্না তো জানিতেনই, বিদেশী রান্নাও জানিতেন বহু প্রবার।

বাঙালীরা কোনও ব্যবসা বজায় রাখিতে পারে না। নরেনবাবুর আর্ট প্রেসও ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া গেল। সচিত্র ভারতের সে চাকচিক্য আর রহিল না। তাহা আকারে ক্ষুদ্র এবং প্রকারে বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িল। তবু কাগজটার কাটতি ছিল। নরেনবাবুর অনুরোধে 'সচিত্র ভারতে' আমি 'কষ্টিপাথর' এবং 'ভুবন সোম' লিখিয়াছিলাম। 'কষ্টিপাথরে' কয়েকটি প্রেম-পত্র আছে। স্বামী স্ত্রীকে লিখিতেছে। পত্রগুলি পড়িয়া নরেনবাবু বলিয়াছিলেন—প্রথম যৌবনে যদি তোমার এই চিঠিগুলি পাইতাম স্ত্রীকে লিখিবার জন্য আমাকে দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না।

তাঁহার মৃত্যুর পর সচিত্র ভারতের ভার তাঁহার একমাত্র পুত্রের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি কাগজটি চালাইতে পারেন নাই। কয়েকবার হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে কাগজটি উঠিয়া যায়।

যে 'প্রবাসী' পত্রিকায় আমার সাহিত্যজীবনের শুরু—সে প্রবাসী পত্রিকাও এখন মৃতপ্রায়। অতিশয় ক্ষীণাঙ্গ। মাঝে মাঝে বাহির হয়। সেকালের আরও কয়েকটি মাসিকপত্রে আমি লিখিতাম। 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতী', 'মাসিক বসুমতী'—ইহাদের একটিও আর বাঁচিয়া নেই। 'সবুজপত্র' কাগজে কখনও লিখি নাই। কিন্তু কাগজটি আমার সাহিত্য-জীবনে ইহার পবিত্র অভিনবত্বের জন্য আমার মনে উদ্দীপনার সাড়া জাগাইয়াছিল। সবুজ-পত্রও বেশীদিন সবুজ থাকে নাই—কিছুদিন পরেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল। আমরা যখন খুব ছোট তখন কয়েকটি কাগজ আমাদের বাড়িতে আসিত। 'বান্ধব', 'সুপ্রভাত', 'নব্যভারত', 'কৃষক', 'বঙ্গদর্শন' (রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত)—এ সব কাগজ বহুদিন আগে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের নামও অনেকের মনে নাই আজকাল। ছোটদের কাগজ ছিল—শিশু, মুকুল, সখা ও সাথী—সবগুলিই আমাদের বাড়ি আসিত। প্রত্যেকটি কাগজই অতি চমৎকার ছিল। আজকাল এ সব কাগজের মত ছোট ছেলে-মেয়েদের কাগজ দেখি না। বাঙালী অনেক ভালো কাজ শুরু করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকাইয়া রাখিতে পারে না। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বই-এর দোকান। গিরিনদার বুক কোম্পানী, বটকৃষ্ণ পালের ঔষধের দোকান, নবীন ময়রার রসগোল্লার দোকান,

দ্বারিকের সন্দেশের দোকান—সব উঠিয়া গিয়াছে। পুরাতন কয়েকটি দোকান এখনও নামে টিকিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সে গৌরব আর নাই। সে সততাও আর নাই। এই প্রসঙ্গে হঠাৎ বুক কোম্পানীর গিরিনদার কথা মনে পড়িল। আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়িতাম। তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে আমার মেস ছিল। বুক কোম্পানী ছিল আমাদের মেসের খুব কাছে কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে। বুক কোম্পানী হইতেই আমার ডাক্তারী বইগুলি কিনিলাম। তাহার পর গিরিনদা কি করিয়া যেন জানিতে পারিলেন—আমি বনফুল ছদ্মনামে 'প্রবাসী'তে লিখি। আমাকে বলিলেন—আপনি সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও বই তো কেনেন না। বলিলাম, কিনিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কিনিবার পয়সা নাই।

গিরিনদা তৎক্ষণাৎ বলিলেন—আপনি যদি পড়তে চান আপনাকে বই দিব। মলাট দিয়া পড়িবেন, বইটি যেন ময়লা না লাগে। পড়া হইলেই ফেরৎ দিয়া যাবেন। গিরিনদার দোকান হইতে অনেক বই পড়িয়াছিলাম। মনে হইতেছে কণ্টিনেন্টাল সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় গিরিনদার দাক্ষিণ্যের জন্যই হইয়াছিল। মনে পড়িতেছে Maxim Gorky-র Mother গিরিনদাই আমাকে পড়াইয়াছিলেন। টলস্টয়ের ছোট গল্প, সিমেণ্ট বলিয়া আর একটি রাশিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ (গ্রন্থকারের নাম মনে নেই) মমের বই সবই গিরিনদার দোকান হইতে পড়িয়াছি। ক্রমশঃ তিনি ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং তাহার অনুগ্রহে আমার নানা দেশের সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটিল। গিরিনদার মত পুস্তক-বিক্রেতা কি আজকাল আছে? সেকালের কথা ভাবিতে গিয়া এবং সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতে গিয়া একটি কথাই মনে হইতেছে। চাকুরিজীবী এবং চাকুরি-সর্ব্বস্ব বাঙালী আজ বড় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ আমলে বাঙালী অনেক চাকরি পাইত, বস্তুতঃ ইংরেজদের খোসামোদ করিয়া সে-ই শাসনকার্য তারা চালাইত। এখন চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে, এখন সে বড় দরিদ্র। সে দারিদ্র্যের প্রভাব তাহার মহত্ত্বকে নীচুতায় পরিণত করিয়াছে। বাঙালী আজ অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বর বজায় রাখিতে গিয়া মিথ্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, পরশ্রীকাতরতা, ঔদ্ধত্য, আত্ম-বিজ্ঞাপন, মিথ্যাভাষণ আজ তাহাদের মধ্যে প্রকট। পুরাতন মহত্ত্ব, মনীষা লোপ পাইতেছে। নূতন মহত্ত্ব ও মনীষা জন্মগ্রহণ করিতেছে না। এই চোঙ্‌প্যাণ্ট হাফশার্ট পরা ট্যাঁস সমাজে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। কারণ ভারতীয়

সভ্যতার প্রাণরস হইতে ইহারা বঞ্চিত। ইহাদের আদর্শ হয় আমেরিকা না হয় রাশিয়া। তাহাদের মত শক্তি বা মনীষা ইহাদের নাই। ইহারা তাহাদের আস্তাকুড়ে দাঁড়াইয়া তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আমাদের দেশের ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা খোলাখুলিভাবেই আজ আমেরিকা ইংলণ্ড, জার্মানী, ফরাসী দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের স্বদেশ-প্রীতি নাই, তাহারা উপার্জনের লোভে সেখানে গিয়াছে এবং তাহাদের চোখধাঁধানো সভ্যতা দেখিয়া গদগদ হইতেছে। তাহাদের দো-আঁশলা সন্তান-সন্ততিদের যে কি গতি হইবে তাহা ভবিষ্যৎই জানে। তবে মনে হয় সুগতি হইবে না, দুর্গতি হইবে। এখনই আমেরিকা ও ইংলণ্ড এইসব বেনোদের শোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরধর্ম যে ভয়াবহ এ কথা প্রাচীন ঋষিরা বারবার বলিয়া গিয়াছেন। আমরা অনেকদিন স্বাধীন হইয়াছি। আটাশ বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু স্বাধীন ভারত এখনও তাহার স্বাধীন রাষ্ট্রে ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। যাহা সে করিয়াছে সবই বিদেশের নকল। অবশেষে কুমারীদের গর্ভপাতও আইন-সঙ্গত করিতে হইয়াছে। আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়াছি। যে ধর্মের জন্য ভারত সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধাভাজন সে ধর্ম আমাদের স্বাধীন ভারতে কোনও স্থান পায় নাই। যাহাকে 'জাতির জনক' আখ্যা দিয়া প্রতি বছর আমরা লোক দেখানো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি সেই ভদ্রলোক আমাদের 'ভারতীয়' হইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে আমরা হত্যা করিয়াছি। ভোট-শিকারী, চোরাবাজারী এবং কৌশলী খলিফারা আজ দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছে। বাঙালীরা আজ তাঁহাদেরই মোসাহেবী করিতে ব্যস্ত। প্রকৃত গুণী এবং ভদ্রলোকেরা আত্মগোপন করিয়া কোনক্রমে আড়ালে আবডালে টিকিয়া আছেন মাত্র। এই হতভাগ্য সমাজে 'পপুলার' হইবার জন্য অধিকাংশ সাহিত্যিক সাহিত্য-রচনা করিতেছেন। প্রতিদিন দামামা বাজাইয়া অলিতে গলিতে সাহিত্য-সভা হইতেছে। কিন্তু এ যুগে মহৎ সাহিত্য কতটুকু হইয়াছে তাহার বিচার ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্যরসিকেরা বিচার করিয়া হতাশই হইবেন সম্ভবতঃ।

কথায় কথায় প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া আসিয়াছি। ভাগলপুরের কথায় ফিরিয়া যাই। ভাগলপুরে লেখা আর ডাক্তারী ছাড়া উল্লেখযোগ্য কথাও কিছু নাই। আমার ল্যাবরেটরির কাজ একঘেয়ে কাজ। তাহাতে বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। বৈচিত্র্য ছিল আমার রোগীগুলির মধ্যে। মেথর, ডোম, চামার, গয়লা, মেছো

কশাই, রিক্‌শাওলা, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান—ইহারাই আমার রোগী ছিল। মুসলমান কশাইরা, তরকারী-উলীরা, চাল, ডাল বিক্রেতারা খুব ভক্ত ছিল আমার। মাড়োয়ারি রাম-অওতার এবং ফোটোগ্রাফার হরি কুঞ্জুর কথা কখনও ভুলিব না। হরি কুঞ্জু, হিন্দী সাহিত্যের চর্চা করিত, সেটি ছিল তাহার নেশা। পেশা ছিল ফোটোগ্রাফি। আমার সাহিত্যের হিন্দি অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল সে। প্রায়ই আমার বাড়িতে আসিত। লীলাকে 'মাতাজি' বলিত। ফোটোগ্রাফার হিসাবেও সে প্রথম শ্রেণীর ছিল। আমাদের অনেক ফটো তুলিয়াছে সে। তাহারই তোলা আমার একটা 'Enlarged' রঙীন ফোটো সে আমাকে উপহার দিয়াছিল। ফোটোটি এখনও আমার কাছে আছে, আর আছে তাহার মধুময় স্মৃতি। রাম-অওতার ধনী মাড়োয়ারি। 'আনন্দ প্রেস' নামে একটি বড় প্রেস আছে তাহার। সে একজন সাহিত্য প্রেমিকও। বাংলা পড়তে পারে না, কিন্তু বুঝতে পারে। আমার লেখার হিন্দি-অনুবাদ পড়িয়াই সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অযাচিতভাবে সে যে আমার কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। অযাচিতভাবে সে আমাকে লেখার প্যাড দিয়া যাইত, লিখিবার জন্য ভালো কাগজের খাতা বাঁধাইয়া দিয়া যাইত, মানা করিলে শুনিত না। তাহার দেওয়া খাতায় অনেক বই লিখিয়াছি। আমি যখন ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসি তখন আমার যাবতীয় জিনিসপত্র গুছাইয়া প্যাক করিয়া যে সাহায্য সে আমাকে করিয়াছিল তাহা নিকট আত্মীয়রাও করে না। ভাগলপুরের অবাঙালীদের স্মৃতিই আমার মনে রঙীন এবং মধুর হইয়া আছে। প্রেমের চাবি দিয়া সব তালাই খোলা সম্ভব। বাঙালীদের উন্নাসিকতা এবং ভুয়া উচ্চম্মন্যতা বাঙালীদের বৃহত্তর বিহারী-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ বলিয়া সেখানে চাকুরি পাইতেছে না, বাঙালীরা শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিজেদের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। এই সব কারণে বাঙালীদের অবস্থা বিহারে দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমরা তিন-পুরুষ বিহারে বাস করিয়াছি, আমরা বিহারীদের মধ্যে অনেক মহৎ গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। বাঙালীরা যেখানে কৃতী, যেখানে সে নিজের গুণের পরিচয় দিয়াছে, যেখানে সে বিহারীদের আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে—সেখানেই সে বিহারীদের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। বিহারপ্রবাসী বাঙালীরা পূর্বে সকলেই স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ ছিলেন। বিহারীরা আজও তাহাদের নাম শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করে। কিন্তু 'আমি 'অমুক রাজার নাতি' বলিলেই খাতির পাওয়া

যাইবে না, যদি নাতিটি অপদার্থ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর কীর্তিমান বাঙালীদের নাম ভাঙাইয়া আমাদের আর কতদিন চলিবে? আমরা কিন্তু তাহাই করিয়া চলিয়াছি। আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের জগদীশচন্দ্র, আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র, এইসব বারবার আওড়াইলে আমাদের উন্নতি বা প্রগতি হইবে না। ইহাদের লইয়া বার বার সভা আর জয়ন্তী করিয়া আমরা যে আত্মাস্ফালন করিতেছি তাহা হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। খোঁজ করিলে দেখা যাইবে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু বা প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইঁহাদের নাম লইয়া হুজুকে মাতিবার প্রবণতাই আমাদের বেশী। তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের জীবনের আদর্শ আমাদের একটুও উদ্বুদ্ধ করে নাই। করিলে এ দুর্দশা আমাদের হইত না।

আত্ম-নিন্দা অনেক করিলাম—এইবার অন্য কথা বলি। আমার জীবনে নানা ধরণের চাকর জুটিয়াছে। তাহাদের কয়েকজনের পরিচয় দিব। অধিকাংশ চাকরই চোর হয়। আমি যখন আজিমগঞ্জে ছিলাম তখন একটি বিশেষ ধরণের চোর চাকর আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। সে কেরোসিন তেল চুরি করিয়া খাইত। প্রথম প্রথম ধরিতে পারি নাই। তাহাকে বহাল করার পর হইতে কেরোসিন বড় তাড়াতাড়ি ফুরাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় রোজই বলিত, কেরোসিন ফুরাইয়াছে। প্রায় রোজই সে কেরোসিন কিনিতে যাইত। একদিন কেরোসিন কিনিতে গিয়া সে ফিরিল না। তখন তাহাকে খুঁজিবার জন্য আমিই বাহির হইলাম। কিছু দূর গিয়া দেখি সে রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। সেদিন মাত্রা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। কাছে গিয়া দেখি মুখ হইতে কেরোসিনের গন্ধ বাহির হইতেছে। পাশে বোতলটা পড়িয়া আছে, তাহাতে একটুও কেরোসিন নাই। লোক ডাকিয়া স্ট্রেচার করিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গেলাম। স্টমাক পাম্প করিয়া যাহা বাহির করিলাম তাহার অধিকাংশই কেরোসিন তেল। পরে সে স্বীকার করিল যে সে নেশার জন্য রোজ কেরোসিন তেল খায়। তাহার আর একটি গুণ ছিল। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রশ্ন করিত আপনারা কয়দিন থাকিবেন? আমার বাবাকেই সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল একদিন। বাবা বলিলেন—আমি অনেকদিন থাকিব। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? সে বলিল—তাহা হইলে আমার মাহিনা বাড়াইয়া দিতে হইবে। কারণ বাড়িতে লোক বাড়িলেই কাজ বাড়ে। তাহার নাম ছিল বিরজু।

আর একটি চাকরের কথা মনে পড়িতেছে। তাহার নাম ছিল 'ধরাসন'।

অত্যন্ত বাক্যবাগীশ ছিল লোকটা। অভিভাবকের মত নানা রকম উপদেশ দিত আমাদের। আমার একটি কুকুর ছিল! লীলা তাহাকে রোজ দুধ-ভাত দিত। ইহা দেখিয়া ধরাসন বলিল—আপনাদের এ কেমন দুর্বুদ্ধি। মানুষ দুধ পায় না, আপনারা একটা কুত্তাকে দুধ খাওয়ান রোজ। এ তো চক্ষে দেখা যায় না। সে নিজেও প্রচুর খাইত। আধ সের চালের ভাত এবং তদুপযুক্ত ডাল ও তরকারি তাহার রোজ চাই-ই। একটু কিছু কম হইলে রাগারাগি করিত।

ভাগলপুরে অনেক রকম ঝি, চাকর এবং ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। অধিকাংশই চৌর্যাপরাধে ধরা পড়িয়া বিতাড়িত হইত। একটি মৈথিল চাকরের কথা মনে পড়িতেছে। মাথায় তাহার প্রকাণ্ড টিকি। লোকটি বেঁটে। আমি তখন তিনবার মাংস খাইতাম। সকালে বাসী মাংস দিয়া লুচি, দুপুরে গরম মাংসের ঝোল ভাত, রাত্রেও তাই। মৈথিল ঠাকুরটিকে বহাল করিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি মাংস খাও তো? যদি খাও বেশী মাংস কিনিতে হইবে। সে জিভ কাটিয়া বলিল—না বাবু, হামি মোংস্ (মাংস) খাই না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই লক্ষ করিলাম খাওয়ার সময় রোজ মাংস কম পড়িতেছে। একদিন ঠাকুরটি হাতে নাতে ধরা পড়িল। দেখিলাম সে একবাটি মাংস সরাইয়া রাখিয়া গপ্‌গপ্ করিয়া খাইতেছে। তাহাকে টিকি ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলাম এবং বেদম প্রহার দিলাম। তখন আমার দ্বিতীয় রিপুটা অশোভনরকম প্রবল ছিল। আর একটি চাকরের কথা মনে পড়িতেছে। তাহার নাম ছিল কারু। নিজেকে সে খুব বুদ্ধিমান মনে করিত; কিন্তু ও রকম বোকা লোক আমি দেখি নাই। বিছানা তখন চৌকিতে হইত। মশারি টাঙাইতে হইত দড়ি দিয়া। এই মশারি টাঙাইতে কারুর প্রায় একঘণ্টা লাগিত। চারকোণা কিছুতেই সমান হইত না। একটা কোণা ঠিক করিলে আর একটা কোণ উঁচু হইয়া যায়। মশারি টাঙাইবার পর সে একটা দিক খুলিয়া রাখিত। শুইতে গিয়া দেখিতাম মশারির ভিতর প্রচুর মশা। কারুকে প্রশ্ন করিলাম—তুমি একটা দিক তুলিয়া রাখ কেন? কারু বিজ্ঞের মত হাসিয়া জবাব দিল—তাহা হইলে আপনি ঢুকিবেন কি করিয়া। কারু লোক খুব খারাপ ছিল না। তাহার বিবাহে কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছিলাম। তাহার ন'বছরের 'কনিয়া' (বধূ) আনিয়া সে একদিন আমাদের দেখাইয়া গিয়াছিল। কারুর আর একটি কীর্তি আমার মনে পড়িতেছে। তখন লীলা আমার কাছে ছিল না। বি. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য বাপের বাড়ি কলিকাতায় গিয়াছিল। ইক্‌মিক্ কুকারে আমার ভাত ও মাংস রান্না হইত। কারু একটি তরকারী ও ডাল

রাঁধিত। মাছ মাংস খাইত না সে। ভাগলপুরে শুক্রবার দিন মাংস পাওয়া যাইত না। মাছ কিনিতাম। একদিন বড় একটি শিলং মাছের টুকরো কিনিলাম। ওজন প্রায় তিন-পোয়া হইবে। খাইবার সময় দেখিলাম কারু মাছটি কাটে নাই। তিন-পোয়া মাছের গোটা টুকরাটাই সে একটা প্লেটে রাখিয়া আমাকে দিয়া গেল। আমি বলিলাম—এ কি করিয়াছ? মাছ কাটো নাই কেন? কারু জবাব দিল—কুটিয়া লাভ কি? সবটা তো আপনিই খাইবেন। কাটাকুটি করিয়া আর কি হইবে? বলিলাম, মাছের ভিতরটা কাঁচা নাই তো। সে বলিল এক কড়াই জলে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিয়াছি তাহার পর তেল মশলা পেঁয়াজ দিয়া ভাজিয়াছি। তাহাতেও যদি সিদ্ধ না হয়, আমি নাচার। লঙ্কা এবং পেঁয়াজ প্রচুর দিয়াছিল, খাইতে মন্দ হয় নাই। মাছটাও ভালো ছিল। সুতরাং সেদিন ভাত কম খাইয়া মাছ দিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। কারুর কিছু জমি ছিল, সে কিছুদিন পরে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া চাসবাসে মন দেয়।

জীবনে যত চাকর পাইয়াছি তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমার মেথর চাকর সিতাবী। ভাগলপুরে প্রথম ল্যাবরেটরি খুলিয়াই মুন্নিকে বহাল করিয়াছিলাম। মুন্নি মারা গেলে তাহার পুত্র সিতাবীকে বহাল করি। আমি যতদিন ভাগলপুরে ছিলাম সে আমার কাছে ছিল। চাকর হিসেবে সর্ব্বগুণান্বিত ছিল সে। চোর ছিল না, কথা খুব কম বলিত। সবরকম কাজ করিত। মেথর ছিল, সুতরাং সবরকম কাজ করিত। মল-মূত্র পরিষ্কার তো করিতই, আমার বাজার করিত, মুরগী কাটিয়া দিত, আমার ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। আমার 'ফি' অনেক সময় আমি টেবিলে ফেলিয়া যাইতাম। একদিনও তাহা এদিক-ওদিক হয় নাই। আমার গোলাপগাছগুলিরও তদারক করিত সে। তাহার বিধবা মা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসিত। লীলার নিকট হইতে খাবার এবং প্রয়োজন হইলে পুরাতন শাড়ি লইয়া যাইত। আমার কাছে চাকরি করিতে করিতে সিতাবীর বিবাহ হয়। কয়েক বছরের মধ্যে সন্তান-সন্ততিও হইল কয়েকটি। একটিমাত্র ছেলে (বীরুয়া) আর বাকী সব মেয়ে। সিতাবীর কথা কখনও ভুলিব না। তাহার স্ত্রী যক্ষ্মারোগে মারা যায়। কিছুদিন তাহাকে আমি টাটকা খাসির রক্ত খাওয়াইয়াছিলাম। ছাগলের যক্ষ্মা হয় না। আমার মনে হইল ছাগলের রক্তে যক্ষ্মা-প্রতিষেধক কিছু আছে নিশ্চয়। খাসির রক্ত খাইয়া কিছুদিন সে ভালো ছিল। তখন যক্ষ্মার আধুনিক চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই। খাসির রক্ত কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারিল না। একদিন হঠাৎ তাহার ফুসফুস হইতে

প্রচুর রক্তক্ষরণ হইল। তাহাতেই মারা গেল সে। ইহার পরই সিতারী উধাও হইয়া গেল কিছুদিন। সিতারীর মা এবং বড় ছেলেটা আসিয়া আমার ল্যাবরেটরির কাজকর্ম করিয়া দিত। মাসতিনেক পরে সিতারী আর একটি বিবাহ করিয়া ফিরিল। এ বউটি বিধবা ছিল, তাহার একটি মেয়েও ছিল। সবৎসা গাভী লইয়া আবার সংসার পাতিল সিতারী। আবার তাহাকে বহাল করিলাম। তাহার পর হইতে বরাবর সে আমার কাছে ছিল। আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সব কাজ করিতে পারিত সে। আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তখন ডাকযোগে পাঠাইতে হইত। নিপুণভাবে পার্শেল করিয়া দিত সিতারী। একবার লীলা ছিল না, লক্ষ্মীপূজার সব আয়োজন সিতারীই করিয়াছিল। বাড়িতে ঝি অনুপস্থিত হইলে সিতারীর মা বা বউ আসিয়া বাসনও মাজিয়া দিত। ঠাকুর বা ঝি পলাতক হইলে সিতারীই নূতন ঝি বা ঠাকুর জোগাড় করিয়া আনিত। এই প্রসঙ্গে একটি কবিরাজের কথা মনে পড়িল। তিনি আমার ল্যাবরেটরির কাছেই থাকিতেন। মাঝে মাঝে আমার ল্যাবরেটরিতে আসিয়া গল্প-গুজব করিয়া আমার সময় নষ্ট করিতেন। ভদ্রতার খাতিরে তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিতাম না। সেকালে পার্কার কলম খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এই পার্কারের হলুদ রং-এর চমৎকার কলম ছিল একটি। পরিমলের নিকট প্রথম দেখিলাম কলমটি। খুব পছন্দ হইল, পরিমল বলিল আমি তোমাকে পাঠাইয়া দিব। কিছুদিন পরেই কলমটি আসিল এবং আমি মহানন্দে তাহা দিয়া পরিমলের কাগজের জন্যই একটি লেখা লিখিতে লাগিলাম। যখন লিখিতেছি তখন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন—বাঃ, চমৎকার কলমটি তো। অতি সুন্দর রং।

বলিলাম, পার্কার পেন। রংটি হলদে পাখীর রঙের মত। পরিমল আমাকে পাঠাইয়াছে কলিকাতা হইতে।

'সুন্দর কলম—'তাহার পর অন্যান্য কথা পাড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ির খবর সব ভালো তো?

বলিলাম—'বাড়ির খবর ভালো। তবে কয়েকদিন পূর্বে আমার ঠাকুরটি দেশে গিয়াছে। বোধ হয় আর ফিরিবে না। কারণ সাতদিনের ছুটি লইয়া গিয়াছে, পনেরোদিন কাটিয়া গেল। মনে হয়, আর আসিবে না। আপনার সন্ধানে কি ভালো ঠাকুর আছে?' কবিরাজ মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—খুব ভালো ঠাকুর আছে একটি। আজই পাঠাইয়া দিব।

বৈকালে দিব্যকান্তি একটি যুবক আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে বহাল করিয়া ফেলিলাম। খাইবার সময় দেখিলাম, শুধু তাহার চেহারাটাই ভালো নয়, রান্নাও অতি চমৎকার। মাছ, মাংস, নিরামিষ রান্না—সবই সুন্দর। বেশ চটপটে, চালাক চতুর অথচ বিনয়ী। কয়েকদিন পর আমার হলদে কলমটি চুরি হইয়া গেল। তাহার কয়েকদিন পরেই ঠাকুরটিও অন্তর্ধান করিল সহসা। সখের কলমটি হারাইয়া বড়ই মর্মাহত হইয়াছিলাম। একদিন স্টেশনে একজনকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলাম। খুব ভিড় ছিল সেদিন। ভাবিলাম, সেই ভিড়ে কলমটি কেহ পকেট হইতে তুলিয়া লইয়াছে। কয়েকদিন পরে কবিরাজ মহাশয় আসিলেন। দেখিলাম, তাহার পকেটে সেই হলদে কলম। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কলম কোথায় পাইলেন? তিনি দন্তবিকশিত করিয়া উত্তর দিলেন, কলিকাতা হইতে আনাইয়াছি। আপনার কলমটি দেখিয়া খুব পছন্দ হইয়াছিল।

নির্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

প্রশ্ন করিলাম—ঠাকুরটি কোথা গেল?

কবিরাজ উত্তর দিলেন—সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। সেখানে একজন বড়লোক তাহাকে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছে।

আমার আর একটি পাঠকের কথা মনে পড়িতেছে। কমবয়সী গৌরবর্ণ ছোকরা একটি। সে যখন আমার কাছে কাজ করিতেছিল তখন একটি হাসিখুশি আধাবয়সী দাই জুটিল। দাইটি দেখিতে সুন্দরী নয়, রোগা চেহারা, কিন্তু দেখিলাম আমার ঠাকুরটি তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। আমার ঠাকুরটি গৌরবর্ণ, তাহার উপর তাহার রক্তাল্পতা ছিল। একদিন শুনিলাম দাইটি তাহাকে সাদা ভালু (শ্বেত ভল্লুক) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে এবং ঠাকুরটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে। ইহার পরই আমি সপরিবারে মণিহারী চলিয়া যাই। ফিরিয়া আসিয়া পাড়াপড়শীর মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম। সকলে বলিল—আপনারা যখন ছিলেন না তখন আপনার ঠাকুরটি ছাতের উপর আপনার বেতের চেয়ারটিতে বসিত এবং আপনার দাই তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিত। দাইটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি নাচ নাকি? সে মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। ঠাকুরটিও অন্তর্ধান করিল একদিন। ঠাকুরটি পরে অবশ্য আবার আমার কাছে আসিয়াছিল—Hook-worm হইয়াছিল তাহার পেটে। তাহার মল পরীক্ষা করিয়া তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম। সে আমার বাড়িতে আবার কাজ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হুক্‌-ওয়ার্ম-গ্রস্ত লোককে পাচক-রূপে

বহাল করা সঙ্গত মনে করি নাই। ভাগলপুরে শেষদিকে আমার বাড়িতে দুর্গা চাকর, তেতরার মা দাই ছিল। দুর্গা জাতে ছিল দোষাদ। তাহার দোষও ছিল কিছু কিছু। কিন্তু চাকর হিসেবে সে ছিল দক্ষ। সিতাবীর মতোই সে ছিল অনেকটা। তেতবাব মাকে আমরা দাই বলিতাম। মাতৃবৎ ছিল সে। অনেকগুলি মেয়ে, একটি ছেলে তেতরা। তেতরা তাহার দ্বিতীয় পুত্র। বড় ছেলেটি মারা গিয়াছিল। স্কুলে পড়িত। ম্যাট্রিক ক্লাস পযন্ত উঠিয়াছিল, তাহার পর মারা যায়। একদিন সে তাহার মৃত পুত্রের স্মৃতি চিহ্ন একটি কাচের পেপার-ওয়েট্ Paper-weight ) আমাকে আনিয়া দিল। বলিল—"বাবু, আপনি সব সময় লিখা পরি' করেন এটি আপনার কাছে থাক। এটি যদি আপনি ব্যবহার করেন আমার 'দিল' ভরে যাবে। আপনি এটা রাখুন বাবু।" দাইয়ের দেওয়া সেই পেপার-ওয়েট্‌টি এখনও আমার কাছে আছে। আমার লেখার টেবিলের উপর থাকে। দাইয়ের মেয়েরা, নাতি-নাতনীরা প্রায় সমস্তদিনই আমার বাড়িতে থাকিত। তেতরার একটি ছেলে হইয়া বউটি মারা যায়। তেতরার সেই ছেলে বিজয় আমাদেরই বাড়িতে মানুষ হইয়াছিল। আমার ছোট মেয়ে করবী তাহার দেখাশোনা করিত। সে যখন একটু বড় হইল সরস্বতীপূজার দিন তাহার হাতে-খড়ি দিলাম। করবী তাহার গার্জেন-টিউটার হইল। বিজয় ক্রমশঃ আমাদেরও সঙ্গী হইয়া উঠিল। নানাবকম ফাইফরমাস খাটিত। মুরগী-গুলিকে ঘরে ঢুকাইত, খাইতে দিত, আমার খরগোস ও গিনিপিগদের তত্ত্বাবধান করিত। আমার ভুটান, জুলু, জাম্বু, রকেট এই চারিটি কুকুরেরও সঙ্গী ছিল সে। অর্থাৎ সে আমাদের বাড়িরই একজন পরিজন হইয়া গিয়াছিল। আমরা যখন কলিকাতায় চলিয়া আসি তখন তাহাদের ছাড়িয়া আসিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের ক্রন্দনরোল আজও আমার কানে বাজিতেছে। আসিবার সময় আমার মঙ্গল গাভীটি দাইকে দিয়া আসিয়াছিলাম। দাই একটি সোনার হার লীলার কাছে রাখিয়া দিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হারটি যেন বিজয়ের বৌকে দেওয়া হয়। লীলার কাছে থাকিলে সুরক্ষিত থাকিবে এই বিশ্বাসে সে হারটি জোর করিয়া লীলার কাছে রাখিয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত এখনও সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। গতবার আমের সময় বিজয় এক বোরা ভাগলপুরী ল্যাংড়া আম লইয়া আমাদের সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে। ইহারা শিক্ষিত নয়, কিন্তু ইহাদের হৃদয়ের আলো শিক্ষিত লোকদের তথাকথিত enlightenment অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নাই। দাইয়ের খবর এখন মাঝে মাঝে লই। সে খুব বড়া হইয়া

গিয়াছে। কিন্তু এখনও বাঁচিয়া আছে। দাই লীলার কাছে রান্না শিখিয়াছিল। চমৎকার বাঙালী রান্না রাঁধিতে পারিত। সুকতো চমৎকার রাঁধিত। ছেঁচকিও সুন্দর উৎরাইত তাহার হাতে। বিহারী রান্নাও মাঝে মাঝে খাওয়াইত সে। তাহার হাতের বেগুনের স্থূলকার স্বাদ এখনও ভুলি নাই।

অনেকরকম ড্রাইভারও আমাকে রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু 'আলী'-ই আমার মনে দাগ রাখিয়া গিয়াছে। আলীর চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এ চরিত্রটি আমি আমার 'হাটে বাজারে' গল্পে অঙ্কিত করিয়াছি। তাহার চরিত্রে বিলাতী বাটলার (Butler) গোছের একটা ছাপ ছিল। সে কখনই প্রভুর কথার উপর কথা বলিত না। তাহার মধ্যে একটা হৃদয়গ্রাহী মুসলমানী আদবকায়দাও আমাকে মুগ্ধ করিত। তাহার দোষ ছিল—নানারকম নেশা করিত। দাই বলিত সে নাকি 'কোকিন' ও ( অর্থাৎ কোকেন ) খায়। সেইজন্য প্রায়ই কামাই করিত এবং সেইজন্যই সে শেষ পর্যন্ত চাকরি বজায় রাখিতে পারে নাই।

আমার সাহিত্যিক-জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম সাহিত্য-সভাগুলি হইতে। পূর্বেই বলিয়াছি আমার একটু খ্যাতি হইবার পর হইতেই আমি বিহারে এবং বিহারের বাইরে ( বাংলাদেশ ছাড়া ) নানা স্থানে সভাপতিরূপে নিমন্ত্রিত হইতাম। অসম্ভব না হইলে আমি সে নিমন্ত্রণগুলি প্রায়ই গ্রহণ করিতাম। আমার যাতায়াতের ভাড়া তাঁহারা দিতেন, লীলাকেও আমি লইয়া যাইতাম এবং তাহার ভাড়া নিজেই দিতাম। আমার কর্মব্যস্ত জীবনে অবকাশ ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিত ইহারা। এই ছোটখাটো ভ্রমণগুলি প্রায়ই খুব উপভোগ করিতাম আমরা। আমার ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল—অর্থাৎ ভাগলপুর স্কুলেই পড়িত—তখন বেশি দূরে যাইতে পারিতাম না। দুই একবার আমার ছোট ভাই ভোলার বাসায় বরারিতে ছেলেমেয়েদের রাখিয়া গিয়াছিলাম। মনে পড়িতেছে, মুঙ্গের, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া সেইদিনই ফিরিয়া আসা সম্ভব ছিল। কখন কোন্ সভায় গিয়াছি তাহার তারিখ আমার মনে নাই। তবু যে কয়টি স্থানে গিয়াছি সেখানকার স্মৃতি মনে আছে। সেই সব সভা উপলক্ষে কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তির সহিতও আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের আজও ভুলি নাই।

প্রথমে ভাগলপুরের কথাই বলি। ভাগলপুর কলেজে তখন অধিকাংশ অধ্যাপকই বাঙালী ছিলেন। হরলালবাবু, গিরিধারীবাবু, অমলাপদবাবু, নারায়ণবাবু

আমরা তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম ) রাখালবাবু, মোহিনীবাবু, নীলমণিবাবু, নিশানাথবাবু, কমলবাবু, ব্রজবাবু। হরলালবাবু, ( কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ) গোঁড়া গুরুভক্ত ছিলেন। তাঁর মেয়ের টাইফয়েড অসুখে পাদোদকের উপর নির্ভর করিয়া কোন ডাক্তারি ঔষধ খাওয়ান নাই। মেয়েটিকে পাদোদক কিন্তু বাঁচাইতে পারে নাই। ইঁহাদের সকলের সহিত আমার বেশ হৃদ্যতা ছিল। অনেকের পরিবারবর্গের সহিতও বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অনেকের সহিত সে ঘনিষ্ঠতা এখনও বজায় আছে। অধ্যাপক হিসাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই কৃতী ছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি ইঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। অনেকের বাংলা-সাহিত্যে পড়াশোনাও প্রচুর ছিল। ইহা ছাড়া অনেকের আবার কিছু কিছু বিশেষ গুণপনা ছিল। রাখালবাবু কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু স্বহস্তে কাঠের আসবাবপত্রও প্রস্তুত করিতেন চমৎকার। তাঁহার স্বহস্তনির্মিত একটি কাঠের বাক্স আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেটি এখনও আমার কাছে আছে। নারায়ণদা অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু ইংরেজি-সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল বেশি। ইংরেজিতে চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারিতেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি, পূজা-আহ্নিক প্রত্যহ করিতেন। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় গুরু ছিলেন তাহার। আমাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করিতেন। গিরিধারীবাবু ছিলেন ইকনমিক্সের অধ্যাপক, কিন্তু তাঁহার বাংলা-সাহিত্যে, ইংরেজি-সাহিত্যে এবং ইতিহাসে গভীর জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। শৌখীন লোক ছিলেন। ভালো ভালো আতর কিনিতেন। বাড়ির সামনে চমৎকার একটি গোলাপবাগানও করিয়াছিলেন। উঁচুদরের সাহিত্যরসিক ছিলেন একজন। তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব ছিল, সমস্ত শীতকাল তিনি স্নান করিতেন না। মাঝে মাঝে তেল মাখিতেন কেবল। আমার লেখার অনেক পাণ্ডুলিপি ছাপিতে দিবার পূর্বে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছি। আমার সঙ্গে যখন আলাপ হয়—তখন তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কিছুদিন পরে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেই পত্নীসংগ্রহ করেন। তাঁহার সহিতও আমাদের খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তিনি বেশ সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। রাঁধিতেন ভালো। সাহিত্য-রসিকাও ছিলেন। এম. এ. পাশ করিয়াছিলেন বাংলায়, ভালো প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহারও 'ধর্ম-বাই' ছিল। হঠাৎ একবার এক গোপালমূর্তিকে কোলে করিয়া আনিয়া কিছুদিন তাঁহার পূজা করিলেন। কিছুদিন পরে গোপালকে ত্যাগ করিয়া তারাদেবীর সাধনায় মাতিয়া উঠিলেন। শেষ পর্যন্ত তারাদেবীকে লইয়াই ছিলেন। এই পরিবারটির সহিত আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব

হইয়াছিল। তাহাদের পুত্রকন্যা হইল, আমাদের চোখের সামনে তাহারা বড় হইয়া উঠিল। গিরিধারী এবং তাঁহার পুত্র মারা গিয়াছেন। ছেলেমেয়েরা ভাগলপুর ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরি করিতেছে। গিরিধারীবাবুর ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রফেসারও হইয়াছিল। তাহারা চাকরের মত সেবা করিত তাঁহার। বাজার করিয়া দিত, জল ভরিয় আনিত, গিরিধারীবাবু অসুস্থ হইলে দিবারাত্রি তাহারা কাছে বসিয়া সেবা করিত। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন গিরিধারী চক্রবর্তী। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন দুইটি বই সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। গোলাপ-বিষয়ক একটি বই, এবং ফ্রেজার সাহেবের লেখা Golden Bough বইটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ একটি। তাঁহার একটি ফটোও আমার কাছে আছে। নীলমণিবাবু ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। শিবতুল্য লোক। সদা-হাস্যময়, সদা-প্রফুল্ল। ইতিহাসে সুপণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার অন্য গুণ ছিল। ভালো প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। পুজোও করিতেন। আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন নীলমণিবাবু। ভাগলপুরে ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয় নামে প্রকৃত সাধক ছিলেন একজন। তিনি মুখ দেখিয়া অনেক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন। অনেক সময় অনেকের মনের নিগূঢ় বার্তাও বলিয়া দিতেন। তাঁহার কুষ্ঠ হইয়াছিল, শুনিয়াছি, তিনি সূর্য-পূজা করিয়া সে ব্যাধি সারাইয়াছিলেন। তাঁহার ডান পায়ের বুড়া আঙুলটি খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর কিন্তু আর কোথাও কিছু হয় নাই। নীলমণিবাবু তাঁহার প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে যাইতেন এবং গীতাপাঠ করিতেন সেখানে। সেখানে প্রত্যহ গীতাপাঠের সভা বসিত একটি। ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয় আমার কাকাবাবুর শিক্ষক ছিলেন। আমার সঙ্গে ঠাকুর্দা-নাতির সম্পর্ক ছিল। খুব স্নেহ করিতেন আমাকে। আমার সম্বন্ধে এমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহা মিলিয়াছে। তাঁহার চক্ষু দুটি খুব উজ্জ্বল ছিল। নীলমণিবাবু বলিতেন—তাঁহার অনেক ক্ষমতা। প্রকাশ করেন না। মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অপার অনুরাগ ও কৌতূহল ছিল। নীলমণিবাবু এ বিষয়ে আমাকে অনেক বই পড়াইয়াছেন। তাঁহার একটি উপহার —ব্রেস্টেড্-এর ইজিপ্টের ইতিহাস—এখনও আমার কাছে আছে। নীলমণিবাবু এখনও বাঁচিয়া আছেন শুনিয়াছি। কিছুদিন আগে দেখা হইয়াছিল, দেখিলাম, গোঁফগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। এই অধ্যাপকরা সকলেই সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। তাই তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে (T. N. J. College) প্রতি বৎসর খুব জাঁকজমকসহকারে সাহিত্যসভা হইত। শহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা

সকলেই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং অনেকেই সে সভায় যোগদান করিতেন। ছাত্ররা তো ছিলই। তাহাদেরও উৎসাহ অফুরন্ত। আমি প্রায় প্রতি বছর সভাপতি নির্বাচিত হইতাম। ওই সভার জন্যই অনেক প্রবন্ধ, অনেক কবিতা লিখিয়াছি। মনে পড়িতেছে, এক বছর আমি আমার 'আহবনীয়' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম। আমি মাসিক-পত্র বা সাময়িক-পত্রের জন্য খুব কম প্রবন্ধ লিখিযাছি। কারণ একটি ভালো প্রবন্ধ লিখিতে যে পরিমাণ শ্রম করিতে হয় সে পরিমাণ পারিশ্রমিক মেলে না, পাঠকও জোটে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখক তাই প্রবন্ধ লেখেন না। আমি সভাপতির ভাষণের জন্যই সাহিত্য ও সমাজ-বিষযক নানা প্রবন্ধ লিখিতাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও দুইবার প্রবন্ধ পড়িবার জন্য আহূত হইয়াছিলাম। আমার 'শিক্ষার ভিত্তি' 'মনন' 'দ্বিজেন্দ্র-দর্পণ' বই তিনটি বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলির সমষ্টি। এখনও অনেক ভাষণ গ্রন্থাকারে গ্রন্থিত হয় নাই।

একবার আমি কলেজের কর্তৃপক্ষকে বলিলাম প্রতিবারই আমাকে সভাপতি করিতেছেন কেন? বাহিরের সাহিত্যিকদেরও আমন্ত্রণ করুন। তাহারা বলিলেন, আপনি যদি তাঁহাদের এখানে আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, আমাদের আপত্তি নাই। আমরা তাঁহার আসা-যাওযার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। কিছুদিন পরে এখানে একটি মাড়োয়ারি কলেজ স্থাপিত হইল। এখানেও আমি কয়েকবার সভাপতিত্ব করিয়া বাহির হইতে সাহিত্যিক-দের আনাইবার ব্যবস্থা করিলাম। তাহারও কিছুদিন পরে মহিলা কলেজ হইল। সেখানেও ওই ব্যবস্থা করিলাম আমি। ভাগলপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদও আমার পরামর্শে প্রতি বছর তাঁহাদের বার্ষিক উৎসবে বাহির হইতে সাহিত্যসেবীদের আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। আমিই পরিষদের সভাপতি ছিলাম। এইভাবে ভাগলপুরে বসিয়াই আমি কলিকাতার প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম। প্রায় সকলেই আসিয়া আমার বাড়িতেই আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। সজনীকান্ত আর পরিমল আমার বাসায় ইতিপূর্বেই একাধিকবার আসিয়াছিল। কিন্তু তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী এবং আরও অনেকে আসিয়াছিলেন সভা উপলক্ষেই। তারাশঙ্কর একাধিকবার আসিয়াছিল। পেটরোগা লোক ছিল,

সে। গুরুপাক কিছু হজম করিতে পারিত না। ঘন ঘন চা আর সিগারেট খাইত। তাহার জন্য লীলা শুকতো-জাতীয় তরকারি, পাতলা মুগের ডাল, মাছ-ভাজা প্রভৃতি রাঁধিয়া দিত। পলতার বড়া, পোস্ত, কাঁচা মাছের টক খুব প্রিয় খাদ্য ছিল তাহার।

ভাগলপুরের এই সভা-সমিতি প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত স্মৃতি আমার মনে আঁকা আছে। সেটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে। মনে পড়িতেছে না এ কাহিনী আমি আর কোথাও লিখিয়াছি কি না। তবু আবার লিখিতেছি। ইহাতে বিভূতি-চরিত্রের একটি বিশিষ্ট পরিচয় আছে। ভাগলপুর কলেজে সভা হইতেছে। বিরাট সভা। বিভূতি সভাপতি, আমি প্রধান অতিথি। এ সব কলেজের সভায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে নিজেদের রচনা পাঠ করে। গান হয়, আবৃত্তি হয়। সব শেষে সভাপতির অভিভাষণ। বিভূতি দেখিলাম কেমন যেন একটু উস্‌খুস করিতেছে। আমার ভাগলপুরে আসিবার কয়েক বছর আগে বিভূতি কিছুদিন ভাগলপুরে ছিল। কলিকাতার কোন ধনী জমিদারের ম্যানেজার-রূপে কাজ করিত। ভাগলপুরে বুঢ়ানাথ শিবমন্দিরের নিকট যে 'বড় বাসা' আছে সেখানেই থাকিত বিভূতি। বাড়িটি ঠিক গঙ্গার উপরই। প্রকাণ্ড ছাদ ছিল একটি। ছাদের এক কোণে একটি ঘরও ছিল। শুনিয়াছি, বিভূতি এই বড় বাসায় বসিয়াই লিখিয়াছিল। বিভূতি নিজেই এ কথা বলিয়াছিল আমাকে। গঙ্গার ওপারে জমিদারি—সেখানেও সে গিয়া মাঝে মাঝে থাকিত। তাহার এই অভিজ্ঞতার ফল—'আরণ্যক' বইটি। মোট কথা ভাগলপুর সম্বন্ধে তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। চেয়ারে কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া বিভূতি অবশেষে আমার কানে কানে বলিল—আমি একটু বাইরে যাব। সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলেকে ডাকিয়া বলিলাম—ইহার সঙ্গে যাও'। ছেলেটিকে লইয়া বিভূতি সভা হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু গেল তো গেলই, আর ফেরে না। যখন আধ-ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল তখন আমি একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। তখন সভায় প্রবন্ধপাঠ চলিতেছে, তাহার পর একটি আবৃত্তি এবং তাহার পরই সভাপতিকে ভাষণ দিতে হইবে। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইয়া আবৃত্তি শুরু হইল তখনও বিভূতির দেখা নাই। মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এ অবস্থায় কি করা উচিত ভাবিতেছি। এমন সময় দেখিলাম বিভূতি হন্ত-দন্ত হইয়া আসিতেছে। আমার কাছে আসিয়া কানের কাছে মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কতদূর হল?'

'সভা শেষ হয়ে এসেছে। এবার তোমাকে ভাষণ দিতে হবে।'

'কি বলব বল দেখি—'

'সাহিত্য বিষয়ে যা হোক কিছু বল—'

বিভূতি মিনিটপাঁচেক কিছু বলিল। সভা শেষ হইয়া গেল।

তাহাকে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এতক্ষণ ছিলে কোথা?

সে যাহা বলিল তাহা বিস্ময়কর। সে বলিল—এই কলেজের কাছে রেল-লাইনের ধারে একটি ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নাল আছে। তাহার তলাটি সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো। আমি যখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন প্রায়ই ওই ডিস্‌টাণ্ট সিগনালের তলায় আসিয়া বসিতাম। উহারই তলায় বসিয়া অনেক সূর্যোদয়, অনেক চন্দ্রোদয় দেখিয়াছি। উদার আকাশে মেঘ দেখিয়াছি, সন্ধ্যার পর নক্ষত্র উঠিতে দেখিয়াছি। স্থানটি আমার বড় প্রিয় ছিল। সভায় আসিয়া সেই ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নালের কথা মনে পড়িল। সে যেন আমাকে বার বার বলিতে লাগিল—তুমি এতদিন পরে এত কাছে আসিয়াছ, আমার সহিত দেখা করিয়া যাইবে না? আমি ভাই সেই সিগনালটি দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার তলায় মাত্র পাঁচ মিনিট বসিয়াছি। বিশ্বাস কর পাঁচ মিনিটের বেশি বসি নাই। কিন্তু জায়গাটা যত কাছে ভাবিয়াছিলাম তত কাছে নয়। এখান হইতে প্রায় এক মাইল। আসিবার সময় আমি মাঠামাঠি আসিয়াছি।

দেখিলাম তাহার কাপড়ে অনেক চোরাকাঁটা লাগিয়া রহিয়াছে। পা ভরতি ধুলো। বিভূতি অপ্রস্তুতমুখে অপরাধীর মতো আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি এক নূতন বিভূতিকে দেখিলাম।

তারাশঙ্কর অনেক সময় সভায় মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিত না। এই উপলক্ষে ভাগলপুরের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্বর্ণ-জয়ন্তীর কথা মনে পড়িতেছে। স্বর্ণ-জয়ন্তী পরিচালনা করিবার জন্য একটি পরিচালক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। আমি ছিলাম সে সমিতির সভাপতি। ঠিক হইল দুইদিন উৎসব হইবে। কলিকাতার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের, গায়কদের এবং গুণীদের নিমন্ত্রণ করিব আমরা। পরিষদের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া আমরা টিকিট করিয়া সভা করিব স্থির করিলাম। অর্থাৎ বিনা টিকিটে কেহ সভায় যাইতে পারিবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাড়ির ছাদে ফাটল দেখা দিয়াছিল, অর্থাভাবে বই কেনা হইতেছিল না, চাঁদা ছিল নামমাত্র, তাহাও আদায় হইত না। তাই আমরা ঠিক করিয়াছিলাম টিকিট করিয়া কিছু টাকা তুলিয়া পরিষদের কিছু অভাব মিটাইব। আমাদের কার্যকরী সমিতিই ইহা স্থির করিলেন। কিন্তু বিনা-পয়সায়—মজা

দেখিতে অভ্যস্ত অনেক বাঙালীরা ইহার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাইতে লাগিল। ঠিক হইয়াছিল ওখানকার সি. এম. এস স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। তিনিই প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন 'হল'-টি যাহাতে আমরা পাই সে ব্যবস্থা তিনি করিবেন। সভার কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ তিনি আমাকে একটি পত্র লিখিলেন, শহরের কয়েকজন লোককে বিশেষ নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইবার জন্য। আমি উত্তর দিলাম, যে কমিটি এই অনুষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন, সেই কমিটির সমর্থন না পাইলে আমি ইহা করিতে পারিব না। এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ একটি সভা ডাকা হোক। সে সভা যদি নির্দেশ দেন ওই লোকগুলিকে নিমন্ত্রণ করা হোক আমি আপত্তি করিব না। সভায় অনেকে আপত্তি করিলেন। সম্পাদক মহাশয়, ডাক্তার ভাদুড়ী বলিলেন—কাহাকে বাদ দিয়া আপনি কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবেন? বাছিয়া বাছিয়া নিমন্ত্রণ করিলে আমাদের বদনাম হইবে। সুতরাং কাহাকেও বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হইল না। সি এম. এস. হলে সভা হইবে ঘোষণা করিয়া আমরা চারিদিকে বিজ্ঞাপন দিলাম। কিন্তু বাঙালী চরিত্রের মহিমা শেষ পর্যন্ত প্রকটিত হইল। সি. এম. এস. স্কুলের প্রিন্সিপাল মহাশয় সহসা আমাকে পত্রযোগে জানাইয়া দিলেন যে, রবিবার তিনি সি. এম. এস হল দিতে পারিবেন না। আমরা অকূল পাথারে পড়িয়া গেলাম। কাছেই মাড়োয়ারিদের একটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। তাহার মালিক আমাকে শ্রদ্ধা করিতেন খুব। তাঁহাকে গিয়া ব্যাপারটা বলিলাম। তিনি তাঁহার স্কুলের 'হল'-টি আমাদের শুধু ব্যবহারই করিতে দিলেন না, সভায় পাতিবার জন্য বড় বড় শতরঞ্চি প্রভৃতিও দিলেন।

যতদূর মনে পড়িতেছে সে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তারাশঙ্কর, বীরেন ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিক, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোহর), বাউল পূর্ণ দাস, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (আমাদের উপীনদা) আশালতা দেবী, সুরকার নচিকেতা ঘোষ এবং তাঁহার সহকারী তবলচি। নামটি মনে পড়িতেছে না। সজনী আসিতে পারে নাই। আমার বাড়িতেই সকলে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। হাসিতে, গল্পে, গানে আমার বাড়ি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। রান্নাঘরে লীলা রান্না লইয়া ব্যস্ত। রান্নাঘরের ঠিক পাশেই আমাদের খাবার ঘর। সেইখানেই আড্ডাটা বসিত। লীলা আমাদের চা দিয়া, খাবার দিয়া আপ্যায়িত করিত। বীরেনের জমাটি গল্প, পঙ্কজের গান মুখর করিয়া তুলিত আমাদের খাওয়ার ঘরটিকে। লীলা রান্নাঘরে বসিয়াই উপভোগ করিত সব। উদ্বোধনী-

সভা হইল গার্লস স্কুলের হলে। আমার বন্ধু শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভাগলপুরের পূর্বগৌরব কীর্তন করিলেন এবং শেষে বলিলেন—এখন সে আলো আর নাই, সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, তবু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিব—যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া—তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

পরবর্তী বক্তা তারাশঙ্করের চোখের দৃষ্টিতে দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া প্রথমেই বলিল—যেখানে বনফুল এখনও মধ্যাহ্নদীপ্তিতে বর্তমান সেখানে অমূল্যবাবু সন্ধ্যার অন্ধকার কি করিয়া দেখিলেন বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি তারাশঙ্করের জামা ধরিয়া টান দিলাম এবং চুপি চুপি বলিলাম, আমাকে বাদ দিয়া অন্য কথা বল।

দ্বিতীয় দিন সি. এম এস.-এর অধ্যক্ষ মহাশয় জানাইলেন—আজ সভা আমাদের হলে হোক। দ্বিতীয় দিনের সভা গানের সভা। পঙ্কজ, মোহর এবং উপীনদা গান গাহিলেন। ভাগলপুরের দুই একজন গায়ক, গায়িকার গানও শোনা গেল। পূর্ণদাস বাউল নাচিয়া গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া দিলেন।

তারাশঙ্করকে দ্বিতীয়বার চটিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে দেখিয়াছিলাম পুরুলিয়ার এক সাহিত্য-সভায়। সে সভায় আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। আমরা সভায় প্রবেশ করিতেছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক তারাশঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনি কি তারাশঙ্করবাবু?

তারাশঙ্কর বলিল—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বলিলেন—আপনার 'জঙ্গম' পড়ে আমি মুগ্ধ। সত্যি, মুগ্ধ—

তারাশঙ্কর তখন কিছু বলিল না। কিন্তু সভায় উঠিয়া প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়া প্রথমেই সে বলিল—বুঝিতে পারিতেছি, আপনারা বড়লোক, আপনাদের পয়সা খরচ করিবার সামর্থ আছে, আপনাদের উদ্দেশ্য খানিকক্ষণ মজা উপভোগ করা। আপনারা বাইজি আনাইলে বেশী মজা পাইতেন। আমরা সাহিত্যিকরা আপনাদের মত লোককে তো মজা দিতে পারিব না।

আমি পিছন হইতে তাহার কামিজ ধরিয়া ঈষৎ টান দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার ইঙ্গিত সে বুঝিল এবং এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেল।

আমার সহিত তারাশঙ্করের একটা গোপন অন্তরঙ্গতা ছিল। বাহিরে অনেক সময় তাহার সহিত আমার নানা বিষয়ে ঝগড়া হইত, বিশেষ করিয়া যখন সে

হুজুগে মাতিয়া কোন রাজনৈতিক দলের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের মনোমত রচনা লিখিতে উদ্যত হইত। তাহাকে চিঠিও লিখিয়াছি একাধিকবার এই সব প্রসঙ্গে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের অন্তরঙ্গতা নিবিড় ছিল। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতাম—সেও আমাকে শ্রদ্ধা করিত। ইহার একটা প্রমাণও পাইয়াছিলাম একটা সভায়। নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পাটনা শাখা আমাকে একবার সম্বর্ধনা দিয়াছিল। আমি পাটনা গিয়াছিলাম। তাঁহারা অন্যান্য সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তারাশঙ্করকেও করিয়াছিলেন। অসুস্থতার জন্য তারাশঙ্কর আসিতে পারে নাই। সভা চলিতেছে—এমন সময় একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—তারাশঙ্করবাবু এই অভিনন্দনপত্রটি পাঠাইয়া দিয়াছেন। এটি যেন সভায় পড়া হয়। সে অভিনন্দন-পত্রে তারাশঙ্কর যাহা লিখিয়াছিল, তাহা শুধু তারাশঙ্করই লিখিতে পারে। তাহাতে আমার অনেক প্রশংসা তো সে করিয়াছিলই, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে গুণগ্রাহী উদার তারাশঙ্করের ছবিও আঁকিয়াছিল সে।

আমি যখন ভাগলপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম তখন তারাশঙ্কর মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসিত। একদিন সে বলিয়াছিল, তুমি ভাগলপুর ছাড়িয়া এখানে আসিয়া ভুল করিয়াছ। এখানে কেহ তোমাকে বিশ্রাম দিবে না, খালি সভা করিতে হইবে। লেখা-পড়া এখনও একেবারে ছাড়ি নাই, কিন্তু তাহার কথাটা যে মিথ্যে নহে তাহাও বুঝিতেছি। ভাগলপুরের কাছেই মুঙ্গের ও জামালপুর। এই দুইটি স্থানে সভা উপলক্ষে একাধিকবার যাইতে হইয়াছিল।

মুঙ্গেরে ছিল আমার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। মুঙ্গের কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সরকার যদিও নিজেকে আমার ভক্ত বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকেও সত্যই খুব শ্রদ্ধা করিতাম। সত্যই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ভাগলপুরেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ। তাঁহার ভগ্নীপতি ভাগলপুর জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি তাঁহার দিদির কাছে আসিয়াছিলেন। সেই সময় আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়। আলাপ হইবার পর দেখিলাম অদ্ভুত তাঁহার স্মৃতি-শক্তি। আমার 'জঙ্গম' উপন্যাস হইতে পাতার পর পাতা মুখস্থ বলিতে পারিতেন। আমার কবিতা এবং গল্পও কণ্ঠস্থ ছিল তাঁহার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা গড়-গড় করিয়া বলিয়া যাইতেন। ইংরেজ কবি ও লেখকদের লেখাও সব মুখস্থ। শেলি, কীটস্, বায়রণ, ব্রাউনিং, ইয়েটস্, ডিকেন্স, বার্ণার্ড-শ—কেহ বাদ

নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্যের বহর ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। তখন শনিবারের চিঠি-র সজনী আমাকে একটি উপন্যাস লিখিবার জন্য তাগাদা দিতেছিল। আমি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না কি বিষয় লইয়া লিখি। নতুন বিষয় মনে না আসিলে আমার লেখার প্রেরণাই জাগে না। কালীকিঙ্করবাবু বললেন—আপনি শিকারের পটভূমিকায় একটা নূতন ধরণের বই লিখিয়া ফেলুন। মৃগয়া শুরু করিয়া দিলাম। রোজ যতটুকু লিখিতাম কালীকিঙ্করবাবু আসিয়া শুনিয়া যাইতেন এবং আমাকে প্রচুর উৎসাহ দিতেন। মৃগয়া বইটি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছি। কালীকিঙ্করবাবু শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, মহৎ লোক ছিলেন। বিবাহ করেন নাই। ছাত্রদেব লইয়াই থাকিতেন। অনেক গরীব ছাত্রকে পড়াইতেন, অনেকেব ব্যয়ভার বহন করিতেন। হঠাৎ অকালে হার্টফেল করিয়া মারা গেলেন।

তাঁহারই আমন্ত্রণে মুঙ্গের কলেজে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলাম। জামাল-পুবেয় সভাতেও তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল। তাঁহার চিঠিতে ঠিকানা লেখার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি খামের বাঁ দিকের উপরের কোণে ঠিকানাটা লিখিতেন। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কেন এমন করেন? তিনি বলিলেন—আপনার নামের উপর পোষ্টাফিসের ছাপ পড়ুক, এটা আমি চাই না। এই মহৎ লোকটি অকালে চলিয়া গেলেন।

একবার জামালপুরের এক সভায় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। কথাটা হঠাৎ মনে পড়িল। সেই সভায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইয়াছিল এবং আমিই তাহার বিচারক ছিলাম। আমি সব শুনিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার কে কে পাইবে তাহাদের নাম লিখিয়া দিলাম। একটু পরে এক ভদ্রলোক আমার কানে কানে বলিলেন—আপনি তো আমাদের মহা মুশকিলে ফেলিলেন।

'কেন?'

আমাদের বড়বাবুর মেয়ে প্রতি বছর আবৃত্তিতে প্রথম হয়। আপনি তো তাহাকে কোনও পুরস্কারই দেন নাই। বড়বাবু চটিয়া যাইবেন এবং সে ধাক্কা আমাদের সামলাইতে হইবে। তিনি আমাদের একজন বড় পেট্রন। আমি বলিলাম—আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। আমি যাহাদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় করিয়াছি, তাহার কিন্তু বদল করিতে পারিব না।

তিনি হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, আপনি বড়বাবুর মেয়েকে স্পেশাল প্রাইজ দিন। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না। ভদ্রলোকের

মুখের কাঁচুমাচু দেখিয়া বড়ই করুণা হইল। শেষে তিনি যাহা বলিলেন তাহাই করিতে হইল। বড়বাবুর মেয়েকে বেশ মোটা একটি ছবি-ওলা বই প্রাইজ দেওয়া হইল।

নানা সভার নানা টুকরা-টুকরা খবর মনে পড়িতেছে। একবার এলাহাবাদে প্রখ্যাত কবি ও চিত্রকর মহাদেবী বর্মণের নিমন্ত্রণে এলাহাবাদে গিয়াছিলাম। তিনি আমাদের প্রচুর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভাষার কবি ও লেখকরাও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন সে সভায়। অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি ছিল না। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের অসুবিধা হইয়াছিল। আমরা মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খাইতে অভ্যস্ত। কিন্তু সেখানে সবই নিরামিষ ব্যাপার।

একদিন আমরা খাইতে বসিয়াছি এমন সময় কবি নিরালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হিন্দী সাহিত্যিক, কিন্তু বাংলাদেশে বহুদিন ছিলেন শান্তি-নিকেতনে। তাঁহার কবিতা রবীন্দ্র-প্রভাবিত। হিন্দী সাহিত্যে 'ছায়াবাদী' কবিতার প্রবর্তক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি শুনিয়াছি।

তিনি আসিয়াই আমাদের সামনে মাটিতে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

"খেতে বসেছেন? দেখি মহাদেবী আপনাদের কি খাওয়াচ্ছেন। মাছ কই?"

বলিলাম—"এখানে সব নিরামিষ। তবে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে না—।"

"অসুবিধা নিশ্চয়ই হচ্ছে। মাছ না হলে যে বাঙালীর খাওয়া হয় না।"

এই সময় মহাদেবী প্রবেশ করলেন।

নিরালা বলিয়া উঠিলেন—"মহাদেবী, এ তোমার কেমন ভদ্রতা? বাঘকে নিমন্ত্রণ করে শাক খেতে দিয়েছ? আমি ওঁকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।"

এলাহাবাদের ডাক্তার মুখার্জির বাড়িতে খবর গেল যে এখানে আমরা নিরামিষ-ভোজীদের পাল্লায় পড়িয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদের নিজেদের বাড়িতে লইয়া গেলেন। মাছ, মাংসের প্রাচুর্যে অভিভূত হইয়া গেলাম আমরা। ডাক্তারবাবুর নামটি মনে নেই। কিন্তু তাঁহার মত ভদ্র, অমায়িক লোক এক প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেই দেখা যায়। শুধু তিনি নন, বাড়ির সকলেই ভদ্র। তিনি নূতন বাড়ি করিয়াছিলেন। বোধ হয় আমি তাঁহার বাড়ির নামকরণ করিয়াছিলাম—"সুদক্ষিণা।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি সভার কথা মনে পড়িতেছে। কানপুর। সেখানে ডাক্তার সুরেন সেন মহাশয় বিখ্যাত লোক। বহু জনহিতকর কার্য

করিয়াছেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলের হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে গিয়াছিলাম। স্কুলের বিশেষত্ব এই যে, ছেলেরা সেখানে প্রথম ভাগ পাঠে করিয়া ভরতি হয় এবং বি. এ. পাশ করিয়া বাহির হয়। স্কুল বদল করিবার প্রয়োজন হয় না। অন্য কোনওরকম ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। এই সভায় আমার ভাষণে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা লইয়াও গোলমাল হইয়াছিল। কাগজে খুব গালাগালি দিয়াছিল আমাকে। আমি বলিয়াছিলাম—আমাদের নৈতিক অধঃপতন আরম্ভ হয় পাল রাজত্বের শেষের দিকে, যখন বৌদ্ধধর্ম সহজিয়া সাহিত্যের ছদ্মবেশে অশ্লীল সাহিত্য প্রচার করিতে লাগিল। তাহার পর মুসলমান রাজত্বের সময় দুর্নীতির প্রবল বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল। আর একটি কথা বলিয়াছিলাম যে, বিহারীরা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয় বলে হিন্দীকে খুব উঁচুদরের সাহিত্য বলিয়া মনে করেন। হিন্দীর সহিত আমাদের কোনও ঝগড়া নাই, কিন্তু কয়েকটি সত্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনা মনে রাখা উচিত। প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র বাঙালীরাই বাহির করেন, বিহারে বাঙালী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টার জন্যই কোর্টে উর্দুর বদলে হিন্দী প্রচলিত হয়। বাঙালী বিদ্যাসাগরই হিন্দী 'বেতাল পচিশি' হইতে বাংলা বেতাল পঞ্চবিংশতি অনুবাদ করেন। বর্তমান হিন্দী সাহিত্য প্রধানতঃ পুষ্ট হইয়াছে প্রাচীন এবং বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের অনুবাদ করিয়া। এইখানেই এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আমরা রাত্রিতে খাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলাম। সেদিন খাবার কি ছিল মনে নাই, কিন্তু একটি কথা মনে আছে। তাহারা ছোট একটি মধুপর্কের বাটিতে ছোট মার্বেলগুলির মত কি একটা দিলেন। খাইয়া ফেলিলাম—ক্ষীর—নটক্ষীর। অতটুকু ক্ষীর যে কাহাকেও দেওয়া সম্ভব তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।

আর একটা সভার কথা মনে পড়িতেছে। কটকে নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন। সেবার মূল সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান-শাখায় ছিলাম আমি। আমার সঙ্গে লীলা তো ছিলই, আমার ছোট-মেয়ে করবীও ছিল। সভায় ছিলেন হেমলতা ঠাকুর (সাহিত্য-জগতের মেজ মা)। সভা বেশ ভালো হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিবরণ তেমন মনে নাই। মনে আছে চাল, ডাল এবং মেথি সাজাইয়া সভার মাঝখানে চমৎকার একটি আলপনার মত ছবি আঁকা ছিল। আর মনে আছে পারুল নামে ছোট একটি কালো মেয়েকে। দশ বারো বছর বয়স। সভায় গান গাহিয়াছিল কি না মনে নাই, কিন্তু আমাদের খুব সেবা করিয়াছিল। সে এখন কলিকাতায় থাকে। গৃহিণী হইয়াছে। সেই ছোট পারুল হারাইয়া গিয়াছে।

প্রদ্যোতের ভগ্নীপতি তখন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আমাকে বলিলেন—আপনি আমাদের ষ্টেট গেস্ট্। আপনাকে আমরা একটি গাড়ি দিব এবং একজন 'গাইড' ও দিব। আপনি পুরী, কোনারক দেখিয়া আসুন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে তিনি আমাদের 'গাইড' স্বরূপ দিলেন। ঠিক করিলাম পুরী এবং কোনারক যাইব। চিল্কা-হ্রদ দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার ডাক্তারী পেশায় খুব বেশী কামাই করিবার উপায় ছিল না। তাই চিল্কা দেখিবার বাসনাটা ত্যাগ করিলাম। প্রদ্যোৎও কটকে আসিয়া হাজির হইল। সে বলিল—আমার চাকর বুদ্ধকেও তুমি সঙ্গে লইয়া যাও। ও চমৎকার রাঁধিতে পারে। একটু পরে মুখ্যমন্ত্রীর পি. এ. মহাশয় আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রীও জগন্নাথ দর্শন করিতে চান। তাঁহাকে যদি সঙ্গে লই আমার আপত্তি আছে কি, আমি বললাম গাড়িতে যদি স্থান-সঙ্কুলান হয় আমার আপত্তি নাই। তিনি আশ্বাস দিলেন একটি বড় গাড়িরই ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। সমুদ্রের ঠিক ধারেই গভর্ণমেণ্টের ডাক-বাংলো। সেখানে গিয়া উঠিলাম। স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম, কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিলাম। কারণ সেই আমার প্রথম সমুদ্র-দর্শন। তাহার পর সমুদ্রের ধারে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, জেলেরা সামুদ্রিক মাছ বিক্রয় করিতেছে। বুদ্ধের পরামর্শে দুই-তিনরকম সুস্বাদু মাছ কিনিয়া ফেলিলাম। দুই টাকায় অনেক মাছ পাওয়া গেল। বাটা মাছের মত একরকম মাছ ( মুখটি কিন্তু লাল নয়, সবুজ ) দেখাইয়া বুদ্ধ বলিল—এ মাছের ঝাল নাকি অমৃতোপম, বেশি করিয়া কিনুন। কিনিলাম। কিন্তু ডাক-বাংলোর একটি ঘরে সেক্রেটারি মহাশয়ের গোঁড়া স্ত্রী বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—পুরীতে আসিয়া প্রথমে জগন্নাথের প্রসাদ খাইতে হয়। সেক্রেটারি মহাশয় কটক হইতে 'ফোন' করিয়া আমাদের জন্য 'কণিকা'-ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাড়ি লইয়া তিনি সে ভোগ আনিতে গিয়াছেন। ভোগ না খাইয়া অন্য কিছু খাওয়া অনুচিত। সুতরাং মাছগুলি পড়িয়া রহিল। বুদ্ধ আশঙ্কা করিতে লাগিল—তখনই রাঁধিয়া না ফেলিলে মাছ পচিয়া যাইবে। আমি বলিলাম—তীর্থস্থানে যখন আসিয়াছি তখন সেখানকার নিয়ম মানিয়া চলাই উচিত। মাছগুলি ঝোলাতেই রহিল। বেলা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। যখন দুইটা বাজিল তখনও সেক্রেটারি মহাশয়ের দেখা নাই। সকলেই ক্ষুধিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেলা আড়াইটা নাগাদ সেক্রেটারি ফিরিলেন। বলিলেন—আজ ভোগ হইবে না। একজন অচ্ছুৎ নাকি ভোগের হাঁড়িটা ভোগ দিবার পূর্বেই দেখিয়া ফেলিয়াছে। সে ভোগ পুতিয়া ফেলা হইয়াছে। সুতরাং

আজ আসুন আমরা এখানেই রান্না করিয়া খাই। আমি বাজার হইতে চাল-ডাল-তরি-তরকারি গুঁড়া মশলা কিনিয়া আনিয়াছি। ঘি, তেল, মাখনও। তাই এত দেরি হইয়া গেল। এখানে ডাক-বাংলোতে বাসন-পত্র সব আছে। বুদ্ধ মাছের ঝাল চমৎকার রাঁধিয়াছিল। আমার মনে হইল ইহা বোধ হয় স্বয়ং জগন্নাথ-দেবেরই ষড়যন্ত্র। তিনি অন্তর্যামী, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন মনে মনে আমি সমুদ্রের মাছ খাইতে ইচ্ছুক। তিনি কৌশল করিয়া আমার ইচ্ছাটা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সরকারী নুলিয়াদের সহায়তায় সমুদ্রস্নান করিলাম। সরকারী হেড-পাণ্ডা আমাদের জগন্নাথমূর্ত্তিও দর্শন করাইলেন। পাণ্ডাদের সাহায্য ব্যতীত জগন্নাথের দর্শন পাওয়া অসম্ভব। মন্দিরের ভিতর অন্ধকার এবং নানা জায়গায় নানা মাপের সিঁড়ি। সুতরাং মনে মনে বারম্বার আওড়াইতেছিলাম—হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা। জগন্নাথদেবের সামনা-সামনি গিয়া সুভদ্রা-বলরামকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম। আমার হঠাৎ মনে হইল, এদেশে কুষ্ঠরোগ এবং ফাইলেরিয়া খুব বেশি হয় বলিয়াই বোধ হয় এখানকার দেবতাদের এই বীভৎস মূর্তি। আমরা দুরারোগ্য ব্যাধিকেও যে দেবতারূপে পূজা করি তাহার প্রমাণ 'মা শীতলা' এবং 'ওলাবিবি'। জগন্নাথদেব, সুভদ্রা এবং বলরামের কপালে মূল্যবান দামী পাথর আছে। এত বড় নীলা আগে কখনও দেখি নাই। পুরীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলিও একে একে দেখিলাম। জগন্নাথদেবের মামীর (?) বাড়িতে প্রচুর বাঁদরের ভিড়। পুরীতে জাতি-বিচার নাই। নানাস্থানে নানা জাতের দোকানদার 'ভাত' বিক্রয় করিতেছে দেখিলাম। ভাতের এমন ফলাও কারবার অন্য কোথাও দেখি নাই।

পরদিন 'কোনারক' অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বুদ্ধ সঙ্গে ছিল, খাদ্যের ভাণ্ডারও পূর্ণ ছিল, বৈচিত্র্যের অভাব হয় নাই। আমরা সরকারী 'অতিথি' বলিয়া সেখানকার হোটেল হইতেও 'ভালো-মন্দ' কিছু পাওয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া গেলাম 'কোনারক' দেখিয়া। অতীত মহিমার এ কি বিরাট প্রতীক। যদিও অনেক জায়গা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তবুও এখনও যাহা আছে তাহা বিস্ময়কর। শুনিলাম এটি সূর্যমন্দির ছিল। মন্দিরটি সূর্য-দেবতার সপ্তাশ্ববাহিত রথ। অশ্বগুলি সব নষ্ট হয় নাই, যেগুলি হয় নাই, সেগুলি বিস্ময়কর ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। অন্যান্য অনেক হিন্দু মন্দিরে যেমন, এখানেও তেমনি যৌন-ক্রীড়া-রত নর-নারীর ছড়াছড়ি। মনে হইল মূর্তিগুলি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—বাপু হে,

সারাজীবন তো এই সব করিয়া কাটাইয়াছ—এবার মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়া আসল দ্রষ্টব্যটি দেখিয়া যাও। আরও শুনিলাম কোনারক মন্দিরের ভিতর আগে নাকি একটি শক্তিশালী চুম্বক বসানো ছিল। লৌহনির্মিত কোন জাহাজ ইহার কাছাকাছি আসিতে পারিত না। চুম্বকের টানে লোহার জোড় খুলিয়া যাইত। হয়ত এ সূর্যমন্দির পুরাকালে দুর্গের স্থান অধিকার করিয়াছিল। অসম্ভব কিছুই নয়, সবই হইতে পারে। ডানিকেন সাহেব হয়ত বলিবেন পৃথিবীতে আশ্চর্যজনক যাহা কিছু আছে সবই নাকি গ্রহান্তরের মানুষের তৈরি। তাঁহার কল্পনাকে বাহাদুরি দিই। কিন্তু এই মানুষই যে একদা অসাধ্যসাধন পটিয়সী শক্তির অধিকারী ছিল এইরূপ কল্পনা তিনি কেন করিলেন না বুঝিতে পারি না। এই মানুষই আকাশবিহার করিতেছে, এটম্ বম্ বানাইতেছে—সে যুগেও হয়তো তাহারা প্রতিভা ও শক্তির যে পরিচয় দিয়াছিল তাহারই কিছু চিহ্ন আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি। গ্রহান্তর হইতে লোক আমদানি করিবার কি প্রয়োজন? মানুষ অসীম শক্তিধর। সে সব করিতে পারে।

হঠাৎ মনে হইল সভা-সমিতির কথা যদি ক্রমশঃ লিখিয়া যাই বই তো মহাভারত হইয়া যাইবে। জীবনে অনেক সভা-সমিতিতে যোগ দিয়াছি। সব সভার সব কথা মনেও নাই। তবে সব মিলাইয়া মনে যে অনুভূতিটা জাগিয়া আছে তাহা একরঙা স্বস্থান ত্যাগ করিয়া সভার ভিড়ে বসিয়া সময় নষ্ট করিতে ভালো লাগে না। যেখানে যেখানে গিয়াছি সনির্বন্ধ অনুরোধের জবরদস্তিতে গিয়াছি। একবার কেরলে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় গিয়াছিলাম। আমার বড় ছেলে অসীম তখন ভেলোরে মেডিকেল অফিসার ছিল। লীলাও আমার সঙ্গে গিয়াছিল। সভাটা উপলক্ষ্য। আমাদের আসল লক্ষ্য ছিল এই সুযোগে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলটা একবার দেখিয়া আসা। অসীম হাসপাতাল হইতে ছুটি লইয়া মাদ্রাজ স্টেশনে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিল। আমরা কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ মেল একটি 'কুপে' পাইয়াছিলাম। সুতরাং মাদ্রাজ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে আসা গেল। মাদ্রাজে আসিয়া আমরা নিজেদের অসীমের হাতে সঁপিয়া দিলাম। সেই সব ব্যবস্থা করিতে লাগিল। মাদ্রাজী কুলিগুলি খুব ভালো। যে মাদ্রাজী নিরামিষ হোটেলে আমরা উঠিলাম সে হোটেলটিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাওয়ার সঙ্গে দুধ বা দই দেয়। খাওয়ার পর এক টুকরা নারিকেল ও পান, সুপারি দেয়। পানে চুণ থাকে না। আমরা কোথায় কি কি দেখিব অসীমই হোটেল-ওলার সহিত বসিয়া এবং গাইড-বুক দেখিয়া তাহা ঠিক করিল। অতঃপর আমরা যাহা

করিলাম—তাহাকে ভ্রমণ বলে না, ঝটিকা-ভ্রমণ বলা যাইতে পারে। যাহা দেখিলাম মনে নাই। 'কাজাগাম'-পন্থী লোকেরা শত চেষ্টা করিয়াও এ দেশের লোকের মন হইতে আর্য প্রভাব মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না। সমস্ত দেশ জুড়িয়া বিষ্ণু, শিব, ষাঁড এবং গণেশের মূর্তি। নীলা দিয়া প্রস্তুত যে মূর্তিটি বিশ্ববিখ্যাত সেটিও নটরাজের মূর্তি। মনে হইল প্রাচীন আর্য-সভ্যতাকে যেন দাক্ষিণাত্যই ধরিয়া রাখিয়াছে। ত্রিবান্দ্রামে আমাদের ডাক্তারি মীটিং কোনক্রমে সারিয়া আমরা কন্যাকুমারীতে গিয়া হাজির হইলাম। গিয়াই মনে হইল জীবন সার্থক হইয়া গেল। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং আরব সাগর—এই তিন সমুদ্রের মিলন-পাবাবারে সূচ্যগ্র হইয়া প্রবেশ করিয়াছে আমাদের ভারত-ভূমি। জলে নামিয়া কুমারিকা অন্তরীপের শেষ-প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলাম একবার। মনে হইল মা বোধ হয় সমুদ্রে স্নান করিবেন বলিয়া নামিতেছিলেন, কিন্তু কোন কারণে যেন নামা হয় নাই। বাধা পড়িয়াছে। এখানকার কন্যাকুমারীর বিবাহও বিঘ্নিত হইয়াছে। হিমালয় হইতে স্বয়ং মহাদেব তাঁহাকে বিবাহ করিতে আসিতেছিলেন, দেবতাদের চক্রান্তে পথে আটকাইয়া পড়িয়াছেন। কন্যাকুমারী কিন্তু আজও মালা হাতে তাঁহার অপেক্ষায় দাড়াইয়া রহিয়াছেন। বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সমুদ্রের জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কন্যাকুমারী হইতে ধনুষ্কোটিতে গিয়াছিলাম। ধনুষ্কোটি একটি দ্বীপ। অসংখ্য ঝিনুক ও ঝিনুক-জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর খোলায় পরিপূর্ণ দ্বীপটি। দ্বীপকে ঘিরিয়া উত্তাল তরঙ্গমালা। সত্যই এক একটি তরঙ্গ তালগাছের মতই উঁচু! অবাক হইয়া সমুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিলাম।

সভা উপলক্ষে নানা স্থানে গিয়াছি। সব সভার বর্ণনা দিলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে। সুতরাং সব সভার কথা লিখিব না। রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালীদের আমন্ত্রণে একবার রেঙ্গুন গিয়াছিলাম, সেখানকার সভার মূল সভাপতি হইয়া। আমি আমার অভিভাষণটি লিখিয়া পূর্বেই সজনীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সে সেটি ছাপাইয়া রাখিয়াছিল। আমি ও লীলা নির্দিষ্ট দিনে ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় পৌঁছাইলাম এবং কলিকাতায় আসিয়া রেঙ্গুনযাত্রী প্লেনটি ধরিলাম। ইহার পূর্বে কখনও প্লেনে চড়ি নাই। যখন আকাশে উড়িলাম ভয়-ভয় করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া গেলাম। মনে হইল নীচে একটি সুনীল কাপড় যেন পাতা রহিয়াছে।

তিন ঘণ্টায় রেঙ্গুন পৌঁছাইয়া গেলাম। মনোজবাবু এবং আরও কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মনোজবাবু গাড়ি

আনিয়াছিলেন, তাঁহার গাড়িতেই তাঁহার বাসায় গেলাম। তাঁহার বাসাতেই আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মনোজবাবু রেঙ্গুনে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের এজেন্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তিনি আমার তৃতীয় ভ্রাতা লালমোহনের মামাশ্বশুর। বিখ্যাত সাধু মোহনানন্দ তাঁর দাদা। মনোজবাবু আমাদের যে যত্ন করিয়াছিলেন তাহা অবর্ণনীয়। নানারকম সুখাদ্যের সহিত আন্তরিক ভদ্রতার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি আমাদের জন্য একটী বর্মিনী চাকরাণী রাখিয়াছিলেন। মেয়েটির কর্মতৎপরতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আসিয়া একটি কথা বলিত না। কেবল কাজ করিত। আমাদের বিছানা তুলিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, আমাদের জুতা পরিষ্কার করিত, আমাদের কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া ইস্ত্রি করিয়া দিত। নীরবে আমাদের ফাই-ফরমাস শুনিত। তাহার এই নীরব নিপুণতা মুগ্ধ করিয়াছিল আমাদের। মনোজ-বাবুর গাড়িতে চড়িয়াই রেঙ্গুনের যাহা কিছু দ্রষ্টব্য তাহা দেখিয়াছিলাম। রেঙ্গুনের প্রধান দ্রষ্টব্য সেখানকার গোল্ডেন প্যাগোডা—যেখানে প্রকাণ্ড একটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত আছে। মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় একতলা বাড়ির সমান। শাদা মূর্তি। চোখ দুটি অদ্ভুত। সেদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় মূর্তিটি যেন জীবন্ত, এখনই কথা কহিবে। মনটা কেমন যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া যায়। প্যাগোডায় ছোট বড় অনেক মূর্তি আছে। প্রত্যেক মূর্তির সম্মুখেই ধূপ জ্বলিতেছে। এই প্যাগোডাই রেঙ্গুনের প্রাণ-কেন্দ্র। রেঙ্গুন শহরের মধ্যে যেখানেই যান—এই স্বর্ণ-প্যাগোডার চূড়াটি দেখিতে পাইবেন। এই প্যাগোডাকে কেন্দ্র করিয়া উহাদের হাটবাজারও বসে। তরিতরকারি মাছমাংস সব পাওয়া যায়। যে সব বর্মী বৌদ্ধ তাঁরা অহিংস বলিয়া মাছ, পাঁঠা, ভেড়া, মুর্গি, ছাগল, গরু কাটেন না। অবৌদ্ধদের পয়সা দিয়া কাটাইয়া নেন এবং পরে মৃত মাছ-মাংস বিক্রয় করেন এবং খানও। এক জায়গায় দেখিলাম—জমা-রক্ত ( Blood Clots ) বিক্রয় হইতেছে। উহা নাকি বর্মীদের নিকট সুখাদ্য। বর্মীদের পচা জিনিস খাইবার দিকেও একটা প্রবণতা আছে। পচা মাছ-মাংসও বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। রেঙ্গুনের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য ইরাবতী নদী। প্রকাণ্ড চওড়া নদী। স্বচ্ছ জল। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ওখানকার সভা। কলিকাতা শহরে ও রকম সভার কথা কেহ বোধ হয় ভাবিতেও পারেন না। টিকিট করিয়া সভা। টিকিটের দাম ১০.০০ হইতে ১০০.০০ পর্যন্ত। বিরাট 'হলে' সভা। সে 'হল'-এ দর্শকের এত 'ভীড়' যে অনেকে টিকিট কিনিয়াও স্থান পায় নাই। দাঁড়াইয়া আছে। এ রকম সভা বঙ্গবাসীরা কল্পনা করিতে পারে না। কারণ

তাহারা সব জিনিসই 'ফোকটে' করিতে চায়। ট্রেনেও টিকিট কাটিয়া চড়ে না অনেক সময়। আমি মূল সভাপতি ছিলাম। প্রবোধ সান্যাল ছিলেন সাহিত্য শাখার সভাপতি আর সঙ্গীত বিভাগে ছিলেন আব্বাসউদ্দীন। তিনি দ্বিতীয় দিন আসিয়াছিলেন এবং পল্লীগীতি গাহিয়া সভা মাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি পুলকিত হইলাম। বলিলেন—আপনার আমি একজন ভক্ত, আপনার সব বই কিনিয়া পড়ি। তাঁহার গাওয়া সব রেকর্ড আমি কিনিয়াছি, এ কথা প্রত্যুত্তরে বলিতে পারিলে আমার মুখরক্ষা হইত। কিন্তু মিথ্যা কথা বলিতে পারিলাম না। তবে আব্বাসউদ্দীনের পল্লীগীতির সত্যই আমি একজন ভক্ত। পল্লীগীতির মধ্যে তিনি প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেন। রেঙ্গুনে তাহার সান্নিধ্যলাভ করিয়া সত্যই বড় ভালো লাগিয়াছিল।

রেঙ্গুনে বহু প্রবাসী বাঙালী পরিবার আমাকে খাওয়াইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইলে আমাকে আরও কয়েকদিন রেঙ্গুনে থাকিতে হইত। তাহা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অধিকাংশ বাড়িতেই আমি যাইতে পারি নাই। একটা বাড়িতে কিন্তু যাইতে হইয়াছিল। সভা হইতে মোটরে করিয়া ফিরিতেছিলাম, একজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়া মোটর থামাইলেন। তিনি আমাকে বলিলেন—পাশেই আমার বাড়ি। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য আমাদের বাড়িতে চলুন। আমি বলিলাম, আমি কিন্তু কিছুই খাইব না। এখনই যাইতেছি। তিনি বলিলেন—আপনি শুধু একবার চলুন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার বাড়িতে গেলাম। তিনি আমাকে একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলাম একটি টেবিলের উপর একটি যুবকের ফটো রহিয়াছে। ফটোতে একটি মালাও রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটি ক্রন্দমানা মহিলাও রহিয়াছেন। ভদ্রলোক বলিলেন—এটি আমার ছেলের ফটো। সে আপনার খুব ভক্ত ছিল। সে রেঙ্গুনের বাহিরে গিয়াছিল, আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য, আজ তাহার আসিবার কথা। পথে কম্যুনিষ্ট গুণ্ডারা কাল তাহাকে খুন করিয়াছে। তাহার আত্মা হয়ত এখানে আসিয়াছে। তাই পাঁচ মিনিটের জন্য আপনাকে এখানে আসিতে বলিলাম। এই বলিয়া ভদ্রলোক হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সভা-প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করি। সভায় প্রায় একই ধরনের কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি হয়। নূতন বড় একটা কিছু থাকে না। আমি সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমার বক্তৃতা লিখিয়া লইয়া যাইতাম। আমার ভাষণগুলি দুইটি পুস্তকে

সঙ্কলিত হইয়াছে—'শিক্ষার ভিত্তি' ও 'মনন' গ্রন্থে। 'শিক্ষার ভিত্তি' ভাষণটি আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দিয়াছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে আমি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও চারটি বক্তৃতা দিয়াছিলাম। সেগুলিও 'দ্বিজেন্দ্র-দর্পণ' গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এমনই প্রবন্ধ কেউ পড়ে না, তাই প্রবন্ধ বড় একটা লিখি না। নাটকও অভিনীত না হইলে বড় একটা বিক্রয় হয় না। নাটক অভিনয় করাইতে হইলে যে শ্রেণীর লোকেদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিতে হয়, সে শ্রেণীর লোকদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সুযোগ বড একটা পাই নাই। চেষ্টা করিলে অবশ্য সুযোগ করিয়া লইতে পারিতাম, কিন্তু সে প্রবৃত্তিও হয় নাই। তবু আমি নিজের প্রেরণার তাগিদেই অনেক নাটক লিখিয়াছি। মনে যখন একটা গল্পের প্লট আসে তখন যে আঙ্গিকে লিখিলে তাহা সর্বোৎকৃষ্টভাবে বলা যায় আমি সেই আঙ্গিকেই লিখিয়াছি। এজন্য আমার অনেক গল্প নাটকের আঙ্গিকে লেখা, যদিও সে সব নাটক কচিৎ অভিনীত হইয়াছে। আমার অনেক গল্প অবশ্য সিনেমায় হইয়াছে। আমার শ্রী মধুসূদন এবং বিদ্যাসাগরের নকলে অনেকে মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত লইয়া নাটক লিখিয়াছেন। আমার সংলাপ এবং আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি অপহরণ করিয়া তাঁহারা কিছু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। মধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর ছাড়াও অনেক বডলোক এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও লইয়া উক্ত নাট্যকারগণ নাটক লেখেন নাই। কারণ প্রকৃত নাটক লিখিতে হইলে যে প্রতিভার প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের নাই। অপহরণের তাঁহারা সুদক্ষ। আমাদের দেশের এই প্রবৃত্তি দেখিয়া আমি আর জীবনী-নাটক লিখি নাই। ভাগলপুরে আমি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলাম এবং সেখানে আমার জীবন-ধারা প্রায় একই গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। ডাক্তারি, সাহিত্য এবং নিজের খেয়াল-খুশী লইয়া থাকিতাম। রোগীর চাপে ডাক্তারি করিতাম এবং প্রকাশকদের চাপে লিখিতাম। অনেক প্রকাশক আমাকে অগ্রিম টাকা দিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে শর্ত থাকিত পরবর্তী বই লিখিলে তাঁহাদের দিব। ইহার বেশী কোনও শর্তে আমি আবদ্ধ হই নাই। বেঙ্গল পাবলিশার্স আমার দুই ছেলের পড়ার খরচ মাসে মাসে দিতেন। তাহারা প্রেসিডেন্সী কলেজে I Sc. পড়িয়াছিল। তাহার পর একজন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ে, ইহার নাম অসীম। আমার ছোট ছেলে চিরঞ্জন শিবপুর কলেজে B. E. পড়িবার জন্য ভর্তি হয়। ইহাদের পড়ার খরচ বেঙ্গল পাবলিশার্স দিয়াছিল এবং সে সব টাকা বই লিখিয়া শোধ করিয়াছিলাম। ডি. এম. লাইব্রেরীর গোপালদাও আমাকে অনেক

টাকা অগ্রিম দিয়া অসময়ে আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার দুই মেয়ে কেয়া আর করবী। তাহাদের বিবাহ কলিকাতাতেই দিয়াছিলাম। তাহাদের বিবাহের খরচের অনেক টাকা গোপালদা দিয়াছিলেন। তাঁহাকেও বই দিয়াই সব টাকা শোধ করিয়াছি। টাকা শোধ করিতে হইবে এ চাপ যদি না থাকিত তাহা হইলে হয়তো আমি এত বই লিখিতাম না। শুনিয়াছি বিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস-লেখক স্কটও নাকি ঋণের চাপে পড়িয়া বই লিখিয়াছিলেন। তাগিদ না থাকিলে সত্যই বেশি লেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথকেও অর্থের তাগিদে বই লিখিতে হইয়াছে। আমি অবশ্য যা তা আবোল-তাবোল লিখিয়া আমার ঋণশোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমি করি নাই। আমি প্রতিটি বইতে নূতন স্বাদ পরিবেশন করিয়া ভালো বই লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। পারিয়াছি কি না তাহা মহাকাল বিচার করিবেন। আমার সমসাময়িক কালের বিচারে আমার তেমন আস্থা নাই, কারণ তাহা পক্ষপাতদুষ্ট হইতে পারে।

আমার এই জীবনচরিতে আমার পারিবারিক খবর বিশেষ দিই নাই। আমার লেখক-জীবনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছেন আমার স্ত্রী লীলাবতী। তিনি আমার অধিকাংশ পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠিকা। তাঁহার মনোমত হইলে আমি লেখা ছাপিতে দিতাম। না হইলে দিতাম না। এই বিষয়ে আমার আরও দুই বন্ধু সহায়ক ছিলেন—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় এবং অধ্যাপক গিরিধর চক্রবর্তী।

আমার পিতা আমার সাহিত্য লইয়া বিশেষ কোনও আলোচনা করেন নাই। শুধু আমার 'দ্বৈরথ' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—বইটি ভালো হয়েছে। আমার বাবার মৃত্যু হয়—১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে, বোধ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। তারিখটা ঠিক মনে পড়িতেছে না। বাবা তাঁর শেষ জীবনটা মনিহারীতেই কাটাইয়াছিলেন। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া এক বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। আমরা মাঝে মাঝে গিয়া দেখিয়া আসিতাম। তাঁহার শরীর একটু খারাপ হইয়াছে খবর পাইলেই আমরা সপরিবারে মনিহারী চলিয়া যাইতাম। মনিহারীতে বাবার যেরূপ সেবা-যত্ন হইয়াছিল ভাগলপুরে তাহা হওয়া সম্ভব ছিল না। মনিহারীতে আমাদের চাষের বাড়িতে অনেক চাকর, প্রচুর স্থান, শহরের গোলমাল নাই। আমার ভাই কালুর কিছুদিন আগেই বিবাহ হইয়াছিল। কালুর বউ বাসন্তী সর্বদা বাবার মাথার শিয়রে বসিয়া থাকিত। বাবার মৃত্যুর সময় আমি কাছে ছিলাম। মনে হইল একটা প্রদীপ যেন ধীরে ধীরে নিভিয়া গেল। বাবার এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া 'উদয়-অস্ত' উপন্যাসটি লিখিয়াছি। তাহাতে বাবার পুত্র-কন্যাদের চরিত্র-

গুলি কাল্পনিক। অন্যান্য চরিত্রগুলি কাল্পনিক নয়। বাবার মৃত্যুর সময়ই আ[
অনুভব করিয়াছিলাম আমরা কত বড় মহৎ ব্যক্তির সন্তান। সামান্য গ্রাম্য ডাক্[
ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এত লোকের হৃদয়-সিংহাসনে রাজকীয় মহিমায় আস[
ছিলেন তাহা আমরা জানিতাম না। তাঁহার শ্রাদ্ধে সাতদিন ধরিয়া লো[
খাইয়াছিল।

আমার ছেলেমেয়েরা যখন নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল আমরা তখ[
ভাগলপুরে একা হইয়া গেলাম। করবীর যখন বিবাহ দিয়া ভাগলপুরে ফিরিল[
তখন সেই শূন্য গৃহে আমাদের মন হাহাকার করিতে লাগিল। আমিও সাহি[
এবং ডাক্তারি একসঙ্গে আর চালাইতে পারিতেছিলাম না। তাই ঠিক করিলা[
একটা ছাড়িতে হইবে। ভাগলপুরে থাকিয়া ডাক্তারি ছাড়া যাইবে না। তাই ঠি[
করিলাম—ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিব। আমার দুই মে[
কলিকাতায় থাকে, দুই ছেলেও কলিকাতায় বা কলিকাতার আশেপাশে থাকে[
আমাদের এই বাসনা ফলবতী হইতে অবশ্য বিলম্ব হইয়াছিল। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে[
মাঝামাঝি ( জুন মাসে ) আমি ভাগলপুর ত্যাগ করি। ভাগলপুরবাসীরা আমাকে[
যে কত ভালবাসিয়াছিল তাহার প্রমাণ তখন পাইয়াছিলাম, নানা সভায় এ[
যেদিন চলিয়া আসি সেদিন স্টেশনে লোকের ভীড় দেখিয়া।

ভাগলপুরের বাড়িটি আমি বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিলাম এবং সেই টাকা দি[
লেকটাউনে বাড়ি কিনিয়াছি। কিনিবার আগে কিছুদিন একটি ভাড়াটে বাস[
ছিলাম। তখন অনুজ সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ আমাকে খুব সাহা[
করিয়াছিল। এ সময় তাহারই সাহায্যে কলিকাতায় আসিয়া তাহারই বাড়ি[
নিকট একটি বাসা ভাড়া লইয়াছিলাম মাসিক ছয়শত টাকা ভাড়া দিয়া। কুমারে[
সর্ববিষয়ে আমার সাহায্য করিয়াছিল। সর্ববিষয়ে সে আমার এখনও সহায়ক[
সজনীর স্থান এখন কুমারেশই অধিকার করিয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া আমি অলস হইয়া থাকি নাই। ছবি আঁকিয়াছি এব[
লিখিয়াছি। ভাগলপুরেও আমি ছবি আঁকিতাম। কিছু কিছু প্রকাশিত[
হইয়াছিল। এখানে আসিয়া বেশ কিছু ছবি আঁকিয়াছি। আমাকে তেলরঙে[
ছবি আঁকিতে শিখাইয়াছিল বন্ধুবর হরিপদ রায়। সে একজন উঁচুদরের শিল্পী[
ছিল। সে আর ইহলোকে নাই। নানারকম লেখা লিখিয়াছি কলিকাতা[
আসিয়া—ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ব্যঙ্গ রচনা, রম্য রচনা, সবরকম[
সভাপতিত্বও করিয়াছি অনেক সভায়। এখানে অনেক ভালো লোকের স[

আলাপ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আমাদের দাদা ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত; অধ্যাপক ডঃ স্কুমার সেন, ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ডাক্তার বিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবিবাসর', 'পুর্ণিমা সম্মেলন' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যরা, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদার, শ্রীযুক্ত তারাপদ সাউ, নাট্যকার মন্মথ রায়, লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার রচনাবলীর প্রকাশক শ্রীমান নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সম্পাদক ডঃ সরোজমোহন মিত্র, লেখক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উদ্বোধনের স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, কল্যাণীর শ্রীমান জয়দেব মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেক মনীষী আলোকবর্তিকার ন্যায় আমার জীবন-সন্ধ্যাকে আলোকিত করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

কলিকাতায় আসিবার পর আমার অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ছ-খণ্ড 'মর্জিমহল' ( ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ ), 'রঙ্গতরঙ্গ', 'অসংলগ্না', 'সন্ধিপূজা', 'আশাবরী', 'নবীন দত্ত', 'প্রথম গরল', 'কৃষ্ণপক্ষ', 'তুমি', 'রূপকথা ও তারপর', 'বৌরব', 'ত্রি-নয়ন' ( ঠুংরি, চ-বৈ-তুহি এবং কৈকেয়ী—এই তিনটি একাঙ্ক নাটক এই পুস্তকে আছে ), 'বহুবর্ণ', 'সাত সমুদ্র তেরো নদী', 'লী', 'বনফুলের নূতন গল্প' প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আমি 'চূড়ামণি রসার্ণব' লিখিয়াছি—'যষ্টিমধু' পত্রিকায়। 'পাপড়ি' লিখিয়াছি উর্দু 'শের' কবিতার ধরনে—অনেক পত্রিকায়। আমি কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি 'অলংকারপুরী' উপন্যাসও লিখিয়াছি। 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' নামক একটি উপন্যাসও লিখিয়াছি। এটিও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য একটি রূপকথা। তা ছাড়া 'মর্জিমহল' লিখিয়াছি ছয়-খণ্ড। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার বড় দৌহিত্রী উর্মি আমাকে একটি চমৎকার ডায়েরি উপহার দিল। বলিল—দাদা, তুমি এবার ডায়েরি লেখ। তাহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে 'মর্জিমহল' লিখিতে শুরু করিলাম। একখণ্ড 'মর্জিমহল' গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে। 'যষ্টিমধু' পত্রিকায় 'দ্বিতীয় খণ্ড' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এই 'মর্জিমহল' বর্তমান জীবনের পটভূমিকায় আমার নানা মেজাজ, নানা আমেজ, নানা খুশী, অখুশী, নানা খামখেয়ালির আলেখ্য। এক হিসাবে এটা আমার জীবন-চরিতেরই একটা অংশ, যদিও তাহা ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা। এগুলি পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ঢুলু আমার 'অগ্নীশ্বর' বইখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করিয়াছে। বইটি রসিকমহলে খুব সুখ্যাতি অর্জন

করিয়াছে। এদেশে গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল গোছের কয়েকটি স্বয়ম্ভু প্রাইজ-দাতা প্রতিষ্ঠান আছেন, তাহাদের সভ্যেরা তদ্বির-প্রভাবিত, স্তাবক-তোষক সবজান্তা জাতীয় লোক। 'অগ্নীশ্বর' তাঁহাদের প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই ' শৃগাল, কুক্কুর, গরু, ভেড়ারাও বইটি সম্বন্ধে নীরব। দেশের রসিকসমাজ কিন্তু বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ঢুলু এখন আমার একটি প্রহসন 'মন্ত্রমুগ্ধ' চিত্রে রূপ দিতেছে। কেমন হইয়াছে এখনও দেখি নাই।

হঠাৎ আমার জীবনে এই সময় একটি নিদারুণ বজ্রাঘাত হইল। ২৭শে জুলাই ১৯৭৬ সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের সময় লীলা চিরতরে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। সেদিন মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাহার সহিত আমার ক্বচিৎ ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। সে আমার সহধর্মিণী ছিল, সহমর্মিণী ছিল। আমার সাহিত্য-জীবনের নেপথ্যে লীলাবতী যে কি ছিল, তাহা সাধারণ লোকে জানে না। বর্ণনা করিয়া বুঝাইবারও উপায় নাই। আমার ন্যায় খামখেয়ালি পাগলকে দিয়া সে যে কী মন্ত্রবলে সাহিত্য-সৃষ্টি করাইয়াছে তাহা জানি না। সংসারের কোনও আঁচ সে আমার গায়ে লাগিতে দেয় নাই। আমার প্রতিটি রচনা সে আগ্রহভরে পড়িত, কোথাও ছন্দপতন হইলে দেখাইয়া দিত। আমার সমস্ত রচনার সে-ই ছিল প্রথম পাঠিকা, প্রথম সমালোচক। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল তাহার। রস-বোধও ছিল নিখুঁত। তাহার পরামর্শে আমি অনেক লেখার অনেক অদল-বদল করিয়াছি। তাহার উপর বড় নির্ভর ছিল। এখন সে নির্ভর চলিয়া গেল।

প্রায় বছরখানেক আগে হইতে পক্ষাঘাত রোগ তাহাকে ধীরে ধীরে আক্রমণ করিতেছিল। কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকরা তাহার চিকিৎসা করিতেছিল। কোন ফল হয় নাই। গত কয়েক মাস সে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। কথা পর্যন্ত বলিতে পারিত না। এ সব রোগ সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দশ, বারো, চোদ্দ, এমন কি কুড়ি বাইশ বছর এ রোগে ভুগিতেছে এ রকম অনেক খবর আমি জানি। লীলা পুণ্যবতী ছিল, ভগবান তাহাকে বেশি কষ্ট দেন নাই। তাহার বাল্যকাল শ্রীশ্রীসারদামায়ের কাছে কাটিয়াছিল। তিনিই সস্নেহে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। আমি কিন্তু বড়ই অসহায় হইয়া পড়িলাম।

কাহার কাছে নিজেরে বল
আনিয়া দিব সাঁঝে

নিজেরে ফের খুঁজিয়া পাব
এবে কাহার মাঝে।

বিরাট একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছি। জানি না তাহা আর পূর্ণ হইবে কিনা। তাহা আর পূর্ণ হইবে না।

বই এবার শেষ করি।

পরিশেষে একটি কথাই নিবেদন করিব। তাহা বাঙালী পাঠক-পাঠিকা-সমাজের উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ অভিবাদন। আমার লেখার প্রতি তাঁহাদের একান্ত আগ্রহ না থাকিলে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্য-সেবা করিতে পারিতাম না। তাঁহাদের বহু পত্র, বহু অভিনন্দন, বহু বিচিত্র সান্নিধ্য আমাকে শুধু পুরস্কৃতই করে নাই, আমাকে নিত্য-নব গ্রন্থ-প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহাদের লেখা কিছু পত্র 'যষ্টিমধু' পত্রিকায় অনেকদিন ধরিয়া 'চিঠির বোঝা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই 'বোঝার' গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিশিষ্টে দিবার ইচ্ছা রহিল।

—শেষ—

# পরিশিষ্ট

## বনফুলকে লেখা বিভিন্ন সাহিত্যিকদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

( ১ )

৩৮, নীল ক্ষেত রোড,
পোঃ রমনা, ঢাকা
৭।৪।১৯৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র ও পরে স্বহস্তের উপহার পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমার কবিতা (স্মরগরল) আপনার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম।

আপনার লেখা—বিশেষতঃ গত কয় বৎসরের গদ্য ও পদ্য রচনা, আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি, এবং সত্যকার প্রতিভার পরিচয়ে শুধুই যে মুগ্ধ হই, তাহা নয়, বাংলা সাহিত্যের এই অতিশয় দুর্গতির দিনে আপনার লেখায় যে সত্যকার সাহিত্যিক প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই, তাহাতে আশ্বস্ত বোধ করি, অর্থাৎ বুঝি যে বাংলা দেশে এখনও সাহিত্যের প্রেরণা মরে নাই। আপনার সম্বন্ধে আর একটা কথা এই যে আপনার রস-দৃষ্টি শুধুই খাঁটি নয়—গভীর, আপনার ভাষা এবং ছন্দ ও মিলের ক্ষমতা যেমন বাণী-সাধনার সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট প্রমাণ (সাহিত্যিক প্রতিভার উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন) তেমনই আপনার কল্পনা ও ভাবুকতা, জীবন রস-রসিকতা ও কবিত্ব উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হয়। আরও মনে হয় আপনার কবিমানস ও কবিশক্তি বয়সের সহিত বৃদ্ধি পাইতেছে, অর্থাৎ অনেকের মত দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া নির্বাণোন্মুখ নহে। আপনার শিখা আরও স্থির, এজন্য আশা করা যায় পূর্ণদীপ্তির এখনও বিলম্ব আছে। এই সকল কারণে এবং রচনার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে এবং উৎকর্ষের পরিচয়ে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রার্থনা করি, দীর্ঘায়ু হইয়া এবং উত্তরোত্তর শক্তিমান হইয়া আপনি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করুন।

আপনার নূতন পুস্তক 'বৈতরণীর তীরে'[১] প্রায় অর্দ্ধেক পড়িয়াছি। গল্পের কৌশলটি খুব মৌলিক না হইলেও চমকপ্রদ। কল্পনার ভঙ্গীতে ও রস-সৃষ্টির আদর্শে লেখকের উচ্চাকাঙ্খা প্রকাশ পাইয়াছে—আরও প্রকাশ পাইয়াছে বাস্তব

সংসার ও সমাজের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। ছোট খাঁচায় বড় পাখীর পাখা ঝাপ্‌টানীর যে রক্তারক্তি—মনুষ্য জীবনের সেই চিরন্তন ট্র্যাজেডি, প্রকৃতিশাসিত পুরুষের দুর্দশা, মূঢ় প্রবৃত্তি ও অমৃতের আকাঙ্খা এই উভয়ের দ্বন্দ্ব—Swinburne-এর ভাষায়—

Remembrance fallen from Heaven,
And Madness risen from Hell—
o o o
In his heart is a blind desire,
In his eyes foreknowledge of death,

সেই মহাকাব্যের ভাববস্তুকে আপনি কৌশলময় ভঙ্গীতে এই গল্পের মধ্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আপনার ভাববস্তু যত বড়, এবং কল্পনাকে যত ঊর্ধ্বে তুলিতে চাহিয়াছেন কথাবস্তু তাহার সমান নহে। এই রচনাটিতে আপনার রসদৃষ্টি ঊর্দ্ধগ হইবার চেষ্টা করিলেও, তাহা রসাস্বাদ অপেক্ষা তীব্র অনুভূতির ক্ষেত্রেই আবদ্ধ হইয়া আছে। রচনাটি যদি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইত (dramatic poetry), তবে বোধ হয় রচনা আরও গাঢ় হইতে পারিত, এত sentimental হইত না। পদ্যের একটা সুবিধা এই যে rhythm ও rhyme-এর কঠোর শাসনে প্রবলতর ভাববস্তু যেন পুষ্টপাকে গাঢ় ও গভীর হইয়া উঠে। আমার মনে হয়: আপনার রসদৃষ্টি ও কবিপ্রেরণায় কোনও দোষ নাই—form বা প্রকাশভঙ্গীই যথাযথ হয় নাই, অর্থাৎ দেহ ও আত্মার মিলন ঘটে নাই। রচনাটিতে যেমন কল্পনা শক্তির পরিচয় আছে, তেমনই প্রকাশ কৌশলে ত্রুটি আছে; অথবা রচনাটিতে কুশলতা অপেক্ষা কৌশল অধিক হইয়াছে। আপনি নিজে একজন উৎকৃষ্ট সাহিত্যরসিক এবং আর্টিষ্ট, অতএব আমার সমালোচনায় যদি কোনও সত্য থাকে তাহা আপনিই বুঝিবেন। নিজে Neurasthenia-র রোগী, বর্তমানে দেহ মন আরও দুর্বল, এজন্য নিজের উপর বিশ্বাস নাই।

আমি এখনও খুব দুর্বল—Chronic Bronchitis, তার উপর Neurasthenia, এবং তারও উপরে Pneumonia এবং বয়সও অনুকূল নহে। এ সকলের উপরে আমার একটি শিশুপুত্র গত ২/২॥ মাস যাবৎ Nephrites-এ ভুগিতেছে, তাহাকে লইয়া বড়ই বিব্রত ও উদ্বিগ্ন আছি; এজন্য সাহিত্যচর্চা ত' একেবারে বন্ধ আছে, বহুদিন কাহাকেও পত্র লিখি নাই, উত্তরও দিই নাই। সজনীবাবুর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির বলে 'মরলগরল' প্রকাশিত হইয়াছে—সে কীর্তির যশ বা অযশ

তাঁহারই প্রাপ্য। কবিতাগুলি কাহার কেমন লাগিল, সাহিত্যসমাজে তাহার কোনও আলোচনা হইল কি না, পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইল কি না—প্রভৃতি কোনও চিন্তাই আমার আর নাই। অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না—যাহা লিখিয়াছি তাহাই গ্রন্থাকারে রাখিয়া যাইতে পারিব না, ইহাই দুঃখ, কারণ আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে বলিয়াই বিশ্বাস করি।

আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও স্নেহ সম্ভাষণ জানিবেন। সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া বাংলাসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করুন। আপনার সকল পুস্তকই আমাকে পাঠাইবেন। 'তৃণখণ্ড'[৩] পাই নাই। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ২ )

ঢাকা

প্রীতিভাজনেষু, ৩।৫।৩৭

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি যাহা লিখিয়াছেন[৪] তাহা আপনারই উপযুক্ত। আমাকে আপনারা যেটুকু শ্রদ্ধা করেন—তাহাতে আপনাদের সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় পাই, তাহাই আনন্দের বিষয়।

আপনার নূতন বইখানি[৫] ইতিমধ্যে শেষ করিয়াছি। বইখানির কল্পনা ও রচনাভঙ্গিতে যথেষ্ট শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ আছে। কাঁচা emotion বা বাস্তব হৃদয় সংবেদনা বইখানির একমাত্র Content বা উপাদান বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে যে Criticism বা অন্তর্দৃষ্টি আছে—অনুভূতির সেই সজ্ঞানতা রসাবেগের সহিত যুক্ত হওয়ায় এক প্রকার কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে। রচনায় subjectivity-র মাত্রা খুব থাকায় একটা lyric আবেগই প্রবল হইয়াছে। এই জন্যই পূর্বে[৬] বলিয়াছিলাম—এ বস্তু কাব্যছন্দেই আরও রস-ঘন হইয়া উঠে। বইখানির মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে pessimism ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে প্রাকৃত জনসুলভ অর্থাৎ 'realistic' attitude-ই প্রকাশ পাইয়াছে—কবিপ্রাণ বাস্তবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে—দেহে ছুরির আঘাতের মত—মনের উপরে জীবজীবনের গ্লানি ও দুঃখ গভীর কশাঘাত করিয়াছে। এই আঘাত, এই বেদনা দেহ-মনের ক্ষেত্রে সত্য—এবং ইহাকে এমন করিয়া কাব্যের আকারে অর্থাৎ বাঙ্ময় করিয়া প্রকটিত করা এক-প্রকার কবি-শক্তি বটে। কিন্তু যে সূক্ষ্মতর চেতনার ক্ষেত্রে আমরা 'রস' আস্বাদন

করিয়া থাকি, সে ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। যে Beauty সমস্ত অসুন্দর ও অপ্রীতিকরকে অতিক্রম করিয়া, অথচ আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে তাহাকে উপলব্ধি করা বা আস্বাদন করা সকল উৎকৃষ্ট কাব্যের মূল প্রেরণা ও অভিপ্রায়। Palace of Art রচনা করিয়া বাস্তব জীবন ও জগৎকে দূরে রাখিয়া এই রস আস্বাদন করিতে হয়—এমন কথা সত্য নয়। এই জগৎই কবির গভীরতর চেতনায় রূপান্তরিত হয়—রসাস্বাদনকালে পাঠকের আর এক জগতে জাগরণ ঘটে, মৃত্যুবিষমূর্চ্ছিত এই প্রাণই অমৃত সাগরে সন্তরণ করে; এই জন্যই কাব্য এত বড়, কবি এত বড়। প্রাকৃত জনমনের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ ও মনঃকল্পিত যে জগৎ তাহাই মিথ্যা, কারণ, দুঃখ ও সুখের দ্বন্দ্ব তাহাকে ক্রমাগত বিক্ষিপ্ত ও বিরূপ করিয়া রাখে। কিন্তু কবির experience—perfect experience একটি অপূর্ব সঙ্গীত-সঙ্গতে তাহাকে সম্পূর্ণ বা perfect করিয়া তোলে। চরম দুঃখ ও পরম সুখ ইহার কোনটাই যে সত্য নয় এমন কি এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও মূল যে এক—ব্যক্তি চেতনার অতি সংকীর্ণ আত্মপ্রীতি, একথা আমরা বুঝি—কিন্তু বাস্তব অভিভূত চেতনা ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। আপনিও তাহা পড়ুন, কিন্তু হৃদয়-রক্তের তাড়নায় আপনার কবি-শক্তি এই গ্রন্থে তাহার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে। সাধারণ মানুষ—যাহারা 'রসিক' নয়, তাহারা তাহাদের দেহ-মনের নিম্নভূমিতে এইরূপ প্রবল 'ভাব' অনুভূতিকেই সত্যকার কাব্যগুণ মনে করিয়া আশ্বস্ত হইবে—আপনাকে 'দরদী' কবি বলিয়া অভিবাদন করিবে—দুঃখ ভাষা পাইয়াছে বলিয়া সুখী হইবে।

এ কালের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাসনা করে—ধর্মবিশ্বাসের মতই খাঁটি কাব্য-কল্পনায় আস্থা আর নাই। আগেকার কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য হইত 'tragedy'; এই tragedy-তে যে রস ঘনীভূত হইয়া উঠিত, তাহা সম্ভব হইত না, যদি কবির কবি-চৈতন্যের মধ্যে একটা বৃহত্তর আশ্বাসের আনন্দ না থাকিত। এই আনন্দ আত্মার সম্পদ—দুঃখকে দেহ-মনের দ্বারা এমন তীব্রভাবে অনুভব করার কারণ তখন ঘটে নাই; মনের নিরাশ্বাস এমন করিয়া আত্মার আনন্দকে স্তম্ভিত করে নাই। তাই দুঃখ তখন রসেরই উপাদান হইয়া উঠিত। আজিকার কাব্যে তাহা হয় না। Hardy[৭]র উপন্যাসই এ যুগের চরম tragedy—Pessimist Schopenhauer-এর Philosophy তাহার ভাব-সত্যকে দুষ্প্রধর্ষ করিয়াছে। এমন Philosophy তাহার মূলে আছে বলিয়া Hardy-র উপন্যাসে এক অপূর্ব রসসৃষ্টি হইয়াছে—মানুষের অতি জাগ্রত বিচারশীল মনকে আশ্রয়হীন করিয়া

শূণ্যবাদের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া, হাহাকারকে স্তম্ভিত করিয়া, সুখদুঃখহীন অথচ আনন্দহীন এক অদ্ভুত অনুভূতির উদ্রেক করে। Art-এ pessimism ইহার ঊর্ধ্বে এখনও উঠিতে পারে নাই। তথাপি Hardy-র উপন্যাসগুলিতে perfect experience-এর রস-পরিণাম নাই—প্রকাণ্ড denial আছে, fulfilment নাই এবং তাহা না থাকিলে অমৃতপিপাসু মানুষেব আত্মা কখনও পরিতৃপ্ত হইবে না।

আপনার কাব্যে রসসৃষ্টির সকল চেষ্টা আছে—দুঃস্বপ্নগুলিকে সাজাইবার কৌশল এবং ভাবেব সুবসাম্য ও সুর বৈচিত্র্য বিধানের প্রযাস। উভয়ই একটি বিশিষ্ট শিল্পী-মনের পরিচয় দিতেছে। লেখাগুলিতে আপনাব ভাবদৃষ্টি, বিচারবুদ্ধি, সহৃদয়তা ও রচনাশক্তি একাধারে মিলিত হওয়ায় সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালী জীবন বা চরিত্রেব যে সকল আলেখ্য আপনি এইসকল লেখায় ধরিয়া দিয়াছেন তাহাতে যে ভাবনা কল্পনা ও আন্তরিকতা বা সত্যানুভূতিব প্রমাণ রহিয়াছে—বসবোধেব ও বিরস-বেদনাব যে যুগপৎ অভিব্যক্তি আছে, তাহা লেখক হিসাবে আপনাব ব্যক্তিত্বকে সুপবিস্ফুট করিয়াছে। এই sty e আপনাব নিজস্ব, এই জন্যই আধুনিক সাহিত্যে আপনাব দানের মূল্য আছে।

আপনার আরও দুইখানি বই[৮] ইতিমধ্যে পৌঁছিয়াছে—সেজন্য ধন্যবাদ। বই দুইখানি পডিয়া ফেলিয়াছি। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তৎসঙ্গে একটি অতিশয় ভাবপ্রবণ sensitive মন—আপনার লেখাগুলির মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে—গদ্য ও পদ্য দুইএর দ্বন্দ্ব লেখকের মানস প্রকৃতিকে প্রাঞ্জল করিয়া তুলিয়াছে। লেখাগুলির মধ্যে সর্বত্র আপনার মনঃপ্রাণ উন্মুক্ত হইয়া আছে, আর্টের সূক্ষ্ম আবরণ না থাকিলে এগুলিকে একেবারে আপনার Journal বা diary বলা যাইত। ভাব প্রবণতার সঙ্গে যে কল্পনাশক্তি ও রস চেতনা উন্মুখ হইয়া আছে তাহাতেই স্থানে স্থানে অতি উচ্চাঙ্গেব রসসৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি মনে হয়, আপনাকে আরও উপরে উঠিতে হইবে—জীবনকে আরও "Steadily and as a whole" দেখিবার সাধনা করিতে হইবে—টুকরাগুলিকে না গাঁথিয়া কেবলমাত্র চয়ন ও গ্রহণে যে দৃষ্টিশক্তি ও কলা কৌশল আছে তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া জীবনকে কেবল স্থান কাল পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ না দেখিয়া, তাহার মূল রহস্যে অনুপ্রাণিত হইয়া স্থান কাল পাত্রকেই আশ্রয় করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রম করিয়া একটা বৃহত্তর সত্যতর ও সুসঙ্গত রসজগৎ সৃষ্টি করিতে হইবে—একটা খুব বড় plan বা plot-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, একটু দূরে সরিয়া

দাঁড়াইয়া, একটা panoramic view প্রকাশিত করিতে হইবে—এক কথায় আপনাকে উপন্যাস লিখিতে হইবে। যে দৃষ্টি বা রসচেতনার প্রমাণ আপনার লেখায় আছে কিন্তু সাধনার সে সময় আপনার নাই, তাই আপনার মনের শিল্প-সাধনায় একটা বড় কিছু গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না—সদ্যতপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহফলকে হাতুড়ির দুই চারিটা দৃঢ়-মুষ্টি আঘাতে যাহা গড়িয়া উঠে তাহাই আপনি দান করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আমার আশা আছে আপনার সৃষ্টিশক্তি বৃহত্তর কীর্তির অপেক্ষা করিতেছে।

'তৃণখণ্ড' পড়িলাম—এক নিঃশ্বাসে। পড়িবার সময়ে শীঘ্র শেষ না হয় এই ইচ্ছাই প্রবল হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে লেখকের 'আত্মচরিত' বা আত্ম-পরিচয় যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই বইখানি এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রত্যেক বাস্তব বহির্জীবনের সঙ্গে লেখকের একজন অতিশয় আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বশালী Cultured soul-এর যে সংঘর্ষ, তাহাই এই বইখানির আসল কথাবস্তু। 'বৈতরণী তীরে' ও 'তৃণখণ্ড' একই বস্তু, একটিতে দিন ও অপরটিতে রাত্রির ভাবনা আছে। বনফুলের গল্প' গুলিতে লেখক নিজে একটু আড়ালে থাকায় রস আরও জমিয়াছে। গল্পগুলির কয়েকটিতে গূঢ়তর রসসৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ কেবল সুখ-দুঃখের পরিমাণ, বা ভাল মন্দ বিচারের যে ভাবুকতা Cynical, Satirical বা Humourous কল্পনা নয়—এগুলিতে লেখকের অনাসক্তি বা কঠিন আত্মসংযম আছে; মানুষকে দায়ী করা নয়,—জীবন বিধাতার নির্মম রসিকতাকেই ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'যুগল স্বপ্ন', 'বল হরি হরিবোল', 'ভৈরবী ও পূরবী', 'খেঁদি' প্রভৃতি এইরূপ রচনা। Thomas Hardy-র 'Life's Little Ironies' মনে পড়ে—তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ আপনার এই গল্পগুলি।

চিঠি বড় হইয়া গেল—একদিনে লিখি নাই। বড় দুর্বল, লিখিবার সামর্থ্য আর নাই। তবু আপনার লেখা ভাল লাগে, আপনার মধ্যে শক্তির পরিচয় পাই বলিয়াই; এবং আপনি শুধু শক্তিমান ও সত্যবান সাহিত্যিক বলিয়াই অনেক কিছু লিখিলাম, যদি আপনার কাজে লাগে। সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ আপনার কিছু কিছু পড়া উচিত। দুইখানি গ্রন্থ আপনাকে পড়িতে বলি :—'Fedor Dostoievoski' by Middleton Murry এবং ঐ একই লেখকের 'Discoveries'। শেষোক্তখানি আমি সম্প্রতি শেষ করিয়াছি; এ রকম বই আপনাদেরও পড়া দরকার।

আমার শরীর পূর্ববৎ। ছুটি আরম্ভ হইয়াছে—একটু বিশ্রামের আশা

করিতেছি। কিন্তু রোগ ত' শুধু শরীবের নয়—জন্মগত মানস-ব্যাধিও আছে, লেখাপড়া একেবারে ত্যাগ করিতে পাবি না; তা ছাডা. নানা দিক থেকে অনুবোধ ও আবদার আছে। অথচ মস্তিষ্ক বড দুর্বল। ছেলেটিকে[৯] লইয়া আবও উৎকণ্ঠি · ও বিব্রত আছি। Chronic দাঁড়াইয়াছে কোনো কিছুতেই কমিতেছে না, বি করি বলুন ত?

আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও আন্তরিক শুভ কামনা জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

আপনার—

শ্রীমোহিতলাল মজুমদাব

( ৩ )

৩৮, নীলক্ষেত বোড,

রমনা, ঢাকা

১৯।৫।৩৭

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। ছেলেটার অসুখ এখন Chronic হ'যে দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তারী চিকিৎসায় কিছু হ'ল না, তাই কবিরাজী কবাইতেছি।

আপনার 'ভূয়োদর্শন'[10] আমি বরাবব পড়িয়া থাকি, লেখাগুলি খুব উপভোগ্য হইতেছে। সাহিত্য সৃষ্টির মূল উপাদানই experi nce—এই exnerience নানা ভঙ্গীতে মনকে ধাক্কা দেয়—যেখানে তাহা চিন্তালেশশূন্য ভাবাবস্থা রূপে প্রত্যক্ষ গোচর হয়, সেইখানেই খাঁটি কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয—এই ভাবাবস্থাই 'রস', Vivid and actual experience হইতেই রসোদ্রেক হয়। যেখানে তাহা না হইযা ভাব ও চিন্তা উভয়ের মিশ্রণ ঘটে, সেইখানেই এই জাতীয় রচনার উদ্ভব হয়। এগুলিও রসসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত—Essay বটে, কিন্তু critical নয় creative। ইংরাজী সাহিত্যে ইহার বিস্তর নিদর্শন আছে। ইহাও একটি বিশিষ্ট literary form—এবং আমার মনে হয় আপনার সাহিত্যিক প্রকৃতির অতিশয় স্বাভাবিক প্রয়োজনবশে এইরূপ form ধরা দিয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন যে একখানি নূতন নাটকও ইতিমধ্যে শেষ করিয়াছেন। এ সকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে এ সময়ে আপনার literary activity প্রবলতম হইয়া উঠিয়াছে—আপনার মধ্যে সত্যকার প্রকাশ-ব্যাকুলতা নানা ভঙ্গীতে পথ খুঁজিতেছে। খুবই আনন্দের কথা। 'ভারতবর্ষে' আপনার 'দ্বৈরথ' এবার শেষ হইল, আমি সব সংখ্যাগুলি পড়ি নাই।

প্রথম দুই instalment পড়িয়া খুব ভাল লাগিয়াছিল। আশা করি ভালই হইয়াছে। সম্পূর্ণ পড়িলে আপনাকে জানাইব।

আমার 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য' আপনাকে একখানি পাঠাইব। উপস্থিত খোঁজ করিয়া জানিলাম বাঁধান কপি (প্রায় দেড়শত) ফুরাইয়াছে। আর কতকগুলি বাঁধা হইলেই আপনাকে একখানি পাঠাইব। আমার আর একখানি ঠিক ঐ আকারের গ্রন্থ ছাপা হইতেছে—Indian Press ছাপাইতেছে, নাম—'সাহিত্য-কথা'। এই বইও ছাপা হইলে আপনাকে উপহার পাঠাইব।

আপনাকে একটি কথা না লিখিয়া পারিলাম না। আমার ফুলের নেশা আছে—এ নেশা সাহিত্যের নেশাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। অনেকদিন হইতেই শুনিতেছি, ভাগলপুরে এক ভদ্রলোকের (অনাদিবাবু—?) খুব ভাল Chrysunthemums সংগ্রহ আছে। তিনি কি বিক্রয় করেন? আমার কয়েকটি খুব বাছা variety-র চারা অন্ততঃ ২ ডজন হইলে ভাল হয়। খুব বড় ফুল globulas (Chinese) Gold, Pink, Red ও Flesh এবং White—এই কয় রঙের খুব শক্ত ও সুস্থচারা আপনি আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন? খরচ যাহা লাগে দিব।

আজ এই পর্যন্ত। আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ৫ )

ঢাকা

২০শে জুন, ১৯৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

বহুদিন হইল আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি—এখনও পর্যন্ত উত্তর দিতে না পারায় লজ্জিত আছি। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মানসিক উদ্বেগের জন্য কিছুতেই আর উৎসাহ বোধ করি না। সময়ে সময়ে এমন অবসাদগ্রস্ত হই যে সামান্য লেখাপড়ার কাজও দুঃসাধ্য বোধ হয়।

আপনি আমার কথামত Chrysunthemum-এর খোঁজ করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি ইতিমধ্যে দেওঘর হইতে কিছু চারা

পাইয়াছি—এ জন্য এবং ও সম্বন্ধে পূর্বেকার উৎসাহ ক্ষীণ হওয়ায়, আমি উপস্থিত আর অধিক চাই না। আপনাকেও আর কষ্ট করিতে হইবে না।

এ মাসের 'ভারতবর্ষে' আপনার 'রূপান্তর' নাটকের প্রথম কিস্তি দেখিলাম—অতি সামান্যই বাহির হইয়াছে। উহা হইতে গল্পটিকে রূপান্তরিত করিবার, নূতন করিয়া সাজাইবার, চরিত্রগুলিকে পুনঃ সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় বেশ বোঝা যাইতেছে; কিন্তু নাটকীয় actionটি কেমন দাঁড়াইবে তাহার আভাস ভালো পাওয়া যায় না। এজন্য এখন কিছু বলা মুস্কিল। তবে আশা হয় আপনার হাতে একটা নূতন ধরনের রস-রূপ ওই পুরাণো গল্পটিতে ফুটিয়া উঠিবে। অর্থাৎ, গল্পের সূত্রটি মাত্র ছাড়া নাটকখানি আপনার একখানি মৌলিক রচনা হইয়া দাঁড়াইবে। চরিত্রগুলির মধ্যে নায়ক হোসেনের চরিত্র সম্ভবত একটা বিশেষ কিছু হইয়া উঠিবে—উহার মধ্যে একটু অভিনবত্ব ও গভীরতা ইতিমধ্যেই আভাসিত হইয়াছে। আমার মতে কোন নাটকই গল্পের মত ক্রমশঃ প্রকাশ হওয়া উচিত নয়—উহাতে নাটকখানি বারবার উচ্ছিষ্ট হয় মাত্র, শেষপর্যন্ত ভুক্ত হওয়া ঘটে না। পড়িয়া যে ধরনের উপভোগ তাহা বাধা পায়—, পাঠকের চিত্তে উহার সম্পূর্ণ রসরূপ ধরা পড়ে না—অতএব নাটকখানি পাঠ্যরূপে 'বিফল প্রেরণা' হইয়া দাঁড়ায়। তারপর যখন উহার অভিনয় হয়, তখন উহার প্রকৃত পরিচয় লাভ ঘটে। একথা অবশ্যই সত্য যে, কোন নাটকই অভিনয় না হওয়া পর্যন্ত নাটকই নয়, তথাপি পাঠ্য নাটক বা closet drama হিসাবেও তাব যে আর এক ধরনের রস-সংবেদনা আছে তাহাও একবারে না পড়িলে ব্যর্থ হয়, এজন্য আমি আধুনিক মাসিকপত্রের এইরূপ piecemeal বা কিস্তিবন্দি নাটকের বিরোধী। নাটক উপন্যাস নয়, উহা মুখ্যত একটা action বা ঘটনা-ঘটিত আখ্যানরস; স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে কাল বা কার্য-কারণের দ্রুত অনুবন্ধই উহার প্রাণ; এই কালগত অখণ্ডতাই বিশেষ করিয়া নাটকীয় রসাস্বাদনের সহায়; এই জন্যই এক কালের নাট্যাচার্যগণ unity of time-র উপরে কত জোর দিয়াছিলেন—অবশ্য ততটা unity বজায় রাখিতে হইলে নাটকের action বড় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, এজন্য উত্তরকালে এই unity-র নিয়ম রক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। তথাপি action গত কালের অখণ্ডতা রক্ষা না করিলেও নাটকের আভিনয়িক 'কাল' বারবার খণ্ডিত হইলে, অথবা পাঠ্যরূপে তাহাকে এরূপভাবে অবিচ্ছিন্ন করিলে তাহার রস নষ্ট হইতে বাধ্য। তবে যদি (যেমন আমাদের সাহিত্যরসিকগণের ধারণা) উহাকে গল্প-উপন্যাসেরই সামিল মনে করা হয়—অর্থাৎ উহার action-এর প্রতি লক্ষ্য না

রাখিয়া—উহাকে দৃশ্য ও dialogue-এর উপাদানে গঠিত এক প্রকার গল্প বলিয়া মনে করিলে—উহার নাট্যরস সম্বন্ধে কোনও ভাবনার কারণ ঘটে না। পাঠকের মন শুধু গল্পটির জন্যই উৎসুক ও কৌতুহলী হইয়া থাকে—মাসের পর মাস সে কৌতুহল বাড়িয়াই চলে। আমার মনে হয়, আজিকার এই সাময়িক সাহিত্য বা ক্ষণিক-রসের যুগে নাটক-প্রকাশের যদি অন্য উপায় না থাকে, তবে, অন্ততঃ দুই বা বড়জোর তিন সংখ্যায় উহা শেষ করা উচিত।

আপনি গদ্য কবিতার সম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিয়াছেন। আপনি অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'তে গত বৎসরের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমার দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় একই—দুই নামে দুই ভাগে ছাপা হইয়াছিল—'অতি আধুনিক ছন্দ' ও 'রবীন্দ্রনাথের অতি আধুনিক কবিতা'। ঐ প্রবন্ধে আমি এই জাতীয় রচনার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিয়াছি। কবিতার শুধু ছন্দ নয়—মিলও চাই এবং পদ যোজনার সুষমাও চাই। এটা ব্যক্তিগত রুচির কথা। কারণ বাক্য ছন্দোবদ্ধ হইলেই কবিতার প্রাথমিক প্রকাশ-রীতি বজায় থাকে—তাহাতেই কবির প্রতিভা যুক্ত হইলে উৎকৃষ্ট কাব্যরস সৃষ্টি হইতে পারে; এ কথা আমাকে কাব্য সমালোচক হিসাবে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ছন্দোহীন কবিতা আর যাই হোক, খাঁটি কবিতা নয়, ভাবের যে সুর, এবং কল্পনার যে আবেগ ভাষায় প্রকাশ করাকে কাব্যনির্মাণ বলে—সেই সুর ও সেই আবেগ ছন্দে ভিন্ন ভাষায় সংক্রামিত হয় না—চিত্তকে সত্যকার কাব্যলোকে উত্তীর্ণ করিতে হইলে—'হেথা নয়'-এর জগতে প্রস্থান করিতে হইলে, আর কোনও রথ নাই। যাহারা গদ্য কবিতার পক্ষপাতী তাহারা লেখক হিসাবে কবি নয়, এবং পাঠক হিসাবে বাংলা দেশের গ্র্যাজুয়েট, অধ্যাপক, এবং পূর্বদেশীয় অতিশিক্ষিত, অতিনব্য, হঠাৎ রসিকের দল। যাহারা কেরাণী বা চাষা তাহারা বেরসিক হইতে পারে—কিন্তু এখনও এই রূপ অতি রসিকতার ছোঁয়াচ হইতে তাহারা মুক্ত আছে; এবং বোধ হয় শেষ পর্যন্ত, এই কেরাণী ও চাষাদের মধ্যেই যাহা কিছু রসজ্ঞ তার সহজ রসিকতার আশা করা যাইতে পারিবে। নতুবা, বোলপুর, বালীগঞ্জ ও বেহালা—এই তিন ব-কারের জ্বালায় বাংলার কাব্য সরস্বতীর এখনও কিছুকাল অজ্ঞাত বাস করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথ শেষবয়সে বাংলা ভাষা, বাংলা বানান ও বাংলা ছন্দ এই তিনের বাপান্ত-শ্রাদ্ধ করিয়া তবে নিজেও সারিবেন এবং বাঙালীকেও সারিবেন।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন।

আমার সংবাদ পূর্ববৎ—নিজে acute neuras'thenia-য় ভুগিতেছি, ছেলেটির অবস্থা আদৌ আশাপ্রদ নয়। ডাক্তারী এবং হোমিওপ্যাথির শেষে কবিরাজী চলিতেছিল—তাহার ফলে এখন কয়দিন যাবৎ খুব diarrhaea দাঁড়াইয়াছে—ফলে দেহের ভার যথেষ্ট লঘু হইয়াছে বটে, কিন্তু অক্ষুধা ও অরুচির জন্য কিছুই খাইতেছে না—Glucose, Barley-water বা Horlicks কিছুতেই রুচি নাই—খাইতে চায় না বা পারে না। এ জন্য বড় দুশ্চিন্তায় আছি। মোটের উপর আমি আর বাঁচিয়া নাই এবং এ যাত্রা উদ্ধার পাইব কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ হইতেছে।

মাঝে মাঝে পত্র দিলে সুখী হইব। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

আপনার—

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ৬ )

ঢাকা

২৮।৭.৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। আপনার জন্য একখানি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' অনেক আগেই আনাইয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু প্যাক করিতে না জানায়, এবং কিভাবে পাঠাইলে ভাল হয় তাহা ঠিক করিতে না পারায় এতদিন পড়িয়াছিল। ইতিমধ্যে একদিন দপ্তরী আসিয়াছিল ( আমার বইগুলি সে বাঁধাইয়া দেয় ) তাহার হাতে প্যাক করিতে দিলাম। সোমবার কলেজে গিয়া তার নিকটে বইখানি লইয়া ডাকে দিতে পাঠাইলাম। দেখিলাম প্যাক ঠিকমত করে নাই—Ordinary Book-Post-এর মত করিয়াছে—সর্বাঙ্গ ভাল করিয়া মুড়িয়া উপরে address-এর জন্য একটি পৃথক label লাগাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে পাকা লোক, তাই নিজের পরিশ্রম বাঁচাইয়া মাশুলের সুবিধার কৈফিয়ৎ দিয়াছে। বইখানি ঠিকমত পৌঁছাইল কিনা জানাইবেন।

বইখানি আপনার স্ত্রীর বি-এ পরীক্ষার standard অপেক্ষা একটু কঠিন হইবে; আপনি তাহাকে নিজে পড়াইয়া দিবেন—আশা করি তাহা পারিবেন। সে সৌভাগ্য আমাদের মত সেকেলে দম্পতীর ঘটিল না। প্রথম প্রবন্ধ ও শেষ প্রবন্ধ এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এ কয়টি পড়িলেই যথেষ্ট হইবে। বাকি

নির্দেশিকার সাহায্যে আবশ্যক মত দেখিয়া পড়িলেই চলিবে। বইখানি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির পাঠ্য হইয়াছে কিনা জানি না—এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি। তাহাতে আসে যায় না ; বাংলা সাহিত্যের উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রদের জ্ঞাতব্য কতকগুলি তথ্য ও তত্ত্ব ঐ গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এবং তাহা জানা থাকিলে মোটের উপর কিঞ্চিৎ উপকার হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমি পরীক্ষা-সাগরে সেতুবন্ধন উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশিত করি নাই—পাঠ্য পুস্তক রচনায় আমার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই, বরং উহাতে জাতিনাশ হয় বলিয়াই মনে করি। আপনি নিজে ঐ পুস্তক আদ্যোপান্ত পড়িয়া, আপনার কেমন লাগিল, একটু বিস্তারিত জানাইলে সুখী হইব। 'সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার' সম্বন্ধে monographটি সর্বাগ্রে পড়িবেন।

আপনার 'রূপান্তর' পড়িতেছি—আলিবাবা[১১] খুব আধুনিক হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে—Old wine in a new bottle !—নয়, 'New wine in an old bottle !' 'শনিবারে চিঠি'র নাটিকাখানি বড়ই মজাদার হইয়াছে—অতিশয় নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার সনেটটি আপনার ভাল লাগিয়াছে, তার কারণ আপনি যথার্থই গভীর রসের রসিক। সনেট সাধারণ গীতি কবিতা নয়—উহা ভাবরসের ঘনীভূত নির্যাস, তাই উহার রস খুব প্রৌঢ় রসিক ভিন্ন আর কেহ আস্বাদন করিতে জানেন না। আমার 'স্মর-গরল'-এর সনেটগুলি আমি খুব বাছিয়া দিয়াছি। উহাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টি সনেট একেবারে গাছ-পাকা ফল হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সনেট বারবার পড়িতে হয়। আমি সনেট সম্বন্ধে একটি আলোচনা ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'তে চৈত্র সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম—ঐ লেখাটি যদি সম্ভবঃ হয়—আপনি এবং আপনার সহধর্মিনী উভয়ে পড়িয়া লইবেন। তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'A sonnet is a moment's monument-
Memorial from the souls' Eternity
To one dead deathless hour.' D.G. Rossetti)[১২]

সনেটের Content একটা অতি গভীর হৃদয়াবেগ—এই passion কেবল উৎসারিত হইলেই চলিবে না—তাহাতে যে কোনও উৎকৃষ্ট lyric-এর জন্ম হইতে পারে—সে ক্ষেত্রে কোনও বন্ধনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেখানে এই passion পুটপাকের মত একটি সুস্পষ্ট ভাবনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইয়া উঠে, সেখানেই তাহা সনেটরূপ গ্রহণ করিতে পারে। একদিকে যেমন আবেগ অপরদিকে তেমনই অন্তনিরুদ্ধ গভীরতা—এই উভয়ের প্রয়োজনে তরলোচ্ছল

ভাববাষ্প যে নিয়মে গাঢ় হইয়া উঠে—সনেটের মিল বিন্যাস ও স্বর-গঠন সেই স্বাভাবিক নিয়মেরই ফল। কবির অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস কেমন করিয়া এই অতি কঠিন নিয়ম-বন্ধনেই সার্থক হইয়া উঠে, এই নাগপাশের কৃত্রিমতা এবং সনেট কবির অকৃত্রিম আন্তরিকতা কেমন করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করে—উৎকৃষ্ট সনেট পড়িবার সময়ে ইহাই ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এইজন্য সনেট লেখকের বিশিষ্ট প্রতিভা ও কৃতিত্বের প্রয়োজন। যে কোনও ভাব বা ভাবনাকে সনেটের ভঙ্গী ও ছাঁচে ঢালা অসম্ভব। ভাব ও রূপের মধ্যে যেখানে একটা স্বাভাবিক আসক্তি থাকে সেখানেই কাব্য প্রেরণা আপনা হইতেই সনেটের সন্ধান করে'।

আশা করি সপরিবারে ভাল আছেন। আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ৭ )

ওঁ

দারভাঙ্গা

১১।১।৩৮

প্রিয়বরেষু—

আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই, তাহার কারণ বড়ই আশা ছিল কলিকাতায় দেখা হইবে। যেদিন পহুঁছিলাম 'শনিবারের চিঠি'র আফিসে শুনিলাম আপনি প্রায় সপ্তাহ খানেক কাটাইয়া ঠিক তাহার আগের দিন ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। নৈরাশ্যের বহরটা বুঝিতেই পারেন, ভাবিলাম ব্যাপারটা বেশ ড্রামাটিকই হইয়াছে—কবির উপযোগী, কিন্তু কারণটা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বোধহয় শ্বশুরবাড়ি যখন অতি উপভোগে বিস্বাদ হইয়া ওঠে তখন বন্ধুবান্ধব থেকে দুনিয়ার তাবৎ বস্তুই আলুনি ঠেকে। কথাটা একটু ঝাল ঠেকিল কি?—কিন্তু নারাজ।

কলিকাতায় অনিশ্চিতভাবে দিন আষ্টেক ঘুরিয়া বেড়ান গেল। এলাহাবাদের অবনীবাবু কয়েকদিন সাথী। বুদ্ধদেব বসু প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের আসন থেকে রবিবাবুর প্রভাব বিলীয়মান বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার একটা প্রতিবাদ-মিটিংএও খানিকটা সময় কাটান গেল। অনেকটা প্রদীপ জ্বালিয়া সূর্য

দেখানোর মত হইল, কিন্তু কি করা যায়?—একটু গাত্রদাহ হইয়াছিল। বুদ্ধদেববাবু পরে অবশ্য অমৃতবাজারে লিখিয়াছেন তিনি ওরূপ কথা বলেন নাই। কাগজগুলা তাঁহার ভুল রিপোর্ট করিয়াছে। যা হ'ক, ব্যাপারটা এখনও জুড়ায় নাই, কাগজে দেখি নরম গরম পত্রাঘাত এখনও বেশ চলিতেছে।

যা হ'ক, আপনার অভাবটা কলিকাতায় খুব অনুভব করিতেছিলাম। একে অনেকদিন দেখা হয় নাই, তাহাতে আবার আশা করিয়াছিলাম খুব বেশি করিয়া পাওয়া যাইবে। ইচ্ছা ছিল আসিবার সময় আপনার ওখান হইয়া আসিব, কিন্তু লটবহর অনেক বেশি হইয়া গেল, তাহা ভিন্ন একজন আত্মীয় সঙ্গী হইলেন, সুতরাং সোজাই চলিয়া আসিতে হইল। শেষ পযন্ত অদর্শনের ক্ষোভটা রহিয়া গেল।

আপনার 'শ্রীমধুসূদন' আমি সামান্যই পড়িয়াছি—একটা issueতে। এখানে কাগজটা[১৩] যে কে লয় সন্ধানই পাইতেছি না। কিন্তু একটা issueতেই যা পড়িলাম তাহাতে আনন্দিত হইয়াছি বলিলে ভুল হইবে,—একেবারে বিস্মিত হইয়াছি। সবচেয়ে আমায় চমৎকৃত করিয়াছে লেখার forceটা, প্রধান চরিত্র এবং subsidiary সমস্ত চরিত্রগুলি হইতেই (যে কটা পাইলাম) মাইকেলের জীবনে অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য যাহার বাধা দিতেছে বা সহায় হইতেছে সকলেই যেন তাঁহার জীবনের dynamic forceটা ফুটাইয়া তুলিতেছে। যদি বরাবর consistency থাকিয়া গিয়া থাকে (এবং নিশ্চয় আছে) তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে এ একটা নূতন জিনিস হইল। আপনার একজন শিক্ষিত পাঠককেও বলিতে শুনিয়াছি—আপনি নাটকের ক্ষেত্রে একটা নূতন পথ প্রবর্তন করিলেন। কথাটা খাঁটি সত্য। আমায় সমালোচক হিসাবে যখন ডাকেন, আমি লজ্জিত হই। ইচ্ছা আছে শীঘ্রই 'ভারতবর্ষ' জোগাড় করিয়া সমস্তটা পড়িয়া লইব। টানা পোড়েনে এবং কয়েকটি কাজের ঝঞ্ঝাটে আর নিশ্চিন্ত হইয়া আসল দিকটাতেই মন দিতে পারিতেছি না।

লেখা কিছুই হইয়া উঠিতেছে না, কবেই বা যে হইল তা জানি না। যদি পাটনার 'প্রভাতী' পাইয়া থাকেন তো 'চাড়ুশিল্প' বলিয়া একটা লেখা পাইবেন। শ্রীমতীদের (এবং শ্রীমানদেরও) একটু চটাইয়াছি। আপনি অনুমোদন করেন কিনা জানিবার ইচ্ছা রহিল। লেখাটি শেষ করিয়াছিলামও তাড়াতাড়িতে এবং ছাপাও হইয়াছে বড় খারাপ। যাহক পড়িয়া দেখিবেন।

ঠাকুরদাকে (কেদারবাবু) 'দ্বিতীয়ভাগ' এক কপি পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু

এখনও তাঁহার আশীর্বাদ পাই নাই। তিনি কেমন আছেন, যদি খবর রাখেন তো নিশ্চয় জানাইবেন।

গুরুজনদিগকে প্রণাম দিবেন, আপনারা নমস্কার লইবেন এবং ছেলে-মেয়েদের আশীর্বাদ দিবেন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীবিভূতিভূষণ

( ৮ )

ওঁ

দারভাঙ্গা
২৩।২।৫৮

সুহৃদ্বরেষু—

বলাইবাবু আমার পূর্বপত্র আশা করি পাইয়াছেন। পরদিবসই আপনার 'কিছুক্ষণ'[১৪] আরম্ভ করি এবং—যাহা আমি আর কখনও করিতে পারি নাই—এক বৈঠকেই বইখানি শেষ করিয়া উঠি। আমি বড় বিলম্বগতি পাঠক, তাহা ভিন্ন একটানা interest জমাইয়া রাখিবার বই বড একটা হাতে পড়ে না। আপনার এই বইটি একটি ব্যতিক্রম। তার কারণ এর চরিত্রগুলি খুব জীবন্ত এবং সচল। অর্থাৎ এদের পাল্লায় পড়িলে জিরাইবার বা নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর থাকে না। আপনার লেখাকে আমি প্রবাসী-সমালোচনায় একবার জুঁইয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলাম বলিয়া যেন মনে পড়িতেছে। এই লেখাটি আপনার একেবারে ঐ জাতীয়—ক্ষুদ্র, তরতরে, সুরভী। আমার সবচেয়ে ভাল লাগিল—মুচীর মেয়েটি, মাড়োয়ারী, আর ষ্টেশনের ছোটবাবু। 'আপনার ও tendency ছাড়ুন মশাই'—তুলির একটি নিখুঁৎ আঁচড়। যখনই মনে পড়ে, না হাসাইয়া ছাড়ে না।

বইখানির অন্তর্নিহিত রূপকটি বড় চমৎকার। দুইদিকে অনির্দিষ্ট অনন্তবিস্তৃত পথ, মাঝখানে কয়টি মাত্র ঘণ্টার জন্য অপরিচিতদের এক জায়গায় সমাবেশ—এই জীবন—একটু চাঞ্চল্য, একটু চিকিমিকি, সঙ্গে সঙ্গে আবার আসন্ন অন্ধকার। এরই উপর মাড়োয়ারী তাহার মুনাফা করিতেছে—এরই একপ্রান্তে তাপদগ্ধ বৃদ্ধ জীবনের সত্যরূপ খোঁজায় আত্মনিমগ্ন। চমৎকার লাগিল।...

আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। বইখানির জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গুরুজনদিগকে প্রণাম জানাইবেন, আপনারা নমস্কার লইবেন এবং বালক বালিকাদের আশীর্বাদ দিবেন। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

( ৯ )

35/D Kailas Bose St.

P.O. Beadon St. Cal.

বলাই,

পত্র পাঠ যাহা লেখা থাকে পাঠাও। আমি বড় বিপন্ন, লেখা সংগ্রহ বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে, সময়ের অভাবই ইহার প্রধানতম কারণ। পার ত কবিতার সঙ্গে একটি ছোট গল্প পাঠাও। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তোমার শ্রীমধুর[১৫] বিশেষ প্রশংসা করিলেন। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত শ্রীমধুসূদন পাঠ করিয়া নতন করিয়া তোমার প্রেমে পড়িয়াছেন। তোমার বয়স যে বেশি হইয়া যাইতেছে ইহা মনে করাইবার ভার লইযাছেন দেখিতেছি ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদ। নিমন্ত্রণ চিঠি পাইয়াছি। যাইতে পারিলে সম্ভবত আমিই সর্বাপেক্ষা বেশি সুখী হইতাম। এখান হইতেই শুভকামনা জানাই। বয়স চল্লিশ পার হইলেও মনের দিক দিয়া তরুণ থাক ইহাই কামনা! তোমার দুই একটি কবিতায় cynicism স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। উহার খপ্পরে পড়িও না। অবশ্য তুমি যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতেছ তাহাতে মাঝে মাঝে cynicism-টাই হয়ত recreation। ভারতবর্ষে নদ্‌কালদ্‌কি[১৬] wonderful আরম্ভ হইয়াছে। তোমাকে এইবার সত্যই একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।...উপায় কি? বীরেন্দ্রবাবুর চিঠি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। প্রীতি জানিবে। ইতি—

19.7.39. পরিমল

( ১০ )

১৮।৭।৩৯

প্রিয় বলাই,

অনেকদিন আগে ভাই তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু নির্লজ্জের মত স্বীকার করছি যে চিঠিটা হারিয়ে যাওয়ায় আর উত্তর দিতে পারিনি। শ্রীমধুসূদন পাঠিয়ে দিও, নিশ্চয় রেডিওতে অভিনয় ক'রবো। রেডিওর জন্যে একঘণ্টা বা আধঘণ্টার কৌতুকনাট্য গোটাকতক লিখে দাওনা ভাই! একঘণ্টার হ'লেই

সুবিধে হয়। অল্প চরিত্র থাকবে, dialogue খুব forceful হবে। দৃশ্যগুলি দীর্ঘ হ'লেই ভাল হয়—আর এটুকু বলা বাহুল্য মাত্র যে বেতারে দ্রষ্টব্য কিছু থাকবে না সবই শ্রোতব্য হবে, অতএব সকলের যাওয়া আসা ও প্রত্যেক situationটি কথা ও শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করলেই ভাল হয়।

এক ঢিলে দুটি পাখী মারবার সাধ হ'লে কাগজে এই ছোট্ট নাটিকাগুলি ছাপিয়ে সেখান থেকেও কিঞ্চিৎ এবং আমাদের থেকেও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করলে মন্দ হবে কি? পরে একত্রে ছোট্ট নাটিকাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করাও লাভজনক। আশা করি প্রস্তাবটা ভেবে দেখবে। যদি আমরা তোমার লেখা রেডিওর উপযোগী ক'রে নিই তাহ'লে আপত্তি থাকবে কিনা সেটাও লিখো। এখন সব কুশল তো? আজ এই পর্যন্ত। ইতি—

তোমাদের

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

( ১১ )

পূর্ণিয়া

২৪।১১।৩৮

Bravo Balai.

তোমার মধুসূদন[১৭] আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। মধু, মধুর বাপ মা, হেনরিয়েটা, বিদ্যাসাগর চমৎকার। যেমন ভয় ছিল তেমনি খুসী হয়েছি, finish'ও admirable হয়েছে। তুমি একটা নতুন পথ খুলে দিয়েছ। আমি যুবকদেব পড়াচ্ছি, সকলেই এক বাক্যে প্রশংসা করছে। আমি যে তাতে কত খুসী তা প্রকাশ করতে পারি না।

৺বিজয়ার ঠিক পরেই সহসা আমার vertigo attack হয়েছে। এখন বৃথা বেঁচে থাকা। শেষ যে কি আছে ভাবতে পারি না।

'বনফুলের আরো গল্প'[১৮] পড়ে আমার পূর্ব ধারণাই দৃঢ় হয়েছে। অর্থাৎ ছোট গল্পই সাহিত্য-জগতে তোমাকে বড় করবে।

তোমার দিদিমা আছেন এবং একই রকম আছেন।

এবার গৌহাটিতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। আমাকে সাহিত্য বিভাগের সভাপতি নির্বাচন করেছিলেন। টেলিগ্রাফে অবস্থা জানিয়ে decline করেছি। 'Letter follows' বলেছিলুম, আজ পর্যন্ত তা পারিনি। লিখতে মাথা ঝিমঝিম করে। গৌহাটি তোমাদের কুটুম্ব বাড়ী, আশা করি যাবে। আমার যাবার খুবই

ইচ্ছা ছিল, (সভাপতি হতে নয়,) স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে। কিছু লিখে নিয়ে যাবার ইচ্ছেও ছিল। ভগবানের ইচ্ছা নয়।

শুনেছি তোমার বাবা, মা রাজগিরে ভাল আছেন। এদিকে খুকি[১৯] ও জামাই মণিহারিতে হাজির! শুনে নিশ্চয়ই চঞ্চল হয়ে থাকবেন। একমাস কাটিয়ে এলেই ভাল হয়। মণিহারিতে তারা ভাল আছে। পক্ষীরা নিশ্চয়ই নিত্য জান্[২০] দিচ্ছে। ভায়ারা[২১] এতদিনে Low Pressure-কে norn al-এ তুলে দিয়ে থাকবে।

সকলে আমাদের ভালবাসা জেনো।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

( ১২ )

38, Nilkhet Road,
Dacca, 25-11-1938

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রের উত্তর আর দিই নাই—প্রয়োজন বোধ করি নাই। তবে আপনার সংবাদ আপনার লেখাগুলিতে পাই এবং সময়ে সময়ে সেই সংবাদের সাড়া মনে জাগে, এবং পত্র লিখিবার প্রয়োজন ঘটে।

আপনার গল্পের বইখানি[২২] ভালো করিয়া পড়িয়াছি। উহার সম্বন্ধে ইহাই বলিবার আছে যে, একটি নূতন form আপনি আয়ত্ত করিয়াছেন—রীতিমত গল্পও নয়, নক্সা-Snapshot-ও নয়—এ একরকম অতি ছোট গল্প। এবং এই সংগ্রহের অধিকাংশই এত সুসম্পূর্ণ রস-কলেবর পাইয়াছে যে আমার মনে হয় ইহা আপনার একটি খুব নূতন কীর্তি বলিয়াই ঘোষিত হইবে। আপনার রচনাশক্তি বা সাহিত্যিক প্রতিভায় এখনও পূর্ণ যৌবন চলিতেছে—ঠিক কোন্ ঘাটে আপনার তরী ভিড়িবে—কোন্ লক্ষ্য আপনি ভেদ করিতে পারিবেন, তাহা এখনও বলা কঠিন, সম্ভাবনার অনেক দিন এখনও রহিয়াছে। খুব লিখিয়া যান, পরে আপনার নিজস্ব ইষ্ট-মূর্তির দেখা পাইবেন।

মধুসূদনের শেষটিতে বড় কায়দা করিয়াছেন—finishing stroke যাকে বলে! মধুসূদনের চরিত্র-চিত্র হিসাবে, তাঁহার জীবন চরিতের নাট্যরূপ হিসাবে, ইহার চেয়ে আর কি করিতে পারিতেন। তথ্য নির্বাচন ও সন্নিবেশেও আপনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

'ভূয়োদর্শন' বেশ লাগিতেছে। নানা ভঙ্গিতে আপনি আপনার অভিজ্ঞতায়

'রসগুণাবলিজারিত' বটিকাগুলি ইতস্ততঃ বিতরণ করিতেছেন। আমার মনে হয় ইহাতে যেন একটা প্রাচুর্যজনিত অপব্যয় আছে। যে সকল মাল মশলা বৃহত্তর সৌধের ভিত্তিনির্মাণে ব্যবহৃত হইতে পারিত তাহাই অজস্রতার চাপে কল্পনা-বৃত্তির অধীরতায় খণ্ড খণ্ড ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। আপনি সেগুলিকে আপনার মনোভাণ্ডারে বেশিদিন ধরিয়া জমিযা উঠিতে দিতেছেন না—অস্বস্তি বোধ করেন। বড় কিছু করিবার ইচ্ছা আপনার আছে—সে কথা আমাকে লিখিয়াছেন, কিন্তু বড় কিছু করিতে হইলে বড় Plan চাই, একটা central ভাববস্তুকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া, কল্পনাকে তাহার চতুর্দিকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করাইতে হইবে—তাহা হইলে যত কিছু খণ্ড ভাব, খণ্ড চিন্তা, খণ্ড অভিজ্ঞতা সেই মণ্ডলের মধ্যে আপনি আকৃষ্ট হইয়া একটা সুডোল Organic আকার ধারণ করিবে। ইহার জন্য ধৈর্য চাই এবং ধ্যান চাই। এই খণ্ড রচনাগুলি অতিশয় সুখপাঠ্য বটে, কিন্তু মনে হয় এগুলিকে বৃহত্তর সৃষ্টির অঙ্গীভূত করিযা আরও বড় সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে।

এবারকার শঃ চি'র অনেকগুলি ভাল লাগিল। আপনি এত রকমের এত লেখা লেখেন কি করিয়া? খুব ভাল লক্ষণ সন্দেহ নাই।

আপনার শেষ বইখানি[২৩] পাই নাই। আমার নূতন বই আপনাকে শীঘ্র পাঠাইব।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ১৩ )

শিলং

২৬.১১।৩৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার নিকট অপরিচিত হইলেও আপনি আমাদের নিকট অপরিচিত নন। আপনার গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ নাটকের ভিতর দিয়া আপনার অন্তরের রসিক মানুষটিকে চিনিবার সৌভাগ্য বাঙ্গালীর হইয়াছে।

'ভারতবর্ষে' কিছুক্ষণ[২৪] পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। যেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা রহিয়াছে সেখানে সমালোচনার লোভ হয়ত ধৃষ্টতা। তবু লোভ যে হয় সেটাকে অস্বীকার করিব কি করিয়া?

আপনার উপন্যাস প্রকাশিত হইবার পূর্বে এক রসিক বন্ধু সাহিত্য সভায়

আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—একরাত্রির উপন্যাস হয় কিনা। আমি অবশ্য উত্তর দিয়াছিলাম যে, একরাত্রির ঘটনা লইয়া উপন্যাস রচনা সম্ভব। তখন এসম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা সুস্পষ্ট ছিলনা। কিন্তু মন সুস্পষ্টতার জন্য গোপনে উদ্‌গ্রীব ছিল। আপনার উপন্যাস আনিল আমার উত্তরের উদাহরণ।[২৫] আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনার দেখিতেছি একরাত্রিও প্রয়োজন হয় নাই, এক প্রহরেই অপূর্ব রস-সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। তুচ্ছ ক্ষণিক সামান্য বস্তুর এরূপ রসমূর্তি রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আমাদের সাহিত্যে আর কোথায় আছে জানিনা। যদি মুহূর্তের অভিব্যক্তিতে সুদূরতা চিরন্তনতা কিছু থাকে, তবে তাহা রসের সার্বভৌমিকতা, কোন বিশিষ্ট এটিটিউডের নয়। আপনি প্রত্যক্ষের রসরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, কোন অদৃশ্য সুদূর অতীন্দ্রিয় রহস্যের স্পর্শে ইহাকে প্রসারিত করেন নাই। অথচ ইহাতে অতিপরিচিতির ধূলিমলিনতা নাই। রুক্ষরূঢ় বাস্তবের রসঘন এই সুপ্রকাশ স্বকীয় গৌরবে সাহিত্যরসিকদের অন্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সহৃদয় পাঠকদের নিকট হইতে আপনার শিল্প-প্রতিভা অকৃত্রিম বন্দনা লাভ করিবেই।

কিন্তু চিঠিখানি লিখিতেছি আপাতত 'শ্রীমধুসূদন' পড়িয়া। প্রথম হইতেই পড়িয়া আসিয়াছি। এই মাসের 'ভারতবর্ষ' খানা মাত্র সামনে রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে, মনে হয়, স্বনামখ্যাত আধুনিক ব্যক্তির জীবন লইয়া আপনিই প্রথম নাটক লিখিলেন। মধুসূদনকে নবীন করিয়া নয়, গভীর করিয়া উজ্জ্বল করিয়া আমরা পাইলাম। ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিয়া আপনি সরস জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। মধুসূদনের জীবনে নাটকীয় উপাদান অনেকখানিই ছিল। আমরা মাইকেলকে নীতির চোখে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলাম; তাঁর দুর্বার খেয়ালী অন্তরতম মনটিকে ত উপেক্ষা করিয়াছিলাম। কবির জীবনের ভালোমন্দের পশ্চাতে যে চিরচঞ্চল মানুষটি রহিয়াছে—রসের তুলিকায় আপনি তাঁহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। মাইকেলের প্রতি ঘৃণা নয়, গভীর সহানুভূতি জাগে। ট্র্যাজেডির অনিবার্য পরিণামের একাগ্র বেদনায় ষোড়শ দৃশ্যটি সুপাঠ্য। দুইটি রেখায় সেবাপরায়ণার পবিত্রতা স্বল্পভাষিণী হেন্‌রিয়েটার আত্মবিলোপের চিত্রটি করুণ হইয়া উঠিয়াছে। শেষের ঘটনাগুলি যেন সব ঘটিয়া গেল। মধুসূদনের বাস্তব জীবনে হয়ত এমনি হইয়াছিল, অন্তত হওয়া উচিত; নাটকে এই ক্ষিপ্রগতি অসঙ্গত হয় নাই। দুর্জয় অগ্নিস্রাবে ফাটিয়া আগ্নেয়গিরি হঠাৎ নিঃশেষ হইয়া গেল।

মধুসূদনের পিতার চরিত্রটিও অপূর্ব হইয়াছে। শেষ দৃশ্যের সমগ্র নাটকের সহিত সঙ্গতি সকলের পক্ষে উপলব্ধি করা শক্ত হইতে পারে।

আপনি এমন সুন্দর ইংরাজিও লিখিয়াছেন।

অনেক কথাই বলিবার আছে। সংক্ষেপে দুইচারিটি জানাইলাম মাত্র। আপনাকে আরো ভালো করিয়া আলোচনা করিবার লোভ যত বড়ই হোক, নিজের অক্ষমতার কথা কেমন করিয়া ভুলিব!

পরিচয় দিবার মত আমার ত কিছু নাই। সদ্য কলেজ হইতে বাহির হইয়া এখানে একটি কলেজে সাহিত্য পড়াই।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার

( ১৪ )

38, Nilkhet Road,
Ramna.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি, এবং আপনার ঐ পত্রে আপনার সাহিত্যিক উৎসাহ ও উৎকণ্ঠার[২৬] পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর পত্রে দেওয়া সম্ভব নয়, সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিলেই কিছু ফল হইতে পারিত।

আপনার প্রাণে যদি কোনও সত্যকার প্রেরণা জাগিয়া থাকে, তবে তাহার ফলে আপনি কিছু করিবেনই—সে বিষয়ে আমার উৎসাহ বাক্য আপনি প্রচুর পাইবেন। খণ্ডকাব্য বা লিরিক অপেক্ষা আপনার ভাবকল্পনা যদি বড় কাব্যের পরিসর দাবী করে তবে নিশ্চয়ই আপনি সে দাবী গ্রাহ্য করিবেন, এবং আপনার প্রেরণা যদি সত্য হয় তবে আপনি যাহা রচনা করিবেন তাহা নিশ্চয়ই সার্থক হইবে। আমি যদি গোড়া হইতেই সে বিষয়ে কোনরূপ সমালোচক-মূলক পরামর্শ আপনাকে দিই তবে তাহাতে আপনার উপকার না হইয়া ক্ষতিও হইতে পারে। এ জন্য আমি ঠিক সোজাসুজি কোনও পরামর্শ দিব না। তথাপি কতকগুলি বিষয়ে আপনার নিজেরই ধারণা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

বর্তমান যুগে সাহিত্যে বড় আকারের কিছু গড়িয়া উঠিতেছে না, তার কারণ, মানুষের মন এখন বিশ্লেষণ-ধর্মী হইয়াছে—বহুর যে বৃহৎ ঐক্য তাহাকে না

মানিয়া, খণ্ডকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ঐক্যের অভাবটাকে ঘোষণা করিতে চায়। মন তাহাতেও নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। আদি ও অন্তের ভাবনা করিতে হয় না, চলমান জগৎযাত্রার ক্ষণিক ও বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি হইতেই একটু রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হয়। ইহাই অতি-আধুনিক বিংশ শতাব্দীর মানবীয় প্রবৃত্তি। খণ্ডকে সমগ্রের অংশরূপে দেখিতে হইলে যে সত্যের কামনা ও কল্পনা করিতে, যে আস্তিক্যনীতিতে আস্থাবান হইতে হয়, তাহাই আজিকার দুর্বল ধর্মভ্রষ্ট মানুষের পক্ষে একটা বিভীষিকা। সকল উৎকৃষ্ট সাহিত্যই শাশ্বত সত্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত, তথাপি সাহিত্যের একটা দেশকালানুবর্তিতা আছে—কারণ সাহিত্য একার নয়—সমাজমনের দেশ ও কালের শাসন তাহাকে মানিতে হয়। আমরা যতই স্বতন্ত্র হই না কেন—যতই চিরযুগের দিকে তাকাইয়া থাকিনা কেন—যুগকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না! আপনি লিখিয়াছেন, লিরিকের যুগ শেষ হইয়াছে, তাহা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়াই বড় কাব্যের যুগ যে অতঃপর আসিতেছে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বরং ইহাও মনে হইতে পারে যে কাব্যেরই যুগ গত হইয়াছে, সাহিত্য-রস আর মানুষের পিপাসার বস্তু হইবে না।

তথাপি যদি কাহারও চিত্তে এ যুগেও, বৃহত্তর কাব্যরচনার প্রেরণা জাগে, তবে বুঝিতে হইবে যে, হয় তাহা একটা মোহ-বিকার মাত্র, নয় তাহার মূলে যুগধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া আছে, এবং তাহা স্বাভাবিক অতএব সত্য। কিন্তু ইহার প্রমাণ—ঐরূপ কাব্যরচনা যখন সফল হইবে—তখনই পাওয়া যাইবে, তার পূর্বে নয়। অতএব, আপনাকে এ বিষয়ে আমি উৎসাহ দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই।

কিন্তু বৃহৎ কাব্য গদ্যে ও পদ্যে—দুই রীতিতে লেখা যায়: বস্তুতঃ আধুনিক উপন্যাসই প্রাচীন মহাকাব্যের নব দেহ। আপনি নিজে দুই রীতিরই সাধক এবং এক রীতিতে বড় কাব্য (উপন্যাস) রচনায় ইতিমধ্যেই ব্রতী হইয়াছেন। তৎসত্ত্বেও আপনি পদ্যছন্দে বড় কাব্য রচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইহাতে বুঝিতেছি, আপনি একটা অতিশয় Romantic বা উচ্চভাববস্তুর উপযুক্ত medium খুঁজিতেছেন, এবং তাহার model কি হইবে, আমার সাহিত্যিক বোধ বুদ্ধির দ্বারা তাহাই ঠিক করিয়া লইতে চান। প্রথমেই বলিয়া রাখি ক্লাসিক্যাল মহাকাব্যের (যেমন Paradise Lost) আদর্শ এখন চলিবে না; তাহার অন্তর্গত সেই ধর্ম বা নীতির সেই নিছক আদর্শমূলক কল্পনা সেই প্রেম ও বিশ্বাসের paradise মানুষ এখন হারাইয়াছে। বড় কাব্য লিখিতে হইলে কোনও একটি Romantic tale পুরাণ ইতিহাস ও কিম্বদন্তী হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং তাহার রসের

মূল উৎস হইবে আদিম মানব প্রকৃতির অতি সরল, অথচ সবল ও গভীর হৃদয় বৃত্তি। আজিকার এই অতি সভ্য কৃত্রিম জীবনাদর্শের অতি সুস্থ প্রাণবন্ত মানুষকে দাঁড় করাইতে পারিলে—কাব্যরসকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে—অতি উচ্চ ধর্ম বা নীতির আদর্শ নয়; মাটি এবং মানুষ, এই দুইকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে।

একটু বড় আকারের কবিতা লিখিবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল—অন্ততঃ কোনও একটি romantic রূপকথার মত কাহিনীসূত্র অবলম্বন করিয়া Keats-এর মত, নিছক সৌন্দর্য-রসের একটি রঙ্গীন ও সুরভি শ্লোক-শতদল রচনা করিবার বড সাধ ছিল, সাহিত্যের মল্লভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার পর রসরাসেশ্বরী আমার প্রতি বিমুখ হওয়ায় সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। একটি বৃহত্তর কাব্য লিখিবার কল্পনাও করিয়াছিলাম—লিখিতে পারিলে আমার কল্পনা ও আমার কাব্যভঙ্গির চরম উৎকর্ষ তাহাতে প্রকাশ পাইত। সে কাব্যের কাহিনী অংশ বহুদিন যাবৎ পরিকল্পিত হইয়াই পড়িয়া আছে, বৌদ্ধযুগের ধর্ম সমাজ শাস্ত্রবিধি ও আচার প্রথা ভালো করিয়া পড়িয়া লইবার প্রয়োজন ছিল, তাহা ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়াই তখন আর সে কাব্যে হাত দিতে পারি নাই, তারপর আমার সাহিত্য-জীবন ক্রমেই রসহীন হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যের ভাববস্তু ছিল যেমন কবিত্ব-পূর্ণ তেমনিই গভীর। মৃত্যুভয়ভীত মানুষ অমরত্ব লাভের বাসনায় প্রেমকে তুচ্ছ করিল—প্রেম ও মৃত্যুর নিত্যসম্বন্ধ সে স্বীকার করিল না, আয়ুষ্মান না হইতে পারিলে প্রেম বৃথা; অতএব সে আগে অমর হইলে তবে প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিবে। শেষে অমরত্বের বর লাভ করিয়া সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল—সে বর তাহার পক্ষে অভিশাপ হইয়া উঠিল। জীবনের সকলই বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই আর আকর্ষণ বা আসক্তি নাই। পুনরায় মৃত্যুলাভের সাধনা করিল। দৈববাণী হইল কোনও কিছুতে আসক্তি না হইলে শাপমোচন হইবে না— সে আর হয় না। অবশেষে এক আশ্চর্য সহজ ভাবে সেই আসক্তি ঘটিল সে একটি এমনই ব্যাপার যাহাতে জন্ম ও মৃত্যু এক সঙ্গে গাঁথা হইয়া আছে—তাহারই ফলে সে আবার অন্তহীন মৃত্যুস্রোত নামিয়া পড়িল। বৌদ্ধ দর্শনের তন্‌হা বা তৃষ্ণার এবং অন্তহীন জন্মমৃত্যুর ট্র্যাজেডি আমি এই কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম, এবং তাহারই মধ্যে প্রেমহীন অমরতার উপরে মৃত্যুবিড়ম্বিত প্রেমের মহিমা ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু সে আর হইল না। এ কাব্য কিন্তু অতিশয় কল্পনা প্রধান, romantic হইত। ইহাতে Gric element-ই

বেশী থাকিত। আপনি Passion ও action এর কাহিনী রচনা করুন। অন্ততঃ Mathew Arnold-এর Sohrab and Rustum-এর মত একখানি কাব্য লিখুন। Tennyson's Idylls of the King পড়িয়াছেন ?

পূর্বে বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে আলোচনা সাক্ষাতে ভিন্ন হইবার উপায় নাই। আমি আপনাকে কয়েকটি অতিশয় স্থূল কথা লিখিলাম—আপনার নিশ্চয়ই ইহার উপর অনেক প্রশ্নই মনে জাগিবে—জানাইলে সাধ্যমত উত্তর দিব।

আশা করি কুশলে আছেন। আমার প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন।

ইতি—

আপনারই

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ১৫ )

Purnea

15. 2. 39

প্রিয় বলাই ভায়া,

অনেক দিন তোমার পত্রাদি পাইনি, সে অপরাধ তোমার নয়, আমি নিজেই লিখতে পারিনা,—সামর্থ্য ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু পেতে যে ইচ্ছে হয় ! বিশেষ তোমার পত্র।

শেষ বয়সে ভুল করে লেখার নেশা ধরা হয়েছিল, তার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন খোঁয়ারি কেবল কষ্ট দেয় ! 'সময় হারার' সাজা। আজ ৭৬ পূর্ণ হল, কাল থেকে ৭৭ আরম্ভ।

ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষ' খুলে আগেই তোমার লেখা খুঁজলাম,—পেলুম না। তোমার বইয়ের বিজ্ঞাপনও নেই। মনটা বিচলিত হল।

টুলু[২৭] এসেছিল। শুনলাম—বাড়ীতে তুমি একা। নিশ্চয়ই খুব লিখছো। কি লিখছো—জঙ্গম ? শুনে ভারি আনন্দ হলো—রবিবাবু[২৮] ডেকেছিলেন, অনেক কথা অনেক আলাপ হয়েছে, যা আদায় করেছ তা অমূল্য উপহার ! তার যোগ্য হও, তার মান রক্ষা করো এই কামনা করি।

মনিহারীর কোয়ার্টারে বসে তোমার বাবার সঙ্গে একদিন তোমার কথা হয়, তাঁকে বলেছিলুম—'বলাই আপনার সাধারণ টাইপের এভারেজ ছেলে নয়, তাকে কোনো বিষয়ে বাধা দেবেন না, free hand দেবেন। সে আমাদের দেশের

একজন হবে। আমি থাকবো না—আপনি দেখে যাবেন ;—তাতে আমি সে লক্ষণ পেয়েছি, তার প্রতি পূর্ণ confidence এই, আজ সন্ধ্যায় আপনাকে এ কথা বললুম। আমার দীর্ঘ জীবন যদি বৃথাই না কেটে থাকে আর সাহিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা যদি লোক-দেখানো না হয়, তা হলে আজকের একথাও ভগবান নিরর্থক করবেন না।" ইত্যাদি। এসব কথা তোমাকে জানাবার ইচ্ছাও ছিল না, আবশ্যকও ছিল না। কিন্তু দিন আর বড় নেই, তার আগেই—যেটা আমার দৃঢ় ধারণা ছিল—'তুমি আমাদের কবির প্রিয় হবে, আন্তরিক ভালবাসা পাবে।' তার সূচনা হয়ে যাওয়ায়, আনন্দ রোধ করতে না পেরেই বলে ফেললুম।

আমি এত বড় কথা বলবার যোগ্য লোক নই, সাহিত্যিক বলেও কেউ নাম করবে না, সে লোভও নেই, কিন্তু একটা কথা আমার নিজের কাছে চিরসত্য—আমি সাহিত্য-প্রাণ ছিলুম। মাঝিরা বলে—'বাইতে পারি না পারি গোড় চিনি।' আমারও তাই। কিছু দিতে পারিনি বটে কিন্তু জীবনটা সাহিত্যের প্রেমে, সাহিত্যের পশ্চাতেই কেটেছে। এতটা ভালবাসা জগতের আর কিছুতেই ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, প্রারম্ভ যৌবনে আরাধ্যসাহিত্য-তীর্থ-ক্ষেত্র হতে দু-দুবার প্রবল আঘাত[২৯] আমাকে ২৭ বৎসর নির্বাসিত করে ফেলেছে। বড আঘাত প্রিয় ক্ষেত্র হতেই আসে।

তাঁর রহস্য কে বুঝবে—৫৭ বৎসর বয়সে অতি ক্ষীণ সূত্র ধরে রূপান্তর গ্রহণ কোরে সে দেখা দিলে—সামান্য কিছু বলে গেল। কোন আবশ্যক ছিল না।

যাক ওসব বাজে কথা। এইবার কবির সঙ্গে কি কি কথা হোলো, বিশেষ, সাহিত্য নিয়ে, সেটা শুনতে ইচ্ছা হয়,—ও রোগ শেষ পর্যন্ত যাবে না। অর্থাৎ তাঁর advice and instructions. হ্যাঁ—'মধুসূদন' শুনে কি বললেন? দীর্ঘ স্বপ্নটা সম্বন্ধে আমারও একটু খটকা ছিল। ওটা কি করতে বললেন। শেষটা কিন্তু আমার ভালই লেগেছিল। শুনলুম ভূত ছাড়াতে বলেছেন! মন্ত্রটা নিশ্চয়ই suggest করে থাকবেন। সেটা কি?

এইটা কিন্তু বড় কঠিন কাজ। লেখককে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা। রবিবাবুর master mind থেকে better suggestion বেরিয়ে থাকবে। তবুও আমার কিন্তু ভয় আছে।

তাঁর কাজকর্ম, উৎসাহ উদ্যম দেখে অবাক হয়েছি। 'সময়হারা' যারা বলে তারা আমাদের কি দিচ্ছে? তারা একটা 'রাজপুতানাই'[৩০] লিখুক না। আজো তাঁর দান অফুরন্ত। এখন দেখছি সকল বিষয়েই কথা কইছেন। সে দিন 'বিশ্ব-ভারতী

সম্মিলনী' সভায় বাংলার বর্তমান রাষ্ট্রনীতির মধ্যে যে সব পাপ ঢুকেছে তা নিয়ে দুঃখ করে অনেক কথা বলেছেন; একটি কথা আমাকে ব্যথা দিলে। শেষে বলেছেন—'এমন কি ভগবানের কাছে জানিয়েছি যেন—বাংলা দেশে আর না জন্মাই! যে বাংলা দেশের জন্যে তিনি কি না করেছেন ও করছেন তার উপর এ অভিমান স্বাভাবিক হতে পারে আমি সেটা ভালবাসারই নামান্তর বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছি। স্বাধীন দেশে জন্মটা সকলেরি কাম্য কিন্তু দেখে শুনে তা'তেও অরুচি আসছে। তিনি কোন দেশে জন্ম চান, জানতে ইচ্ছা হয়! গত দু'বৎসরের মধ্যে কোন দেশের পরিচয় পেতে তো আমাদের বাকি নেই। —শরীর আর বয়না, না হলে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যেতুম। দেখতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

কেয়া, অসীম, খোকা[৩১]—সব কেমন আছে! তোমার দিদিমার একভাবই চলছে।

বহুদিন পরে পত্র লিখতে বসে অনেক কিছু লিখে ফেললুম। ৩।৪ মাস কাকেও পত্র লেখা হয় নি। হরিদাস কেমন আছে তাও জানি না।

তারাশঙ্কর ভায়া কোথায়? পত্র লিখতে পারি না, দুঃখিত হয়ে থাকবে। ৭৭ বৎসর বয়সটার শরীরের উপর প্রভাবটা যে কি, কাকেও বোঝাতে পারব না। আমি ত চাই পত্র লিখতে, তাতে ভালই থাকি, কিন্তু পারি কই!

এখন ভালবাসা জানাই। অবসর মত কুশল জানিও।

কবিকে পত্র লিখতে ইচ্ছা হয় কিন্তু বৃথা কষ্ট দেওয়া পাছে হয়, তাই লিখি না।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬ )

Kantalbari
DARBHANGA
২১. ৫. ৩৯

প্রিয়বরেষু,

আপনি যে 'ঝোলে ঝালে অম্বলে'[৩২] ডুবিয়া আছেন এ সন্দেহ আমার অনেক দিন হইতেই মনে উদয় হইয়াছে। একটা প্রমাণ আপনি পত্র দিতে এবারে বড্ড দেরি করিয়াছেন; সুখে নাকানি-চোবানি না খাইতে থাকিলে এ-অবস্থা সচরাচর হয় না। অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া সে আন্দাজ করিতে পারি না এমন নয়।

সূদন' পাঠানর জন্ত ধন্যবাদ দিতেছি নিজের তরফ থেকে; কিন্ত লেখার জন্য বাংলা সাহিত্যের তরফ থেকে কি ভাষায় ধন্যবাদ দিব? জিনিসটা চমৎকারই নয় শুধু, marvellous! ইংরাজী শব্দটি বাংলা 'চমৎকার'-এর চেয়ে বেশি জোরাল জ্ঞানেই প্রয়োগ করিলাম, অভিধান যদি তা না বলে তো আর আমার কথা নাই। আমি ড্রামা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই—ও জিনিসটা নাকি টেক্‌নিকে টেক্‌নিকে ভরা। তবে রসের দিক দিয়া অনায়াসেই বলিতে পারি, এমন বই বাংলা ভাষায় খুব বেশি নাই। মাইকেলের জীবনী পড়িয়াছি, তাঁর সম্বন্ধে নিবন্ধিকাও অনেক পড়িয়াছি. কিন্তু মাইকেলকে ফুটাইয়া, জাতির সামনে তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার উদ্দাম ব্যক্তিত্ব চিরভাস্বর করিয়া রাখা—এটা আপনার জন্যই যেন তোলা ছিল; আপনার বইটা মাইকেলের resurrection. এখন 'শ্রীমধুস্থদন' হাতে লইলেই মাইকেলের মুখোমুখি হওয়া যাইবে। কবির মুকুর কবিই;—A poet only can do justice to a poet. জীবনীকারদের ছোট করিতেছি না; বিশেষ করিয়া মাইকেলের জীবনী তো বাংলা ভাষার একটা সম্পদ, আমি শুধু বলিতেছি ফটোয় পুরো মানুষটি ওঠে না। আপনি আশু মুকুজ্জের রেখাচিত্র প্রতিচ্ছবি—'The Bengal Tiger' নিশ্চয় দেখিয়াছেন। (চিত্রীর নামটা ভুলিয়া যাইতেছি) কোন photo কি ওরকম হইতে পারিত!

আপনার প্রত্যেক চরিত্রটি নিখুঁৎভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক ঘটনাগুলি কথাবার্তার প্রতি শব্দটি এমন করিয়া বাছাই করা যে মাইকেলের জীবন, কিম্বা তাহার পারিপার্শ্বিক একেবারে রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে। আমার এক একবার মনে হইল—এ কথা যদি না বলা হইয়া থাকে, কি এ-ঘটনাটুকু যদি না ঘটিয়া থাকে তো সেইখানেই ত্রুটি ছিল—আপনার লেখার এ বাহুল্য নয়

আপনি বন্ধু, এই পর্যন্তই থাক; অপরিচিত হইলে যা অনুভব করিতেছি আরও সালঙ্কারে প্রাণ খুলিয়া বলা যাইত। আপনার বই অভিনীত হইবে কিনা ঠিক বলিতে পারিলাম না, তবে আশা করি সমঝদারে চেষ্টা করিবে—বিশেষ করিয়া public stage-এ; তবে সেই সঙ্গে এও আরও গভীরভাবে আশা করি যে যেন 'যত্র-তত্র' চেষ্টা না হয়। আমি public stage সম্বন্ধেও খুব উঁচু ধারণা রাখিবার সুযোগ পাই নাই,—তবে আশু দের (Asude—vide A. B. Patrika) 'Sheman' সমন্বিত আমাদের এমেচারদের সম্বন্ধে আমি বড়ই সশঙ্কিত থাকি। এদের মত খুনে আর দুঃসাহসী নাই মশাই! ওরা এক একটি কালাপাহাড়, আপনি প্রাণ

গলাইয়া যে মূর্তি গড়িলেন ওরা এক লহমায় তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভূতলে ( যথাযথ বলিতে গেলে বাঁশের মাচার উপর ) বিছাইয়া দিবে। তাহার পর আবার মেডেলের জন্ম হাত পাতিবে! ঠিক কথা ওদের কথাতেই মনে পড়িল। আপনি গানগুলো লিখিয়া দেন নাই কেন মশাই? ও-স্বাধীনতা দিতে গেলেন কেন? ধরুন Henrietta যেথানে Rev. কৃষ্ণমোহনকে গৎ শোনাইতেছে ( পৃঃ ১২০ ),—আপনি কি স্থির নিশ্চয় যে কোন ভজহরি-হেনেরিয়েটা ওখানে ছাড়া পাইয়া একটা কীর্তন, বিদ্যাসুন্দরী, বা নিদেনপক্ষে একটা গজল চালাইয়া বসিয়া থাকিবে না! আপনারা আজকাল 'সিনে' টিপয়ের কয়টি পায়া থাকিবে সে-কথাও ধরিয়া লিখিয়া দিতেছেন, তা সত্ত্বেও এরা ধরাধরি করিয়া গ্রীনরুমের ড্রেসিং টেবিল আনিয়া হাজির কবিতেছে—আর আসল কাজেই এমন ঢালোয়া বিশ্বাস করিয়া বসিলেন?

আপনার 'ভূয়োদর্শন' খুবই চমৎকার হইতেছে। 'শনিবারের চিঠি' পড়িবার যখন খুবই কম সময় থাকে তখন শেষের দিকের অম্লরসে জিভটা তাজা করিয়া লইয়া ঐটে পড়ি। সজনীবাবুর জন্ম অত্যন্ত চিন্তিত আছি। সুবলবাবুর পত্র নিশ্চয় পাইয়া থাকিবেন যে তিনি ডাইবিটিস বাড়ার জন্য হাসপাতালে। আজ সুবলবাবুকে পত্র দিলাম। আপনি যদি আজকালের মধ্যে পত্র পাইয়া থাকেন তো ফেরৎ ডাকেই আমায় খবর জানাইবেন। আমি তরসু আমার পত্রের উত্তরে সুবলবাবুর দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি। মনটা কিন্তু খারাপ হইযা আছে।···আমা গ্রীষ্মাবকাশ ৩রা জুন হইতে। প্রোগ্রাম এখনও ঠিক নাই; তবে যেখানেই যাই—যাইবার বা ফিরিবার সময় আপনার ওখানে ঢু মারিবার ইচ্ছা আছে। সতই্য আপনার ওখানে যাওয়া হইতেছে না, মানে ইচ্ছা আছে তবে ইচ্ছাশক্তি নাই, অনেক সময় ইচ্ছেতব শক্তিরও অভাব ঘটে। আবার এক চোট কোমর বাঁধিয়া দেখি। তবে এ ভাবিবেন না, যেন যে আপনার না-নড়িবার সম্বন্ধে বিলকুল সব বিশ্বাস করিয়া বসিলাম। অত প্লট সাজাইতেছেন আর এটুকু সাজাইবেন এতে বিস্ময়ই বা কি?···নূতন বই সম্বন্ধে কৌতূহল রহিল, কোথায় বাহির করিতেছেন? আজ এ পর্যন্ত থাক, একআনী টিকিটের ঘাড়ে অনেক চাপান গেল। সজনীবাবুর খবর দিবেন।

নমস্কার লইবেন, গুরুজনদিগকে প্রণাম দিবেন ও ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ দিবেন।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

( ১৭ )

Bogra
1-6-39

বনফুল,

পাখীটাঙানতে আমাকে ঠকিয়েছ। কারণ fact is stranger than fiction.

বৈতরণীর ডাক্তারকে অপ্রকৃতিস্থ পাগল জেনেই সমালোচনা করেছি। পাগলেরও একটা fixed idea & responsiveness to one sort of stimuly only থাকা দরকার।—তোমার পাগল যেমন কোথাও আনন্দে আটখানা হয় না। তার মনের morouseness নিয়ে সে সবটা বেঁকিয়ে দেখবে, 'ফিক্‌ফিক্' হাসি তার মুখ থেকে আর এক সুরে বেরুবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মড়ার evolutionটা তত important আপত্তি নয় আমার। ওটাকে Class ও-তে ফেলেছি। কারুর সঙ্গে কথা কইবে না সেটা জানি। তোমার লেখায় সেটা স্পষ্ট হ'লে পাগলের ক্ষতি হ'ত না। আর একটা কথা, পাগলের অসম্বন্ধ প্রলাপ নিয়ে এক প্যারা লেখা যায়, একটা বই লেখা যায় না। বইএর পাগল একটু সুসম্বন্ধ কথাবার্তা কইবে, এবং কথায়বার্তায় নিজের পাগলত্ব দেখাবে। যাই হোক আমি তোমাকে আমার কথা বোঝাতে পারব না। আমি বোঝাতে পারব না যে, তোমার ঐ কখানা বই একত্র করলে Epic হবে না, ও বইগুলা first class material দিয়ে second class construction হয়েছে, যা Engineer-এর চোখ এড়াতে পারবে না। নিন্দা শুনতে যদি ভালবাস,—তবলা বাঁধা হবার আগে গান আরম্ভ ক'রে লম্বকর্ণ শ্রোতাদের তাক্ লাগাবার প্রবৃত্তি যদি কম থাকে ত তোমার উচিত আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ হাতুড়ির ঠক্‌ঠক্ সহ্য করা। কারণ আমার বিশ্বাস তোমার অন্য সমঝদাররা একটু আধটু বেসুরে বিক্ষুব্ধ হন না। এবং তুমিও সেই কুসংসর্গে পড়ে বেসুরে সুরসাধনা আরম্ভ করচো।

ছেলেবেলায় Chekhov-এর Ward No 6 & Black Monk প'ড়ে খুব ভাল লেগেছিল। এখন কেমন লাগবে জানিনা। তুমি যদি না প'ড়ে থাক ত প'ড়ে দেখতে পার, পাগলের খবর পাবে।

ভাল soliloquy ও দু'একখানা পড়া দরকার। একটা আমার মনে পড়চে—

—'Uncanny tales by M. Crawford'৩৩-এর একটা গল্প। আরও খুঁজলে পাওয়া যাবে।

গরমে তোমরা আমাদের ঠকাতে পারবে না।

শুভার্থী—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

( ১৮ )

২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
১১-১১-৩৯

বলাই,

বুধবার রাত্রে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি এবং গত দুই দিন রবীন্দ্রনাথের সহিত ল্যাপটালিপিট্টি করিয়াছিলাম—চিঠি লেখার সময় হয় নাই। রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী সংক্রান্ত কাজ শেষ করিয়া বাংলা সাহিত্য লইয়া অনেক আলোচনা হইল —তিনি তোমাকেই অধুনাজীবিত (নিজেকে বাদ) স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে বরমাল্য দিয়াছেন; কবিতা গল্প উপন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কাছে এক রকম উইল করিয়াই দিলেন। দুঃখ করিতে লাগিলেন, তুমি আর যাওনা, তোমার সম্বন্ধে জানিবার অনেক কৌতূহল তাঁহার আছে। আমি দশ বার দিনের মধ্যে বোলপুর যাইতেছি। তোমাকেও আসিতে হইবে। তারাশঙ্কর সম্বন্ধেও তাঁহার মত খুব উচ্চ তবে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে তারাশঙ্কর একটু ক্লান্ত হইয়াছে। তিনি রবীন্দ্র পরবর্তী গল্পসাহিত্যে তোমাদের দুইজনকে ছাড়া আর কাহারও নাম করিতে পারেন না। প্রেমেন্দ্রের লেখা তিনি পড়েন নাই, মানিক সম্বন্ধে তিনি হতাশ এবং আধুনিক দলের দ্বন্দ্বে পীড়িত। আরও অনেক কথা হইয়াছে, সাক্ষাতে বলিব— তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের প্রেমের কথা—বহু গুহ্য কথা শুনিলাম। আজ পর্যন্ত সেসকল কেহ শুনে নাই। তাঁহাকে পত্র দিও। আজ সকালে বোলপুরে গেলেন।

ভালবাসা লও। শীঘ্র পত্র দাও।

—সজনী

( ১৭ )

38. Nilkhet Road, Ramna
Dacca

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি আমার বিজয়া দশমীর নমস্কার আলিঙ্গন জানিবেন।

বহুদিন পূর্বে আপনার একখানা পত্র পাইয়াছিলাম, তখন অতিশয় অসুস্থ ছিলাম, এখনও ভাল নাই। তবে পূর্বাপেক্ষা ভাল, তাই সেই পত্র আবার পড়িয়া এতদিন পরে আপনাকে পত্র লিখিতেছি।

আমি শরীরে ও মনে অতিশয় অবসন্ন হইয়াছি। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে একটিও মনের আত্মীয় নাই, তার উপর এইরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, মনে হইতেছে, আমি যেন মৃত্যুর বহির্দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছি, জীবনের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নাই; এমন অবস্থা আমার জীবনে আর কখনো হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। বহুদিন নিজ সমাজ বা জন্ম-জলাশয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; তারপর, এইরূপ স্বাস্থ্য ও অন্যান্য গুরুতর কারণে এখান হইতে নড়িবার—একটু স্থান পরিবর্তন করিবার উপায় দেখি না। এ এক রকম Purgotory বা প্রায়শ্চিত্ত-নরক। ইহাকে মানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি, কোনও অভিমান আর নাই, এখন অপরাধ ভঞ্জনের পালা, নিজের আত্মার শান্তি ও সান্ত্বনা চাই। পরের ভাবনা ভাবিবার স্পর্ধা না থাকাই ভাল। জীবনে অনেক দেনা হইয়াছে পাওনার অঙ্ক চিরদিন শূন্যই রহিয়া গেল, দেনা শোধ করিতে পারিলাম না, এই দুঃখই শেষে বড় হইয়া থাকিল। জীবনে কিছুই অর্জন করি নাই। একটি মানুষকেও আপন করিতে পারি নাই; ভাব-চিন্তার প্রচণ্ড সন্নিবেগে ধূমকেতুর মত ছুটিয়া এই আকাশযাত্রা শেষ করিলাম; স্নেহপ্রেমের স্থির রশ্মিতে যাহারা আসন পাতিয়া বসে তাহাদের দলে আমার নাম কাটাইয়াছি। আমি যে কত একা তাহা জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে তাহা অনুভব করিতেছি। যে আনন্দময়, সেই শক্তিমান, এবং তাহারই একা হওয়া সাজে—প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে সে একা হইয়াও বহু—সংসার সমাজ তার সেই প্রাণশক্তির, সেই আত্মানন্দের লীলাক্ষেত্র। এককালে আমার এই শক্তি ছিল, কিন্তু তাহার অপব্যবহার করিয়াছি—আমি সেই প্রাণশক্তিকে অ-প্রাণের সহিত যুদ্ধে ক্ষয় করিয়াছি—নিজেকে বড় বঞ্চিত করিয়াছি। তাই আজ আমার এই শাস্তি। আমি প্রকৃতিতে বৈষ্ণব হইয়াও তান্ত্রিকের সাধনা করিয়াছিলাম—আত্মসমর্পণ না করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার দেবতা

প্রসন্ন হন নাই। আজ এই রোগক্ষীণ দেহে, আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায়, আমি সেই দেবতাকে খুঁজিতেছি, আমার সকল অভিমান যেন দূর হয়! আমি যেন আমার জন্য শোক না করি, কোন ক্ষোভ লইয়া না মরি। ভাল হোক, মন্দ হোক, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, প্রশংসার বা অপ্রশংসার—যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার কর্তৃত্ববোধ যেন মুছিয়া যায়—নিন্দা ও প্রশংসা দুইই যেন আমার প্রাপ্য বলিয়া মনে না করি। সে যেন আর একজন করাইয়াছেন। আমি তুচ্ছ নিমিত্তমাত্র, আমার নামও যেন তাহাতে না থাকে। ছাপার অক্ষরে আমার নাম পড়িতে আমি চিরদিনই কি রকম যেন সঙ্কোচ বোধ করি—খ্যাতির মোহ আমার নাই, এমন কথা দেহ ধারণ করিয়া বলিলে তাহা মিথ্যা হইবে, কিন্তু ঐ মোহ সত্ত্বেও চিরদিন একটা সঙ্কোচ আছে। নিজের ভিতরে দৃষ্টি দিয়া বুঝিয়াছি, এ সঙ্কোচ সত্য। আমার একটি কবিতায় আমি নিজের একমাত্র আশা বলিয়া যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহা আমার প্রাণের কথা। সে কথা এই—

এমনি কাটিল বেলা আমি ধরিত্রীর
ক্ষীণ-প্রাণ শীর্ণ শিশু,—বসি' একধারে
দুইটি ডাগর আঁখি ভরে জলভারে
চেয়ে আছি, আশাহীন তৃষ্ণায় অধীর।
জননী দাঁড়ায়ে হোথা—স্তনস্রাবীক্ষীর
পিয়িছে উল্লাসে মাতি' কাতারে কাতারে,
প্রবল দুরন্ত যারা, হাস্য অশ্রুধারে
উথলে অবোধ প্রীতি, নয়ন মদির।
আমি শুধু চেয়ে আছি—নারিনু ধরিতে
ধরণীর সুধাপাত্র। শুধু এক আশা!—
বঞ্চিত সন্তান তরে কিছু কি বাঁধিয়া
রাখেনি অঞ্চলে মাতা? সস্নেহে সাধিয়া
ধরিবে না মুঠি মোর—সর্ব দুঃখনাশা
একটু প্রসাদ কণা গোপনে ভরিতে?
সে নহে যশের আশা—কালের সাগরে
অম্বুমুখে ক্ষণবিম্ব বুদ্বুদ-বিলাস!
আমি চাই নিজপ্রাণে পূর্ণ অভিলাষ—
হৃদিপুষ্প ভরি যাবে পরাগে-কেশরে।

জীবনের সর্বশেষ পূর্ণিমা-বাসরে
বাতায়নে ধরা দিবে সারাটি আকাশ !
রবে না আড়াল কোথা, সুবর্ণ সঙ্কাশ
নেহারিব পূর্ণশশী দিকে দিগন্তরে !
শয়ন-শিয়রে মোর নিশি কোজাগরী
দাঁড়াইবে চুপে চুপে—খুলিবে গুণ্ঠন
নিখিলের রূপলক্ষ্মী ! নয়ন-গণ্ডুষে
সে লাবণ্য-স্নিগ্ধ লব একেবারে শুষে !
যে অমৃত পিপাসায় করিনি লুণ্ঠন—
হেরিব গোপন পাত্রে উঠিয়াছে ভরি !
( স্মর গরল : শেষ আশা )

আজ তাহারই প্রতীক্ষা আরও বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে—প্রাণের মধ্যে আমি মুক্তি চাই, অতিশয় শান্ত শুদ্ধ অবস্থায় সেই জ্যোৎস্না রাত্রির পূর্ণ সেই প্লাবন প্রতীক্ষা করিয়া আছি। তারপর যাহা, তাহাও 'নচিকেতা'র মুখে বলিয়াছি—

নয়নে আমার
নাহি আর কায়া-ছায়া, দৃষ্টি সৃষ্টিহারা
ডুবে যায় বর্ণহীন আলোক-পাথারে !
কর্ণে জাগে স্তব্ধতার মহামৌন-বাণী।
দেহ হল স্পন্দহীন,—রোমাঞ্চ পুলক।
স্বেদ, কম্প, শিহরণ, কিছু নাই আর !
বীতরাগ, বীতশোক, বীতমন্যু আমি।
ভয় নাই, আশা নাই, এই কণ্ঠে মোর
ধ্বনিবে না কভু আর স্তুতি, আরাধনা,
যাচনা, মিনতি !—এই মৃত্যু !—ধন্য আমি !...

—দেখিতেছি ইহাই আমার প্রাণের অতিগভীর ও স্থায়ী কামনা। এই জন্যই আশা হয়, সে কামনা পূরিবে, আমি আমার আমিত্ব বর্জন করিয়া নিঃশেষে লয় পাইব। সাংসারিক সুখ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, স্নেহ, প্রেম—এ সকল আমার জন্য নহে। আপনাদের মত প্রাণবান প্রেমিকের দিকে আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকি—মুগ্ধ হই। কিন্তু জানি ও সৌভাগ্য আমার পক্ষে পর-ধন ! আমার জীবনের চরম সিদ্ধিলাভ—আত্মবিলোপ।

কয়দিন ভয়ানক বর্ষার পর আজ একটু রোদ উঠিয়াছে! সকালে উঠিয়া আপনাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া কেমন একটু পাগলামী করিতে ইচ্ছা হইল—আকাশের নীল ও রৌদ্রের কাঞ্চন, দুয়ে মিলিয়া যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই আমার এমন বিভ্রম ঘটাইল—আপনি কবি বলিয়াই, জানিয়া শুনিয়া নিজেকে সম্বরণ করিলাম না। আশা করি এই infliction আপনি সকৌতুকে সহ্য করিবেন। নতুবা যে সকল অভিমান দূর করিতে চায়, সে এমন করিয়া আপনার কথাই এত অধিক বলিবে কেন? পাপ কি সহজে যাইতে চায়? কত ছলে, কত সূক্ষ্ম আকারে আত্মগোপন করিয়া নিজ দুর্গ অধিকার করিয়া থাকে! আপনি নিজে খুব হাসিতে পারেন—সেই হাসির দ্বারা ইহাকে শোধন করিয়া লইবেন।

আপনার যত লেখা যেখানে বাহির হইতেছে, সবই পড়িতেছি—ভাষার উপর আপনার আশ্চর্য অধিকার দাঁড়াইয়াছে, ইহার অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আপনার অক্লান্ত লেখনীর স্বচ্ছন্দ লীলাও আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। আমাদের এই বাঙালী জীবন ও বাঙালী চরিত্রকে আপনি যে সুস্থ সবল ও সরস দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—আপনার লেখার সেই sanity ও সহানুভূতি, বাস্তব ও আদর্শের বলিষ্ঠ সমন্বয়, এবং কল্পনার ঋজুতা ও সারল্য, আপনার রচনাকে একালের পক্ষে বড় মূল্যবান করিয়াছে। আপনার দৃষ্টি যেমন উদার তেমনই বস্তুনিষ্ঠ—একটা গভীরতর নীতির প্রাণধর্মের গূঢ়তম রহস্যের প্রতি সেই দৃষ্টি আবদ্ধ আছে বলিয়াই—'Life's little ironies' আপনি এমন করিয়া উন্মোচন করিতে পারেন। আপনার সম্বন্ধে আমি বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। আজ এইখানেই শেষ করি। আশা করি সপরিবারে ভাল আছেন। পূজার ছুটিতে যদি আর কোথাও গিয়া থাকেন, তবে আশা করি এই পত্র যথাস্থানে পৌঁছিবে।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ২০ )

পূর্ণিয়া ১৭-৩-৪০

প্রিয় বলাই ভায়া,

তুমকায় তোমার পত্র পাই। তোমার পত্র আমার আনন্দের বস্তু। যা লিখেছ সব কথাগুলিই সত্য। আমি যে কারণে তোমাকে আসতে বারণ করেছিলুম, সেই

কারণই তুমি দেখিয়েছ। দু'এক দিনের জন্যে ১৪৪ মাইল 'বাসে' আসা যাওয়ার অর্থ হয় না। কেহ কেহ শ্বশুরবাড়ী যেতে পারেন, আর 'সমনে' কোর্টে টেনে নিয়ে যেতে পারে। তুমি এলে আমাকে লজ্জা দেওয়াই হোতো!

আমি চিরদিন 'আসনের' পক্ষপাতী। ধ্যান ধারণার আসন, লেখাপড়ার আসন, যখন তখন ছাড়লে সিদ্ধির সম্ভাবনা কম। সাধকেরা নিজের আসন ছাড়েন না। আসন নড়লে মনও নড়ে যায়। ওটাতে মস্ত বড় বিক্ষেপ আনে। তুমি যে ইমারতী কাজে লিপ্ত তাতে তোমার নড়াচড়া চলতে পারে না। ১০০ পৃষ্ঠার বই আমাদের নাই, ওদের 'ফর সাইথ্ সাগা' আছে, War and Peace আছে। সুতরাং 'জঙ্গম' কল্পনার সামঞ্জস্য রক্ষা করে বৃহদায়তন হলে আমরা তোমার কাছে এমন কিছু পাব যা আমাদের নাই। Sir P. C. Roy একবার বলেছিলেন, আমাদের লেখকদের কল্পনাশক্তি তিন চারটি চরিত্র নিয়ে ঘোরে ফেরে, তাই বড় কিছু গড়ে তুলতে পারে না। আমি ভাই 'জঙ্গমের' ২।৩ সংখ্যা দেখেছিলুম। বিষয়ের বনেদ গাঁথা চলছে। আমি সত্যই দুর্বল হয়েছি, কোনো কাজই আর এগোয় না।

'মোহমুক্তি' ভারতবর্ষে দেওয়াটা সম্বন্ধে আমার মন চায়নি। অন্যের আগ্রহে লেখা, তার বিষয়বস্তু—সাময়িক নয়। বিশেষ বড়। তুমি একবার সময় মত দেখে তোমার যা বলবার আমাকে জানিও চৈত্র সংখ্যায় শেষ হয়েছে। যদি নাটক না হয়ে থাকে, তা হলে পুস্তকাকারে প্রকাশ করব না। আর যদি সামান্য পরিবর্তনে defect শোধরানো যায়, তখন সে সম্বন্ধে ভাবা যাবে।

দুমকা চেঞ্জের জায়গা বটে। নাতনী আর তার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলুম। সকলেই ভাল ছিলুম। কিন্তু দুমকা যা দেয়—পথ তা নিয়ে নেয়! বাসে ৪২ মাইল এসে রামপুরহাটে Loop Express ধরে সারারাত্র জাগরণ ও ৬।৭ বার ওঠানামা করতে করতে যখন বাড়ী ফেরা যায়, তখন আর মনে হয় না যে স্বাস্থ্যকর স্থান থেকে ফিরলুম। যা হোক—এখনো ভালই আছি।

তোমাদের পাবার ইচ্ছা আমার কম নয় বলাই, কিন্তু সামর্থ্য খুইয়েছি ভাই, আর সাহস পাই না। ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম, জানতে চেয়েছ। অনেক কিছু মনে হয়, আবার মনেই লয় পায়! লেখবার ইচ্ছা যায়নি, বোধ হয় যাবেও না, কিন্তু কাজে হয় না। এদিকে Blood Pressure 130তে নেবে এসেছে।

হাঁ—মোহিত ভায়ার কথা লিখেছ। Exactly so, যা লিখেছ তার একরতিও কম নয়। এরূপ সাহিত্য-প্রাণ প্রেমিক আমি দেখিনি। তিনি সাহিত্যের

প্রতিমূর্তি, অন্তর বাহির সাহিত্যময়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। সাহিত্য সম্বন্ধে এত চিন্তা আর কাকেও করতে দেখিনি।

টুলু ভায়া এখানে রয়েছে, আলো আছে।

আজ বেশ বৃষ্টি চলছে। রামগড় না মিইয়ে যায়। গরীব কিষাণদের জন্যে ভাবছি। বড়গুলো ভেসে গেলেই ভালো হয়। কেবল পদ Power ও অর্থ কামড়ে থাকতে চায়।

কবিকে একবার শেষ নমস্কার করে আসবার ইচ্ছা ছিল, বোধ হয় পারলুম না। বাঙালীর সবই গিয়েছে, শান্তিনিকেতনটিও কি বেনের হাতে তুলে দিয়ে যাবেন?

মাষ্টার সীতেশ সিংহ এখন কোথায়? ভাগলপুরেই আছেন কি?

সজনী ভায়া রামগড় যায়নি তো?

আচ্ছা, আজ আর নয়। এখন সকলকে ভালবাসা জানাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

( ২১ )

38, Nilkhet Road, Ramna,

Dacca,

৯-১০-৪০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু এতদিন আপনারি পত্রের প্রতীক্ষায় ছিলাম, কারণ তৎপূর্বে পত্র দিয়াছিলাম, উভয়ের পত্র cross করিয়াছিল। এখন মনে হইতেছে, আপনিও আমার চিঠির প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাই লিখিতে বসিলাম।

এখন নিঃসঙ্গ আছি—ছুটিতে ছাত্রদের সঙ্গও নাই—যেন কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না, ভাল লাগে না; এক, চিঠি লেখা ছাড়া। শরদিন্দুবাবুকে অনেক চিঠি লিখিয়াছি—ভদ্রলোক বোধ হয় আমার এই চৈঠিক বাচালতায় আশ্চর্য হইয়াছেন। উপায় নাই, কথা কহিবার একটি সঙ্গী নাই; এক আধজন যাহারা আসে, তাহারা খাটি পূর্ববঙ্গীয়, সাহিত্য-রস তাহাদের পক্ষে taboo। পূর্ববঙ্গ—বাংলার Scotland, ইহার প্রকৃতি আমাদের হইতে মূলে পৃথক, পরস্পরকে ঠাট্টাই করি, আর গালাগালিই দিই, সত্যকার প্রকৃতিভেদ আছে; অতএব পূর্ণমিলনের আশা না করিয়া we should agree to differ। এতদিন এখানে রহিলাম, কি বয়স্কদের মধ্যে, কি

ছাত্রদের মধ্যে—একটিও সত্যকার সাহিত্যরসিক দেখিলাম না। ছাত্রেরাও সাহিত্যচর্চার যে কসরৎ করে অথবা রসিক হওয়ার যে 'আপ্রাণ' চেষ্টা করে, তাহা সকল সময়ে ভয়াবহ না হইলেও, শোকাবহ। ইহারা অলঙ্কৃত বা শ্লেষযুক্ত ভাষা আদৌ বরদাস্ত করিতে পারে না। সকল বিষয়েই too literal। ইহারা nerve অপেক্ষা muscle-এর গুণগ্রাহী ও quality অপেক্ষা quantity-র আদর করে—পাঁপরভাজা খায় না, বড় হালকা, unsubstantial বলিয়া। তা ছাড়া এমন stark materialist আমি আর কোথাও দেখি নাই, যে কোন প্রকার শক্তি-প্রতিপত্তি, ও পয়সার জন্য—প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার জন্য—ইহারা এমন কাজ নাই যাহা করিতে পারে না। ইংরাজীতে যাহাকে grit বলে তাহা ইহাদের খুব বেশি মাত্রায় আছে—জিদ আছে, গোঁ আছে, impulsivenessও আছে, কিন্তু সত্যকার Idealism নাই, কারণ সে culture নাই। ইহাদের হৃদয়ের সৌরভ নাই—রং আছে, কিন্তু সেও বড় কাঁচা। আমার মনে হয় অতীতের সঙ্গে ইহাদের যোগ বড় অল্প, কোন পাকা বনিয়াদ কোথাও নাই, ধর্মের বাঁধন একটা ছিল, তাহা এক্ষণে ঘুচিয়া যাওয়ায়—কোন সংস্কারই এখন আর নাই, তাই সর্ববিষয়ে ইহারা প্রগতিবাদের দোহাই দিয়া অভিমান চরিতার্থ করিতেছে। মনের aristocracy নাই বলিয়া ইহাদের কোন বিষয়ে 'লজ্জা' নাই, এইখানে আমাদিগকে উহারা হটাইয়া দিয়াছে। এই সমাজেই আমি এতকাল বাস করিতেছি, মনের মত মানুষ একটি পাইলাম না, যদিও অনেকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। সেরূপ সঙ্গ নিঃসঙ্গতার চেয়েও কষ্টকর। আবার যাহারা ৫০০'০০ উপরে মাহিনা পায়, বা কোন বড় চাকুরী করে, তাহাদের বিলাতিয়ানা ও snobbery বাঙ্গালী-জাতির মুখে কালি মাখাইতেছে। ঐ যে বলিয়াছি—ইহাদের মনের aristocracy কোন কালেই ছিল না।

উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহা পুরুষদেরই-সম্বন্ধে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমি খুব ওয়াকিবহাল নই; তবু মনে হয়, তাঁহাদের কমনীয়তা কিছু কম হইলেও, আমাদের মেয়েদের তুলনায় তাঁহারা শক্তিমতী ও বুদ্ধিমতী। পরিবার এখনও অনেকাংশ একান্নবর্তী থাকায়, তাঁহাদের হৃদয়ের প্রসার এখনও আছে। তাঁহারা দুর্বলা নয়, সবলা। সেবায় যত্নে পরিশ্রমে তাঁহারা অধিকতর পটু, কিন্তু—জানি না, মনে হয়—দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্যগুণে তাঁহারা আমাদের সীমন্তিনীদের সমকক্ষ নহেন।

কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। আপনার মত রসিক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে নারীচরিত্র ও নারীদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই;

তাই, বলিয়াই জিব কাটিয়াছি, আপনি তাহা দেখিতে পান নাই। তবু এখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে পারি—য়ুনিভার্সিটিতে প্রায় ৬০।৭০—এবার ৮০।৯০ জন মেয়েছাত্রী আছে। এতদিন এখানে আছি তবু একখানিও এমন মুখ দেখি নাই যাহা দেখিলে মনে চমক লাগে—কল্পনা জাগিয়া উঠে। এই জন্যই বোধ হয় এদেশে কবি নাই। যাহারা জোর করিয়া কবি হয় তাহারা Sex ছাড়া আর কিছুরই প্রেরণা পায় না—যে প্রেম সৌন্দর্যের সহিত অভিন্ন—তার সেই অসীম রহস্য, সেই সচন্দ্রতারকা বিভাবরীরূপ ইহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করে না, ইহারা কুৎসিত বাস্তবের জয় ঘোষণা করে।

কিন্তু আমি বলিতেছিলাম, আমার এই নিঃসঙ্গতার কথা। আজ শারদীয়া নবমী—কোথাও ঢাকঢোলের শব্দও নাই—আমি থাকি শহর হইতে দূরে মাঠের ধারে। এ কয়দিন একটি মানুষও আসে নাই। ভাগ্যে বাগান ছিল, তাই একটু অন্যমনস্ক হইতে পারি—শীতের ফুলের আয়োজন এখন হইতেই করিতে হয়। ঘরে আসিয়া বসিলে কিন্তু আর ভাল লাগে না। 'পূজাসংখ্যা' গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করি। তাতেও বিপদ কম নয়। মাথার অসুখ হইয়াছে—মাথা একটুতেই উত্তেজিত হয়—মনের সুখ না থাক, শান্তি ত চাই! একদিকে রবীন্দ্রনাথের গুরুতর পীড়ার সংবাদে সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত, তাঁহারা মহাপ্রস্থানের মুহূর্ত সকলে মহা-উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিয়া আছে আমিও একটু ভাবস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে পূজার 'আনন্দ-বাজারে' রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরী' চোখে পড়িল—পড়িয়া এমন একটা শক পাইলাম তাহা বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার শেষ দান অথবা পরিণাম যেন একটা গগনভেদী অট্টহাস্য হইয়া উঠিল। কবি রবীন্দ্রনাথের খেলার ঘর, পড়িবার ঘর, সাধন-কক্ষ, বসন্ত-বাটিকা, পূজার ঘর, অধ্যাপনা গৃহ, নৃত্যশালা, ব্যাধি-মন্দির—বাংলাসাহিত্যে এই সকলই দেখিয়াছি, কিন্তু 'ল্যাভেটরী'ও যে দেখিতে হইবে তাহা কল্পনা করি নাই। এই রচনাটিকে আগা-গোড়া অন্য অর্থে লইয়া বিদ্রূপ বা শ্লেষের রচনা বলিয়া সাফাই গাওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সে হইবে শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা।

আশ্বিন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে আপনার 'ভৌতিক'[৩৫] পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি—'আধুনিক বাংলা কবিতা'র এমন সমালোচনামূলক satire এ পর্যন্ত কেহ লিখিতে পারে নাই। কার্তিকের সংখ্যায় 'প্রোলেটারিয়েট'[৩৬] কবিতাটিও উক্ত রসের একটি masterpiece। ভারতবর্ষে আপনার একটি নাটিকা[৩৭] দেখিলাম, শুনাইয়া-

ছিলেন। আরগুলির কি হইল? আপনি কি সেগুলি কৃপণের মত সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন? সেই 'বানপ্রস্থ' এ পর্যন্ত কোথাও বাহির হইতে দেখিলাম না? দেখিলাম, 'রাত্রি' শনিবারের চিঠিতে বাহির হইবে—'প্রভাতীর' কি হইল? সেখানে কি শেষ হইয়াছে? এবারে শনিবারের চিঠিতে একটিও ভাল গল্প নাই—পূজার বাজারে সব জিনিসই মহার্ঘ, শনিবারের চিঠির পক্ষেও সওদা করা কঠিন হইয়াছে!

'আনন্দবাজারে' আপনি ফাঁকি[৩৮] দিয়াছেন—'দ্বৈরথ'-গল্পটিকে ভাঙ্গিয়া কেবল একটু হাল্কা করিয়া বাঁধিয়াছেন, আপনাকে এখনই—বাবুর রোগে ধরিল! লক্ষণ ভাল নয়, ও কাজ করিবেন না। একটি ঠিক অপরটির মত না হইলেও স্পষ্ট repetition আছে, উহাতে কোনটারই মর্যাদা থাকে না। আপনার বই পাইয়াছি, বহু ধন্যবাদ। 'মন্ত্রমুগ্ধ' কিন্তু আমাকে একবারও দেন নাই।

এবারে তারাশঙ্করের দুইটি গল্প বড় ভাল লাগিল—খাঁটি তারাশঙ্করী গল্প,—প্রবাসীতে 'কবি' ও আনন্দবাজারে 'বন্দিনী কমলা'। দুইটি দুই ধরণের, একটিতে (বন্দিনী কমলা) atmosphere অপরটিতে চরিত্র সৃষ্টি বড় উপাদেয় হইয়াছে। 'কবি' গল্পটির কল্পনা একেবারে প্রথম শ্রেণীর: জিনিসটি বাহিরে অতিশয় simple—কিন্তু প্রত্যেক touchটি অর্থপূর্ণ: গল্পের শেষটিতে কবিচরিত্র ও কবিভাগ্যের যে নিগূঢ়তত্ব এই গ্রাম্য 'কবিয়ালে'র জীবনে লেখক যেভাবে ফুট'ইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। দেখা যাইতেছে তারাশঙ্করের সৃষ্টিশক্তি এখনও অব্যাহত আছে। আপনার কেমন লাগিয়াছে?

আজ যা খুশি লিখিয়া চলিয়াছি কেবল আলাপ করিবার জন্য। আবার বড় অবসাদ বোধ করিতেছি। মনে হইতেছে জীবনটা বৃথায় গেল—কত ভুল করিয়াছি! নিজকে অতিশয় দীন দরিদ্র মনে হইতেছে; জীবন যে কত বড়, আর আমি যে কত ছোট, ইহাই ভাবিয়া এবং নিঃস্বতার পরিমাণ চিন্তা করিয়া বড়ই হতাশ হইতেছি—কোন দিকে এতটুকুও হাতে পাইলাম না!

আমার ৺বিজয়াদশমীর আলিঙ্গন-নমস্কার জানিবেন—একটু আগে হইলেও ডাকে যথাসময়ে পৌঁছিবে। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। ইতি—

আপনার—

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ২২ )

27-7-40

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়ে একটু অবাক হলাম। সমব্যবসায়ীকে বিনা পারিশ্রমিকে গল্প লিখতে অনুরোধ করার এতটা উদার সাহিত্য-সেবক এখনও হতে পারিনি। পারিশ্রমিক যে পাওয়া যাবেই এটা আপনার বোঝা উচিৎ ছিল।

পারিশ্রমিক অবশ্য এরা বেশী দিতে পারবে না—দশ টাকা মাত্র। এই টাকার বিনিময়ে কতদিনের মধ্যে আপনি গল্প দিতে পারবেন বা পারবেন না জানালে বাধিত হব।

আপনার 'মৃগয়া' আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে। সত্যি কথা বলতে কি এতটা ভাল লাগবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না!

এই চিঠিতে 'মৃগয়া' সম্বন্ধে আমার উচ্ছ্বাস আর প্রকাশ করলাম না, পরে দেখা হলে করব। বইটি অনেক দিক দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছে, শুধু যে দিকটি সম্বন্ধে আপনি নিজে আমার কাছে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন সেইটি এর প্রধান ত্রুটি বলে মনে হল।

'মৃগয়া' পড়বার পর লাইব্রেরী থেকে নিজে উৎসাহ করে আপনার বই আনিয়ে পড়তে সুরু করেছি, আপনার এতখানি অনুরাগী আমি হয়ে উঠেছি। শারীরিক মানসিক ও আর্থিক সঙ্গতির অভাবে বাংলা দেশে অধিকাংশ লেখক যৌবন দেখা না দিতে দিতেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এদেশের আবহাওয়ার দোষেই বোধহয়, গাছের চেয়ে যেমন আগাছার প্রশ্রয় বেশী মাটিতে, সাহিত্যে তা ত বটেই, তার ওপর গাছ যা দুএকটা দেখা যায়, তারও বেশীর ভাগ সতেজ বলিষ্ঠ বাড় নেই। আমার প্রশংসার যদি কোন দাম আপনার কাছে থাকে, তাহলে জেনে রাখুন যে শুধু ভৌগোলিক দিক থেকে নয়, মানসিক দিক থেকেও আপনি বাংলার এই জোলো হাওয়ার প্রভাবের বাইরে থাকেন বলে মানতে আমি বাধ্য হয়েছি।

ভবিষ্যতে কলকাতায় এলে আমার ঠিকানাটা খুঁজে বার করে যদি দেখা করবার সময় ও উৎসাহ পান, অত্যন্ত খুশী হব। নমস্কার।

প্রীতিকামী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

( ২৩ )

1-1A, Ananda Chatterjee Lane
Baghbazar.
30-12-40

ভাই বলাই,

তোমার পত্র পেয়েছি, এবং মণির মারফৎ 'নির্মোক' পেয়েছি। তুমি আমায় অপ্রত্যাশিত ভাবে অভিভূত করে দিয়েছ। তোমার বন্ধুপ্রীতিতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।

'নির্মোক' পূর্বেই প্রবাসীতে পড়েছি। আবার পড়লাম। বিজ্ঞান সাহিত্যের মধ্যে মিশে গেছে। তার মধ্য থেকেও চিরকালের মানুষগুলি অভিনব রূপে সম্মুখে এসে কথা কয়ে যাচ্ছে পাঠকের সঙ্গে। বিস্তারিত সমালোচনা করবার প্রয়োজন নাই, বই তোমার ভাল হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যে বিষয়বস্তুর গণ্ডী সম্প্রসারিত করে সমসাময়িক এবং অনুবর্তীগণের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

আমি নিজে এখন অতিশয় কর্মভারবিব্রত। ভারতবর্ষে 'গণদেবতা'র জন্য মনুসংহিতা থেকে Marx-এর Capitalism ইত্যাদি পড়তে হচ্ছে। আরও একখানা বই ধরেছি, নন্দরাণী নামে। বৈষ্ণব জীবন। অবকাশ একটু হলে তোমার ওখানে একবার যাব।

তোমার ছেলেদের খবর দিয়ো। মেয়ের বিয়ে নিয়ে বড় বিব্রত হয়েছি। ভাল পাত্রের সন্ধান দিতে পার? বন্দ্যোপাধ্যায় বা শাণ্ডিল্য গোত্র ছাড়া অন্য কোন বল্লালী বালাই নাই। মেয়েটি আমার দেখতে ভাল, বয়স পনেরো চলছে—ঠিক হিসেবে—চৌদ্দ বৎসর কয়েক মাস।

আমার বড় ছেলে এবার—অর্থাৎ আগামী জুলাইয়ে এম-এ দেবে। এখানেই পড়ছে সে। ছোটটি এবার ম্যাট্রিক শেষ করে রিপনে আই-এসসি-তে ভর্তি হয়েছে।

গৃহিণী বাতে ভুগলেন কিছুদিন। বাড়ী-বাতিকে ভুগছেন বারমাস। বাড়ী-বাড়ী বাতিক হয়েছে। বাত অবশ্য এখন সম্পূর্ণ সেরে গেছে মনে হচ্ছে। ম্যালেরিয়ার পর হয়েছিল। এখন জ্বরটা একটু সারতেই বাতও গেছে। সম্প্রতি আরও কলিক দেখা দিয়েছে! একদফা এমিটিন প্রয়োগ চালাতে হবে মনে হচ্ছে।

কি রকম সংসারী হয়েছি দেখছো?—চিঠিখানা বিয়ে অসুখের কথাতেই ভ'রে গেল। আমার ভালবাসা জেনো! ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ দিয়ো। বন্ধুপত্নীকে নমস্কার জানাচ্ছি। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

( ২৪ )

ঢাকা

১২।৮।৪১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে আপনি অতি সংক্ষেপে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন—বাঙালীমাত্রেই (যাহার মনুষ্যোচিত শিক্ষা দীক্ষা আছে) তাহা অনুভব করিতেছে। কিন্তু সেইরূপ মানুষ-বাঙালীর সংখ্যা এত কম, যে এই গগণবিদারী শোক কোলাহলে, কোথাও প্রাণ একটু অবকাশ পাইতেছে না। আমি সেই প্রথম দিন হইতে এখনও হয় সভা নয় পত্রিকা, এই দুই-এর উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়াছি। রবীন্দ্র-বিয়োগের যে বেদনা আমরা অনুভব করিতেছি, তাও অল্পলোকেই করিবে। তাই, এই যে শোকোচ্ছ্বাস ইহা রবীন্দ্রনাথের জন্য ততটা নয় যতটা তাঁহার কীর্তি ও খ্যাতির গর্ব ঘোষণার জন্য। রবীন্দ্রনাথ যে কে ছিলেন ও কি ছিলেন, এ জ্ঞান ভাল করিয়া না জন্মাইবার আগেই বাঙালীর সর্ববিধ অধঃপতন শুরু হইয়াছে—রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার মত মন ও হৃদয়ের স্বাস্থ্য এবং মনুষ্যত্বসংস্কার যাহাদের শতকরা ৯৯ জনেরও বেশির নাই, তাহারা আজ এই যে রবীন্দ্রশোকে শোকার্ত হইয়াছে, সে শোক, এবং তাহা যে- রবীন্দ্রনাথের জন্য, তাহাতে আমাদের মত ব্যক্তির শ্বাসরোধ হয়—বুদ্ধকে বৌদ্ধরা যাহা করিয়া তুলিয়াছিল, ইহারা রবীন্দ্রনাথকে এখনই তাই করিয়া তুলিয়াছে; এজন্য আমার শোক অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। আপনার পত্রে যাহা পাইলাম তাহাই আসল বস্তু, আমি তাহা অন্তরে গ্রহণ করিয়াছি।

আজ এই পর্যন্ত। আমার প্রীতি ও সমবেদনা জানিবেন।

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

( ২৫ )

বাঁকুড়া, ২৩।৬।৪২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ইতিপূর্বে আপনার "শ্রীমধুসূদনে" আপনি যে ধারা প্রবর্তন করেছিলেন অপরে তার অনুকরণ করছেন, আপনি স্বয়ং তার অনুসরণে "বিদ্যাসাগর" লিখেছেন। বিদ্যাসাগর চরিত্রটি যথাযথ হয়েছে, শেষটিও বেশ dramatic. তা সত্ত্বেও এ বই ঠিক নাটক হয়নি, কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনে hero হলেও নাটকের hero হবার অনুপযুক্ত। Heroine-এর একেবারেই অভাব ঘটেছে—আপনার হাত নয়, বিষয়টিরই দোষ। যাহোক আপনার বই অত্যন্ত সুপাঠ্য হয়েছে, আর আপনার দরদ হয়ত আমাদের অসাড় সমাজের বুকে ভাগ্যহীনাদের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগাবে। আমার প্রীতি অভিনন্দন ও নমস্কার। ইতি—

বিনীত

অন্নদাশংকর রায়

বলাই, অন্নদার পত্র পাঠাইলাম কেমন সুন্দর লিখেছে দেখবে। —সবাইকে বই দিয়েছি দেখা যাক কি Review বাহির হয়। ইতি—

গোপালদা

( ২৬ )

বাঁকুড়া, ২।১২।৪২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'মধ্যবিত্ত' দু' কপি পেয়েছি। এক কপি অরবিন্দকে[৪০] দিলুম, সম্ভব হলে এখানকার মেডিকেল স্কুলের ছাত্রেরা অভিনয় করবে। বইখানি আমার ভালো লেগেছে, বিশেষ করে ওর শেষটা। বাংলার মধ্যবিত্তদের আপনি, না বিধাতা—কে এমন অমানুষ করেছেন? ওদের প্রতি করুণাই জাগে, দরদ জন্মায় না। বোধহয় ওরা বড় বেশী typical হয়েছে, individual হয়নি। আপনি আরো নাটক লিখুন।

'ভূয়োদর্শন' বইখানায় প্রবন্ধ ও ছোটগল্প উভয়ের আকর্ষণ রয়েছে। রচনার টেক্‌নিক্ কৌশলের পরিচায়ক। হঠাৎ বোঝা যায় না কী পড়ছি প্রবন্ধ না ছোট গল্প। আর চমক লাগে যখন শেষ হয়।

আপনি Indian P. E. N. Club-এর member হলে পত্রিকাখানা বিনা খরচে পাবেন। Member-দের বার্ষিক চাঁদা ৩৲( তিন টাকা ) মাত্র। আপনি

Indian P. E. N. এর Secretary-কে চিঠি লিখলে তিনি একখানা form পাঠাবেন। Form-খানায় আপনার পরিচয় ও স্বাক্ষর ছাড়া আরো দু' জনের স্বাক্ষর প্রয়োজন। আমি আগেরএকজন হব। অন্য জনের স্বাক্ষর না থাকলেও চলবে, কারণ আপনার নাম আমার ইংরেজী পুস্তিকায় আছে।

আমার প্রীতি নমস্কার। ইতি—

বিনীত

অন্নদাশঙ্কর রায়

পুনশ্চ: লীলা রায় আমার স্ত্রী।

( ২৭ )

145B/Vivekananda Road,

Calcutta.

Jan., 30, 1943

প্রীতিভাজনেষু,

বড় অন্যায় হয়ে গেছে। দু' দু' খানা চিঠি অমন তাড়াতাড়ি পেয়েছি, তবু জবাব দিইনি। অপরাধ এবারকার মত ক্ষমা করবেন।—জানি তা করবেন, তবু না লিখলে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত বোধ করছিলাম। তাই কাগজে-কলমে এই কথা কয়টি লিখলাম—যদিও লিখলে কথাগুলি বড় 'formal' শোনায়। আর 'formal' সম্পর্ক আপনার সঙ্গে নয়—আপনিও তা গড়তে দেন নি। আমিও গড়িনি।

দু'দিন 'ফণ্টামারা'[৪১] খুঁজতে হয়েছিল। বাজারে আজকাল 'পেঙ্গুইন' সুদুর্লভ।—পক্ষী জাতীয় জীবমাত্রই প্রায় সর্ব রকমে দুষ্প্রাপ্য। একখানা পাওয়া গেল এক বন্ধুর কাছে—সময় হলে ফেরৎ দেবেন। না দিলেও ক্ষতি হবে না। তবে কোনো কাজে লাগলে যে ভাবে খুশী তা ব্যবহার করবেন—যতদিন খুশী রাখবেন বা বরাবরের মত রেখে দিতে পারেন, কারণ কলকাতায় আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আরও দু' এক কপি আছে।

আপনার 'গল্প সংগ্রহ'[৪২] নিয়ে কিন্তু বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। এখানে এসে দেখলাম—কাগজের বাজারে আগুন। ছোট-খাট প্রকাশকদের খড়ো ঘরের এতদিনে কিছু আর নেই। 'পুঁথিঘরের' ওঁরা সামান্য কাগজ রেখেছিলেন তা শেষ হয়েছে। এখন আর নূতন কিনিতে সাহস করছেন না। ওঁদের বড় দুঃখ রইল। তা থাক, ভবিষ্যতে এক সময়ে ওঁদের আবার দেখা যাবে। কিন্তু 'গল্প সংগ্রহের'

জন্য অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন প্রকাশকদের খুঁজতে হবে। আমি আর কারুর সঙ্গে কথা বলিনি। বলব কি ?—সেই মোহিতবাবু সুশীলবাবুর যাঁরা প্রকাশক—বিভূতিবাবুর 'নীলাঙ্গুরীয়'ও তাঁরাই ছেপেছেন—, 'General Printers and Publishers' তাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় না থাকলে আমি কথা বলতে পারি। ওঁরা আমার পরিচিতই। আমার বিশ্বাস, আপনার 'গল্প সংগ্রহ' পেলে সকল প্রকাশকই উৎফুল্ল হবেন। হ্যাঁ, মোট কত ফর্মার বই হতে পারে সমস্ত সংগ্রহটি ?

সজনি ফিরে এসেছে, জানি। একেবারে সস্ত্রীক আবার পুরানো কলকাতায় এসেছে। কিন্তু দেখা করতে এখনো পারি নি—যেমন আপনাকেও চিঠি লিখি নি। আমার অকাজের 'ডিমোন' তাড়া করেছে। তার ওপরে আজ দুদিন এখানে বাদলা। কাল পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করব।

বই-পত্র আরও কিছু আপনাকে পাঠাব কি ? লোকজন পেলে ভালো হয়। আপনারও প্রয়োজন মত জানাবেন—কি আপনার চাই। ব্যবস্থা করব।

রুশিয়ার প্রস্তাবটা নিয়ে এবার পুলিশের কর্তাদের কাছে একটু দরবার করতেও অগ্রসর হচ্ছি। উপায় কি ? আমি অবশ্য সমস্ত প্রাণ দিয়েই চাই—ওদেশ একবার দেখে আসতে। কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভ হবে কিনা জানিনা। একটা কথা—প্রকাণ্ড দেশ বহু লোক, বহু জাত। আমার নিজের বিশ্বাস—মানুষ মানুষই। তাই, সেখানে স্বর্গ ও দেবতা খুঁজে পাব না, আবার নরক ও শয়তানও কেবল দেখব না। ভারতবর্ষে যেমন, ওদেশেও এক দিক থেকে তেমনি হবে—অর্থাৎ 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' সে দর্শক তেমনি দেখবেন—মিস্ মেয়ো দেখলেন, ভারতবর্ষের drain, আর ভগ্নী নিবেদিতা দেখলেন—ধ্যান-সুন্দর হিমালয়। এই দুই নিয়েই ভারতবর্ষ। কিন্তু আমরা জানি এই ছাড়িয়েও ভারতবর্ষ। তেমনি হবে রুশিয়াও। আমি শুধু বুঝে দেখতে চাইব—সেখানে মানুষ মানুষই হবার মত উপকরণগুলো পাচ্ছে কি না, আর তাকে অমানুষ করবার মত উপকরণগুলো উপড়ে ফেলা হচ্ছে কি না ( ফেলা হয়েছে, বলতে এখনো সাহস হয় নি ; সে যে অনেক দিনের জঞ্জাল। আর dirt is a painless disease ) যতটুকু বিশ্বাস, সংবাদ আমি পেয়েছি তাতে মনে হয় তা হচ্ছে। আর আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, সেখানকার মানুষ আবিষ্কার করেছে নিজেদের। অর্থাৎ তাঁদের প্রাণে এই বিশ্বাস এসেছে যে, তারা অনেক কিছু গড়তে পারে এবং অনেক কিছু তারা গড়ছেও—যাতে ত্রুটি থাকলেও তা সৃষ্টি ; শুধু নিয়মবাঁধা কারিগরী নয়।—কিন্তু থাক এ কথা এবার।

আমার 'একদা' লীলা বৌদি পড়েছেন ( কিন্তু তা বলবার আগে, এই সমস্যাটা দূর করুন তো—কি করে এই মেয়েদের আমরা উল্লেখ করব ? 'মিসেস্ মুখার্জি ?' আমি নিতান্ত ড্রইংরুম বিহারিণীদের ছাড়া কাউকে মিসেস বলতে পারব না। চিরদিনকার দেশী নিয়মে আত্মীয় স্থানীয়াদের আত্মীয়া বলে 'বৌদি' বরং বলব। আর আমরা নূতন নিয়মে যা বলতাম, তা আপনাদের অভ্যস্ত কানে একেবারে অসহ্য। অথচ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, আমাদের কাছে ওর চেয়ে বড় আহ্বান আর নেই, কি তা, আপনি কি অনুমান করতে পারেন ? ) 'একদা' তাঁর ভালো লেগেছে, তিনি তাও লিখে জানিয়েছেন। বুঝতেই পারেন—এতে আমার নিজেকে সত্যই ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস—আমি 'লেখকজাতের' লোক নই, 'লিখিয়ে-জাতের' লোক। কিন্তু এক-একবার আপনাদের কথা শুনে নিজের সন্দেহ হয়—আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু 'অকাজের ডিমোন' তখনি আমাকে তাড়া করে—লেখা আর হয়ে উঠছে না। সেই বড় প্ল্যান-করা কাব্যনাট্য আর লিখতে পারছি না, কিন্তু আইডিয়াটা ছাড়ি নি। সেটাও পিছনে লেগে আছে।

শরীরে অযত্ন আর সহজে করব না। আপনি শুনে খুশী হবেন—মোটের উপর খাইও। তবে ওই পক্ষিজাতীয় জীব দুর্লভ, অথচ তার ওপর লোভ আমার দুর্জয়। আপাতত, মোটের উপর এ বাজারে যথেষ্ট সুপাচ্য খাদ্যই খাচ্ছি—মায়ের হাতের গুণে।

আমার মাকে আপনাদের কথা বলেছি। তিনি সম্প্রতি পান বসন্তে বেশ ভুগেছেন, এখন তাঁর দেহ ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। অথচ বুঝতে চান না যে, আমাদের জন্য রাঁধাবাড়া, তত্ত্ব-তল্লাসী, এ আর তাঁর পক্ষে এখন সম্ভব হবে না। আরও বুঝতে চান না এই কথাটি যে, ওকে এভাবে খাটতে দেখলে ( চাকর-বামুন বড় নেই ) আমরা মনে মনে অস্বস্তি কম বোধ করি না—যদিও মুখে ওঁর রাঁধা জিনিস না হলেই প্রায় আর খাদ্য রুচতে চায় না। কিন্তু মাকে নিয়ে কি করি ? আর নিজেকেই বা নিয়ে করি কি ?

বৌদিকে আমার নমস্কার দেবেন। আর কেয়াদের দেবেন আমার আশীর্বাদ। প্রীতি গ্রহণ করবেন। সময় পেলে যা খুশী দু-এক ছত্র আমাকে লিখবেন—দু' জনাই,—এই দাবীটুকু মনে রাখবেন। ইতি—

আপনাদের প্রীতিমুগ্ধ
গোপাল
( গোপাল হালদার )

( ২৮ )

Premier Publicity Society
8/C, Beadon Street,
Calcutta.
16. 1. 45.

ভাই বলাই,

হয়ত এই চিঠি পেয়ে বিস্মিত হবে·· আমি নিজেও বিস্মিত হচ্ছি যে এইভাবে তোমাকে চিঠি লিখতে হলো।

গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল কথা বলি—আমার এক বিশেষ বন্ধু সরকারের কাছ থেকে আপাতত একশোখানি বই-এর permit পেয়েছেন—তাঁরা গল্প-ভারতী নাম দিয়ে প্রত্যেক মাসে একখানি করে দুশো পাতার বই প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেছেন। সাধারণ বাংলা বই-এর সাইজে ১৬ পাতা ফর্মা হবে। বইখানিতে শুধু ছোটগল্প থাকবে। আমি তার সম্পাদক হয়েছি। চাকরী ছাড়াও, এই গ্রন্থের সঙ্গে আমার নিজের মনের একটা সংযোগ আছে, ছোট গল্পকে আমাদের সাহিত্যে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া।

সম্পাদক ছাড়া, এই গ্রন্থ প্রকাশের পেছনে তাঁরা একটি সম্পাদকসঙ্ঘ তৈরী করেছেন। এই সঙ্ঘে তোমার নাম আমি চাই। প্রত্যেক মাসে এই সঙ্ঘের একবার করে অধিবেশন হবে। এই অধিবেশনে সম্পাদক-সঙ্ঘের মনোনীত সভ্য যিনি যোগদান করবেন তিনি রাহাখরচ স্বরূপ দশ টাকা পাবেন। এই হলো এক দফা।

দ্বিতীয় দফা হলো, এই গ্রন্থের জন্যে তোমার কাছ থেকে নিয়মিত লেখা চাই। প্রত্যেক প্রকাশিত লেখার দরুণ আর্থিক দক্ষিণার ব্যবস্থা আছে। আমি চাই, বনফুলের সেই এক পাতার গল্প···তীক্ষ্ণ, তীব্র, তড়িৎজ্বালাময়···

অথবা বনফুল যা ভাল বিবেচনা করে, তেমনি গল্প···

গল্পের এক কোণে তুমি যে মূল্য সঙ্গত মনে কর, একটুখানি লিখে দিও, আমি তাই-ই পাঠিয়ে দেবো—

মাঝে কলকাতায় এসেছিলে—শুনেছিলাম···

আজও তোমার সেই ল্যাবরেটরী ঘরটি ভুলিনি—

আমার প্রীতি জানবে এবং অতি সত্বর পত্রের উত্তর স্বরূপ লেখা পাঠাবে—আশাকরি, ব্যর্থ মনোরথ হব না।

Publication-এর respectibity সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। ইতি—

স্নেহধন্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

( ২৭ )

পূর্ণিয়া

৭ই জানুয়ারী, '৪৬

রাত্রি ঠিক ৮টা

প্রিয় বলাই,

বাজে কথা কওয়াটা আমার একটা বড রোগের মধ্যে। পত্রের উত্তর দেওয়াটাও আমার ব্রতের মধ্যে। শরৎবাবু বলেছেন, 'ও কাজটি ছেড়ে দিন, না হয় সাহিত্য সেবা ছেড়ে দিন। সাহিত্যিকের ওটি পরম শত্রু'। আমি অত বড় বিচক্ষণ বন্ধুর কথা রাখতে পারিনি। ১৫ বছর পরে সেকথার অর্থ বুঝলুম, বহু ক্ষতির পর অর্থাৎ আরো তিনচারখানা রাবিস বাড়াতে পারতুম তারা সেটা হবার সময় দেয়নি। এক হিসেবে ভালই করেছে, উপকার করেছে বললুম না, কারণ এ বাজারে রাবিসেরও চাহিদা যথেষ্ট দেখছি।

যাক্, পত্র লেখাটা সামর্থহীন হয়ে আপনিই কমেছে। তুমি লিখেছ 'অনেক দিন' পত্র পাওনি তাই লিখলুম। তার ওপর শীতটাও কম অভদ্রতা করছে না! এ গেল লেখাদির কথা। আবার 'হাতের' লেখার কথাও আছে। সেটাও শত্রুতা করছে কম নয়। দেখে কেহ বিশ্বাস করেনা যে আমি রোগী বা বয়োজীর্ণ অক্ষম। ওটা যে অভ্যাসবশে আমার কেরাণী জীবনের কলঙ্ক রূপে কাজ করছে, সেটা আর কি করে বোঝাব, এই আমার অবস্থা।

আর নয়, স্বভাবকে সম্মান দেওয়ার জন্যে, দুটো বাজে কথা কয়ে নিলুম, স্বস্তিও পেলুম।

এইবার যে কি লিখব জানি না। বরাবরই লিখে চলেছি একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—না ধর্ম, না নীতি, না জ্ঞান, না উপদেশ, কেবলমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকতো যদি কাকেও একটু আনন্দ দিতে পারি; সারা দিন পশুর খাটুনি খেটে শুষ্ক মুখে

বাসায় ফিরে, ছুটি মুড়ি মুখে দেবার পর তার আর স্বরাজের কথা কি জ্ঞান বা নীতির কথা পড়বার শখ থাকে না, পত্নীর সঙ্গে কথায় সাহস পায় না। সে সব পড়বার লোক আছে। আমি সেই অর্ধাসন ক্লিষ্ট ভায়েদের জন্যে বাজে কথা, রহস্যচ্ছলে দুঃখের কথা লেখবার ব্যর্থ প্রয়াস পেতুম মাত্র। তাই আমার জন্ম-তিথির কোনো সার্থকতা বুঝি না বলাই। শরীর সত্যের দিকে, মানে—যাবার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। এমন সময় তোমার সত্যিকার সদুদ্দেশ্য আমাকে বড়ই বিচলিত করেছে। যশের কথা সিদ্ধ সাধুদেরও অরুচিকর নয়। আমি যে কি লিখব ভেবে পাই না। সেদিন ডায়ারিতে লিখেছি—'না' কথাটি তার জন্মাবধি 'কটু', কাকেও তুষ্ট করে না—যিনি বলেন ও যিনি শোনেন, উভয়েই অসুখী হন। সত্য হলেও মিষ্টতা বর্জিত।

বিশেষ, যাকে অভিন্ন, আপন বলে ভাবি, তার অনুরোধ! আমার স্বগ্রামের ছেলেরা ওই অনুরোধটি প্রতি বৎসরই করছে, এবারেও করেছে। বলেছি 'আমার অবস্থায় এত পূর্বে কোন কথা বলা উচিত নয়, পরে লিখব। কিন্তু যাঁর আশায় বলি, তিনি সাহায্য করছেন না, মজা দেখছেন। দিনে এক প্রকার মন্দ থাকি না, রাত্রে তাঁকে অনেকটা কাছাকাছি পাই, যেন সঙ্গে নিলেন বলে। সেটা নিত্য নয়, এক-এক দিন। দিনে অনেকটা সহজ থাকি ইত্যাদি। যাক্ ··

ইতিমধ্যে কেমন থাকব জানি না, তাই ভাবছি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পূর্বে কাকেও কোনো কথা লেখা আমার উচিত নয়। আমার উপর দক্ষিণেশ্বরের প্রিয়দের দাবী সমধিক বা বড়। আবার তোমাদের কাছে যাবার ইচ্ছা কয়েকটি কারণে প্রবলতর—(১) তোমার বাড়িটি দেখা ও তার আনন্দ উপভোগ করা, (২) শ্রদ্ধেয় সত্যবাবুর[৪৩] প্রিয় সঙ্গ পাওয়া, (৩) কেয়ার গান শোনা, আর চতুর্থের মধ্যে আমার একটা গর্বের কথা আছে, যেটা তোমার শোনবার নয়—নেপথ্যেই বলছি—'বনফুলের আহ্বানের একটা স্বতন্ত্র ও বিশেষ মূল্য আছে। আমার মূল্য সঞ্চয়ের দিন গেলেও, তার আনন্দ সমধিক।

আজ ৮ই জানুয়ারী। খাবার জন্যে ডাক আসায় উঠতে হল। নাতিরা আপিসে বেরিয়ে গেছে। পত্র post করা হল না। দ্বিতীয় ডাক (postal) এলেন আহারের নয়, আঘাতের। Spain-এর একটা প্রবচন আছে One who strikes the second blow begins the quarrel. তাই ঘটালে দক্ষিণেশ্বরের দ্বিতীয় পত্র। তাদের দুখানি পত্রই তোমাকে পাঠাচ্ছি, ও বিচারকের আসন ছেড়ে দিচ্ছি। নিজের আমার আর বলবার কিছু নেই। যদি শরীর না সাহায্য

করে, কোথাও যাওয়া হবে না সেটা স্থির। যদি কোথাও যেতে পারি, অথচ দক্ষিণেশ্বরে না যাই, তার অপরাধ শেষ পর্যন্ত বহন করতে হবে। শাস্তি পাব না। পূর্বের যদি কিছু প্রিয় সঞ্চয় সপক্ষে থাকে, তার মূল্য আর থাকতে পারে না। যে কানাইবাবুর কথা পত্রে আছে ও যিনি সর্বশেষে বলেছেন 'বলিস তো আমি নিজে আনতে যাই।'—তিনি আমার একমাত্র বাল্যবন্ধু living, এই সঙ্গীন অবস্থায় আমি উপনীত।

বিষয়টি নূতন। পঞ্জিকায় এর জন্য ব্যবস্থা নাই, আদ্যশ্রাদ্ধ অপেক্ষা গুরুতর, নচেৎ ভাবা যেত। এখন ক্ষুব্ধ চিত্তে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সত্যবাবুকে ও সহৃদ উৎসাহী সুধীদের ও প্রীতিভাজনদের নমস্কার ও যোগ্য সম্ভাষণ জানান ছাড়া আমার মাথায় আর কিছু আসছে না বলাই। বাড়ীর সকলকে ও প্রিয়দের শুভাশীষ জানিও।

'মায়ের' উপর নির্ভর করে থাকতে চেষ্টা পাই, তিনি যা করবেন তাই হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটি জানবার উপায় নেই। মন খারাপ কর না। দক্ষিণেশ্বরেই যে যাওয়া হবে সে কথা কে বলতে পারে?

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনঃ—গেণু[৪৪] রুখলে, আজো পত্র post করতে দিলে না, ভাল করে দেখতে চায়! মানে—তোমার এই আত্মীয়সুলভ প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করতে সকলেরি লাগছে।—কে!

( ৩০ )

Bagnan P. O.
(Howrah)
14. 3. 46.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। তাহাতে আপনার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের সংবাদ আছে, তজ্জন্য আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং আনন্দ দুইই জানাইতেছি। দুইটি সংবাদই পূর্বে পাইয়াছিলাম। মাতৃবিয়োগে সন্তানমাত্রেরই কাতর হইবার কথা, যে হয় না সে 'মানুষ' নয়। বাড়ীখানির জন্য আপনাকে যেরূপে অর্থসংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং যে মূল্যে তাহা পাইয়াছেন তাহাও আপনার সাহিত্যিক

প্রতিভার পুরস্কার হিসাবে অভিনন্দনীয়। আমি সে বিষয়ে কিছু ভিতরের সংবাদ পাইয়াছিলাম, ইহাও শুনিয়া সুখী হইয়াছিলাম যে তাহাতে বন্ধুত্বের শক্তিও যুক্ত ছিল। আপনি শুধুই খ্যাতিমান নহেন ভাগ্যবানও বটে। সুস্থ ও সবল জীবনচর্যার সহিত সাহিত্য সেবার অকৃত্রিম নিষ্ঠা থাকিলে যাহা হয় আপনার তাহাই হইয়াছে। আমি জীবন ও সাহিত্যকে এক করিয়া দেখি বলিয়াই আপনার জীবনে তাহার প্রমাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছি, আমার আনন্দের ইহাও একটা কারণ।

আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। এতদিন করেন নাই কেন, তাহার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আমি আর সংসার বা সমাজের কেহ নই, ভদ্রসমাজের ত নইই; যে জীবনযাপন করিতেছি তাহাতে আমাকে স্মরণ করায় প্রত্যবায় আছে। আপনি শুধুই স্মরণ করেন নাই, এক্ষণে আপনার নিজ গৃহের গৃহস্বামীরূপে আমাকে আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ ও বিচলিত করিয়াছে। আপনার 'ভূয়োদর্শন' পড়িয়াছি। আপনাকে কোন উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষেও ধৃষ্টতা। আপনার গৃহে একদিন অতিথি হইয়াছিলাম, সে দিনের সেই কয় ঘণ্টার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া থাক। আমার আর সে দিন নাই, আমার সমাগমে সে আনন্দ আর পাইবেন না। সকলই কালের অধীন, দুঃখ করিয়া লাভ কি?

'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত্যাগের জন্য আপনি দুঃখিত হইয়াছেন। আপনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার—দুঃখটা কিরূপ? আমার জন্য, না বাংলাসাহিত্যের জন্য? আমি কি কেহ নই? আর সকলেরই জীবনের সুখ, দুঃখে সিদ্ধি ও ঋদ্ধিলাভে অধিকার আছে, নাই কেবল আমার? আমার সম্বন্ধে কেবল সাহিত্যসেবা, আর কোন দাবীর কথা ওঠে না, অর্থ বা যশ ত নহেই, এমন কি মান অপমানের কথাটাও অবান্তর! 'শনিবারের চিঠি' আমি ছাড়িয়াছি, সেটা বুঝি আমার পক্ষেও দুঃখকর নয়! নিজের হৃদপিণ্ড নিজে উৎপাটন করিয়া ফেলে যে, সে কি কম দুঃখে তাহা করে! কবি লিখিয়াছেন—

কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া পরেছ হাড়ের মালা।
কটির কাপড় দিয়াছ ফেলিয়া না জানি সে কত জ্বালা!

—এ জ্বালা কে বুঝিবে? 'শনিবারের চিঠি' আমার কি এবং আমিই বা 'শনিবারের চিঠি'র কে, তাহা ত আপনি কখন জানিবেন না, জানিলেও বিশ্বাস করিবেন না (তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি)। আপনি যাহা লিখিয়াছেন—তাহা ত সাহিত্যিক শিষ্টাচার মাত্র; এ ঘটনা যে বিশেষ কিছু নয়, আপনার মত আশাবাদী আত্ম-

প্রত্যয়শালী স্বাস্থ্যবান সাহিত্যিকের একটু সহানুভূতিই যথেষ্ট ; সেই সহানুভূতিও গভীর হইবার অবকাশ নাই, কারণ অপরপক্ষে আপনার একটা দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব প্রেমের—যে প্রেম সর্ব আপরাধ মার্জনা করিতেই উৎসুক। আপনি প্রেমিক, অতএব পুণ্যবান।

'জঙ্গম' প্রথম খণ্ড পাইয়াছিলাম তারপর আর কোন খণ্ড পাই নাই। আপনার আদর্শ চরিত্র জঙ্গমের যিনি নায়ক, তাঁহার কাহিনী আপনার হাতে কেমন কাব্যশ্রী লাভ করে তাহা দেখিবার ইচ্ছা ছিল ; তখন মনে হয় নাই যে, তাহার Counterfoil হিসাবে আমার চরিত্রটাও আবশ্যক হইবে। আপনারা আর্টিষ্ট, আপনাদের প্রয়োজনের ত অন্ত নাই! বাস্তবকে লইয়া যখন রসসৃষ্টি করিতে হয়, তখন কল্পনা একটু অধিক স্বাধীনতা দাবী করিবেই। শঙ্করের কাহিনী আপনি জানেন (যতটা জানা সম্ভব এবং আবশ্যক) কিন্তু আমার কাহিনী ত জানেন না ; তথাপি যেটুকু সাক্ষাতে দেখিয়াছেন এবং যাহা শুনিয়াছেন (অতি মূল্যবান সাক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই) এবং আমার যে সাহিত্যিক Personality, আপনার মত রসিক ব্যক্তির ভয় ভক্তি ও জুগুপ্সা উদ্রেক করে, এই সকল হইতে আপনি একটি পরম রমনীয় রসবিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন শুনিয়াছি। এখনও দেখি নাই তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? অতিশয় অসাহিত্যিক পাঠক যাহারা তাহারাই ইহার রস বুঝিবে না, আমার চারিত্রিক পরিচয় হিসাবেই উহা মূল্যবান মনে করিবে (শুনিলাম উহাতে স্ত্রীকে প্রহার করাও আছে), কিন্তু আপনি সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমাকে রসিক হইতে অনুরোধ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাকৃতজনসুলভ মনোবৃত্তির বশে আমি যেন ক্ষুব্ধ না হই। আমার সাহিত্যিক আত্মার অচলপ্রতিষ্ঠ রসিকতার প্রতি আপনার এই শ্রদ্ধাই আমাকে বিচলিত করিয়াছে। আমি সত্যই রসের ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছি, শুধুই সাহিত্যিক মান-অপমান নয়, আমার ব্যক্তিগত কোন্ অনুভূতিও নাই! সত্যই কি আমি দেহধারী জীব নই! এতদিন কি আমি আপনাদিগকে এমনই প্রতারিত করিয়াছি! লোক বলিতেছে ঐ চরিত্র আমারই, লোকে ত' অত আর্ট বোঝে না। আপনিও বলিতেছেন উহাতে আমার চরিত্রের 'ছাপ' আছে, সে ছাপটা কালির দাগ না রঙের ছাপ? আপনার নায়কের সুগভীর মনুষ্যত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়াছে ত?

পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল এবং লেখাও শিষ্টাচার সম্মত হইল না ; তাহার একটা কারণ, আমার Blood pressure আবার বাড়িয়াছে। আপনি কিছু মনে করিবেন

না; আমার দিন খুব সম্ভব ফুরাইয়া আসিয়াছে। জীবনে আমি আমার জন্য কিছুই চাই নাই। মৃত্যুকেও ভয় করি না। কেবল দুঃখ হয়, কি দেখিয়া গেলাম! এ যুগে এ সমাজে স্বার্থ ছাড়া কি আর ধর্ম নাই! ঐ স্বার্থ ব্যক্তির আত্মাস্তিক শক্তির সহায়ে দিকে দিকে কি মিথ্যা মহিমায় মণ্ডিত হইতেছে! জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ ও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে যে, পিশাচই দেবতার ছদ্মবেশে পূজা আদায় করিতেছে, এবং দেবত্ব ঘৃণিত ও বিকৃত হইতেছে! আমি বড় নই। কিন্তু বড়ত্বের স্পৃহা আমার ছিল। তাই আমি ধন-মান, পদ প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতায় কাহারও সহিত লড়ি নাই; বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম—

'When vice prevails and impious men bear sway.

The post of honour is a private station.'

এই private stationই আমার কাম্য ছিল, তাই নিজের রচনাও নিজের নামে প্রকাশিত করিতে চাহি নাই। কিন্তু সেই আমারও আজ কি লাঞ্ছনা! আজ রোগে শোকে এবং দারিদ্র্যের আসন্ন আক্রমণে আমি মুমূর্ষু ও মুহ্যমান্ তথাপি আমি মানুষকে ঈর্ষা করি না, আমার সত্য হইতেও বিচলিত হই নাই; বরং ইহাই মনে করিয়া উত্তরোত্তর বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইতেছি যে, এ যুগে বাংলায় সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে আমার মত ত্যাগী তপস্বী আর কেহ নাই, সমগ্র জাতির হইয়া আমি-ই এই অগ্নিহোত্র একা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলাম আর কেহ নাই—কেহ নাই! ইহাও আমার আত্মশ্লাঘা নয়, বড় দুঃখের কারণও বটে; যদি মরিবার আগে দেখিয়া যাইতাম আর একজনও এই অগ্নিহোত্রের ভার লইবে! সেই আমাকে অপমান ও আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। আমার সরস্বতী শিবপ্রণয়িণী সতী, সেই সতীর অপমান শিব সহ্য করিবেন না—ধনগর্বিত ও ঈর্ষামদমত্ত দক্ষ সর্বযুগেই আছে, শিবও সনাতন। মৃত্যুর অন্ধকারে ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

আপনাকে আর কি শুভ ইচ্ছা জানাইব?—আপনার সকল কামনা সফল হউক। এ কামনা আর না করিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, আপনি শক্তিমান, আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ এইমাত্র ডাক আসিল, আপনার 'উপহার' পৌঁছিয়াছে। ধন্যবাদ।

( ৩১ )

Tallygunj
41-13, Russa Road

ভাই বলাই,

তোমার পত্র পেয়ে খুব খুশী হলাম। তুমি উত্তরোত্তর উন্নতি করে বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কর্ণধার হও—এটাই আমার কামনা। তুমি গদ্যে পদ্যে সমান কৃতী—যাকে বলে সব্যসাচী। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, চুটকি, নকসা, গান—সাহিত্যের যতগুলো শাখা আছে সবগুলোতে তোমার সমান দক্ষতা। এমনটা ত কারো মধ্যে দেখি না ভাই। তাছাড়া আমাদের সাহিত্যরথীদের একটা বৈশিষ্ট্য—রচনা রঙ্গরসে সমৃদ্ধ হয়। Wit. Humour এর মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে সেটা তোমার চেষ্টাকৃত নয়—আপনা হতেই আসে। আর একটা কথা বিদ্যাবত্তা ও কালচার।

বিদ্যাবত্তা ও উচ্চশ্রেণীর কালচার না থাকলে উপাদান উপকরণের যোগানটা নিরবিচ্ছিন্ন হয় না। কাজেই একদিন রসভাণ্ডার ফুরিয়ে আসে। তখন কেবল পিষ্টপেষণ ও পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। তোমাব ভাণ্ডার ভরা—এবং সে ভাণ্ডারে গ্রন্থাদি হতে—অভিজ্ঞতা হতে নিত্যনতুন মালমশলা সরবরাহ হচ্ছে। এসব কথা আমার সুচিন্তিত মন্তব্য। তুমি ভাগলপুরে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এত আগে থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে না ভাই। তোমার রচনার সৌধ কালচারের মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

শরীর কেমন থাকবে—সাংসারিক পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে এখনই তা বলা যায়না। আমি যে কত জেরবার তা তোমাকে পত্রে কি জানাব? আমার লেখার দীনতা অনেকটা নানা অশান্তির জন্য। যাক যে সব কথা। তুমি আমার ভালবাসা জানবে ভাই। ইতি:—

তোমার
কালিদাসদাদা

( ৩২ )

Suniti Kumar Chatterji

Asutosh Building
The University of
Caicutta

24 January, 1948

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, এম-বি, ভাগলপুর।

প্রিয়বরেষু,

আপনার ১৮।১।৪৮ তারিখের চিঠির উত্তর দিতে কয়দিন দেরী হয়ে গেল—নিজের শরীর একটু অসুস্থ ছিল, তা ছাড়া বাড়ীতে স্ত্রী ও পুত্র দুজনেরই শরীর ভাল যাচ্ছে না। রোমান লিপি সম্বন্ধে আপনার যা আপত্তি, তা হ'চ্ছে চোদ্দ আনা লোকের আপত্তি, আর ঐ আপত্তি অতি স্বাভাবিক—চেনা অক্ষরগুলির বিশিষ্ট রেখা সমাবেশই আমাদের মনে একটা ছবি বা ভাব এনে দেয় সেটা ভাষা প্রয়োগের পক্ষে একটা কম সহায়ক নয়—ফরাসী 'শর্ম' থেকে বাঙলা 'সরম' এলেও ভাষাতত্ত্বের বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুমোদিত 'শরম' বানান নিতে ইচ্ছে হয় না; আর তার পরে তো আছে—'অনভ্যাসস্য ফোঁটা কপালে চচ্চড়ায়তে', রোমান বা অন্য অচেনা অক্ষরে পরিচিত বাঙলা ভাষা লিখতে বাধবেই। দেবনাগরী আমি বাঙলা লিপির মতই সহজে লিখি, পড়ি; কিন্তু তবুও স্বীকার করবো যে বাংলা অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত বই পেলে দেবনাগরী চাই না। বাঙলা অক্ষরে সংস্কৃত আরও যেন নিকটের বস্তু হয়ে পড়ে। তবে পরিচয়ের ফলে অচেনাও নিজের হয়ে যায়, আর বিশেষ যখন তাকে নিজেব করলে আমাদের নানা সুবিধা হবে বলে মনে হয়। এই পরিচয় একদিনে হবার নয়, সেই জন্য আমি মনে করি অন্ততঃ এক পুরুষ—দু পুরুষও লাগতে পারে—২৫ থেকে ৫০ বছর ধরে biliteralism অর্থাৎ দ্বিলিপিকতা চলবে—পাশাপাশি বাঙলা আর রোমান, অথবা দেবনাগরী আর রোমান, পরে কিছুকাল এই জুড়ি হাঁকিয়ে শেষে দেখা যাবে যে এক ঘোড়ায় কাজ আরও ভাল চলবে।

আপনার আমন্ত্রণ নেবার পক্ষে আমার এবার একটি অন্তরায় হচ্ছে আমি ইতিপূর্বেই বায়না নিয়ে ফেলেছি, তার জন্য সুর ভাঁজবো-ভাঁজবো করছি—আমার কয়েকজন রাজস্থানী ছাত্রের আগ্রহ, আমি জয়পুরে তাদের এক সংস্কৃতি-মণ্ডলে গিয়ে, ভারতীয় সভ্যতার সম্বন্ধে শ্রীপঞ্চমীর সময়ে একটা 'ভাষণ' হিন্দীতে দিয়ে আসি। একরকম রাজী হয়ে গিয়েছি, এখন হিন্দীতে গলাবাজীর মশলা গুঁড়োবার

উদ্যোগে আছি, অর্থাৎ ব্যবস্থা রচনা হাতে নেবো ভাবছি। এরা শাসিয়েছে, যদি সময়ের তাড়া থাকে তাহলে বায়ুযানের ব্যবস্থা করবে। দিল্লীতে মেয়ে জামাই দৌহিত্রী আছে, একদিন দিল্লীতে থাকতে পারা যাবে। তাছাড়া জয়পুরের আশেপাশে দুই একটি জায়গা ঐ সময়ে সেরে আসবার তাগিদ এসেছে। একেবারে পাকা ইন্তেজাম হয়নি, তবে কথা দিয়েছি, তাতেই তারা সব প্রবন্ধ করবার জন্য তৈরী হচ্ছে। সুতরাং বহুদিন পরে আপনার সঙ্গে সদালাপ করবার লোভ এবং গৃহিনীকেও সঙ্গে নিয়ে তাকে একটু হলিডে দেবার সুযোগ, দুইই আপাততঃ অনিচ্ছার সঙ্গে ত্যাগ করতে হচ্ছে।

আপনার 'অগ্নি' খানি পড়েছি—খুব চমৎকার হয়েছে। বর্ণনার সত্যতা অপূর্ব, যেমন বাইরের, তেমনি অন্তরের। অন্য বইখানা ছেলেমেয়েদের ( আর তাদের বন্ধুদের ) হাতে হাতে ঘুরছিল, salvage করে পড়তে হবে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'বোল্গা সে গঙ্গা'-র ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছে, From Volga to Ganga, এক ইংরেজ ICS-এর করা। রাহুলের কমিউনিষ্টদল ত্যাগ বিশেষ intriguing—একটা আধ্যাত্মিক বা মানসিক অস্বস্তি এর মধ্যে আছে, রাহুলের সম্বন্ধে যা শুনলুম তাতে তা মনে হয়। 'বোল্গা সে গঙ্গা'-তে অনেক ভুল আর বাজে কথা আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আধুনিক কমিউনিষ্ট দলের নেতাদের বাইরে প্রাচীনকালের, মধ্যযুগের আর আধুনিক অন্যসব দলের চিন্তানেতারা জোচ্চোর, মতলববাজ—আশাকরা যায় এই মনোভাবের উর্ধ্বে এখন তিনি উঠবেন। আপনার সেই ইতিহাসের ধারামূলক উপন্যাসে[৪৫] হাত দিয়েছেন? পারিবারিক অন্য সমস্ত কুশল তো? প্রীতি নমস্কার জানবেন। ইতি—

আপনার

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৪৬]

( ৩৩ )

চতুরঙ্গ কার্যালয়
৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-১৩
ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৫৪

সবিনয় নিবেদন,

আন্তর্জাতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি কবিতা ও গল্প সংগ্রহ পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশের

আয়োজন হইতেছে। আপনি নিজে আপনার দুইটি গল্প[৪৭] নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়া এ আয়োজনে সাহায্য করিলে বাধিত হইব। অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই মে-র মধ্যে রচনাগুলি পাঠাইবেন। সংগ্রহে প্রকাশিত রচনাগুলির যথোচিত সম্মানমূল্য দেওয়া হইবে। ইতি—

বিনীত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

( ৩৪ )

শান্তিনিকেতন

বীরভূম

৩১।১।৫৫

প্রীতিভাজনীয়েষু,

গত কাল নির্বিঘ্নে যথাস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। রাস্তায় সঙ্গী জুটিয়াছিল অরবিন্দ,[৪৮] কাজেই সময়ের দীর্ঘতাজনিত দুঃখ অনেকটাই প্রশমিত হইয়াছিল। ২৯।১।৫৫-এ নির্মলবাবু প্রেরিত দশ টাকা শান্তিনিকেতনে পৌঁছিয়াছিল—অর্থাৎ যে তারিখে সকালে ভাগলপুর হইতে আমার ফিরিবার কথা ছিল। নির্মলবাবু বলিয়াছিলেন টেলিগ্রামও তিনি আমাকে করিয়াছিলেন—সে টেলিগ্রাম আজও আসিল না। সম্ভবত টেলিগ্রাফিক মেসেজটা দ্রুত আসিতে গিযা পথে কোথাও পা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে—হয়ত কোনোদিন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া দেখা দিবে। কিন্তু তাহার পথ চাহিয়া উৎসুক হইয়া থাকিবার কোনো প্রয়োজন আর নাই।

দীর্ঘদিন পরে আপনাদের সঙ্গে যে দুদিন মিলিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল—সে দুদিন সত্যিই খুব আনন্দে কাটিয়াছে। পূর্বে যে পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে সৌজন্য এবং প্রচলিত ভব্যতার একটা সূক্ষ্ম আড়াল ছিল, যে আড়ালটা আমাদের উভয়ের আন্তরিকতাকে পরস্পরের কাছে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করিতে পারে নাই। এবার কিন্তু আপনাদের উদারতা ও আন্তরিকতা সবই অনবগুণ্ঠিত হইয়া আমার অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। এবার আপনার আটপহুরে চাল-চলনের মধ্যে বনফুলের সুষমার সত্যিকার পরিচয় পাইলাম। বনফুলের এবং সাজান গোছান বাগানের ফুলের অবদানের মধ্যে প্রভেদ কী সে কথা সাধারণকে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন অনেক সময় ঘটে,—কিন্তু সে প্রভেদের কথা আপনি

বোঝেন। কেননা, আপনি নিজের পরিচয় রসিক সমাজে 'বনফুল' নামে দিয়াছেন।

সেদিন যখন দূরবীণের সাহায্যে দূরের পাখীগুলিকে অত্যন্ত কাছে দেখিতে-ছিলাম তখন মনে হইতেছিল মনের চোখে প্রেমের দূরবীণ ঠিকমত লাগাইতে পারিলে অনেক দূরের জিনিস,—অনেক মনের অগোচর জিনিস অত্যন্ত আপনার হইয়া মনের কাছে আর চোখের কাছে সহজে ধরা দেয়। আবার সেই প্রেমের অভাবে কত কাছের জিনিস দূরে সরিয়া যায়—উড়িয়া যায়। আমাদের সচেতন মনের অজ্ঞাতসারে অনেক সময় মনের গভীর তলায় মাঝে মাঝে কোনো প্রচ্ছন্ন শক্তি বা ভাবের দূরবীণ অতি সহজে ভাবী ঘটনার, অদৃশ্য ঘটনার ব্যাপারকে মনের অনুভব-রাজ্যে এমন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। অথচ সাধারণ বুদ্ধিময় যুক্তি তর্কের দ্বারা সেই প্রচ্ছন্নভাব বা শক্তি যে কী বা কে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আপনার অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে কি বলে? জবাব অবশ্য দিবেন। আপনারা সকলে আমার প্রীতি গ্রহণ করুন। ধন্যবাদের সৌজন্য চর্চা করিব না। কেননা নির্মল প্রীতিরাজ্যে আপনাকে পাইয়াছি।

প্রীতিকামী শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

পুনঃ

নির্মলবাবু ও চণ্ডীবাবুকে[৪৯] আমার প্রীতি নমস্কার দেবেন—ও [illegible]। সত্যি যাচাই করবেন—আমাকে সেদিনকার সকলের ভাল লেগেছিল কিনা?

( ৩৫ )

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২

১৪।৪।৫৫

শ্রীযুক্ত ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১১ তারিখের এবং তার আগের চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি।

পূর্বে আমি রবীন্দ্রপুরস্কার-কমিটিতে ছিলাম, মতভেদের জন্য ছেড়ে দিই নিয়মাবলী সম্বন্ধে বরাবর আমি আপত্তি জানিয়েছি। আমাকে কেন পুরস্কার দেওয়া হল জানি না, বোধ হয় সব চেয়ে স্থবির বলেই। সত্য বলছি, বনফুল পুরস্কার পেলে আমার বেশী আনন্দ হত।

এককালে যার সদস্য ছিলাম সেই কমিটি কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ায় অস্বস্তি বো

করছি। অবশ্য টাকার মূল্য আছে, পাঁচ টাকা বা পাঁচ হাজার যাই হক। কিন্তু যা ঢেঁটরা না পিটিয়ে সহজভাবে হস্তগত হয় (যেমন ইনশিওরান্স কম্পানির বোনস) সেই টাকাই বেশী কাম্য মনে করি।

দাদার[৫০] লেখার একটি নির্বাচিত সংগ্রহ প্রকাশের চেষ্টা করছি। নরেনবাবু আমাশয় রোগে খুব ভুগেছেন, এখন সেরে উঠছেন। আপনি আবার কবে এখানে আসবেন? নমস্কার জানবেন।

আপনার

রাজশেখর বসু

( ৩৬ )

৫৩, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯

৫।৫।৫৫

কল্যাণীয়েষু বলাই,

তোমার কার্ডখানি পেয়ে কি সুখী হলাম বলতে পারি না। তোমার প্রতি আমার কর্তাদের[৫১] ব্যবহারে আমি লজ্জিত হয়েছিলাম। ভয়ে তোমাকে চিঠি লিখিনি, যদি তুমি তাদের ব্যবহারে আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে থাকো। মাঝে মাঝে রাজশেখর সাহস দেন 'বনফুলের ভেতর নীচতা নেই। তুমি খবরাখবর রেখো'।

সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছি। আমার ডাক্তারও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন ৭৭ বছর বয়সে আমি রক্ত আমাশয়কে এত সহজে ঘায়েল করে ফেলবো। তবে সাবধানে আছি। কিন্তু তোমার মাতাঠাকুরাণীর দৌবাত্ম্য বেড়েছে। ৫০ বছর পরে তাঁকে আর তাচ্ছিল্য করতে পারছিনে। তবুও আশা করে বসে আছি, বৌমার হাতের চিতলমাছ রান্না আবার খাবো। অরবিন্দ আশা দিয়েছে, বর্ষাকালে নিয়ে যাবে তোমার কাছে। কয়েকদিন সেখানে থেকে মনিহারীতে[৫২] নিয়ে যাবে মাছ ধরবার জন্য। রাজশেখরের সঙ্গে প্রায় দেখা হয়। বৃদ্ধটি (আমার চেয়ে ১॥০ বছরের ছোট) আমার অসুখের সময় ফল নিয়ে ২দিন এসেছিলেন। আমাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে গত জানুয়ারী মাসে বলাতে একটা পদ্য লিখে দেন তখন। তোমার ভাল লাগবে, তুলে দিচ্ছি।

পঞ্চাশ বছর পরে

**Be old with me,**

**The best is yet to be.**[১]

বুড়ো হও দুজনে থাকিয়া কাছে কাছে,
উত্তম ফল এখনও বাকী আছে ॥
অনেক বছর দুজনে করেছ ঘর,
বহু দোষ গুণ সহেছ পরস্পর।
যা কিছু ঘটেছে সব ভাল, সব ভাল,
আর যা ঘটিবে তাও ভাল, তাও ভাল।
বিধাতার যাহা ভাল লাগে ঘটে তাই,
চোখ কান বুজে সহা ছাড়া গতি নাই।
সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥[2]
সুখ বা দুঃখ প্রিয় অপ্রিয় যাহা পাও,
অপরাজিত হয়ে হৃদয়ে মেনে নাও।

১। Browning

২। মহাভারত

সজনীও ২দিন এসেছিলেন। সজনীর কাগজে রাজশেখরকে বৃথা আক্রমণ রছে। বছরখানিক আগে 'কথা সাহিত্যে' সজনী রাজশেখর সম্বন্ধে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। সেকথা আমি সজনীকে মনে করিয়ে দিয়েছি। রাজশেখর ও তারাশঙ্কর সম্বর্ধনায় রাজশেখরের উক্তি শোন। নির্মল[৫৩] লিখে নিয়েছিলেন—"দূর থেকে প্রশংসা শুনতে ভাল লাগে, সামনে শুনলে গালাগালের মতন শোনায়। ভগবান আমায় একটু কালা করেছেন, তাই সব কথা শুনতে পাইনি, এইটে আমার সুবিধা। আর মামুলি কথা বলব না। 'আপনারা যা বলেছেন, আমি তার যোগ্য নই। এ হল বঙ্গভারতীর প্রাপ্য ইত্যাদি' বলব না। এরকম বিপদে আমি পচরাচর পড়িনি। তারাশঙ্কর আমার চেয়ে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি আমার হয়ে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানান।' আশা করি সকলে ভাল আছ। সকলকে আমার ভালবাসা দিও। সময় পেলে উত্তর দিও। ইতি—

নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

( ৩৭ )

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয় নগর কলোনী
পুণা-২
৮।৫।৫৫

ভাই বলাই,

প্রায় মাসখানেক খুব হৈ হৈ করে কেটে গেল। পুণা থেকে রায়পুর, রায়পুর থেকে পুণা, পুণা থেকে বম্বে, বম্বে থেকে আবার পুণা। এতদিনে স্বস্থানে ফিরে এসে একটু ধাতস্থ হয়ে বসেছি। আমার নতুন পুত্রবধূটি[৫৪] দেখতে শুনতে ভালই হয়েছেন, অন্যান্য পরিচয় ক্রমশ পাওয়া যাবে। টুনু[৫৫] বৌ নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে, ওখানেই সংসার পাতবে। উপস্থিত সে কলকাতাতেই posted। আমার বড় এবং মেজ ছেলে বোম্বাইয়ে আছে, কারণ ওদের কর্মস্থল ওখানেই। ওরা তিনজনেই এখন স্বাধীন। আমাকে ছুটি দিয়েছে, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে পুণায় এসে কাশীবাস করছি। সঙ্গে আছেন সহধর্মিনী এবং নাতি। আমার এখনও ওই একটিই নাতি, সে আমাদের কাছেই থাকে, এখানকার স্কুলে পড়ছে।

বোম্বাইয়ে থাকা কালে আমার শরীর প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। পুণায় এসে অনেকটা ভাল আছি। সিনেমার সম্পর্ক ঘুচে গেছে, তার ফলে বাংলা লেখার অবকাশ পেয়েছি। এইভাবে শেষ দিনগুলো যদি কেটে যায় তাহলে নালিশ করবার আর কিছু থাকবে না। ছেলেদের বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিলাম, আমার সাংসারিক কর্তব্য সব হল।

তোমার এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান এবং পুণ্যবান, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ছেলেদের কোষ্ঠি দেখেছি, তারা ধীমান এবং সুকৃত, যথাসময় নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তুমি করবীর[৫৬] বিয়ের জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? তার তো এই সবে চৌদ্দ পূর্ণ হয়েছে, বিয়ের তাড়া নেই। কোষ্ঠি দেখেও মনে হল এখনও দেরী আছে, যদি না সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা খুবই কম। আমি এদিকে নজর রাখবো, যোগ্যপাত্র দেখলে নিশ্চয় তোমাকে খবর দেব। প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে এসেছেন, তিনিও তাঁর মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁর মেয়ের বয়স ২১।২২ হয়েছে। সুতরাং তোমার বেশী অধীর হবার কারণ নেই।

তোমার 'কিছুক্ষণ' সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে যা বুঝলাম তাতে মনে হয় রমেশ

সাইগল তোমার গল্প থেকেই তার ফিল্মের[৫৭] আইডিয়া নিয়েছে। ছবিটা আমি দেখিনি, কিন্তু যারা দেখেছে তারা বলেছে একই আইডিয়া। কিন্তু লোকটা ভারি ধূর্ত, ঘটনাসংস্থানে অনেক অদলবদল করেছে। তুমি যদি ব্যাটাকে ধরতে পারো তাহলে খুবই ভাল হয়। অন্তত উকিল মার্ফত একখানা চিঠি দিয়ে ভয় দেখাতে পারো। হয়তো কেলেঙ্কারীর ভয়ে টাকা দিয়ে মিটমাট করে ফেলতে পারে। একে তো ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় আমাদের গল্প নিয়মিত চুরি করে ছাপছে, এক পয়সা দেয় না। তার ওপর সিনেমাওয়ালারাও যদি পুকুর চুরি আরম্ভ করে তাহলে আমরা যাই কোথায়? এর একটা বিধান হওয়া দরকার।

আমার সাম্প্রতিক লেখা তুমি বোধ হয় কিছু পড়নি। পড়বার মত না, তবু লিখে যাচ্ছি, পাঠকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছি। যত বয়স বাড়ছে ততই মনে হচ্ছে মানুষের জীবনে গভীরতা নেই, serious সাহিত্যিকেরা গভীরতার একটা মিথ্যা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে পাঠককে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করছে। জীবনে যদি serious কিছু থাকে তবে ত—হাসি-কৌতুক—হেসেখেলে জীবনটা কাটিয়ে দেবার কৌশল। Paradox-এর মত শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি যা অনুভব করি তাই লিখলাম। আমার এই শঙ্করী-ধর্ম সত্ত্বেও যদি আমার লেখা পড়তে চাও বই পাঠাব।

আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। এদিকে এবার খুব গরম পড়েছে, ওদিকে তো পড়বেই। বেহারের গরম অনেকদিন ভুলে ছিলাম, এবার একটু একটু মনে পড়ছে।

আমার ভালবাসা নিও,

তোমার

শরদিন্দু

( ৩৮ )

টালিগঞ্জ

চারু এভিনিউ

৯।৫।৫৫

ভাই বলাই,

আশা করি ভালো আছ। তোমার 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পটা আমার ১টা Text

book-এ দিলাম—তুমি তোমার ১টা photo কিংবা ছাপা ফোটো পাঠিয়ে দিলে সুখী হইব।

একটা কবিতার Anthology করার ভার ছিল আমার উপর। তোমার আহবণীয় হতে শেষ কবিতাটা নিয়েছি, এর জন্য তোমার কাছে অনুমতির জন্য পত্র যাবে। আশা করি ভালো আছ। আমার শরীর আর বড় ভালো থাকছে না। তোমার পারিবারিক সংবাদ দিও। ইতি—

তোমার দাদা
শ্রীকালিদাস রায়

## পত্র-নির্দেশিকা

[ 'চিঠির বোঝা'র সংগৃহীত সব পত্রই 'ষষ্ঠি-মধু' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ]

১। বৈতরণী তীরে—বনফুলের দ্বিতীয় উপন্যাস। অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২। স্থইনবার্ণ—পুরো নাম Algernon Charles Swinburne (1837-1909) উনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কবি। ইন্দ্রিয়-লালসার জন্য তাঁর কবিতা সমালোচকদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিল।

৩। তৃণখণ্ড—বনফুলের প্রথম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ—পৌষ, ১৩৪২।

৪। আপনি যাহা লিখিয়াছেন—মোহিতলালের ৭।৪।১৯৩৭ তারিখের পত্রের উত্তরে বনফুলের প্রশংসাসূচক পত্র।

৫। নূতন বইখানি—'বৈতরণী তীরে' গ্রন্থ।

৬। পূর্বে লিখিয়াছিলাম—৭।৪।১৯৩৭ তারিখের পত্রের উল্লেখ।

৭। Hardy—ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮) Far from the Madding Crowd, The Return of The Native, The Mayor of Casterbridge প্রভৃতি তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত উপন্যাস।

৮। আরও দুইখানি বই—'তৃণখণ্ড' এবং 'বনফুলের গল্প'। 'বনফুলের গল্প' বনফুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত।

৯। ছেলেটিকে লইয়া—মোহিতলালের একটি শিশুপুত্র দীর্ঘদিন যাবৎ Nephrites রোগে ভুগছিল।

১০। ভূয়োদর্শন—'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১০।৬।১৯৪২ তারিখে। "শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ রচনা লিখতে লিখতে বনফুলের একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল। সেজন্য তিনি ঐ পত্রিকায়-ই একটু ভিন্ন স্বাদের রচনা লিখলেন। এখানে ব্যঙ্গ (satire) নয়, প্রকৃষ্ট হাস্যরস (Humour) সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য।"

১১। আলিবাবা—আরব্য উপন্যাসের একটি বিখ্যাত গল্প আলিবাবা। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'আলিবাবা' রঙ্গনাট্য এককালে বাঙালী-সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

১২। রসেটি—পুরো নাম Dante Gabriel Rossetti (1828-82)। কবি ও চিত্রকর। তাঁর বিখ্যাত সনেট The Blessed Damozel।

১৩। কাগজটা—বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়।

১৪। কিছুক্ষণ—বনফুলের চতুর্থ উপন্যাস। প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪।

১৫। শ্রীমধু—'শ্রীমধুসূদন' নাটক।

১৬। লদকালদকি—বনফুলের 'জঙ্গম' উপন্যাস। এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ভন্টুর ব্যবহৃত শব্দ। 'জঙ্গম' প্রথম খণ্ড প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ, ১৩৫০ তারিখে। তার পূর্বে উপন্যাসটি ক্রমশঃ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৭। মধুসূদন—বনফুল রচিত 'শ্রীমধুসূদন' নাটক।

১৮। বনফুলের আরও গল্প—বনফুলের দ্বিতীয় গল্পসঙ্কলন গ্রন্থ। প্রকাশের তারিখ ১১।৮।১৯৩৮।

১৯। খুকি—বনফুলের ছোট বোন। নাম উমা।

২০। নিত্য জান দিচ্ছে—বনফুলের বাড়িতে মুরগী জমা ছিল। তিনি রোজ একটা করে মুরগী খেতেন।

২১। ভায়ারা—নিহত পাখীগুলো। বনফুল তখন রক্তের নিম্নচাপে ভুগছিলেন।

২২। আপনার গল্পের বইখানি—'বনফুলের গল্প' গ্রন্থখানি।

২৩। আপনার শেষ বইখানি—বনফুলের 'নির্মোক' উপন্যাস।

২৪। 'কিছুক্ষণ'—বনফুলের চতুর্থ উপন্যাস।

২৫। আমার উত্তরের উদাহরণ—কিছুক্ষণ উপন্যাসটির ঘটনাকাল একটি ট্রেন দুর্ঘটনার পর বিলম্বিত আরেকটি ট্রেনের আসার মধ্যবর্তী কাল। বলতে গেলে একটি দিনের ঘটনা।

২৬। আপনার সাহিত্যিক উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা—প্রাচীনকালে রামায়ণ মহাভারতের মত বিরাট কাব্য ছিল। বর্তমানে সাহিত্যের মূল বাহন গদ্য। গদ্যের মাধ্যমে বনফুল সমকালীন জীবন অবলম্বনে একটা বিরাট উপন্যাস রচনার কথা ভাবছিলেন। তারই ফল বোধ হয় 'জঙ্গম' উপন্যাস।

২৭। টুলু—বনফুলের ভ্রাতা। নাম গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়।

২৮। রবিবাবু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৯। দু দুবার প্রবল আঘাত—সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সামরিক বিভাগে কাজ করতেন। কাজের তাগিদে তিনি একবার চীনে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় আঘাত এসেছিল তার একমাত্র জামাতার মৃত্যুতে। কেদারনাথ ছিলেন প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

৩০। রাজপুতানা—রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের একটি অনবদ্য কবিতা।

৩১। কেয়া, অসীম, খোকা—বনফুলের বড় মেয়ে এবং দুই ছেলে।

৩২। ঝোলে ঝালে অম্বলে—ডাক্তারি, সাহিত্যচর্চা এবং সংসারের ব্যাপারে বনফুলকে তখন খুবই ব্যস্ত থাকতে হোত।

৩৩। M. Crawford—আমেরিকান ঔপন্যাসিক। পুরো নাম Francis Marion Crawford ( 1854-1909 )। তিনি Indian Herald পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলাহাবাদে ছিলেন।

৩৪। মোহমুক্তি—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নাটক।

৩৫। ভৌতিক—'বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা' দ্রষ্টব্য।

৩৬। প্রোলেটারিয়েট— ঐ

৩৭। একটি নাটিকা—'কঙ্কি' 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত।

৩৮। বাণপ্রস্থ—'দশভাণ' নাটক সংকলন-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩৯। ফাঁকি দিয়াছেন—'সিনেমার গল্প' চিত্রনাট্যটি 'দ্বৈরথ' উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

৪০। অরবিন্দ—বনফুলের ভ্রাতা। বর্তমানে চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

৪১। ঘণ্টামারা—পক্ষী সম্বন্ধে পেঙ্গুইনের বই।

৪২। গল্পসংগ্রহ—বনফুলের প্রস্তাবিত ছোটগল্পের সংকলন গ্রন্থ। এই নামে পরেও কোন পুস্তক প্রকাশিত হয়নি।

৪৩। সত্যবাবুর—বনফুলের পিতা। শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়।

৪৪। গেন্থ—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি।

৪৫। ধারামূলক উপন্যাসে—বনফুলের 'স্থাবর' উপন্যাস।

৪৬। সুনীতিকুমার—সুনীতিকুমার এই সময়ে দেবনাগরী লিপিতে বাংলা ভাষা প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

৪৭। আপনার দুটি গল্প—বনফুলের একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির নাম চান্দ্রায়ণ। গ্রন্থটির নাম Green & Gold ( 1956 ), গল্পটি হুমায়ুন কবির ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। নাম One of Those।

৪৮। অরবিন্দ—বনফুলের ভ্রাতা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

৪৯। নির্মলবাবু ও চণ্ডীবাবু—নির্মলবাবু বনফুলের ভ্রাতা। চণ্ডীবাবু বা চণ্ডীচরণ ঘোষ ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভাগলপুর শাখার সম্পাদক।

৫০। দাদার লেখার—শশিশেখর বসুর রচনাবলী।

৫১। আমার কর্তাদের—সচিত্র ভারতের কর্মচারীদের।

৫২। মনিহারিতে—বনফুলের পৈত্রিক নিবাস।

৫৩। নির্মল—নির্মল বসু ( নৃতত্ত্ববিদ )।

৫৪। নতুন পুত্রবধূ—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেজছেলের বৌ।

৫৫। টুনু—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেজ ছেলে।

৫৬। করবী—বনফুলের ছোটমেয়ে।

৫৭। তার ফিল্মের—বনফুলের 'কিছুক্ষণ' উপন্যাস হিন্দীতে অনূদিত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র পেয়ে বনফুল রমেশ সাইগলকে উকিলের চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে শেষ পর্যন্ত ফিল্মটি বন্ধ হয়ে যায়।

পত্রগুচ্ছ সম্পাদন এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছেন ডঃ সরোজমোহন মিত্র।